'আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে
সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি, এখন উপদেশ
নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?'
(সূরা ক্বামার : ১৭)
তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ
সহজ বাংলায়
আল কুরআনের
অনুবাদ
তৃতীয় খণ্ড
সূরা আহ্‌কাফ থেকে সূরা নাস
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর
উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ
অধ্যাপক গোলাম আযম

তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ

সহজ বাংলায়

আল কুরআনের অনুবাদ

তৃতীয় খণ্ড

সূরা আহ্‌কাফ থেকে সূরা নাস

তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ

সহজ বাংলায়
আল কুরআনের অনুবাদ

তৃতীয় খণ্ড

সূরা আহ্‌কাফ থেকে সূরা নাস

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর
উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ
অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

দ্বাদশ মুদ্রণ : জুলাই ২০১৩
একাদশ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১২
দশম মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১১
নবম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১১
অষ্টম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১০
সপ্তম মুদ্রণ: মার্চ ২০০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৮
প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৬

সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (তৃতীয় খণ্ড: সূরা আহ্‌কাফ থেকে সূরা নাস) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি (৮ম   লা), পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ © অনুবাদক ❖ বর্ণবিন্যাস: কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা।

e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : দুই শত সত্তর টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 47 3

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে আল কুরআনের এই মহতী উদ্যোগের সাথে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এ গ্রন্থখানি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রচিত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের শেষ পাঁচ পারার সার-সংক্ষেপ।

এ গ্রন্থের অনুবাদক পরম শ্রদ্ধাভাজন মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম দীর্ঘ দিন থেকে সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা পৌছানোর উদ্দেশ্যে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় বেশ কিছু বই-পুস্তক রচনা করছেন। 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়', 'মযবুত ঈমান', 'সহীহ ইলম ও নেক আমল', 'জীবন্ত নামায', 'আদম সৃষ্টির হাকীকত', 'কুরআন বোঝা সহজ' 'ইসলাম ও বিজ্ঞান, 'ইসলাম ও দর্শন', 'প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা', 'আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক' ইত্যাদি শিরোনামের অনেক বই ইতোমধ্যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাধারণ স্বল্প-শিক্ষিত লোকদের মাঝে কুরআনের আলো পৌছে দেওয়ার সুতীব্র বাসনা নিয়েই লেখক 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ'-এর সহজ বাংলা অনুবাদ করার কঠিনসাধ্য কাজটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

অত্যন্ত চমৎকার সাহিত্যিক মানের ভাষা আয়ত্তে থাকার পরও তাঁর পক্ষ থেকে সহজ ভাষায় ইসলামের এ খিদমত বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলেই আমরা মনে করি।

কামিয়াব প্রকাশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে, আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তায় আমরা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত। আল্লাহ তাআলা এ খিদমতকে আমাদের সকলের জন্য আখিরাতে নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট

বিশেষ পরামর্শ

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়ার তাওফীক দিয়েছেন। এটা আপনার উপর মহান মা'বুদের বিরাট রহমত। সূরা আর রাহ্‌মানের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন, "সকল দয়ার যিনি অধিকারী, তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" অর্থাৎ, কুরআন শিখতে পারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়া।

এ গ্রন্থ পড়ার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটি জরুরি পরামর্শ দিচ্ছি :

১. 'কুরআনের আসল পরিচয়' শিরোনামে শুরুতেই যে লেখাটি আছে তা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিন। তাহলে কুরআনের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যাবে এবং কুরআন বোঝা সহজ হবে।

২. অনুবাদ পড়ার আগে কমপক্ষে এক রুকূ' বা একটি সূরা সুরের সাথে স্পষ্ট উচ্চারণে তিলাওয়াত করুন। রাসূল (স) সুরেলা আওয়াজে তিলাওয়াত করার তাকীদ দিয়েছেন। নীরবে এক আয়াত করে পড়েই যদি অনুবাদ পড়া হয়, তাহলে তিলাওয়াতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

৩. তিলাওয়াত শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করুন এবং কুরআন বোঝার তাওফীক চেয়ে দো'আ করুন।

৪. সূরার পরিচিতি ধীরে-সুস্থে পড়ে সূরা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করুন।

৫. 'আলোচনার ধারা' শিরোনামে লেখা পয়েন্টভিত্তিক আলোচনা পড়ে সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করুন।

৬. অনুবাদ পড়ার সময় সংশ্লিষ্ট টীকা পড়ুন ।

৭. যদি কোথাও মর্মকথা বুঝতে অসুবিধা বোধ হয় তাহলে আলোচনার ধারায় সংশ্লিষ্ট পয়েন্টে লেখা ব্যাখ্যা পড়ুন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন বোঝার ও মজা পাওয়ার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ভূমিকা

১৯৫২ ও '৫৩ সালে কুরআন বোঝার উদ্দেশ্যে কয়েকটি অনুবাদ ও তাফসীর (টীকাসহ) বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় যোগাড় করে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করলাম। বিএ পর্যন্ত আরবী ভাষা পাঠ্যসূচিতে থাকা সত্ত্বেও কুরআনকে সরাসরি বোঝার যোগ্যতা আমার নেই মনে করে এ প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে বই-পুস্তক পড়ার উপরই নির্ভর করতে হলো। তখন আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক।

১৯৫৪ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। উত্তরবঙ্গে জামায়াতের দায়িত্বশীল জনাব আবদুল খালেক সংগঠনের কর্মীদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক বৈঠকে কয়েক মাস দারসে কুরআন দিলেন। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তিনি কুরআন বোঝার টেকনিক (কৌশল) সম্পর্কে এমন চমৎকার আলোচনা করলেন যে, আমার মনে হলো, এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে কুরআন বোঝা শুধু সম্ভবই নয়; সহজও।

আমি বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম যে, এ টেকনিক আপনি কোথায় পেলেন? বললেন, তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা থেকে শিখেছি। আমি পূর্বে এ টেকনিক না জানার কারণে কুরআন অধ্যয়ন ক্ষ্যান্ত করলাম। এখন এ পদ্ধতি জেনে তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করার জন্য পাগলপারা হয়ে গেলাম; কিন্তু তখনো ঐ তাফসীরের বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি। বাধ্য হয়ে রংপুর কলেজের উর্দু ভাষার অধ্যাপকের সাহায্য নিয়ে উর্দু ভাষা শিখে তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করলাম। 'কুরআন বোঝা সহজ' শিরোনামে বই লিখে ঐ কৌশলকে তুলে ধরলাম।

তাফহীমুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ

একটি সাধু ভাষায় ও আরেকটি চলতি ভাষায় বাংলায় তাফহীমুল কুরআনের দু রকম অনুবাদ বাজারে চালু আছে। অল্প শিক্ষিতদের উপযোগী ভাষায় এর অনুবাদ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করলাম। আমি ইসলাম সম্পর্কে যত বই লিখেছি, সবই তাদের উপযোগী সহজ ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত বিশাল তাফসীরের সহজ ভাষায় অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলে অসহায়বোধ করলাম।

'তরজমায়ে কুরআন মজীদ'-এর অনুবাদ

যারা বিশাল তাফসীর পড়তে সাহস করবে না তারাও যাতে মাওলানা মওদূদীর অনুবাদ পড়ে কুরআনকে বুঝতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তিনি 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ' নামে আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তাফসীরের বদলে এমন সংক্ষিপ্ত টীকা লেখার ব্যবস্থা করেন, যা না হলে শুধু অনুবাদ পড়ে কুরআন বোঝাই যায় না।

আমি এ গ্রন্থটিরই অনুবাদ করেছি। 'সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ' নামে তিন খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে সাড়ে বারো পারা, দ্বিতীয় খণ্ডে সাড়ে বারো পারা এবং তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে, শেষ পাঁচ পারা।

শেষ পাঁচ পারার কথা

আল কুরআনের মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে শেষ পাঁচ পারায় ৬৯টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টিই মাক্কী সূরা। সহজ বাংলায় তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব না হলেও শেষ পাঁচ পারার তাফসীরের সংক্ষিপ্ত-সার লেখা অত্যন্ত জরুরি মনে করলাম। প্রথমে আমপারার সূরাগুলো করলাম। ১৯৮২ সালে আমপারার সার-সংক্ষেপ প্রথম প্রকাশিত হয়। এর ব্যাপক চাহিদা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শেষ দিক থেকেই ১ পারা করে ২৬ পারা পর্যন্ত রচনা করলাম। ২০০৯ সালে আমপারার সার-সংক্ষেপের ১৯তম মুদ্রণ হওয়ায় এর ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

'সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ'-এর তৃতীয় খণ্ডে তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ থাকায় প্রথম খণ্ডের সমান আকার ধারণ করেছে। এতে সূরা ফাতিহাসহ মোট ৭০টি সূরার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর সহজ বাংলায় এতে পরিবেশন করা হয়েছে।

মহান মাবুদের নিকট কাতরভাবে দু'আ করি, যাতে এ গ্রন্থটি তাঁর বাংলাভাষী বান্দাহ-বান্দীদের নিকট ব্যাপকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন।

গোলাম আযম
ফেব্রুয়ারি, ২০১০

সূচিপত্র

তৃতীয় খণ্ড

সূরা আহ্‌কাফ থেকে সূরা নাস

—৩য়/৩-ক

৪৬. সূরা আহ্কাফ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ২১ নং আয়াতের একটি শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরার ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি নবুওয়াতের দশম বছরের শেষ দিকে অথবা এর পরের বছরের শুরুতে নাযিল হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবুওয়াতের দশম বছরটি রাসূল (স)-এর জীবনে চরম কঠিন বছর ছিল। কুরাইশদের সব গোত্র মিলে রাসূল (স)-এর গোটা হাশেমী বংশকে 'শি'বে আবী তালিব' নামক এক উপত্যকায় তিন বছর বন্দীদশায় রেখেছিল। গোটা মক্কাবাসী তাদেরকে বয়কট করে রেখেছিল। ঐ উপত্যকার বাইরে থেকে কোনো খাবার এমনকি পানি পর্যন্ত ভেতরে যেতে দেওয়া হয়নি। ফলে গোটা হাশেমী বংশের লোকদের কষ্টের সীমা ছিল না।

আল্লাহ! আল্লাহ! করে যখন এ কঠিন অবরোধ থেকে তিন বছর পর মুক্তি পাওয়া গেল, তখন মাত্র দু মাসের মধ্যে রাসূল (স)-এর সবচেয়ে আপন দুজন লোক ইন্তিকাল করেন— প্রথমে তাঁর চাচা আবূ তালিব এবং পরে বিবি হযরত খাদীজা (রা)।

তাঁর চাচা ছোটবেলা থেকেই পিতার স্নেহ দিয়ে তাঁকে লালন-পালন করেছেন এবং নবুওয়াতের দশটি বছর কুরাইশদের বিরোধিতার মুকাবিলায় রাসূল (স)-কে হেফাযতের উদ্দেশ্যে মযবুত ঢালের ভূমিকা পালন করেছেন।

আর তাঁর বিবি একদিকে নিজের ব্যবসায়ের সমস্ত ধন-সম্পদ নবুওয়াতের মিশন পালনে খরচ করেছেন, অপরদিকে তিনি নবুওয়াতের শুরু থেকে সকল আপদ-বিপদে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির প্রধান উৎস ছিলেন। এ কারণেই এ বছরটিকে রাসূল (স) 'আমুল হুয্ন' (বেদনাদায়ক বছর বলে) উল্লেখ করতেন।

এ দুজন প্রধান সহায়ক ব্যক্তিত্ব বিদায় হওয়ার পর কুরাইশরা আরও জোরেশোরে বিরোধিতায় লেগে গেল। তারা রাসূল (স)-কে এতই বিরক্ত করতে লাগল যে, ঘর থেকে বের হওয়াই মুশকিল হয়ে গেল।

মক্কার ময়দান সংকীর্ণ হওয়ায় রাসূল (স) বড় আশা নিয়ে তায়েফ গেলেন। দীনের দাওয়াত কবুল না করলেও তায়েফবাসীরা তাঁকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে বলে মনে করে বনূ সাকীফের সরদারদের কাছে গেলেন। তারা রাসূল (স)-কে তায়েফ থেকে বের করে দিল এবং ফিরে আসার সময় দুষ্ট ছেলেরা তাঁকে পাথর মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল।

রক্তমাখা অবস্থায় ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আল্লাহর নবী তায়েফের বাইরে এক বাগানের দেয়ালের ছায়ায় বসে আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে দু'আ করতে লাগলেন। আকাশে মেঘ ছেয়ে গেছে মনে করে

উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখলেন। তিনি বললেন, 'হে রাসূল! তায়েফবাসীদের ব্যবহার আপনার রব দেখেছেন। তায়েফের পাহাড়গুলোর জিম্মাদার ফেরেশতাকে তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা হুকুম করতে চান করুন।' তখন ফেরেশতা রাসূল (স)-কে সালাম দিয়ে বললেন, 'আপনার হুকুম পেলে পাহাড়গুলো দিয়ে তাদেরকে পিষে মেরে ফেলব।' রাসূল (স) জবাবে বললেন, 'না, আমার আশা যে, এদের ঘরেই আল্লাহর বান্দাহ সৃষ্টি হবে।'

এরপর তিনি 'নাখলা' নামক এক জায়গায় কিছুদিন রইলেন। এরই মধ্যে কোনো একদিন তিনি নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করার সময় একদল জিন ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কুরআন শুনে তাঁর উপর ঈমান আনল এবং নিজেদের কাওমে গিয়ে ইসলামের তাবলীগ শুরু করল।

আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে জানালেন, মানুষ আপনার দাওয়াত কবুল না করলেও জিনেরা তা কবুল করে এ দাওয়াত জিন জাতির মধ্যে ছড়াচ্ছে।

এ সূরার আলোচ্য বিষয়

মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। কাফিররা যে গুমরাহির মধ্যে ডুবে আছে, এর মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে তাদের ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাদের ধারণা যে, রাসূলের দাওয়াত সত্য হলে সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা অবশ্যই কবুল করত। কিয়ামত, আখিরাত, পুরস্কার ও শাস্তির কথা পুরনো কাহিনীমাত্র। তাদের প্রতিটি ভুল ধারণা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে এবং কুরআনের ডাকে সাড়া না দিলে তাদের কী দশা হবে, তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে কুরআন মুহাম্মদ (স) তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন তা তাঁর রচনা নয়; স্বয়ং ঐ আল্লাহ এ কিতাব নাযিল করেছেন– যিনি এমন মহাশক্তিশালী, তাঁর কথা অমান্য করলে এর পরিণাম থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। মহান কৌশলী হিসেবে তাঁর কিতাবে যেসব হুকুম রয়েছে, তা তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই দিয়েছেন। তাঁর কোনো কথাই ভুল বা ক্ষতিকর নয়।

তিনি আসমান ও জমিন অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এর পেছনে বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে। এ দুনিয়া চিরদিন থাকবে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আরেক দুনিয়া তৈরি করা হবে, যেখানে সবার হিসাব-নিকাশ নিয়ে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

এ সৃষ্টিজগৎ সত্যসহকারে বা সত্যতার সাথে সৃষ্টি করার কথা বহু সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ বড়ই ব্যাপক।

মানুষকে ভালো ও মন্দের চেতনা দিয়ে সৃষ্টি করে তাদেরকে যেমন খুশি তেমন দুনিয়ায় চলার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। গোটা সৃষ্টিজগৎকে তাদের মর্জিমতো ব্যবহার করার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ তার জীবনে যা করে এর ভালো ও মন্দ ফল অবশ্যই আছে। এটাই যুক্তি ও ইনসাফের দাবি যে, যিনি এসব মানুষকে দিয়েছেন তিনি একদিন এর হিসাব নেবেন। ভালো ও মন্দের পরিণাম এক হতে পারে না। তাই সত্যতার সাথে এ বিশ্বসৃষ্টির অর্থ গভীরভাবে বুঝতে হবে।

প্রথম অর্থ হলো– আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি শিশুর খেলনা ঘর তৈরি করে আবার ভেঙে ফেলার মতো খেলাচ্ছলে এ দুনিয়া সাজাইনি। এক সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। ঐ উদ্দেশ্য কে, কতটুকু পূরণ করল তা অবশ্যই আখিরাতে যাচাই করা হবে।

দ্বিতীয় অর্থ হলো– আল্লাহ বলছেন, আমার গোটা সৃষ্টি হক, ইনসাফ ও যুক্তির ভিত্তিতে নির্মিত। বাতিলের কোনো ভিত্তি নেই। তাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে হককে অবহেলা করে চললে পরিণামে অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

তৃতীয় অর্থ হলো– সারা জাহান সত্যিই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সবকিছুর উপর তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এ সত্যের উপরই কায়েম আছে। এখানে আর কারো স্থায়ী ক্ষমতা নেই। যাকে তিনি যেটুকু যতদিনের জন্য দেন এর বাইরে কেউ কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

৪-৬ নং আয়াতে শিরকের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি দেখানো হয়েছে। আল্লাহর সাথে শরিককৃত অন্য কোনো শক্তি ও ব্যক্তি তাঁর কোনো গুণ বা কাজের অংশীদার নয়। কিন্তু অংশীদার মনে করেই মুশরিকরা তাদেরকে ডাকে ও তাদের পূজা করে। অথচ আল্লাহর যাত (সত্তা) ও সিফাতে (গুণাবলিতে) অন্য কেউ কোনো দিক দিয়েই শরিক নয়।

তাই এখানে রাসূল (স)-কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করুন, সৃষ্টিজগতের কোন্ জিনিসটা তারা সৃষ্টি করেছে, যাদেরকে তারা মা'বুদ বলে ডাকে? একমাত্র আল্লাহই তো সব কিছুর স্রষ্টা। তাহলে কোন্ যুক্তিতে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তারা ডাকে? তাদের কাছে আগের কোনো রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ-প্রেরিত কোনো কিতাবে কি শিরকের পক্ষে কোনো কথা আছে? অথবা আগের কোনো নবী বা বুজুর্গ লোকের শিক্ষায় কোনো প্রমাণ থাকলে তা পেশ কর।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা নেহায়েত বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কাছে কিছু চাওয়া অর্থহীন। কোনো দেব-দেবী, মূর্তি বা বুজুর্গদের মাযারে যতই ডাকা হোক, তাদের পক্ষ থেকে কোনোদিন সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, তারা জানতেও পারে না যে, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে। তাই তাদের কাছে ধরনা দেওয়া একেবারেই হাস্যকর।

হাশরের ময়দানে যখন সবাই জমায়েত হবে তখন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডেকেছে তারাও হাজির হবে, আর যাদেরকে ডাকা হতো তারাও উপস্থিত থাকবে। যাদেরকে মা'বুদ বানানো হয়েছিল তারা সেদিন তাদের ভক্তদের দুশমন হয়ে যাবে এবং ভক্ত বলে স্বীকারও করবে না।

৭ ও ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখন রাসূল (স) কুরআনের স্পষ্ট আয়াতগুলো জনগণকে পড়ে শোনান তখন কাফিররা তা মেনে না নিয়ে মন্তব্য করে যে, এসব কথা যাদু ছাড়া কিছুই নয়। কুরআনের ভাষা ও কথার এতটা আকর্ষণ কাফিররাও অনুভব করত যে, এসব কথা সাধারণ মানুষের হতে পারে না। এ কথা বুঝেও তারা আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করত না। কুরআনের আকর্ষণীয় বাণীকে তারা যাদু বলে উড়িয়ে দিত।

যাদু হোক আর যাই হোক এসব কথা তো রাসূল (স)-এর মুখেই তারা শুনতে পেত। তাই আল্লাহ প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কি কাফিররা মনে করে যে, কুরআনের আয়াতগুলো রাসূল (স) রচনা করেছেন?

আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি কাফিরদেরকে বলুন, আমি যদি নিজের রচিত কথা আল্লাহর নামে প্রচার করি তাহলে আল্লাহ আমাকে অবশ্যই পাকড়াও করবেন; তখন তোমরা তো আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাহলে কোন্ সাহসে আমি এমন কাজ করতে পারি? যাহোক, কুরআন আল্লাহর বাণী কি না, সে বিষয়ে আল্লাহ নিজেই সাক্ষী। তোমরা তা স্বীকার না করলে আমার কিছুই আসে যায় না।

তবে যদি তোমরা আল্লাহর কথা মেনে নাও তাহলে তোমাদের এতদিনের বিরোধিতার গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এ কারণেই তোমরা হঠকারিতা ও কুরআনের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে এখনো পাকড়াও করেননি। তিনি তোমাদেরকে সময় দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচতে হলে আর দেরি না করে কবুল করে নাও।

৯ ও ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে উপদেশ দিয়েছেন, কাফিরদেরকে বোঝানোর জন্য কীভাবে কথা বলতে হবে। হে রাসূল! আপনি তাদের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকের নিকট আপিল করে বলুন, 'দেখ মক্কাবাসীরা! রাসূল হিসেবে আমিই প্রথম ব্যক্তি নই। আমার আগে ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) এবং আরও অনেক রাসূল এসেছিলেন, যাদের কথা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। আমি তো তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানির পরিণাম সম্পর্কে সাবধানই করতে পারি। আমার হাতে তো আর কোনো ক্ষমতা নেই। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যা হুকুম করেন আমি তা-ই করি। আমি অন্য কোনো গায়েবী ইলমের মালিক নই।

তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখ তো, এ কুরআন যদি সত্যি আল্লাহরই বাণী হয়ে থাকে তাহলে তা অমান্য করলে তোমাদের কী দশা হবে? আল্লাহর বাণী হিসেবে কুরআনকে স্বীকার করে নিতে কী কারণে তোমাদের আপত্তি?

'আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারটা তো নতুন কিছু নয়। ইতঃপূর্বে বনী ইসরাঈলের নিকট আল্লাহর বাণী পেশ করা হলে তোমাদের মতো লোকেরাই তা মেনে নিয়েছে। এটাকে অসম্ভব মনে করার কী কারণ থাকতে পারে?

আসলে তোমাদেরকে অহংকারে পেয়ে বসেছে। বাপদাদার কাল থেকে যেভাবে চলে এসেছ তা ছেড়ে কুরআনের কথা মেনে নিতে তোমাদের আত্মসম্মানে কেন বাধে? তোমরা যদি বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে বিচার করতে না চাও তাহলে এমন বিবেকহীন লোকদেরকে আল্লাহ হেদায়াত পাওয়ার তাওফীক দেন না। তোমরা না মানলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। তোমরাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দ্বিতীয় রুকূ

১১ নং আয়াতে কুরআনের প্রতি ঈমান না আনার যে খোঁড়া অজুহাত কাফিররা দেখাত তা উল্লেখ করে এর জবাব ১২ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে। কাফিরদের অজুহাত ছিল যে, কুরআন যদি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয় এবং মুহাম্মদ (স) যদি সঠিক পথের দিকেই ডাকেন তাহলে সমাজের জ্ঞানী, গুণী, সমঝদার ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিশ্চয়ই ঈমান আনতেন। গরিব, গোলাম ও সাধারণ কিছু লোক ঈমান আনায় তারা এটাকে মযবুত অজুহাত বানাল।

এটা দ্বারা তারা বোঝাতে চাইল যে, তারাই হক ও বাতিলের মাপকাঠি। কায়েমি স্বার্থের কারণে বড় লোকেরা সত্যকে কবুল করে না। অথচ তাদের কবুল না করাকেই সত্যের মাপকাঠি বলে দাবি করল। তাদের ঐ অদ্ভুত মাপকাঠিতে বিচার করে তারা আরো দাবি করল যে, রাসূলের দাওয়াত কোনো 'নতুন মিথ্যা' নয়, এটা 'পুরনো মিথ্যাই'। এ কথা দ্বারা পরোক্ষভাবে তারা স্বীকার করে নিল যে, এ জাতীয় বাণী আগেও প্রচারিত হয়েছে, যা সমসাময়িক কায়েমি স্বার্থ কবুল করে নেয়নি।

১২ নং আয়াতে তাদের এসব বাজে কথার জবাবে বলা হয়েছে, এর আগে মূসা (আ)-এর উপর অবতারিত কিতাব যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য হেদায়াত ও রহমত ছিল, বর্তমানে মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতারিত কুরআন মাজীদও তেমনি মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। মূসা (আ) যেমন 'পুরনো মিথ্যা' নয় বরং সত্য হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন, মুহাম্মদ (স)ও

তেমনি রহমত নিয়েই এসেছেন। আর কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার ফলে মক্কাবাসীদের এর সত্যতা না বোঝার কোনো কারণ নেই।

যারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না তারা নিজেদের উপরই নিজেরা যুলুম করছে বলে কুরআনই তাদেরকে সাবধান করছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কুরআন অগণিত সুসংবাদ বয়ে এনেছে।

১৩ ও ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঐসব লোকদেরকে জান্নাতের সুখবর দিয়েছেন, যারা আল্লাহকে মনে-প্রাণে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার পর আজীবন মযবুতভাবে আল্লাহর পথে চলে। তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও পেরেশান হতে হয় না। আরো বিস্তারিতভাবে সূরা হা-মীম আসসাজদার ৩০ থেকে ৩২ নং আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে।

আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে এ কথার উপর মযবুত থাকার চমৎকার ব্যাখ্যায় হযরত ওমর (রা) বলেন, 'মযবুত থাকার মানে শেয়ালের মতো এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা না করা।' অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব ইখলাসের সাথে করতে থাকা এবং কোনো অবস্থায়ই তাগূতের নিকট মাথা নত না করা ও শয়তানের ধোঁকায় না পড়া। এমন লোকদের দুনিয়ায়ও পেরেশানি বোধ হয় না এবং মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে কবর ও হাশরে কোথাও ভয়ের ও পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ ঘটবে না।

তাদের এ মযবুতির বদলায় তারা চিরকাল বেহেশতে পরম সুখে থাকবে।

১৫ ও ১৬ নং আয়াতে সন্তানকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের হুকুম দিয়ে বলা হয়েছে যে, মায়ের হক পিতার তুলনায় তিন গুণ বেশি। কারণ, মা কষ্ট করে পেটে অনেক দিন বহন করেন, কষ্ট ভোগ করে প্রসব করেন এবং দুবছর দুধ পান করাকালে বিশেষ কষ্ট করে লালন-পালন করেন। এ তিনটা কাজের একটাও পিতার করতে হয় না। তাই রাসূল (স) একজনের প্রশ্নের জবাবে মায়ের প্রতি কর্তব্যের কথা তিন বার বলার পর পিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

গর্ভধারণ ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় ৩০ মাস উল্লেখ করা দ্বারা ইসলামের পারিবারিক আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন−

১. সূরা লুকমানে শিশুকে দুবছর দুধ খাওয়ানোর বিধান দেওয়া হয়েছে। এ সূরায় গর্ভকাল ও দুধ খাওয়ার সময় মোট ৩০ মাস বলায় এ কথা জানা গেল যে, সন্তান পেটে আসার ছয় মাস পর প্রসব হলে এ সন্তানকে জায়েয বলে গণ্য করতে হবে। বিয়ের ছয় মাসের কম সময়ে শিশু সুস্থ অবস্থায় জন্ম নিলে বোঝা যাবে যে, এ শিশু যিনার ফসল।

২. প্রসবের পর যে দু'বছর শিশু মায়ের দুধ পান করে এ সময়ের মধ্যে অন্য কোনো শিশু এ মায়ের দুধ পান করলে এ দুটো শিশুর মধ্যে বিয়ে হতে পারবে না। এরা দুধভাই-বোন বলে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) সাবধানতার উদ্দেশ্যে এ রায় দিয়েছেন যে, যদি আড়াই বছর (৩০ মাস) সময়ের মধ্যেও অন্য কোনো শিশু দুধ পান করে তাহলেও দুধভাই-বোন বলে গণ্য হওয়া উচিত।

১৫ নং আয়াতের বাকি অংশে সুসন্তানের আচরণ তুলে ধরা হয়েছে। সুসন্তান তারাই− যারা পিতামাতার জন্য দু'আ করে, আল্লাহর পছন্দনীয় নেক আমলের তাওফীক আল্লাহর কাছে চায়, তাদের সন্তানদেরকেও নেক বানানোর জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করে, গোনাহ মাফের জন্য তাওবা করে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাহ বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেয়।

১৬ নং আয়াতে এ ধরনের লোকদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি তাদের সবচেয়ে উন্নতমানের আমলকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি; তাদের ক্রুটিপূর্ণ আমলকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করি না আর তাদের যাবতীয় বদ আমল আমি মাফ করে দিই। এমন লোকদেরকে বেহেশত দেওয়ার যে ওয়াদা আমি করেছি, সে ওয়াদা অবশ্যই আমি পালন করব।'

১৭ ও ১৮ নং আয়াতে এর আগের দু'আয়াতের বর্ণিত নেক লোকদের বিপরীত চরিত্রের মানুষের অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বদ লোকেরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার পরিবর্তে তাদের উপদেশ অমান্য করে থাকে এবং পিতা-মাতা আখিরাতের ভয় দেখালে তাদেরকে ঠাট্টা করে। দরদি পিতা-মাতা হতভাগা সন্তানকে আল্লাহর ওয়াদার দোহাই দিলে সে কথাকে পুরনো কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়।

এ জাতীয় লোকেরা আযাবেরই যোগ্য। জিন ও মানুষের মধ্যে অতীতে যেসব বদলোক মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সাথেই এরা আযাব ভোগ করবে।

১৫ ও ১৬ নং এবং ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে বিপরীত চরিত্রের লোকদের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা ঐ সময় মক্কায় বাস্তবে উপস্থিত ছিল। যারা রাসূল (স)-এর দাওয়াত কবুল করলেন তাদেরকে কুরাইশ নেতারা সাধারণ লোক বলে যতই তুচ্ছ মনে করুক, তাদের চরিত্র যে ঐ অহঙ্কারীদের চেয়ে অনেক উন্নতমানের ছিল, সে কথাই পরোক্ষভাবে এ কয়েকটি আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯ নং আয়াতে উপরে বর্ণিত দু ধরনের লোকের সাথে পূর্ণ সুবিচার করা হবে বলে ঘোষণা দিয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, কারো উপর যুলুম করা হবে না। নেক লোকদের আমল ও কুরবানীর মর্যাদা দেওয়া হবে। তাদেরকে সে অনুযায়ী পুরস্কার না দিলে যুলুম হবে। তেমনি বদ লোকদের উপযুক্ত শাস্তি না দিলেও ইনসাফ হতে পারে না। তবে তাদের যা পাওনা এর বেশি শাস্তি দেওয়া হবে না। বেশি শাস্তি দিলেও যুলুম হয়ে যাবে।

২০ নং আয়াতে কাফিরদেরকে দোযখে ফেলার সময় আল্লাহ কী বলবেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। বলা হবে, 'রাসূল (স)-এর দাওয়াত কবুল না করে অহঙ্কারবশত আল্লাহর দাসত্ব করতে অস্বীকার করে নাফসের গোলাম হয়ে দুনিয়ার মজা লুটতেই তোমরা মত্ত ছিলে। এখন এর বদলে তোমরা অপমানকর আযাবের মজা ভোগ করতে থাক।'

দুনিয়ায় অহঙ্কার করার কারণে ওখানে অপমান করা হবে। সৎ ও নেক লোকেরা গরিব বলে তাদের সাথে বসতেও তারা ঘৃণা করত। এরই পরিণামে আখিরাতে তাদের গর্ব খর্ব করা হবে।

তৃতীয় রুকু

২১ থেকে ২৩ নং আয়াতে হূদ (আ)-এর কাওম 'আদ জাতি তাদের রাসূলকে মানতে অস্বীকার করার ঘটনা উল্লেখ করে মক্কাবাসীদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে রাসূল (স)-কে অস্বীকার করে তারা 'আদ জাতির মতো ধ্বংসের পথে না যায়। হূদ (আ)-এর সাথে তাঁর কাওমের তর্ক-বিতর্কের বিবরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, মক্কাবাসীরাও রাসূল (স)-এর সাথে ঐ ধরনের বিতর্কেই লিপ্ত।

২৪ থেকে ২৬ নং আয়াতে 'আদ জাতির করুণ দশার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে মক্কার কাফিরদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মক্কাবাসী! তোমাদের চেয়েও 'আদ জাতি অনেক উন্নত ছিল; কিন্তু আল্লাহর আযাব তাদেরকেসহ সবকিছু ধ্বংস করে দিল। তোমাদের

মতোই তাদেরও কান, চোখ ও দিল ছিল; কিন্তু এসব দিয়ে আল্লাহর আয়াতকে বুঝে কবুল করার বদলে তারা ঠাট্টায় উড়িয়ে দেওয়ায় তাদের যে পরিণাম হয়েছে তোমাদেরও সে পরিণামই হবে– যদি রাসূল (স)-এর সাথে তোমরা তাদের মতোই ব্যবহার কর।

চতুর্থ রুকু

২৭ ও ২৮ নং আয়াতে মক্কার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন কাওমকে ধ্বংস করার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, বারবার তাদেরকে হেদায়াত করার উদ্দেশ্যে আয়াতসমূহ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তারা তা কবুল না করে নিজেদের মনগড়া মা'বুদদের পূজাই করতে থাকল। ঐ মা'বুদদের যদি সামান্য ক্ষমতাও থাকত তাহলে তাদেরকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করত। তাদের ভিত্তিহীন মনগড়া আকীদার যে পরিণাম হয়েছিল, সে একই দশা মক্কাবাসীদেরও হবে– যদি তারা শিরকী আকীদা ত্যাগ না করে।

২৯ থেকে ৩১ নং আয়াতে একদল জিনের কথা উল্লেখ করে মক্কাবাসীদেরকে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে, সত্যের তালাশে যারা থাকে তারা সত্য পেলে বিনা দ্বিধায় কবুল করে। একদল জিন রাসূল (স)-এর মুখে কুরআন শুনেই বুঝতে পারল যে, এটা আল্লাহর কালাম। তাদেরকে দাওয়াতও দিতে হলো না। তারা শুনে নিজেরাই তাঁর উপর ঈমান এনে নিজেদের কাওমের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লেগে গেল।

অথচ হতভাগা মক্কাবাসীরা রাসূল (স) থেকে দাওয়াত পাওয়া সত্ত্বেও তা কবুল করল না। এরা ঐ জিনদের তুলনায় কতই না নিকৃষ্ট!

৩২ ও ৩৩ নং আয়াতে কাফিরদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, যারা রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া দিল না, তাদের জেনে রাখা উচিত– তারা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে না; বরং আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের এ কথা বোঝা উচিত যে, যিনি আসমান-জমিন এত সহজে সৃষ্টি করলেন, তিনি মানুষকে পরকালে আবার জীবিত করে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন।

৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আজ কাফিররা আখিরাতের কথা যতই অবিশ্বাস করুক, যখন তাদেরকে দোযখের সামনে হাজির করে জিজ্ঞেস করা হবে যে, এখন বল এটা সত্য কি না– তখন আল্লাহর কসম করে স্বীকার করবে যে, এটা বাস্তব সত্য; কিন্তু তখন স্বীকার করে কোনো লাভ হবে না। স্বীকার করতে হলে দুনিয়াতেই করা উচিত। তাহলে দোযখের আযাব থেকে বাঁচার উপায় হবে।

সূরার শেষ আয়াতটিতে রাসূল (স)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার কাওমের ব্যবহারে সবর করুন, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন। এমনটা কামনা করা ঠিক হবে না যে, হয় তারা জলদি ঈমান আনুক আর না হয় আল্লাহর আযাব আসুক।

এখন তারা দুনিয়ার মজা লুটতে মত্ত থাকায় দোযখের কোনো পরওয়া করছে না বটে; কিন্তু যখন সত্যিই তা দেখতে পাবে তখন ভয়ের চোটে দুনিয়ার দীর্ঘ জীবনটাও সামান্যক্ষণই মনে হবে।

এসব কথা তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হলো। যারা তা কবুল করবে এবং সত্যপথে চলবে তাদের ধ্বংস হওয়ার ভয় নেই। একমাত্র নাফরমানরাই ধ্বংস হবে।

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٥ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পারা ২৬

حٰمٓ ①

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২. মহা শক্তিশালী মহান কৌশলী আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব নাযিল হয়েছে।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

৩. আমি আসমান ও জমিন এবং এ দুটোর মধ্যে যা আছে তা সত্যতার সাথে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু যারা কাফির তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করা সত্ত্বেও তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④

৪. (হে রাসূল!) এদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তাদের কথা কি কখনো ভেবে দেখেছ? তারা দুনিয়াতে কী কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে একটু দেখাও তো। অথবা আসমান (সৃষ্টিতে) কি তাদের কোনো হিস্যা আছে? তোমরা যদি (তোমাদের আকীদার ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে (এর প্রমাণ হিসেবে) আগের কোনো (আসমানী) কিতাব বা (সবার কাছে) স্বীকৃত কোনো ইলম থেকে তা পেশ কর।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑤

৫. ঐ লোকের চেয়ে বেশি গুমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামতের দিন পর্যন্তও সাড়া দেবে না।[১] বরং তাদেরকে যে ডাকা হয়েছে সে কথা তারা জানেই না।

১. জবাব দেওয়ার অর্থ কারো আবেদনের ফায়সালা দান করা। অর্থাৎ, এই উপাস্যদের সেই ক্ষমতা নেই, যার ভিত্তিতে তারা এদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদনের উপর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

৬. (হাশরের ময়দানে) যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন যারা তাদেরকে ডাকত তারা তাদের দুশমন হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে।[২]

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭. যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় এবং সত্য তাদের সামনে এসে যায় তখন কাফিররা বলে যে, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু'।

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۖ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৮. তবে কি তারা বলতে চায় যে, রাসূল নিজেই তা রচনা করে নিয়েছে? (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি যদি নিজেই রচনা করে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তোমরা যেসব কথা বানাচ্ছ তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৩]

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰٓى

৯. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, আমি তো রাসূলদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি নই। আর আমি জানি না যে, আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে। আমি তো শুধু ঐ ওহী মেনে চলছি, যা

২. অর্থাৎ, তারা পরিষ্কারভাবে বলে দেবে, 'আমরা কখনো তাদেরকে এ কথা বলিনি যে, তোমরা সাহায্যের জন্য আমাদেরকে ডাক ও দো'আ করতে থাক; আমরা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করব। আর আমরা এ কথা জানিও না যে, এরা আমাদের কাছে দো'আ করত। তারা নিজেরাই অনুমান করে নিয়েছিল যে, আমরা তাদের অভাব পূরণকারী। তারা নিজেরাই আমাদের ডেকে দো'আ করত।

৩. আয়াতের এ অংশের দুরকম অর্থ প্রকাশ পায়। প্রথম অর্থ– প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার দয়া ও ক্ষমাগুণের কারণেই এসব লোক আল্লাহর কালামের প্রতি মিথ্যারোপ করতে এতটুকুও সংকোচবোধ না করে তারা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। কেননা, দুনিয়ার মালিক আল্লাহ যদি নির্দয় ও কঠোর হতেন তাহলে এমন দুঃসাহসীরা একটি নিঃশ্বাসের পর আরেকটি নিঃশ্বাস নেওয়ারও সুযোগ পেত না।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– হে যালিমরা! এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও। আল্লাহ তাআলার করুণার দুয়ার তোমাদের জন্য এখনো খোলা আছে এবং এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করছ তা মাফ হতে পারে।

إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

আমার উপর নাযিল হয়।[৪] আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾

১০. (হে রাসূল! আরো) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি এ কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তা মানতে অস্বীকার কর (তাহলে তোমাদের কী দশা হবে?)। এ ধরনের এক কালামের পক্ষে তো বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী[৫] সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান এনেছে, আর তোমরা অহঙ্কারে ডুবে রইলে। আল্লাহ এমন যালিমদেরকে হেদায়াত করেন না।

রুকূ' ২

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

১১. কাফিররা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে যে, যদি (এ কিতাবকে মেনে নেওয়া সত্যিই) কোনো ভালো কাজ হতো তাহলে তারা এ বিষয়ে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না।[৬] যেহেতু তারা এ থেকে হেদায়াত পেল না, সেহেতু তারা বলবে যে, এটা তো পুরনো মিথ্যা (কাহিনী)।

وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

১২. অথচ এর আগে মূসার কিতাব পথের দিশারি ও রহমত হিসেবে এসেছিল। আর এ কিতাব আরবী ভাষায় এরই সত্যতা প্রকাশ করছে, যাতে (এ কিতাব) যালিমদেরকে সাবধান করে দেয় এবং সৎ লোকদেরকে সুসংবাদ দান করে।

৪. অর্থাৎ প্রথমে যেমন সকল রাসূলই মানুষ হতেন এবং আল্লাহর গুণ ও ক্ষমতায় তাদের কোনো অংশ ছিল না, আমিও তেমনি একজন রাসূল।

৫. এখানে সাক্ষীর অর্থ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়; বরং বনী ইসরাঈলের একজন সাধারণ ব্যক্তি। এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– কুরআন মাজীদ তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা এমন কোনো অপরিচিত অদ্ভুত জিনিস নয়, যা এই প্রথমবার দুনিয়ায় তোমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। যাতে তোমরা এ ওযর করতে পার যে, 'আমরা এমন অদ্ভুত কথা কেমন করে মেনে নিতে পারি, যা মানবজাতির সামনে এর আগে কখনো পেশ করা হয়নি।'

৬. তাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– গুটিকতক সাধারণ লোক এই কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা যদি কোনো ভালো কাজ হতো, তাহলে আমাদের মতো বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে কেমন করে পেছনে পড়ে থাকত?

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয়ই যারা বলেছে, 'আল্লাহই আমাদের রব', তারপর এ কথার উপর মযবুত রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশানও হবে না।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এসব লোকই বেহেশতের অধিকারী। চিরদিন তারা সেখানে থাকবে। তারা (দুনিয়ায়) যেসব আমল করছিল এটা তারই বদলা।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ
أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

১৫. আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে পেটে রেখেছে, কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং তাকে পেটে বহন করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে তারপর যখন সে পূর্ণ যৌবন লাভ করল এবং চল্লিশ বছরে পড়ল তখন সে বলল, হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যেন আমি ঐসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছেন এবং যেন আমি এমন নেক আমল করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার সন্তানদেরকেও নেককার বানিয়ে আমাকে সুখী করুন। আমি আপনার নিকট তাওবা করছি এবং আপনার অনুগত বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ
وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

১৬. এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমি তাদের সবচেয়ে ভালো আমলগুলো কবুল করি এবং তাদের মন্দ কাজগুলোকে মাফ করে দিই। এরাই বেহেশতী লোকদের মধ্যে শামিল হবে ঐ সত্য ওয়াদা মোতাবেক, যা তাদের সাথে করা হচ্ছিল।

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي
أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۚ

১৭. (এমন লোকও আছে) যে তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছ যে,

وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

আমাকে (কবর থেকে আবার) বের করা হবে। অথচ আমার আগে বহু পুরুষ (প্রজন্ম) গত হয়ে গেছে (তাদের মধ্যে তো কেউ উঠে আসেনি)। তখন (বাপ-মা) দুজনেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে, ওরে হতভাগা! একীন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এসব পুরনোকালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

১৮. এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর আযাবের ফায়সালা হয়ে গেছে। এদের আগে জিন ও মানুষের মধ্যে (এ ধরনের) যারা গত হয়ে গেছে তাদের সাথে এরাও গিয়ে শামিল হবে। অবশ্যই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

১৯. (এ দুধরনের লোকদের মধ্যে) প্রত্যেকের মর্যাদা তার আমল অনুযায়ীই হবে, যাতে আল্লাহ তার আমলের পুরো বদলা দেন। (অবশ্য) তার উপর কোনো যুলুম করা হবে না।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

২০. তারপর যখন কাফিরদেরকে দোযখের সামনে নিয়ে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদেরকে বলা হবে), তোমরা তোমাদের ভাগের সব নিয়ামত দুনিয়ার জীবনেই খতম করেছ এবং এর মজা ভোগ করেছ। তোমরা দুনিয়ায় অন্যায়ভাবে যে অহঙ্কার করে বেড়াচ্ছিলে এবং যে নাফরমানী তোমরা করেছিলে, এর বদলায় আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাব দেওয়া হবে।

রুকূ' ৩

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

২১. এদেরকে 'আদ জাতির ভাই (হূদ [আ])-এর কাহিনী একটু শোনাও। যখন তিনি আহকাফে তাঁর কাওমকে সাবধান করেছিলেন— এ ধরনের সাবধানকারী এর আগেও এসেছে এবং পরেও এসেছে, (এ

أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٢١

কথা বলে) যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না; আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়ানক আযাবের দিনের আশঙ্কাবোধ করছি।'

قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٢٢

২২. তারা বলল, তুমি কি আমাদের মা'বুদদের থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এস না দেখি।

قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝٢٣

২৩. তিনি (হূদ [আ]) বললেন; এ বিষয়ে ইলম তো আল্লাহর কাছেই আছে।[৭] আমি তো শুধু ঐ বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি, যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা এক জাহেল কাওম।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢٤

২৪. তারপর যখন তারা আযাবকে তাদের এলাকার দিকে আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তা নয়, বরং এটা ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[৮] এটা এমন তুফানি বাতাস, যার ভেতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝٢٥

২৫. এর রবের হুকুমে সে প্রত্যেক জিনিসকে ধ্বংস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা হলো যে, তাদের থাকার জায়গাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে বদলা দিয়ে থাকি।

৭. অর্থাৎ, তোমাদের উপর যখন আযাব পাঠানো হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে তার জ্ঞান।

৮. এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, কে তাদের এই উত্তর দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এ হচ্ছে মেঘ, যা তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক ভয়ানক তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصٰرًا وَّأَفْـِٔدَةً ۖ فَمَآ أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ ۙ بِـَٔايٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. আমি তাদেরকে এমন সব কিছু দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দিইনি। আমি তাদেরকে কান, চোখ ও দিল দিয়েছিলাম; কিন্তু তাদের শোনার, দেখার ও বোঝার (এ শক্তিগুলো) তাদের কোনো কাজে আসল না। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-তামাশা করত তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলল।

রুকূ' ৪

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْءَايٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. তোমাদের আশপাশের এলাকার অনেকে জনবসতি আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আয়াতসমূহ পাঠিয়ে বারবার নানা উপায়ে তাদেরকে বুঝিয়েছি, যেন তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে ওরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল তারা এদেরকে কেন সাহায্য করল না? বরং তারা তো তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল। তারা যে মিথ্যা ও মনগড়া আকীদা বানিয়ে নিয়েছিল এর পরিণাম এটাই।[৯]

৯. অর্থাৎ এই সত্তাগুলোর প্রতি তারা প্রথমে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভক্তি-বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, 'এরা আল্লাহর প্রিয় দাস; এদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব।' কিন্তু পরে তারা এ সত্তাগুলোকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে ও তাদের কাছে দো'আ চাইতে শুরু করল এবং তাদের সম্পর্কে এ ধারণা করে বসল যে, এরাই ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী, এরা আমাদের অভিযোগ শুনতে ও বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। এই গুমরাহি থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে আল্লাহ তাআলা রাসূলদের মাধ্যমে আয়াতসমূহ পাঠিয়ে নানা প্রকারে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা নিজেরা মিথ্যা প্রভুর বন্দেগিতে অটল হয়ে জিদ করতে থাকে যে, 'আমরা আল্লাহর বদলে এদের আশ্রয় নিয়েই থাকব।' এখন বল নিজেদের গুমরাহির কারণে যখন এই মুশরিকদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছে তখন তাদের সেই বিপদ দূরকারী উপাস্যরা কোথায় সরে গিয়েছে? এই দুঃসময়ে তারা তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না কেন?

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. (হে রাসূল! এ ঘটনাটাও উল্লেখ করার মতো যে) আমি একদল জিনকে আপনার দিকে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তারা কুরআন শুনে। যখন ওরা ঐ জায়গায় পৌঁছল (যেখানে আপনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন) তখন একে অপরকে বলল, 'তোমরা চুপ করে শোন'। তারপর যখন কুরআন পড়া হয়ে গেল তখন তারা নিজ কাওমের নিকট সতর্ককারী হয়ে ফিরে গেল।[১০]

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা গিয়ে বলল, হে আমাদের কাওম! আমরা এক কিতাব শুনলাম, যা মূসা (আ)-এর পর নাযিল করা হয়েছে, যা এর আগের কিতাবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং সত্যের দিকে ও সঠিক পথের দিকে হেদায়াত করে।[১১]

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

৩১. হে আমাদের কাওম! যে আল্লাহর দিকে ডাকে তার ডাকে সাড়া দাও ও তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবেন।

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ

৩২. আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা না মানে তার দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি নেই, যে আল্লাহকে হারিয়ে দিতে

১০. তায়েফের সফর থেকে মক্কা ফেরার পথে যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (স) নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, এমন সময় জিনদের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা রাসূল (স)-এর কুরআন পাঠ শোনার জন্য সেখানে থামে। এ সম্পর্কে সকল বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ঐ ঘটনায় জিনেরা রাসূল (স)-এর সামনে দেখা দেয়নি এবং তিনিও জিনদের আসার কথা জানতে বা বুঝতে পারেননি। অবশ্য পরে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে জিনদের আসার এবং কুরআন শোনার খবর দিয়েছিলেন।

১১. এ. দ্বারা জানা গেল, এ জিন দল আগে হযরত মূসা (আ) ও আসমানি কিতাবসমূহের উপর ঈমান এনেছিল। কুরআন শোনার পর তারা অনুভব করল, এটা তো সেই একই শিক্ষা, যা পূর্ববর্তী নবীগণ দিয়ে গেছেন। সুতরাং তারা এই কিতাব ও তার আনয়নকারী রাসূল (স)-এর উপর ঈমান এনেছিল।

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾

পারে; আর তার এমন কোনো সহায় নেই, যে তাকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারে। এসব লোক স্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে আছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা কি এটুকুও বোঝে না, যে আল্লাহ জমিন ও আসমান সৃষ্টি করলেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে তিনি ক্লান্ত হননি, সে আল্লাহ মৃতকে অবশ্যই জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন। কেন নয়? নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর উপর শক্তিশালী।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. যেদিন কাফিরদেরকে আগুনের সামনে আনা হবে (সেদিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে) 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম (এটা বাস্তব সত্য)'! আল্লাহ বলবেন, তোমরা যে কুফরী করেছিলে, তার বদলায় এখন আযাবের মজা ভোগ কর।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতএব (হে রাসূল!) আপনি সবর করুন, যেমন সাহসী রাসূলগণ সবর করেছেন। তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। যখন তারা ঐ জিনিস দেখতে পাবে, যে বিষয়ে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে— তখন তাদের এমন মনে হবে যে, যেন তারা দুনিয়ায় দিনের একটি মাত্র ক্ষণের বেশি ছিল না। কথা পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। নাফরমান লোক ছাড়া কি আর কেউ ধ্বংস হবে?

৪৭. সূরা মুহাম্মাদ

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার দু নম্বর আয়াতে 'মুহাম্মাদ' (স)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরার আরেকটা নাম 'কিতাল'। ২০ নং আয়াতের 'কিতাল' শব্দ থেকে সে নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি বদর যুদ্ধের আগে নাযিল হয়েছে। এর আগে সূরা হাজ্জের ৩৯ নং আয়াত ও সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে যুদ্ধের হুকুম নাযিল হয়েছিল বটে; কিন্তু যুদ্ধ তখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। এ সূরার ৪ নং আয়াতেই যুদ্ধ শুরু হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

হিজরতের পর আল্লাহর নির্দেশে সাহসী ঈমানদারগণ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে লাগলেন। দুর্বলতা কিংবা বিভিন্ন সমস্যার কারণে যারা হিজরত করতে পারেননি তাদের উপর চরম যুলুম চলতে লাগল। মদীনার ছোট্ট বস্তিটি চারদিক দিয়ে কাফিরদের দ্বারা ঘেরাও হয়েই ছিল।

কুরাইশদের নেতৃত্বে আরবের কাফির ও মুশরিকরা মদীনার ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য সংগঠিত হতে লাগল। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, হয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবনপণ করে লড়াই করতে হবে, নতুবা জাহিলিয়াতের নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে। অথচ যুদ্ধ করার জন্য যে অর্থশক্তি ও সমরশক্তি দরকার তা যোগাড় করা তো দূরের কথা, তখন পর্যন্ত ঐ সব মুহাজিরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাই সম্ভব হয়নি, যারা নিজেদের সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু যখন অস্তিত্বের প্রশ্ন সৃষ্টি হলো এবং আরবে ইসলাম থাকবে– না জাহেলিয়াত থাকবে সে প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার হয়ে পড়ল, তখন এ সূরায় আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে ঐ বলিষ্ঠ হিম্মতের পথই দেখালেন, যা ঈমানের স্বাভাবিক দাবি। একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রেখে জীবন দিয়ে হলেও ইসলামকে এবং নতুন ইসলামী রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করার সিদ্ধান্তই নেওয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচনার বিষয় হলো ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করা এবং এ বিষয়ে প্রাথমিক হেদায়াত দেওয়া। এ কারণেই এ সূরার অপর নাম কিতাল বা যুদ্ধ। সূরার প্রথম অংশে ঘোষণা করা হয়েছে, হক ও বাতিলের এ সংঘর্ষে হকপন্থিরাই আল্লাহর সাহায্য এবং তাদের কুরবানীর মূল্যবান পুরস্কার পাবে। আর কাফিররা পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিতই থাকবে।

এরপর মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যুদ্ধের হুকুম আসার আগে তারা মুসলমান হওয়ার বড় দাবিদার ছিল। যুদ্ধের হুকুম আসার পর তারা পালানোর পথ তালাশ করছে এবং কাফিরদের সাথে গোপন আঁতাতের চেষ্টা চালাচ্ছে।

তারপর সংখ্যায় কম ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব সত্ত্বেও যাতে মুসলিমরা হিম্মত না হারায় এবং সন্ধি প্রস্তাব পেশ করার মতো দুর্বলতা না দেখায় সেজন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সূরার শেষদিকে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সে সময় মুসলিমদের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও দীনের জন্য কুরবানীর তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, হকপন্থি ও বাতিলপন্থির অবস্থা কখনো এক রকম হতে পারে না। ঈমানদার ও কাফিরদের সাথে তিনি কখনো এক ধরনের ব্যবহার করেন না। যারা নিজেরা কুফরী করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং অন্য মানুষকে ঈমান আনতে বাধা দিয়েছে, তারা ভালো কাজ করলেও তার কোনো সুফল পাবে না। কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে যা কিছু করতে চেষ্টা করছে এরও ঐ ফল হতে দেওয়া হবে না, যা তারা চায়। তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।

আর যারা রাসূল (স) ও কুরআনের উপর ঈমান এনেছে, তাদের অতীত জীবনের সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তাদের আকীদা, চিন্তা ও আমলে যেসব ত্রুটি ছিল তা দূর করে দিয়েছেন। তাদের অতীত পথভ্রষ্টতার জীবন সংশোধন করে হেদায়াতের পথে চলার তাওফীক দিয়েছেন এবং এতদিন কাফিরদের অধীনে তারা যে অসহায় অবস্থায় ছিল তা থেকে উদ্ধার করেছেন।

৪ নং আয়াতের প্রথম অংশে মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, যখন কাফিরদের সাথে লড়াই শুরু হয়ে যায় তখন শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাজিত করাই আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। যতক্ষণ শত্রু যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে ততক্ষণ তাদেরকে বন্দি করা বা গনিমতের মাল দখল করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শত্রু যদি পরাজিত হয় এবং তাদের আবার হামলা করার শক্তি না থাকে, তাহলে তাদেরকে বন্দি করে কষে বাঁধ।

যুদ্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে বন্দিদের ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখবে। হয় তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, নতুবা বন্দিপণস্বরূপ অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবে। এখানে অতি সংক্ষেপে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে যে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে এর ভিত্তিতে রাসূল (স) নিম্নরূপ নীতি শিক্ষা দিয়েছেন :

ক. যদি বন্দী করে রাখাই প্রয়োজন হয় তাহলে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। জেলখানায় আটক না রেখে মুসলিম পরিবারে দাস হিসেবে রাখার ব্যবস্থা করা বেশি ভালো। অথবা জিম্মি হিসেবে জিযিয়া নিয়ে দেশে স্বাধীনভাবে বাস করতে দেবে।

খ. যদি তাদেরকে আটক রাখার প্রয়োজন না থাকে তাহলে বন্দিবিনিময়ের মাধ্যমে ছেড়ে দেবে। অথবা টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেবে। অথবা কোনো খিদমতের পুরস্কার হিসেবে মুক্ত করে দেবে। এ আয়াতের শেষাংশে বড়ই গভীর অর্থপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। হক ও বাতিলের মধ্যে এই যে লড়াই চলে, এর পেছনে বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে। বাতিলকে শুধু ধ্বংস করাই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে বিভিন্ন রকম গযব নাযিল করেই তা করা যেত।

একদল লোক হকের পক্ষে আরেকদল হকের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণে অগণিত মানব সমস্যা সৃষ্টি হয়। কত নেক লোক নিহত ও আহত হয় এবং তাদের কারণে আরো অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ লড়াই আল্লাহর কোনো খামখেয়ালি বা শখের খেলা নয়। এর পেছনে বিরাট হিকমত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর খলীফার মর্যাদা দিতে চান। আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় কায়েম করার মাধ্যমেই ঐ মর্যাদা লাভ করতে হয়। আল্লাহ নিজে দীন কায়েম না করে তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল (স) ও রাসূলের উপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর এর দায়িত্ব দিয়েছেন– এটাই খিলাফতের দায়িত্ব ।

এ দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়ায় মানুষকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। কে হকপন্থি আর কে বাতিলপন্থি– এরই পরীক্ষা চলছে লড়াইয়ের মাধ্যমে। যারা হকের পক্ষে লড়াই করবে আল্লাহ তাআলা তাদের এ কুরবানীর পুরস্কার দেন এবং পরীক্ষায় পাস বলে গণ্য করেন।

বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই এড়িয়ে হকপন্থি হওয়ার দাবি আল্লাহর কাছে টিকবে না। হককে কায়েম করতে গেলে বাতিলের সাথে টক্কর অবশ্যই হবে। টক্কর না হলে বুঝতে হবে যে, হককে কায়েমের কাজ করা হচ্ছে না।

৫-৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হকের পক্ষে যারা সংগ্রাম করে তাদেরকে বিরাট সুসংবাদ দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে চালাবেন, তাদেরকে গুমরাহী থেকে হেফাযত করবেন, তাদের অবস্থা উন্নত করবেন এবং ওয়াদামতো জান্নাত দেবেন। ৭ নং আয়াতে আল্লাহর হক দীনকে কায়েম করার চেষ্টা করলে আল্লাহকে সাহায্য করা হয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। যারা এ কাজ করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করার ওয়াদা করেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করবেন।

৮-১০ নং আয়াতে কাফিরদের পরিণাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করা হবে এবং তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ করে দেওয়া হবে। কারণ, তারা আল্লাহর কিতাবকে অপছন্দ করেছে। অথচ তাদেরই মঙ্গলের জন্য এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে।

১০ নং আয়াতে কাফিরদেরকে সাবধান হওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, তারা কি তাদের আগের ঐ সব কাওমের অবস্থা দেখেনি, যাদেরকে কুফরীর কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে? যদি তারা পূর্ববর্তী কাফিরদের পথে চলে তাহলে তাদেরও একই অবস্থা হবে।

১১ নং আয়াতে ঈমানদারদের সৌভাগ্য ও কাফিরদের দুর্দশার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ঈমানদারদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক, আর কাফিরদের জন্য কেউ সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক নেই। এখানে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, ভালো ও মন্দের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যার মঙ্গল চান সে-ই শুধু তা পায়। তিনি যার অমঙ্গল করেন তার মঙ্গলের কোনো উপায় নেই।

উহুদের যুদ্ধে প্রথম দিকে কাফিরদের বিজয় হয়। তখন কুরাইশ সরদার আবূ সুফিয়ান চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আমাদের উয্যা আছে; তোমাদের কোনো উয্যা নেই। তাই তোমরা পরাজিত।' রাসূল (স) সাহাবীগণকে এর জবাব এভাবে দিতে বললেন, 'আল্লাহ আমাদের সহায়, তোমাদের কোনো সহায় নেই।' এ আয়াত থেকেই এ কথাটি নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় রুকু

১২ নং আয়াতে নেক লোকদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া ও কাফিরদেরকে দোযখের ভয় দেখানো হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবনের এ কয়টা দিন তারা যতই মজা লুটে পশুর মতো ভোগ করে চলছে, শেষ পর্যন্ত দোযখই তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

১৩ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, হে রাসূল! আপনাকে যারা মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান লোকদেরকেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কেউ ছিল না। সুতরাং আপনাকে যারা বের করে দিয়েছে তাদেরও একই দশা হবে।

১৪ ও ১৫ নং আয়াতে এমন এক ইনসাফের কথা বলা হয়েছে, যার যুক্তি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর দেওয়া হেদায়াত মেনে চলে আর যারা নাফসের তাঁবেদারি করে বদ আমলে লিপ্ত তাদের পরিণাম এক রকম হতে পারে না। যারা মুত্তাকী তাদের জন্য রকমারি সুস্বাদু পানীয় ও ফলমূলে সাজানো বেহেশত রয়েছে। আর তাদের রবের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও দয়া।

মুত্তাকীদের অবস্থা কি তাদের মতো হতে পারে– যারা চিরকাল দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে এমন গরম পানি খেতে হবে, যা খেলে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত কেটে যাবে?

১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তারা ঈমানদারদের সাথে একই মজলিসে বসে রাসূল (স)-এর কথা শোনে; কিন্তু তাদের ঈমান না থাকার কারণে মন দিয়ে ভক্তির সাথে শোনেও না এবং কথার মর্মও বুঝতে পারে না। তাই পরে তারা ঈমানদারদের কাছে জিজ্ঞেস করে, রাসূল (স) কী কথা বললেন?

১৭ নং আয়াতে ঈমানদার লোকদের অবস্থা যে মুনাফিকদের বিপরীত, সে কথাই স্পষ্ট করা হয়েছে। যেহেতু তারা হেদায়াত কবুল করেছে, সেহেতু তারা যখনই রাসূল (স) থেকে কোনো কথা শুনতে পায় তখন আল্লাহ আরো হেদায়াত দেন এবং তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে দেন। যে কথা শোনে মুনাফিকরা হেদায়াত তালাশ করে পায় না, সে কথা থেকেই ঈমানদাররা হেদায়াতের নতুন নতুন আলো পায় এবং যে যতটা যোগ্য সে পরিমাণ তাকওয়া হাসিল করে নেয়।

১৮ নং আয়াতে কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তাদেরকে হেদায়াত করার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই তো নেওয়া হয়েছে। রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে এবং রাসূল (স) ও সাহাবাগণের চরিত্রের উদাহরণ পেশ করে তাদেরকে হেদায়াত কবুলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এরা সে সুযোগ গ্রহণ করছে না। তাহলে কি কিয়ামত এসে হাজির হওয়ার পর তারা ঈমান আনবে? ঐ কিয়ামতই বা দূরে কোথায়? কিয়ামতের আলামত তো এসেই গেছে। শেষ নবীর পর তো আর কোনো নবী আসবে না, কিয়ামতই আসবে। সুতরাং এখনো সময় আছে ঈমান আনার। এ সুযোগ হারালে আর ফিরে পাবে না মৃত্যু পর্যন্তও।

১৯ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, লোকেরা মানুক বা না-ই মানুক আল্লাহ যে একমাত্র মা'বুদ তা প্রচার করতেই থাকুন। নারী ও পুরুষ যারাই এ কথা মেনে নেয়, তাদের গুনাহ মাফ চান। আপনি যত নিষ্ঠার সাথেই দায়িত্ব পালন করেন না কেন আল্লাহর দেওয়া মান এর চেয়েও উন্নত। তাই আপনি নিজের জন্যও ক্ষমা চান।

আল্লাহ সবার অবস্থাই জানেন, কে কী করছে সব খবরই রাখেন এবং কার শেষ ঠিকানা কোথায় হবে সে কথাও জানেন।

তৃতীয় রুকু

২০-২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ঐ সময় মদীনার যে অবস্থা ছিল তখন এ সূরায় যুদ্ধের হুকুম আসায় মুনাফিকরা চিহ্নিত হয়ে গেল। মদীনার ক্ষুদ্র বস্তিটুকু ছাড়া গোটা আরব মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি হওয়ার যে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তাতে সত্যিকার ঈমানদাররা যুদ্ধের হুকুমই কামনা করছিলেন। জীবন দিয়ে হলেও ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তারা চেয়েছিলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশসহ কোনো সূরা নাযিল হোক।

যখন যুদ্ধের হুকুমসহ সূরা নাযিল হলো তখন মুনাফিকদের অবস্থা এমন হলো, যেন মওতের সময় এসে গেছে। তাদের চাহনিতে হতাশা স্পষ্ট ফুটে ওঠল। অথচ এতদিন তারা নামায-রোযা ইত্যাদি আদায় করার মাধ্যমে ঈমানদার মুসলিম হিসেবেই পরিচিত ছিল। আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে আফসোস করে বলেছেন, এরা মুখে অনুগত হয়ে চলার ওয়াদা করে বেড়াত। এখন যদি সে ওয়াদা পূরণ করত তাহলে তাদেরই মঙ্গল হতো।

২২ নং আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র মদীনায় যদি টিকে যায় তাহলে আরবে মুসলিমদেরই শাসন কায়েম হবে। কে সত্যিকার মুসলিম আর কে সুবিধাবাদী ও মুনাফিক, তা যুদ্ধের মাধ্যমেই চিহ্নিত হতে হবে। এভাবে ছাঁটাই-বাছাই ছাড়া যদি সুবিধাবাদীরা শাসনক্ষমতায় অংশীদার হয় তাহলে স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে কাজ করবে। তারা আল্লাহর দেওয়া ইনসাফের আইনের বদলে মনগড়া বিধান চালু করবে। ফলে সমাজে হাজারো ফাসাদ সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে তারা আত্মীয়দের হক নষ্ট করার ব্যবস্থা করবে। তাই আল্লাহ ঐসব লোকের উপর লা'নত করেছেন। ফলে নিজের জন্য কোন্টা মঙ্গল তা বোঝার যোগ্যতাও নষ্ট হয়ে গেছে। দেখার চোখ ও শোনার কান থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগল না।

৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, হক ও বাতিলের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা আল্লাহর কোনো শখের খেলা নয়। ২২ নং আয়াতে এ যুদ্ধের আরেকটা বড় প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাতিলের বিরুদ্ধে হকপন্থিদের লড়াই ও যুদ্ধের মাধ্যমেই বাছাই হয়ে যায় যে, কাদের হাতে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার থাকা উচিত। যারা এর যোগ্য নয় তারা লড়াই থেকে পালিয়ে নিজেদেরকে চিহ্নিত করে দেয়।

২৪-২৮ নং আয়াতে ঐ মুনাফিকদের সম্পর্কেই আরো আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুনাফিকীর তালা তাদের অন্তরে লাগিয়ে রাখার কারণেই কুরআনের মর্মকথার নাগাল তারা পায় না। হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও তারা শয়তানের ফাঁদে পড়ে গেছে। এ কারণেই আল্লাহর কালাম তাদের পছন্দ হয় না। আল্লাহ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দিয়েছেন। অথচ আত্মরক্ষার স্বার্থে তারা গোপনে কাফিরদের সাথে সহযোগিতার ওয়াদা করে (২৬ নং আয়াত)।

২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এ মুনাফিকদের মওতের সময় থেকেই তাদের উপর আযাব শুরু হয়ে যাবে। ফেরেশতারা মারতে মারতে তাদের রূহ নিয়ে যাবে। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাশরের বিচারের আগে বারযাখেও আযাব হয়। মওত থেকে হাশর পর্যন্ত সময়কে বারযাখ বলে। কবরের আযাবের সত্যতাও এ থেকে প্রমাণিত হয়। বারযাখের এ আযাবের কারণ ২৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে, মুসলিম সমাজে বসবাস করার সময় মুনাফিকরা যে নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি নেক আমল এবং আরো যত ভালো কাজ করেছে, এর কোনো পুরস্কার তাদেরকে দেওয়া হবে না।

এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যখন হক ও বাতিলের মধ্যে লড়াই ও সংঘর্ষ চলতে থাকে তখন যাদের সমর্থন ও সহযোগিতা বাতিলের পক্ষে বলে বোঝা যায়, তাদের কোনো নেক আমলই আল্লাহ কবুল করেন না।

চতুর্থ রুকূ

২৯-৩২ নং আয়াতেও মুনাফিকদের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। মুনাফিক তারাই, যারা আসলে ঈমানই আনেনি। মুসলিম সমাজে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। রাসূল (স)-এর পেছনে এরা জামাআতে নামাযও পড়ে। লোকেরা যাতে মুসলমান বলে মনে করে সেভাবেই তারা আচরণ করে। তাই সাধারণ অবস্থায় মুনাফিকদেরকে আলাদা করে চেনার সুযোগ থাকে না।

এ কারণেই হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের প্রয়োজন। আল্লাহ চান না যে, খবীস ও তাইয়েব (অসৎ ও সৎ) মিশে থাকুক (সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ নং আয়াত)। সৎ থেকে অসৎদেরকে আলাদা করে চেনার প্রয়োজনেই যুদ্ধের দরকার।

২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওরা মুনাফিকী মনোভাব যতই গোপন রাখার চেষ্টা করুক, তিনি তা প্রকাশ করবেনই। ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে বলেছেন, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নাম ধরে বলে তাদেরকে চিহ্নিত করে আপনাকে দেখাতে পারি; কিন্তু এর দরকার নেই। কারণ, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তাদের কথাবার্তা ও চালচলন থেকেই মুসলমানরা তাদেরকে চিনে নিতে পারবে।

৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হক ও বাতিলের এ লড়াইটাই হলো ঐ পরীক্ষা– যার মাধ্যমে ধরা পড়ে যে, কে মুমিন আর কে মুনাফিক এবং কে মুজাহিদ আর কে জান বাঁচিয়ে চলে।

৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা মুনাফিক তারা মনের দিক দিয়ে কাফির হওয়ার কারণেই তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয় এবং রাসূল (স)-এর বিরোধিতা করে। অবশ্য তারা আল্লাহ ও রাসূলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দেবেন। আমল বরবাদ করার এক অর্থ হলো, তারা নেকী পাবে বলে মনে করে যেসব আমল করেছে এর কোনো পুরস্কার দেওয়া হবে না। আরেক অর্থ হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতির নিয়তে তারা যেসব কাজ করেছে, তাদের সেসব কাজের উদ্দেশ্যও সফল হতে দেওয়া হবে না।

৩৩-৩৫ নং আয়াতে মুসলিমদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের এ পরিস্থিতিতে খুবই সতর্কতার সাথে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর কথা মেনে চল এবং এমন সচেতন থাক, যাতে কোনো ভুলের কারণে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে না যায়। এমন কোনো কথা বা কাজ যেন না হয়, যার কারণে কাফিরদের ফায়দা হয় এবং মুসলিমদের ক্ষতি হয়। ৩৪ নং আয়াতে মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যা কিছু করছে এর শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে দেওয়া হবে।

৩৫ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ কাফিরদের সামরিক শক্তি চূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও; মাঝপথে সন্ধির প্রস্তাব দিও না। তাহলে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে এবং কাফিরদের হিম্মত বেড়ে যাবে। এ অবস্থায় ওরাও সন্ধিতে রাজি হবে না। হক ও বাতিলের লড়াই মাঝপথে থামিয়ে দিলে হকের বিজয় বিলম্বিত হবে। বাতিল সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়ার পর প্রয়োজন হলে এবং অপরপক্ষ চাইলে সন্ধি হতে পারে।

সমগ্র আরব শক্তির বিরুদ্ধে মদীনার নতুন ছোট্ট রাষ্ট্রের মুজাহিদদের উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ বলছেন, বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাও; আমি তোমাদের সাথে আছি। এ পথে যার যা সাধ্যে কুলায় কর্তব্য পালন কর। তোমাদের আমলের পূর্ণ বদলা দেওয়া হবে।

৩৬-৩৮ নং আয়াতে আল্লাহর পথে মুসলিমদেরকে জান ও মাল কুরবানী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের চাওয়া-পাওয়া সবই খেল-তামাশার মতোই। মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে। মানুষ তার যাবতীয় সময়, শ্রম, মেধা ইত্যাদি ঐসব ব্যাপারেই কাজে লাগায়। মাঝে মাঝে কিছু সময় একটু বিনোদনের জন্য খেল-তামাশায়ও খরচ করে; কিন্তু সেটা তার আসল উদ্দেশ্য নয়। তেমনি আখিরাতের সাফল্য যাদের আসল লক্ষ্য, তাদের নিকট দুনিয়ার জীবনের সুখ-সুবিধা একটু বিনোদনের মতোই ক্ষণস্থায়ী। তাই ঈমান ও তাকওয়ার জীবন যাপন করলে এর কর্মফল পাবে। আল্লাহর পথে মাল খরচ করতে বলায় এ কথা মনে করবে না যে, আল্লাহ নিজের জন্য চাচ্ছেন।

৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আমি নিজের জন্য চাইলে তো তোমাদের সবটুকু মালই চাইতে পারি। তা কি তোমরা দিতে পারবে? তখন তো বখিলীই করে বসবে। তোমরা যে কৃপণ এভাবে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে মাল খরচ করতে বলার পর দেখা যায়, কতক লোক কৃপণতা করে। আসলে এ কৃপণতা বোকামি। যারা কৃপণতা করে তারা নিজেরাই বঞ্চিত হয়। রাসূল (স) বলেছেন, যে মালটুকু আল্লাহর পথে খরচ করা হয় আসলে সেটাই শুধু দাতার। যে মাল সে দুনিয়ায় রেখে মরে যায় তা অপরের।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা যদি ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনের জন্য জান ও মাল খরচ না করে এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে আমার দীনের গাড়ি অচল থাকবে না। আমি তোমাদের বদলে অন্য লোককে এ কাজের তাওফীক দেব, যারা তোমাদের মতো অবহেলা করবে না। আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই। তোমাদেরই ক্ষতি হবে।

সূরা মুহাম্মাদ

৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٨ رُكُوْعَاتُهَا ٤

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

১. যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথে (আসতে মানুষকে) বাধা দিয়েছে, আল্লাহ তাদের সকল আমল বিফল করে দিয়েছেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

২. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং যা মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে তা তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য বলে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের সব দোষ দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দিয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ③

৩. এটা এ কারণে যে, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের অনুসরণ করেছে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত হককে মেনে চলেছে। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে তাদের সঠিক অবস্থা জানিয়ে দেন।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚۛ ذٰلِكَ ۛؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ

৪. তাই যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন (তাদের) গর্দানে আঘাত করাই (প্রথম কাজ)। যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ফেলবে তখন (বন্দীদেরকে) কষে বাঁধবে। যুদ্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার পর তোমরা ইচ্ছা করলে বন্দীদের প্রতি দয়া করবে বা ফিদ্ইয়া নিয়ে ছেড়ে দেবে– এটাই তোমাদের করার মতো কাজ।[১]

১. আয়াতের শব্দসমূহ এবং আগের ও পরের প্রসঙ্গ থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যুদ্ধের হুকুম আসার পর এবং যুদ্ধ হওয়ার আগে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। 'যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখী হবে' বলা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখনো মুকাবিলা হয়নি। মুকাবিলা হওয়ার আগে হেদায়াত দেওয়া হচ্ছে যে, যখন মুকাবিলা ঘটবে তখন মুসলমানদের কর্তব্য হবে সবার আগে শত্রুর সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণ খতম করা। এরপর যাদের গ্রেফতার করা হবে, তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের এই স্বাধীনতা থাকল যে, ফিদ্ইয়া নিয়ে অথবা নিজেদের কয়েদিদের বিনিময়ে তাদেরকে তারা মুক্তি দিতে পারে। অথবা বন্দি রেখে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারে। কিংবা ঠিক মনে করলে বিনা পণেও মুক্তি দিতে পারে।

لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদেরকে দমন করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান।[২] আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলকে কখনো বিফল করবেন না।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝

৫. তিনি তাদেরকে সঠিক পথে চালাবেন[৩] এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

৬. আর তাদেরকে ঐ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার কথা তিনি তাদেরকে (আগেই) জানিয়ে দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

৭. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর[৪] তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে মযবুত করে দেবেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

৮. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য ধ্বংস এবং আল্লাহ তাদের আমল নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[৫]

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

৯. কারণ, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করেছে; তাই আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।

২. অর্থাৎ যদি মিথ্যার মাথা ভেঙে দেওয়াই শুধু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হতো তাহলে তার জন্য তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। একটি ভূমিকম্প দ্বারা বা একটি তুফান দ্বারা তিনি তো চক্ষের নিমিষেই এ কাজ সমাধা করতে পারেন। কিন্তু তার তো উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষের মধ্যে যারা হকপন্থি, সত্যবাদী ও সত্যপন্থি তাদের সাথে বাতিলপিন্থদের লড়াই হোক। তাদের বিরুদ্ধে তারা ন্যায় যুদ্ধ করুক, যাতে যার মধ্যে যে গুণ আছে এই পরীক্ষায় পরিষ্কার হয়ে পূর্ণরূপে তা প্রকাশ পেতে পারে এবং প্রত্যেককে তার কর্ম ও যোগ্যতা অনুযায়ী যে যে মর্যাদার উপযুক্ত তা দান করা যেতে পারে।

৩. অর্থাৎ জান্নাতের পথ দেখাবেন।

৪. আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর কালেমা উচ্চ করা এবং সত্যকে জয়যুক্ত করার কাজে অংশগ্রহণ করা।

৫. এর দুটি অর্থ– প্রথমত, সেই কাফিররা যেমন ধ্বংস হয়েছিল, মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াতকে যারা অমান্য করছে তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে। দ্বিতীয়ত, যে ধ্বংসের ভেতর তারা দুনিয়ায় নিপতিত রয়েছে, আখিরাতেও তাদের জন্য সে ধ্বংসই নির্ধারিত রয়েছে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾

১০. তারা কি দুনিয়াতে ঘোরাফেরা করেনি এবং তাদের আগে যারা ছিল তাদের কী দশা হয়েছে তা কি দেখছে না? আল্লাহ তাদের সব কিছু তাদের উপর উল্টিয়ে দিয়েছেন এবং এ কাফিরদের দশাও তা-ই হবে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾

১১. এর কারণ এই যে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহই তাদের সাহায্যকারী, আর কাফিরদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

রুকূ' ২

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

১২. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলেছে। আর যারা কুফরী করেছে তারা দুনিয়ার কয়দিনের মজা লুটছে ও জানোয়ারদের মতো খাচ্ছে; আর দোযখই হলো তাদের ঠিকানা।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৩. (হে রাসূল!) আপনার যে এলাকা থেকে[৬] আপনাকে বের করে দিয়েছে এর চেয়ে শক্তিশালী কত এলাকা বিলীন হয়ে গেছে। আমি তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি যে, তাদেরকে বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾

১৪. এটা কি কখনো হতে পারে, যে লোক তার রবের সুস্পষ্ট হেদায়াত মেনে চলে, সে তার মতো হয়ে যাবে, যার নিকট তার বদ আমলকে পছন্দনীয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাদের নাফসের তাঁবেদারি করে চলেছে?

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ

১৫. মুত্তাকীদের জন্য এমন বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে, যার মধ্যে বহমান থাকবে পরিষ্কার পানির নহর, এমন দুধের নহর যার স্বাদ নষ্ট হয় না, এমন শরাবের নহর, যা যারা পান করে তাদের জন্য সুস্বাদু এবং এমন মধুর

৬. অর্থাৎ মক্কা, যেখান থেকে কুরাইশরা রাসূল (স)-কে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল।

مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

নহর, যা খাঁটি ও স্বচ্ছ।[৭] তাদের জন্য আরো থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত। (যে এমন বেহেশতের ভাগী হবে সে কি) তাদের মতো হতে পারে, যারা চিরকাল দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত কেটে ফেলবে?

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৬. (হে রাসূল!) তাদের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যারা কান লাগিয়ে আপনার কথা শোনে। পরে যখন আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন যাদেরকে ইলমের নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই মাত্র তিনি কী বললেন'[৮]। এরা ঐ লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং যারা নাফসের গোলামি করে চলেছে।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

১৭. আর যারা হেদায়াত লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে আরো বেশি হেদায়াত দেন এবং তাদের উপযোগী তাকওয়া দান করেন।

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

১৮. এখন এরা কি শুধু কিয়ামতেরই অপেক্ষায় আছে যে, তা হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়ুক? কিয়ামতের লক্ষণগুলো তো এসেই গেছে। (যখন কিয়ামত নিজেই এসে যাবে) তখন তাদের নসীহত কবুল করার আর কোন্ সুযোগ বাকি থাকবে?

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

১৯. অতএব (হে রাসূল!) ভালো করে জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো

৭. হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যা জানা যায় যে, এ দুধ প্রাণীর স্তন থেকে বের হবে না, এ পানীয় পচনশীল ফল থেকে তৈরি হবে না, বা এ মধু মৌমাছির পেটের নয়; বরং এসব জিনিস আল্লাহর হুকুমে আপনা আপনিই তৈরি হবে।

৮. এখানে ঐ সব কাফির, মুনাফিক ও ইসলামবিরোধী আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মজলিসে এসে বসত ও তাঁর আদেশ-উপদেশ বা কুরআনের আয়াত শুনত। কিন্তু তাদের মন এসব বিষয় থেকে দূরে থাকার কারণে রাসূল (স) তাঁর পবিত্র যবানে যা কিছু বলতেন তা সবকিছু শোনা সত্ত্বেও তারা কিছুই শুনত না এবং রাসূল (স)-এর মজলিস থেকে বাইরে এসে তারা মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করত, 'এই মাত্র তিনি কী বলছিলেন?'

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

মা'বুদ নেই। আর আপনার নিজের[৯] এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের গুনাহ্ মাফ চান। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতার খবরও রাখেন এবং (শেষ) ঠিকানাও জানেন।

রুকূ' ৩

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

২০. যারা ঈমানদার তারা বলছিল, (যুদ্ধের আদেশসহ) কোনো সূরা কেন নাযিল হচ্ছে না? কিন্তু যখন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে একটি মযবুত সূরা নাযিল হলো তখন (হে রাসূল) আপনি দেখতে পেলেন যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেমন মওতের সময় কেউ বেহুঁশ অবস্থায় তাকায়।[১০] তাদের জন্য আফসোস!

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

২১. (তারা তো মুখে) অনুগত হয়ে চলার ওয়াদা করছে এবং ভালো ভালো কথা বলছে; কিন্তু যখন (জিহাদের) স্পষ্ট হুকুম এসে গেল তখন যদি তারা আল্লাহর নিকট ওয়াদা পূরণ করত তাহলে তা তাদের জন্যই ভালো হতো।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

২২. এখন তোমাদের কাছ থেকে এ ছাড়া আর কিছু কি আশা করা যায় যে, যদি তোমরা জনগণের শাসক হও তাহলে দুনিয়াতে ফাসাদ করবে এবং মারামারি করে আত্মীয়তা বিনষ্ট করবে?[১১]

৯. ইসলাম মানুষকে যে চরিত্র-নীতি শিক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে এও একটি যে, বান্দাহ নিজ প্রভুর বন্দেগী ও ইবাদাতের কর্তব্য পালনে ও তাঁর দীনের জন্য প্রাণপণ সাধনা-সংগ্রামে নিজের সাধ্যমতো যতই চেষ্টা-যত্ন করতে থাকুক না কেন কখনো তার এ ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, 'যা কিছু আমার করার ছিল আমি তা করেছি'; বরং তার মনে করা উচিত যে, 'আমার উপর আমার প্রভুর যে হক ছিল তা ঠিকমতো পালন করতে পারিনি।' সবসময় নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে আল্লাহর কাছে বান্দার দো'আ করা উচিত যে, 'হে প্রভু! আমি যা কিছু অপরাধ ও দোষত্রুটি করেছি তা তুমি ক্ষমা কর।' আল্লাহ তাআলা যে আদেশ করেছেন, হে নবী! 'ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের অপরাধের জন্যও'– এর মূল ভাব এটাই।

১০. অর্থাৎ যাঁরা খাঁটি মুসলমান ছিল তাঁরা যুদ্ধের আদেশের জন্য অধীরভাবে আগ্রহী ছিল। কিন্তু যারা ঈমানহীন হয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়েছিল, যুদ্ধের আদেশ আসামাত্রই তাদের প্রাণ যেন উড়ে গেল।

১১. অর্থাৎ যদি এ সময় তোমরা ইসলামের হেফাযত করতে এগিয়ে না আস এবং হযরত মুহাম্মদ (স) ও ঈমানদারগণ যে মহান বিপ্লবের জন্য চেষ্টা-সাধনা করছেন তার জন্য নিজেদের জান-মাল কুরবান করতে কুণ্ঠিত ও বিমুখ হও, তবে এর ফল এটা ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তোমরা

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾

২৩. এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং তাদের শোনার ও দেখার শক্তি নষ্ট করে দিয়েছেন।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

২৪. তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে?

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫. আসল কথা হলো, যারা তাদের কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তা থেকে ফিরে গেছে, তাদেরকে শয়তান সেদিকে লোভ দেখিয়েছে এবং মিথ্যা আশার জাল বিস্তার করে দিয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. এ কারণেই আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তারা (রাসূলের দুশমনদেরকে) বলে দিয়েছে যে, কোন্ কোন্ ব্যাপারে তোমাদের কথা আমরা মানবো।[১২] আল্লাহ তাদের এসব গোপন কথা জানেন।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭. ফেরেশতারা যখন তাদের রূহ কবয করে মুখ ও পিঠে মারতে মারতে তাদেরকে নিয়ে যাবে তখন তাদের কেমন দশা হবে?

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৮. এটা এ কারণেই হবে যে, তারা এমন পথে চলেছে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে তারা অপছন্দ করেছে। তাই তিনি তাদের সব আমলকে বরবাদ করে দিয়েছেন।[১৩]

আবার সেই জাহিলিয়াতের অন্ধকারময় সমাজ জীবনের দিকে ফিরে যাবে, যে অবস্থায় তোমরা শত শত বছর ধরে একে অপরের গলা কাটাকাটি করছিলে, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে জীবিত অবস্থায় কবর দিচ্ছিলে এবং আল্লাহর জমিনকে যুলুম ও ফাসাদে পূর্ণ করছিলে।

১২. অর্থাৎ ঈমানের স্বীকৃতি ও মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ভেতরে ভেতরে ইসলামের শত্রুদের সাথে শলাপরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং তাদের নিকট ওয়াদা দিতে থাকে যে, কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করব।

১৩. 'সব আমল' অর্থ সেই সব কাজ, যা তারা মুসলমান হয়ে করেছিল। তাদের নামায, রোযা, যাকাত– মোটকথা তাদের সেই সব ইবাদাত ও সেই সব নেকী (পুণ্যকাজ) যা বাহ্যত সৎ কাজ বলে গণ্য করা হয়, তা এ কারণে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হয়েছে যে, তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ ও তাঁর দীন এবং ইসলামী মিল্লাতের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করেনি; বরং ষড়যন্ত্র ও শলাপরামর্শ করতে থাকে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের সুযোগ আসতেই নিজেরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তায় রত হয়।

রুকূ' ৪

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯. যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি মনে করেছে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে দেবেন না?

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

৩০. (হে রাসূল!) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে আপনার চোখে দেখিয়ে দিতে পারি, যাতে আপনি তাদের চেহারা দেখেই চিনে নিতে পারেন; কিন্তু তাদের কথার ধরন থেকে তো তোমরা তাদেরকে চিনতেই পার। আল্লাহ তোমাদের সব আমল সম্পর্কেই ভালো করে জানেন।[১৪]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۙ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

৩২. যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথে (আসতে মানুষকে) বাধা দিয়েছে এবং হেদায়াতের পথ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের সাথে ঝগড়া করেছে, তারা বাস্তবে আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। বরং আল্লাহই তাদের সব আমল বরবাদ করে দেবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চলো। আর নিজেদের আমল নষ্ট করো না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

৩৪. যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং কাফির অবস্থায় মরেছে তাদেরকে আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না।

১৪. অন্যকথায়, আমলের মঙ্গলজনক ও সফল হওয়া পূর্ণভাবে নির্ভর করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আনুগত্যের উপর। আনুগত্য শূন্য হয়ে যাওয়ার পর কোনো কাজই আর সৎ কাজ থাকে না– যে জন্য মানুষ কোনো পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতএব তোমরা হীনতা স্বীকার করে সন্ধির প্রস্তাব দিও না।[১৫] তোমরাই তো বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন এবং তিনি তোমাদের আমলের বদলা মোটেই কম দেবেন না।

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

৩৬. দুনিয়ার জীবনটা তো খেলা ও তামাশার ব্যাপার। যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়ার জীবন যাপন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল দেবেন। আর তিনি তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের মাল চাইবেন না।

إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৭. যদি তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের মাল চেয়েই বসেন এবং সবটুকুই দাবি করেন তাহলে তোমরা তো বখিলীই করবে। তখন তিনি তোমাদের বদ মতলব প্রকাশ করে দেবেন।

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৮. দেখ, তোমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে মাল খরচ কর। তোমাদের মধ্যে কতক লোক বখিলী করছে। অথচ যে বখিলী করছে সে আসলে নিজের সাথে নিজেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত[১৬], তোমরাই অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে আল্লাহ তোমাদের বদলে অন্য কাওমকে নিয়ে আসবেন। আর তারা তোমাদের মতো হবে না।

১৫. এখানে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, এ কথা তখন হয়েছিল, যখন মাত্র মদীনার ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক শত মুহাজির ও আনসারের এক মুষ্টিমেয় দল ইসলামের পতাকা বহন করেছিল এবং তার মুকাবিলায় শুধু কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রগুলো নয় বরং সমগ্র আরব দেশের কাফির ও মুশরিকরাও ছিল। এ অবস্থায় বলা হয়েছে যে, হিম্মতহারা হয়ে শত্রুদের কাছে সন্ধির আবেদন করতে যেও না; বরং জীবনপণ করে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬. অর্থাৎ তিনি ঐশ্বর্যবান-অভাবহীন। তোমাদের কাছ থেকে তাঁর নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর পথে কিছু খরচ করার জন্য যদি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন, তবে তা তাঁর নিজের জন্য নয়; বরং তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য।

৪৮. সূরা ফাত্হ

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'ফাত্হ' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। সব সূরার নাম থেকে সূরার আলোচ্য বিষয় বোঝা যায় না। কিন্তু এ সূরার নাম ও আলোচ্য বিষয় একই। ফাত্হ অর্থ বিজয়। এ সূরায় হুদাইবিয়ার সন্ধির আকারে পরোক্ষ বিজয়ের উল্লেখ করে পরবর্তী অন্যান্য বিজয়, এমনকি মক্কা বিজয়ের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

সকল ঐতিহাসিকের মতে, ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। এ সন্ধির পর রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরাম (রা)-সহ মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে গোটা সূরাটি নাযিল হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

রাসূল (স) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় গেলেন এবং ওমরাহ আদায় করলেন। যে কয়েক রকমে ওহী নাযিল হয়েছে, স্বপ্ন তার মধ্যে একটি। তাই রাসূল (স) উৎসাহের সাথে সাহাবীগণকে তৈরি হতে বললেন। ১৪০০ সাহাবী নিয়ে জিলকদ মাসের প্রথমদিকে সফর শুরু হলো।

মক্কার কুরাইশ নেতারা মহাসমস্যায় পড়ল। হাজার হাজার বছর ধরে হজ্জ ও ওমরার জন্য যে চারটি মাসে আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণ হারাম বলে সবাই মেনে চলে, জিলকদ মাস এরই একটি। তারা ভাবল, যদি বিনা বাধায় ওমরাহ করতে দেওয়া হয় তাহলে কুরাইশদের ইজ্জত থাকবে না। আর বাধা দিলে সারা আরবে বদনাম হবে।

হুদাইবিয়া নামক জায়গাটি মক্কা থেকে জেদ্দা যাওয়ার পথে পড়ে। হারাম শরীফের শেষ সীমানায়ই ঐ জায়গা। ওখানে রাসূল (স) পৌছার আগেই কুরাইশরা দূতের মাধ্যমে রাসূল (স)-কে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিল। রাসূল (স) হযরত উসমান (রা)-কে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠালেন এ কথা বোঝানোর জন্য যে, তিনি যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসেননি। কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছেন শুধু ওমরার নিয়তে। তাই এতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। তারা সে কথা মানতে রাজি হলো না; বরং হযরত উসমান (রা)-কে আটক করে রাখল। গুজব রটল যে, উসমান (রা)-কে শহীদ করে ফেলেছে। তিনি ফিরে না যাওয়ায় গুজবে সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো। অথচ এ খবর সঠিক ছিল না।

রাসূল (স) সাহাবীগণ থেকে শপথ নিলেন যে, আমরা পেছাব না। সবাই জীবন দেব, তবু পিছু হটব না। এ শপথই ইতিহাসে 'বাইআতে রিদওয়ান' নামে বিখ্যাত। এমন অপ্রস্তুত অবস্থায়ও দীনের জন্য জীবন দিতে শপথ নেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে এ সূরায় জানানো হয়েছে। রিদওয়ান মানে সন্তুষ্টি। হুদাইবিয়ার একটি গাছের নিচে রাসূল (স)-এর হাতে হাত রেখে সবাই বাইআত নিলেন। রাসূল (স) নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে হযরত উসমান (রা)-এর নামে বাইআত নিলেন।

এরপরই দেখা গেল, হযরত উসমান (রা) ফিরে এলেন এবং সুহাইল বিন আমরের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি প্রতিনিধি দল সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। অনেক আলাপ-আলোচনার পর যেসব শর্তের আলোকে সন্ধিপত্র তৈরি হলো তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ১০ বছর পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং কোনো পক্ষই প্রকাশ্যে বা গোপনে যুদ্ধের পক্ষে কোনো কাজ করবে না।

২. এ সময়ের মধ্যে কুরাইশদের কোনো লোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদীনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফেরত দিতে হবে; কিন্তু মদীনা থেকে কোনো মুসলমান মক্কায় চলে এলে তাকে মদীনায় ফেরত দেওয়া হবে না।

৩. আরবের বিভিন্ন গোত্র এ দুপক্ষের যেকোনো এক পক্ষের সহযোগী হিসেবে এ সন্ধিতে শরীক হতে চাইলে হতে পারবে।

৪. রাসূল (স) এ বছর ওমরা না করেই ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর ওমরার উদ্দেশ্যে তিন দিন মক্কায় থাকতে পারবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, একটি করে তলোয়ার সাথে রাখা ছাড়া যুদ্ধের কোনো অস্ত্র সাথে আনতে পারবেন না। ঐ তিন দিন মক্কাবাসীরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার সময় মক্কার কোনো লোককে সাথে নিতে পারবেন না।

যখন সন্ধির এসব শর্ত লেখা হচ্ছিল তখন কুরাইশরা এটাকে তাদের বিজয় মনে করছিল এবং সাহাবীগণ ঐ শর্তগুলোকে অপমানজনক মনে করে অস্থিরতা বোধ করছিলেন। এসব শর্ত মুসলিমদের স্বার্থের বিরোধী মনে হলেও এগুলো যে আসলে এবং পরিণামে বিজয়ের সহায়ক, সে কথা রাসূল (স) ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেননি।

সাহাবীগণ সন্ধির ব্যাপারে মনে মনে দুঃখিত থাকা অবস্থায়ই কুরাইশ নেতা সুহাইলের ছেলে আবূ জানদাল পায়ে বেড়ি লাগানো অবস্থায় কোনো রকমে বন্দীদশা থেকে পালিয়ে রাসূল (স)-এর নিকট আশ্রয় চাইলে এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সুহাইল তার ছেলেকে ফেরত চাইলে রাসূল (স) যখন ফেরত দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। তাঁদের এক মযলুম মুসলিম ভাইকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে দেখে তাঁরা এ সন্ধির নগদ অপকারিতা দেখে ব্যথিত হলেন।

সন্ধিপত্র লেখার সময় দুপক্ষের নাম লিখতে গিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর সাথে 'রাসূলুল্লাহ' কথাটি অপরপক্ষের দাবিতে কেটে দেওয়া হলো। এটাও সাহাবায়ে কেরামের প্রাণে আঘাত দিল। সন্ধি শেষ হওয়ার পর রাসূল (স) সবাইকে আদেশ দিলেন, কুরবানীর জন্য সাথে আনা পশু যবেহ করে এবং মাথা কামিয়ে বা চুল ছেঁটে ইহরাম খুলে ফেল। পরপর তিন বার বলার পরও সাহাবীগণ মনমরা হয়ে চুপ করে রইলেন। কেউ আদেশ পালন করলেন না।

যাঁরা একটু আগেই রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন দিতে রাজি হলেন তাঁরা এ আদেশ পালন না করায় রাসূল (স) তাঁবুর ভেতরে গিয়ে তাঁর সফরসাথী স্ত্রী উম্মে সালমা (রা)-কে এ অবস্থাটা জানালেন। বুদ্ধিমতী স্ত্রী পরামর্শ দিলেন, আপনি নিজের পশু কুরবানী দিয়ে মাথা কামিয়ে ইহরাম খুলে ফেলুন।

সাহাবীগণ রাসূল (স)-কে ইহরাম খুলতে দেখে সবাই তাঁর অনুসরণ করলেন; কিন্তু মনমরা অবস্থা রয়েই গেল। রাসূল (স)-এর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো না, ওমরাহ করা গেল না, এমন সন্ধি করা

হলো, যা মন কবুল করছে না— এসব চিন্তা নিয়েই সাহাবীগণ দুঃখিত অবস্থায় মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে এ সূরাটি নাযিল হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ও পরাজয়সূচক মনে করেই সাহাবীগণ ব্যথাভরা মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর এ প্রিয় বান্দাহদের মনের এ অবস্থায় আল্লাহর মায়া লাগারই কথা। যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত, তাঁরা মদীনায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত দেরি না করে পথেই সূরাটি নাযিল করে তিনি তাঁর আদরের গোলামদেরকে খুশি করার ব্যবস্থা করলেন।

সূরাটি নাযিলের সাথে সাথে রাসূল (স) পথচলা মুলতবি করে সবাইকে একত্রিত করে বললেন, আজ আমার উপর এমন জিনিস নাযিল হয়েছে, যা দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান। এ কথা বলার পর তিনি সূরাটি তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। বিশেষ করে হযরত ওমর (রা)-কে ডেকে এ সূরার মূল্য বোঝতে বললেন। কারণ, হযরত ওমর (রা)-ই এ সন্ধিতে সবচেয়ে বেশি আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন।

সূরাটি শোনার পর সাহাবায়ে কেরামের মনের দুঃখ দূর হলো। সন্ধিটি মুসলিমদের জন্য অবশ্যই উপকারী বলে ইয়াকীন হলেও বাস্তবে তখনো অনুভব করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই সবাই বুঝতে পারলেন যে, এ সন্ধিটি সত্যিই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহান বিজয়।

আলোচ্য বিষয়

হুদাইবিয়ার সন্ধিকে কেন্দ্র করেই গোটা সূরায় বক্তব্য রাখা হয়েছে। সন্ধির পূর্বে বাইআতে রিদওয়ান, সন্ধির পর খাইবার বিজয়ের ইঙ্গিত, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ না করে সন্ধির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য, রাসূল (স) ওমরা করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সত্যে পরিণত করার নিশ্চয়তা দান ইত্যাদি সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণ হয়েছে তা জানিয়ে দিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে সম্বোধন করে যা বলা হয়েছে তা মুসলিম জামাআতের সবাইকে জানানোই এর উদ্দেশ্য। সন্ধির সবক'টি ফায়দার কথা রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলাই স্বাভাবিক। কারণ, নেতার বিজয়ই জামাআতের বিজয়। জামাআতের পরাজয় নেতারই পরাজয়।

১. প্রথমেই বলা হয়েছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয়। রাসূল (স) ছাড়া অন্য কেউ বিজয় বলে বুঝতে না পারার কারণেই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ বিজয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ সূরা নাযিল হওয়ার পরও বিজয়ের দিকটা সবার কাছে স্পষ্ট হয়নি। হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা বিজয় হলো কীভাবে? আরো অনেকেই বুঝতে চাইলেন। এ নিয়ে সবাই প্রশ্ন তুললে রাসূল (স) ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

   রাসূল (স) বললেন, তোমরা মুশরিকদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলে। ওরা আগামী বছর ওমরাহ করতে যাওয়ার দরখাস্ত করে তোমাদেরকে ফিরে আসতে রাজি করাল। তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের দিলে চরম বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তারাই যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধি করার আগ্রহ দেখাল। আল্লাহ তাদের উপর তোমাদেরকে বিনা বাধায় কাজ করার সুযোগ করে দিলেন; যুদ্ধ পরিস্থিতি দূর হয়ে গেল।

সত্যি কিছু দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামের বিজয় ঐ সন্ধি থেকেই শুরু হয়ে গেল। ইসলামের দাওয়াতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল কুরাইশ নেতৃত্ব। মদীনায় বারবার হামলা করে ইসলামী রাষ্ট্রকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল। এ সন্ধির ফলে গোটা আরবে এ রাষ্ট্রের প্রভাব-বলয় দ্রুত বাড়তে লাগল। গোত্রের পর গোত্র ইসলাম কবুল করতে থাকল। দেশ গড়ার কাজ বিনা বাধায় এগিয়ে চলল।

২. এ সন্ধির দ্বিতীয় ফায়দার ব্যাখ্যা ২নং টীকায় মাওলানা মওদূদী (র) নিজেই করেছেন।

৩. এ সন্ধির মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি নিয়ামত পূর্ণ হওয়ার পথ সহজ হয়ে গেল। এর অর্থ হলো, মুসলিম জাতি বিনা বাধায় ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলার সুযোগ পেল। আল্লাহর দীন হলো শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। মানুষ যখন সে দীন মেনে চলার সুযোগ পায়, তখনই নিয়ামত ভোগ করতে পারে। সন্ধির আগে পদে পদে বাধা ছিল। আরবের সব এলাকায় দীন কবুল করা সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। আল্লাহর আইন জারি করার পথে চরম বাধা ছিল। এ সন্ধির ফলে ইসলামের সুফল ভোগ করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে গেল। দীনের নিয়ামত পূর্ণতা লাভের সুযোগ পেল। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ পূর্ণরূপে গড়ে উঠলে মানুষ বুঝতে পারল যে, দীন কত বড় নিয়ামত।

৪. এ সন্ধির উদ্দেশ্য কী, তা বোঝার তাওফীক দিয়ে রাসূল (স)-কে সরল-সঠিক পথ দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যদি রাসূল (স)-কে এ বিষয়ে হেদায়াত না করতেন, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের মতো তিনিও সন্ধির উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন না। আর তিনি না বুঝলে এ সন্ধিও হতো না। কাফিররা সন্ধির যে ক'টা শর্ত তাদের পক্ষে যাবে বলে মনে করেছিল তা যে তাদের বিরুদ্ধে যাবে, তা রাসূল (স) বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাদের আত্মঘাতী প্রস্তাব তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

৫. এ সন্ধির মাধ্যমে রাসূল (স)-কে বলিষ্ঠ সাহায্য করা হয়েছে। 'নাসরান আযীযা' বলা হয়েছে। এর এক অর্থ হলো, এমন বিরাট সাহায্য, যার ফলে দুশমনরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বিরোধিতা করতে অক্ষম হয়ে যাবে। আরেকটি অর্থ হলো, অতুলনীয় সাহায্য। অর্থাৎ এমন ঘটনা বিরল যে, এক পক্ষ এমন সব শর্ত পেশ করল তা যে তাদের বিরুদ্ধেই যাবে সেকথা তারা টেরও পেল না। ঐসব শর্ত যে রাসূল (স)-এর পক্ষে ছিল, সে কথা দুশমনরা বুঝতেই পারেনি। তাই এ সাহায্য বড়ই আজব ও তুলনাবিহীন।

৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে ও পরে সাহাবায়ে কেরামের ইখলাস ও আনুগত্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, তাদেরকে তিনিই ঐ মনোবল, মানসিক প্রশান্তি ও এতমিনান দান করেছেন, যার ফলে কঠিন ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায়ও তারা বিনা দ্বিধায় রাসূল (স)-এর আনুগত্য করেছেন। তাঁরা রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে অতি বিপজ্জনক সফরে রওয়ানা হন। যে কুরাইশরা বারবার মদীনা আক্রমণ করল তাদের কাছে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যাওয়া অবশ্যই বিপজ্জনক ছিল। রাসূল (স)-এর নির্দেশ পেয়ে খালি হাতে তাঁরা কুরাইশদের সাথে লড়ে জীবন দিতে রাজি হয়েছেন। সন্ধির শর্তগুলোর সুফল বুঝতে না পেরে মনের চরম অস্থিরতা সত্ত্বেও তাঁরা রাসূল (স)-এর প্রতি আস্থা হারাননি। আবূ জানদাল (রা)-কে করুণ অবস্থায় যালিমদের হাতে ফেরত দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা রাসূল (স)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন।

উপরে বর্ণিত অবস্থায় সাহাবীগণ যদি বেসবর হতেন এবং কোনো এক সময়ও রাসূল (স)-এর সিদ্ধান্তকে মেনে না নিতেন, তাহলে যে বিজয়ের পথে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তা পরাজয়ে পরিণত হতো।

তাঁদের সবর ও আনুগত্যের কারণে সব পরীক্ষার সময়ই তাদের ঈমান মযবুত হতে লাগল। ঈমান কখনো এক অবস্থায় থাকে না। মুমিনের জীবনে বারবার এমন পরীক্ষা আসে যে, তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দীন তার নিকট জান, মাল, আবেগ, সময়, শ্রম কুরবানীর দাবি জানায়। যদি কুরবানী দেওয়ার হিম্মত করে তাহলে তার ঈমান আরও সবল হয় এবং ঈমান বেড়ে যায়। আর যদি কুরবানী করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। বারবার দুর্বলতা দেখাতে থাকলে ঈমানের মূল পুঁজিটুকু পর্যন্ত হারানোর কারণ ঘটে।

এ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আসমান ও জমিনের যে সেনাবাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আসলে আল্লাহর নিজেরই ক্ষমতা। ফেরেশতা ছাড়াও আসমান-জমিনের সকল সৃষ্টিই আল্লাহর সেনাবাহিনী। তিনি কোনো কাওমকে ধ্বংস করতে হলে তুফান, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি শক্তি ব্যবহার করেন।

এখানে আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন যে, কাফির ও বাতিল শক্তিকে তিনি ইচ্ছে করলেই দমন করতে পারেন। এ ক্ষমতা তাঁর হাতেই আছে; কিন্তু আল্লাহ মুমিনদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এবং আখিরাতে তাদের সম্মান ও সফলতা হাসিলের সুযোগ দেওয়ার জন্য দুনিয়ায় তাদেরকেই বাতিলের সাথে লড়াই করে দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি জেনে-বুঝেই এবং ইচ্ছে করেই এ ব্যবস্থা করেছেন।

৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সত্যিকার মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীকে চিরদিন বেহেশতে থাকার সুযোগ দেবেন। এখানে নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, পুরস্কারের বেলায় নারী ও পুরুষের মর্যাদা সমান। যে আমলের জন্য যে পুরস্কার দেওয়া হবে, তা পুরুষ ও নারীর বেলায় কম-বেশি করা হবে না।

তিনি আরো সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা বেহেশতে যাবে তাদের সব দোষ-ত্রুটি বেহেশতে যাওয়ার আগেই দূর করে দেওয়া হবে। তাদের সব গুনাহ আগেই মাফ করে দেওয়া হবে। যেসব মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষ গুনাহ করে, সেসবও দূর করে দেওয়া হবে, যাতে বেহেশতে কখনো তাদের লজ্জিত হতে না হয়।

মানুষ অবশ্যই তার জীবনে সফলতা লাভ করতে চায়। সবাই সফলতার জন্যই এত কষ্ট করে। দুনিয়ার সামান্য সুখ-সুবিধা, সুনাম-সুখ্যাতি, ভোগ-বিলাসিতা আল্লাহর দৃষ্টিতে পরীক্ষা মাত্র, সফলতা নয়। আল্লাহ যাকে ক্ষমা করে বেহেশত দান করবেন সে-ই আসলে আল্লাহর দৃষ্টিতে সফল।

৬ নং আয়াতে মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এরা আল্লাহ সম্বন্ধে এ খারাপ ধারণা রাখে যে, তিনি রাসূল (স) ও সাহাবীগণের ভালো-মন্দের ধার ধারেন না এবং তাদের বিজয়ের জন্য সাহায্য করবেন না।

মদীনা ও আশপাশের মুনাফিক ও কাফিররা আশা করেছিল যে, রাসূল (স) ও সাহাবীগণ ওমরাহ সফর থেকে ফিরে আসতে পারবেন না। মক্কাবাসীরা তাঁদেরকে শেষ করে দেবে। আর মক্কার মুশরিকরা ঐ সন্ধির মারফতে রাসূল (স)-কে ওমরাহ না করে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারায় খুব

তৃপ্তি বোধ করল এবং তারা বিজয়ী হয়েছে বলে গৌরববোধ করল; কিন্তু তারা যে নিজেরাই মন্দের খপ্পরে পড়ে গেছে তা বুঝতে পারল না। তাদের দেওয়া শর্তে যে সন্ধি করা হলো, তার ফলেই যে রাসূল (স) বিজয়ের পথে এগিয়ে চললেন, তা তারা টেরই পেল না।

এ চক্রান্ত করার কারণে আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করায় তাদের উপর লা'নত করেছেন। এ তো গেল দুনিয়ার শাস্তি। আর আখিরাতে তিনি তাদেরকে দোযখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

পূর্বের আয়াতে মুমিনদের পরম সফলতার বিবরণ দিয়ে এ আয়াতে মুনাফিক ও মুশরিকদের চরম বিফলতা ও ব্যর্থতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৭ নং আয়াতে ঐ কথাই বলা হয়েছে, যা ৪ নং আয়াতে আছে। আসমান-জমিনের যাবতীয় শক্তি আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করেন। এসব শক্তির নিজস্ব কোনো ইচ্ছা ও ক্ষমতা নেই। এসবই আল্লাহর সেনাবাহিনী।

৮ ও ৯ নং আয়াতে দুনিয়ায় রাসূল (স)-এর দায়িত্ব ও ঈমানদারদের কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে রাসূল (স)-এর তিন রকম দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, তিনি 'শাহেদ' বা সাক্ষ্যদাতা। রাসূল (স)-এর সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব বড়ই ব্যাপক। দুনিয়ায় তিনি কথা ও কাজের দ্বারা সাক্ষ্য দেন। তিনি যা বলেন তা-ই সত্য ও সঠিক। কারণ, তিনি নিজের পক্ষ থেকে নয়, আল্লাহর ওহীর ভিত্তিতে কথা বলেন। তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাক্ষী। তেমনিভাবে তাঁর আমলই সঠিক আমল। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে তিনি আল্লাহর মর্জির জীবন্ত সাক্ষী। তিনি যে কাজ যেভাবে করেছেন সেটাই সঠিক। তাঁর জীবনে আল্লাহর ইচ্ছাই তিনি পূরণ করেছেন। তাই আমলের দিক দিয়েও তিনি আল্লাহর সাক্ষী।

এরপর আখিরাতেও তিনি সাক্ষীর দায়িত্ব পালন করবেন। সেখানে তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহর ওহীর বাণী পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছেন এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে সঠিকভাবে আল্লাহ যা চান তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। রাসূলের এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আল্লাহ ফায়সালা করবেন যে, যারা রাসূলকে মেনে চলেছে, তাদের জন্যই পুরস্কার রয়েছে আর যারা তা করেনি তারা শাস্তির যোগ্য।

দ্বিতীয়ত, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা। নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কেউ ভালো কাজের যে ভালো ফল হবে বলে সুসংবাদ দেয়, তাতে ভুল হতে পারে। কিন্তু রাসূল যখন কোনো বিষয়ে সুসংবাদ দেন, তাতে সামান্য সন্দেহও করা চলে না। তাই রাসূল (স) যখন কোনো সুসংবাদ দেন তখন বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহরই আইন। যেসব কাজের বদলায় বেহেশত দেওয়ার সুসংবাদ তিনি দেন তা অকাট্য সত্য।

তৃতীয়ত, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যই আইন। যেসব কাজের ফলে দুনিয়ায় অশান্তি ও দুঃখ হবে এবং আখিরাতে শাস্তি হবে বলে তিনি বলেছেন, তা হবেই হবে।

৯ নং আয়াতে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনে। যারা ঈমান আনে তারা যেন রাসূল (স)-কে তাঁর আসল দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার যে বিরাট ও মহান দায়িত্ব রাসূল (স)-এর উপর রয়েছে, সে দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তায়, যারা ঈমানের দাবিদার।

ঈমানদারদের আরো একটি কতর্ব্য হলো– রাসূল (স)-কে রাসূল হিসেবে যেমন সম্মান করতে হবে, তেমনি মহব্বতের সাথে তাঁকে শ্রদ্ধাও করতে হবে। তাঁকে নির্ভুল মনে করতে হবে এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। সব মানুষের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসতে হবে।

ঈমানদারদের তৃতীয় কর্তব্য হলো– সকাল-সন্ধ্যা তথা সবসময় আল্লাহর তাসবীহ্ করা। এর মানে হলো, মুখে সুবহানাল্লাহ বলতে থাকা, মনে তাওহীদের মযবুত ধারণা রাখা এবং কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই বিধান মেনে চলা।

১০ নং আয়াতে ঐ 'বাইআতে রিদওয়ান'-এর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যারা রাসূল (স)-এর হাতে হাত দিয়ে আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী দেওয়ার শপথ করেছিল, তারা আসলে আল্লাহর কাছেই শপথ করেছিল। কারণ, রাসূলের হাত মানে আল্লাহর প্রতিনিধির হাত।

আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার এ ওয়াদা সাময়িক নয়। হুদাইবিয়াতে ঐ ওয়াদা পালনের দরকার হয়নি বলে সে ওয়াদার দায়িত্ব সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এ ওয়াদা স্থায়ী এবং সারা জীবনের জন্য। যদি এ ওয়াদা কেউ পালন না করে তাহলে এর কুফল সে অবশ্যই ভোগ করবে। আর যারা সারা জীবন এ ওয়াদা পালন করতে থাকবে তারা বড় পুরস্কার পাবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১-১৪ নং আয়াতে মদীনা ও আশপাশের মুনাফিকদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল (স) ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য সকল সাহাবীকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন; কিন্তু মুনাফিকরা গেল না। এখন রাসূল (স) ফিরে এলে তারা কী রকম মিথ্যা অজুহাত পেশ করবে তা ১১ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুখে তারা যে কৈফিয়ত দেবে তা তাদের মনের কথা নয়।

ঐ সফরে না যাওয়ার কারণ হিসেবে তারা বলবে যে, টাকা-পয়সা ও বিবি-বাচ্চার ধান্দায় আমরা যেতে পারিনি। এর জবাবে রাসূল (স) তাদেরকে কী বলবেন, তাও এ আয়াতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা যে ক্ষতির ভয়ে পিছিয়ে থাকলে, সে ক্ষতি তোমাদের এখনো হতে পারে। আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকর্তা। তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চাইলে কেউ ফেরাতে পারবে না। তোমরা কেন গেলে না এবং এখানে থেকে কী কী ষড়যন্ত্র করেছ, তা সবই আল্লাহ জানেন।'

১২ নং আয়াতে মুনাফিকদের মনের গোপন কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়ে! বলেছেন, আসলে তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ আর মদীনায় ফিরে আসতে পারবে না– এটাই তাদের মনের বাসনা ছিল। তাই তারা খুব খুশি মনে এ ধারণা করেছিল; কিন্তু এ ধারণাটা কত জঘন্য ছিল! এরা মুসলিম পরিচয় দেয়, অথচ রাসূল (স)-এর ধ্বংস চায়।

এ জাতীয় লোকদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে বলে ১৩ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহই আসমান-জমিনের মালিক। তিনি যাদেরকে শাস্তি দিতে চান তাদেরকে বাঁচানোর ক্ষমতা কারো নেই। তাই সবারই তাঁর প্রতি ঈমান আনা উচিত। তাহলে তিনি অতীতের গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১৫ ও ১৬ নং আয়াতে সেই মুনাফিকদের সম্বন্ধে আরো কিছু বলা হয়েছে। যারা ক্ষতির ভয়ে ওমরার সফরে গেল না, তারা এখন জিহাদে যেতে খুবই আগ্রহী। কারণ, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর কুরাইশরা যুদ্ধে আসবে না বলে এখন সহজেই বিজয় হবে এবং যথেষ্ট গনিমতের মাল পাওয়া

যাবে। এত দিন কুরাইশদের নেতৃত্বেই আরবের অন্যান্য গোত্র রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এখন ঐসব গোত্র আর আক্রমণ করতে সাহস করবে না; বরং রাসূল (স) এখন সহজেই বিজয়ী হতে থাকবেন।

তাই মুনাফিক বেদুইনরা গনিমতের লোভে জিহাদে তাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে দাবি করবে বলে ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, তাদেরকে নেবেন না। আল্লাহ ফায়সালা করেছেন যে, 'বাইআতে রিদওয়ান'-এর সময় যারা উপস্থিত ছিল, শুধু তারাই এখন গনিমতের মাল পাবে। এ বিধান মুনাফিকরা বদলে দিতে চায় এবং তারাও গনিমতে শরিক হতে চায়।

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাত্র তিন মাস পরই রাসূল (স) খাইবার অভিযানে যান। এখন মুনাফিকদের দাবি মেনে তাদেরকে যেতে না দিলে তারা যে মন্তব্য করবে তা-ও আগেই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে যে, আমাদের সাথে হিংসা করা হচ্ছে। অথচ হিংসার কোনো ব্যাপার নয়। তারা শুধু নিজের স্বার্থই বোঝে। তাদের দোষেই যে তাদেরকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না সে কথা বুঝতে চায় না।

১৬ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, ঐ মুনাফিকরা যখন জিহাদে যেতে চায় তখন তাদেরকে বলে দিন, আগামীতে যখন সত্যি যুদ্ধ হবে তখন তোমাদেরকে ডাকা হবে। তখন দেখা যাবে কতটুকু আগ্রহ আছে। যদি সে যুদ্ধে যাও তাহলে আল্লাহ পুরস্কার অবশ্য দেবেন। আর যদি আগের মতোই মুনাফিকী কর তাহলে আযাবের ভাগীই হবে।

১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, অন্ধ, খোঁড়া ও রোগীদেরকে জিহাদে যেতে হবে না। কিন্তু বিনা ওযরে যারা পিছিয়ে থাকে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। তারা যদি বাজে ওযর পেশ করে বা এমন বাহানা করে, যা থেকে বোঝা যায়– তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানতেই চাচ্ছে না, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তাদের জন্যই বেহেশত নিশ্চিত।

তৃতীয় রুকূ'

১৮-২১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের 'বাইআতে রিদওয়ান'-এর কারণে তাদের উপর খুশি হয়ে দুনিয়াতেই যেসব পুরস্কার দিলেন তা জানিয়ে দিয়েছেন।

১. প্রথম পুরস্কার হলো, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে সুসংবাদ দিলেন। মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর হতে পারে না। নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও যারা ঐ শপথ নিলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের গভীর ইখলাসের মূল্য এভাবেই দিলেন।

২. ঐ কঠিন অবস্থায় যে পেরেশানি সাহাবীগণের মনে বিরাজ করছিল তা তীব্র আবেগ সৃষ্টি করে তাদেরকে এমন সব কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারত, যা ক্ষতিকর হতো। তাই তাদের দিলের অবস্থা জেনেই আল্লাহ তাআলা তাদের মনে প্রশান্তি এনে দিলেন।

৩. আসন্ন বিজয় বা নিকটবর্তী বিজয় দিলেন। খাইবার বিজয়কেই এখানে বোঝানো হয়েছে, যা সপ্তম হিজরীর সফর মাসে অর্জিত হয়। এ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ১৮ নং আয়াতের শেষাংশে ও পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। খাইবারে অর্জিত গনীমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাসূল (স)-এর দায়িত্বে রেখে বাকি সবই ঐ বাইআতে হাজির সাহাবীগণের মধ্যেই বিলি করা হয়।

৪. ২০ নং আয়াতের শুরুতে খাইবারের পরবর্তী একের পর এক বিজয় ও গনীমতের অনেক মালের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

৫. এ আয়াতেই 'জরুরি হিসেবে তিনি তোমাদেরকে এ বিজয় দিয়েই দিলেন' বলে হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বোঝানো হয়েছে।

৬. এ আয়াতেই 'মানুষের হাত তোমাদের বিরুদ্ধে ওঠা থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা হুদাইবিয়ায় যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে না যাওয়ায় অস্ত্রহীন অবস্থায় মক্কাবাসীরা যুদ্ধ করলে বিরাট ক্ষতি হতো। আল্লাহ তা থেকে রক্ষা করেছেন। অপরদিকে মদীনা থেকে তোমরা চলে আসার পর খালি ময়দান পেয়ে আশপাশের গোত্রগুলো মদীনায় হামলা করলে বিরাট বিপদ হতো। আল্লাহ এভাবে তাদেরকেও আক্রমণ করতে দেননি।

৭. এ আয়াতেই 'মুমিনদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সাহাবীগণ বাইআতে রিদওয়ান করে মুমিনদের জন্য আদর্শ হয়ে রইলেন। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ইখলাসের সাথে রাসূল (স)-এর আনুগত্য করলে কীভাবে আল্লাহ সাহায্য করেন, আল্লাহ তাআলা সাহাবীগণকে এর উদাহরণ বানিয়ে দিলেন। তাঁরা চিরদিন মুমিনদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে রইলেন।

৮. এ আয়াতের শেষাংশে 'আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন' অর্থাৎ তোমরা যে হিম্মত করে ঐ বাইআতের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলে– এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ সরল-সঠিক পথই দেখালেন যে, তোমরা সত্যের পথে এগিয়ে চল, বাতিলের শক্তি কত বেশি সেদিকে খেয়াল করে হিম্মতহারা হয়ো না, দীনের দাবি যখনই হয় তখনই আল্লাহর উপর ভরসা করে বাতিলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কর। সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী জীবন এ হিম্মতেরই পরিচয় বহন করে।

৯. ২১ নং আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, এখনও এমন বিজয় লাভ করা তোমাদের বাকি আছে, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য ঘেরাও করে রেখেছেন। এ ওয়াদা মক্কা বিজয়ের ইঙ্গিতই দেয়। অর্থাৎ মক্কা এখনো তোমাদের হাতে আসেনি; কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির সুফল হিসেবে তা তোমরা পাবে। আল্লাহ তা তোমাদের জন্য রিজার্ভ করে রেখেছেন, যা কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

২২-২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখন মক্কার কাফিররা বিদ্বেষবশত রাসূল (স) ও সাহাবীগণকে ওমরাহ করতে দিল না এবং কুরবানীর পশুকেও মক্কায় যেতে দিল না, এমনকি অপমানকর শর্তে সন্ধি করার চাপ দিল, তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে যুদ্ধ হওয়ারই কথা। এসব অন্যায় দাবি মেনে নেওয়া মুসলিমদের জন্য খুবই কঠিন ছিল।

২৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ঐ অবস্থায় মুমিনের উপর সান্ত্বনা নাযিল না করলে আবেগের বশে বেসবর হয়ে এমন কিছু তারা করে বসত, যার কারণে শান্তিপূর্ণভাবে সন্ধি হতো না। তাদেরকে তাকওয়ার নীতি মানতে আল্লাহ বাধ্য করলেন। অবশ্য তারা এ নীতি মানারই যোগ্য।

২২ ও ২৩ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে, কাফিররা সন্ধির প্রস্তাব না এনে যদি যুদ্ধ করত, তাহলে তাদের অবশ্যই পরাজয় হতো। এটাই আল্লাহর নিয়ম যে, রাসূলের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তাদেরকে আল্লাহ অপমানই করেন। এ নীতি আল্লাহর স্থায়ী নীতি।

২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা বাইআতে রিদওয়ানের মাধ্যমে মনের দিক দিয়ে যেভাবে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলে, তাতে যুদ্ধ হলে তোমাদেরকেই আমি জয়ী করতাম। কিন্তু আমি বিশেষ কারণে যুদ্ধ থেকে তোমাদেরকে ও তাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছি।

২৫ নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ঐ যুদ্ধ হতে দেননি কেন। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে না আসায় যুদ্ধ হলে পরাজিত হওয়ার ভয় ছিল বলে নয়, অন্য বিশেষ কারণেই যুদ্ধ থেকে উভয়পক্ষকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছিল। সে কারণটি হলো— ঐ সময় মক্কায় এমন কিছু নারী ও পুরুষ ছিল, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিজরত করতে পারেনি। রাসূল (স) ও সাহাবীগণ তাদেরকে চিনতেন না। এ অবস্থায় যুদ্ধ হলে মুসলমানদের হাতেই ঐসব মুসলমান নিহত হতো। তাদের উপর মেহেরবানী করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ হতে দেওয়া হয়নি। যদি মুমিদেরকে আলাদাভাবে চেনার সুযোগ থাকত তাহলে যুদ্ধ হতে দেওয়া হতো এবং কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া যেত।

চতুর্থ রুকূ'

২৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের মনের ঐ প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন, যা ওমরাহ্ করতে না পারায় তাদের মনে তোলপাড় করছিল। তাদের মনে প্রশ্ন উঠল যে, আল্লাহর রাসূল স্বপ্নে দেখলেন যে ওমরাহ্ করছেন, অথচ তা সত্যে পরিণত হলো না কেন? রাসূলের প্রশ্ন তো ওহীই হয়ে থাকে। ওহীর এ খবর বাস্তবে পরিণত হলো না কেন?

আল্লাহ্ তাআলা এর জবাবে বলেছেন, ঐ স্বপ্ন সত্য ওহীই ছিল; কিন্তু এবারই ওমরাহ্ করা হবে এমন কথা তো ছিল না। এ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। তখন ইনশা-আল্লাহ তোমরা বাইতুল্লাহতে নিরাপদে ঢুকবে। তাওয়াফ ও সাঈ করার পর মাথা কামিয়ে বা চুল ছেঁটে ইহ্রাম খুলবে।

এ ওমরাহ্ যে এবার হবে না তা আল্লাহর অবশ্যই জানা ছিল। তোমরা তা জানতে না বলেই এ প্রশ্ন তোমাদের মনে জেগেছে। কিন্তু এবারের এ সফর মোটেই ব্যর্থ হয়নি। এ সফর না হলে হুদাইবিয়ার সন্ধির আকারে যে বিরাট বিজয় হলো, তা কী করে হাসিল হতো? এ সন্ধির কারণেই তো এত অল্প সময়ে অতি সহজেই খাইবার জয় সম্ভব হচ্ছে।

এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায় যে, আল্লাহ্ নিজে যা করতে চান তা অবশ্যই হবে। তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা ওমরাহ্ করবে বলার আগে তিনি 'ইনশা-আল্লাহ' কেন বললেন? ইনশা-আল্লাহ মানুষকে বলতে হয় এ জন্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে মানুষ কিছু করবে বললেও করতে পারবে না।

এখানে 'ইনশা-আল্লাহ' বলার উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ্ তাআলা বোঝাতে চান যে, এবার ওমরাহ্ তিনি ইচ্ছা না করায়ই করতে পারনি; কাফিরদের বাধার কারণে নয়। আল্লাহই চাননি যে, এবার ওমরাহ্ হোক। ভবিষ্যতেও কাফিররা করতে দেবে বলে বা তোমরা করতে চাও বলেই নয়, আল্লাহ্ চান বলেই করতে পারবে। আগামীতে তিনি করতে দেবেন, যেহেতু তিনি ইচ্ছা করেন।

২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা রাসূল (স)-কে যে সত্য দীন ও হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা শুধু ওয়ায ও তাবলীগের জন্য নয়; বরং অন্য সব মতবাদ ও বিধানের উপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য। আল্লাহর দীন মানবরচিত বিধানের অধীনে কোনো রকমে টিকে থাকার জন্য পাঠানো হয়নি বরং আল্লাহর বিধান বিজয়ী হয়েই থাকবে। এ বিধান অন্য মত, পথ ও আইনকে যতটুকু বেঁচে থাকার অনুমতি দেবে ততটুকুই টিকে থাকবে।

এখানে এ কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, মক্কাবাসীরা আল্লাহর দীনকে রবদাশ্‌ত করতে না চাইলেও এ দীন তাদের উপর অবশ্যই বিজয়ী হবে এবং তাদেরকে এর অধীনেই থাকতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে 'আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট' বলার মর্মকথা বড়ই গভীর। হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লেখার সময় মুহাম্মদ (স)-এর নামের পরে 'রাসূলুল্লাহ' লেখায় কুরাইশরা আপত্তি করল। রাসূল (স) নিজ হাতে তা কেটে দিলেন। সেদিকে ইশারা করে বলা হয়েছে, তিনি যে সত্যিই আল্লাহর রাসূল তা কাফিররা স্বীকার করা বা না করার উপর নির্ভর করে না। এ বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। কেউ কোনো সত্য কথা স্বীকার না করলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না। তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল বলে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তাই এ মহাসত্য অন্য কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে বাধ্য নয়।

২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের প্রশংসায় অনেক কথা বলেছেন।

১. প্রথমই বলেছেন যে, তারা কাফিরদের উপর বড়ই কঠোর; কিন্তু নিজেদের মধ্যে একে অপরের জন্য খুবই নম্র। অর্থাৎ তারা বলিষ্ঠ মনোবলের মানুষ। তাদের কথা, কাজ ও আচরণ এমন নয় যে, কাফিররা তাদেরকে দুর্বল ভাবতে পারে। কাফিররা তাদেরকে সমীহ করে চলতে বাধ্য। কারণ, যেকোনো অবস্থায় তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের যোগ্য।

   তাদের সাহসিকতা, বলিষ্ঠতা ও কঠোরতা ইসলামবিরোধীদের সামনেই প্রকাশ পায়। কিন্তু মুমিনদের সাথে তাদের আচরণ অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র।

২. তাদেরকে সব সময় আল্লাহর দাসত্বেই মশগুল দেখা যায়। এমন কোনো কাজে তাদেরকে লিপ্ত দেখা যায় না, যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। তারা কামাই-রোযগারের বেলায় একমাত্র হালাল পথেই আল্লাহর মেহেরবানী তালাশ করে। আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের সব কর্মতৎপরতার আসল লক্ষ্য।

৩. তাদের চেহারা দেখলেই মনে হয়, তারা বড়ই নেক, বড়ই আল্লাহওয়ালা ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী।

৪. তাওরাত কিতাবেও সাহাবীদের সম্পর্কে এ বিবরণ আছে।

৫. ইনজীলে সাহাবীগণের উদাহরণ এভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন– একটি বীজ বপন করার পর অঙ্কুর বের হলো। তারপর চারা যখন কাণ্ডের উপর মযবুতভাবে খাড়া হয় তখন চাষীর মন খুশিতে ভরে ওঠে। মনে হয় এখানে রাসূল (স)-কে চাষীর সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সাহাবাগণকে ফসলের গাছের উপমা হিসেবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ চাষী তার জমিতে বপন করা বীজ থেকে সুন্দর চারা দেখে যেমন খুশি হয়, রাসূল (স) ও তাঁর দাওয়াতের ফসল হিসেবে সাহাবীগণের উন্নত মান দেখে খুশি হয়েছেন। কিন্তু কাফিররা এতে হিংসায় জ্বলেছে।

৬. সব শেষে তাদের গুনাহ মাফ করে মহাপুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে।

সূরা ফাত্হ

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

১-২-৩. (হে রাসূল!) আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয়[১] দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পরের ভুল-ত্রুটি[২] মাফ করেন, আপনার উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দেন, আপনাকে সরল-সঠিক পথ দেখান[৩] এবং আপনাকে বিরাট বিজয় ও সাহায্য দান করেন।

هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ

৪. তিনিই সে সত্তা, যিনি মুমিনদের অন্তরে সান্ত্বনা[৪] দান করেছেন, যাতে তারা তাদের

১. হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিজয়ের এ সুসংবাদ শোনানো হলে সবাই অবাক হয়েছিল যে, 'এই সন্ধিকে কেমন করে বিজয় বলা যেতে পারে; কাফিররা আমাদের দ্বারা যে শর্তগুলো মানাতে চাচ্ছিল এর মাধ্যমে আমরা তার সবক'টি বাহ্যত মেনে নিয়েছি।' কিন্তু অল্পকাল পরেই বোঝা গেল যে, এ সন্ধি প্রকৃতপক্ষে ছিল এক বিরাট বিজয়।

২. যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এ কথা ইরশাদ করা হয়েছিল, তার দিকে লক্ষ্য রাখলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এখানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে বিগত ১৯ বছর যাবত মুসলমানরা ইসলামের সফলতা ও বিজয়ের যে চেষ্টা-সাধনা করে আসছে তার মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছে– এ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো কী, তা কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়; বরং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তো সেখানে কোনো ত্রুটির সন্ধান পেতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে পূর্ণতার যে উচ্চতর মানদণ্ড আছে তার বিচারে এর মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, যার জন্য এত তাড়াতাড়ি মুসলমানদের পক্ষে আরবের মুশরিকদের উপর চরম বিজয় সম্ভবপর হতে পারত না। আল্লাহ তাআলার ইরশাদের অর্থ হচ্ছে– এই ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ যদি তোমরা চেষ্টা করতে থাকতে, তাহলে আরবকে তোমাদের আধিপত্যের অধীনে আনতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন হতো। কিন্তু আমি তোমাদের সেই সব দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ও ক্ষমা করে নিছক নিজের অনুগ্রহ দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন করে দিয়েছি এবং হুদাইবিয়ায় তোমাদের জন্য সেই বিজয় ও গৌরবের দরজা খুলে দিয়েছি, যা সাধারণ রীতি অনুযায়ী তোমাদের নিজেদের চেষ্টায় সম্ভব হতো না।

৩. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সোজা রাস্তা দেখানোর অর্থ তাঁকে বিজয় ও সফলতার পথ দেখানো।

৪. 'সান্ত্বনা দান করেছেন' অর্থ– স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা ও হৃদয়ের প্রশান্তি দান করেছেন। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যে উত্তেজনামূলক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল সেসবের মধ্যে মুসলমানদের ধৈর্য ধারণ করা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভালোভাবে পার হওয়া কেবল আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহেরেই ফল ছিল। নতুবা সে সময় সামান্য একটু ত্রুটি সব কাজ পণ্ড ও বিনষ্ট করে দিত।

لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ۙ

ঈমানের সাথে আরো এক ঈমান বাড়িয়ে নেয়। আসমান ও জমিনের সব সেনাবাহিনী আল্লাহর হাতেই রয়েছে এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন ও সুকৌশলী।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ۙ

৫. আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তিনি তাদের সব দোষ-ত্রুটি দূর করে দেবেন। আল্লাহর কাছে এটাই হলো বড় সফলতা।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّاۤنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَاۤئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ۝

৬. আর আল্লাহ মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষকে আযাব দেবেন, যারা আল্লাহর সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখে। তারা নিজেরাই মন্দের খপ্পরে পড়ে গেছে। আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন এবং তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। আর তাদের জন্য দোযখের ব্যবস্থা করেছেন, যা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৭. আসমান ও জমিনের সব সেনাবাহিনী আল্লাহরই হাতে রয়েছে। তিনি মহা শক্তিশালী ও সুকৌশলী।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ۙ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

৮-৯. (হে রাসূল!) আমি আপনাকে সাক্ষী[৫] হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি, যাতে (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন, তাঁকে সাহায্য কর, তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ করতে থাক।

৫. শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) 'শাহেদ' শব্দের অনুবাদ করেছেন, 'সত্য প্রকাশকারী' অর্থাৎ সত্যের সাক্ষ্যদাতা।

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

১০. (হে রাসূল!) যারা আপনার কাছে বাইআত করছিল[৬] তারা (আসলে) আল্লাহর কাছে বাইআত করেছিল, তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত[৭] ছিল। এখন যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করবে এর কুফল তার উপরই পড়বে। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে তা পূরণ করবে, আল্লাহ শিগ্‌গিরই তাকে বড় পুরস্কার দেবেন।

রুকূ' ২

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

১১. (হে রাসূল!) বেদুঈনদের মধ্যে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল[৮] তারা এখন আপনাকে অবশ্যই বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির ধান্দা আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিল; আপনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। তারা মুখে ঐসব কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ যদি তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করতে চান তাহলে তোমাদের পক্ষে কে তাঁর ফায়সালাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে? তোমরা যাকিছু করছ তা তো আল্লাহই জানেন।

৬. মক্কা মু'আয্‌যামাতে হযরত উসমান (রা)-এর শহীদ হয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে হুদাইবিয়াতে যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ শপথ নেওয়া হয়েছিল যে, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাত যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে মুসলমানরা এখানে এবং এক্ষণি কুরাইশদের সাথে চরম বোঝাপড়া করে নেবে, তাতে যদি সবাই শহীদ হয় তাও মেনে নিতে হবে।

৭. অর্থাৎ যে হাতে হাত রেখে সে সময় লোকেরা শপথ নিয়েছিল, তা ব্যক্তি হিসেবে রাসূল (স)-এর হাত ছিল না; বরং আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল। এ বাইআত রাসূল (স)-এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার সাথে করা হচ্ছিল।

৮. ওমরার প্রস্তুতি শুরু করার সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাথে রওয়ানা হওয়ার জন্য যাদেরকে আহ্বান করেছিলেন, এখানে মদীনার চারপাশের সেসব লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঈমানের দাবি সত্ত্বেও তারা কেবল নিজেদের প্রাণের মায়ার খাতিরে ঘর থেকে বের হয়নি। তারা মনে করছিল, এমন সময় ওমরার জন্য কুরাইশদের গৃহে যাওয়ার অর্থ মরণের মুখেই নিজেদেরকে ফেলে দেওয়া।

বَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

১২. (কিন্তু তোমরা যা বলছ তা আসল কথা নয়) বরং তোমরা এ ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে আর কখনো ফিরে আসতে পারবে না। এ ধারণাটা তোমাদের মনে খুব ভালোই লেগেছিল। তোমরা খুবই খারাপ ধারণা করেছিলে। বড়ই খারাপ মনের লোক তোমরা!

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

১৩. আল্লাহ ও রাসূলের উপর যারা ঈমান আনে না, এমন কাফিরদের জন্য আমি দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾

১৪. আল্লাহই আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করেন, যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমরা যখন গনীমতের মাল হাসিল করতে যাবে তখন ঐ পেছনে পড়ে থাকা (বেদুঈনরা) তোমাদেরকে অবশ্যই বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও।[৯] এরা আল্লাহর বিধান বদলে দিতে চায়। এদেরকে সাফ বলে দিন যে, 'তোমরা কখনো আমাদের সাথে যেতে পার না, আল্লাহ আগেই এ কথা বলে দিয়েছেন।' তখন তারা বলবে 'না, তোমরাই বরং আমাদের সাথে হিংসা করছ' (যদিও হিংসার কোনো কথা নয়), বরং এরা সঠিক কথা কমই বুঝে।

৯. অর্থাৎ শিগ্‌গির এমন সময় আসবে, যখন এসব লোকই– যারা আজ বিপজ্জনক অভিযানে তোমার সাথে যেতে চাচ্ছে না, তারা তোমাকে এমন এক অভিযানে যাত্রা করতে দেখবে, যার মধ্যে বিনা কষ্টে জয় ও বহু গনীমতের মাল লাভের সম্ভাবনা আছে বলে তারা ধারণা করবে। আর সে সময় তারা নিজেরাই তোমার কাছে আসবে ও বলবে, 'আমাদেরকেও সাথে নিয়ে নিন'।

১৬. (হে রাসূল!) পেছনে থেকে যাওয়া বেদুঈন আরবদেরকে বলে দিন, শিগ্‌গিরই তোমাদেরকে এমন সব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে, যারা খুবই শক্তিশালী। তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। তখন যদি তোমরা জিহাদের হুকুম পালন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো বদলা দেবেন। আর যদি তোমরা আগের মতোই পেছনে ফিরে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব দেবেন।

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

১৭. অবশ্য যদি অন্ধ, খোঁড়া ও রোগী জিহাদে না আসে তাহলে কোনো দোষ নেই। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলবে আল্লাহ তাকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান। আর যে মুখ ফিরে থাকবে তাকে তিনি কষ্টদায়ক আযাব দেবেন।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

রুকূ' ৩

১৮. (হে রাসূল!) আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, যখন তারা গাছের তলায় আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি তাদের উপর সান্ত্বনা[১০] নাযিল করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

১৯. এবং তাদেরকে আরো অনেক গনীমতের মাল দিলেন,[১১] যা (শিগ্‌গিরই) তারা লাভ করবে। আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

১০. এখানে 'সাকীনাত' অর্থ দিলের সেই অবস্থা, যার ভিত্তিতে একজন মানুষ পেরেশান না হয়েও ঠাণ্ডা মাথায় মনের পূর্ণ সন্তুষ্টি ও প্রশান্তিসহ নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেয় এবং কোনো ভয় ও অস্থিরতা ছাড়াই এ চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যেকোনো অবস্থায় এ কাজ করতে হবে, এর ফল যাই হোক না কেন।

১১. এখানে খাইবার বিজয় ও সেখানে পাওয়া গনীমতের মালের কথা বলা হয়েছে।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝٢٠

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক গনীমতের মাল দেওয়ার ওয়াদা করছেন[১২] যা তোমরা লাভ করবে। জরুরি হিসেবে তিনি তোমাদেরকে তো এ বিজয়[১৩] দিয়েই দিলেন। আর তিনি মানুষের হাত তোমাদের বিরুদ্ধে ওঠা থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন,[১৪] যাতে মুমিনদের জন্য এটা নিদর্শন হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝٢١

২১. এ ছাড়া আরো গনীমতের মাল (তোমাদের দেওয়ার ওয়াদা তিনি করেছেন), যা এখনো তোমরা লাভ করতে পারনি। আল্লাহ তা ঘেরাও করে রেখেছেন।[১৫] আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতা রাখেন।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝٢٢

২২. কাফিররা যদি এ সময়ই তোমাদের সাথে লড়াই করত তাহলে অবশ্যই তারা পিছু হটে যেত এবং তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝٢٣

২৩. এটাই আল্লাহর বিধান, যা আগে থেকে চলে এসেছে। আর তোমরা আল্লাহর এ নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝٢٤

২৪. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি মক্কায় তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন। অথচ তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে দিয়েছিলেন। তোমরা যাকিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

১২. খাইবার বিজয়ের পর যেসব বিজয় মুসলমানরা একের পর এক লাভ করতে থাকে, এখানে সেসবকে বোঝানো হয়েছে।

১৩. এখানে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বোঝানো হয়েছে। সূরার শুরুতে যাকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলা হয়েছিল।

১৪. অর্থাৎ হুদাইবিয়াতে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার মতো সাহস তিনি কুরাইশ কাফিরদের দেননি। যদিও বাস্তব দিক দিয়ে তারা অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল এবং সামরিক দিক দিয়ে তোমাদের অবস্থা তাদের তুলনায় খুবই দুর্বল মনে হচ্ছিল।

১৫. খুবসম্ভব এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত তো মক্কা তোমাদের দখলে আসেনি। কিন্তু আল্লাহ তাকে ঘেরাও করে নিয়েছেন এবং হুদাইবিয়ার এ জয়ের ফলে মক্কাও তোমাদের হাতে এসে যাবে।

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ
تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ
لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا
لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

২৫. এরাই তো ঐ লোক, যারা কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এবং কুরবানীর উটগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে দেয়নি। যদি (মক্কায়) এমন মুমিন পুরুষ ও নারী না থাকত[১৬] যাদের কথা তোমরা জান না এবং যদি এ ভয় না থাকত যে, না জানার কারণে তোমরা তাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে এবং এতে তোমাদের উপর তাদের পক্ষ থেকে দোষ ধরা হবে (তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করা হতো না)। (যুদ্ধ এ জন্য বন্ধ করা হয়েছে) যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতে শামিল করে নেন। ঐ মুমিনরা যদি (কাফিরদের থেকে) আলাদা অবস্থায় থাকত তাহলে (মক্কায়) যারা কাফির ছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই কঠিন শাস্তি দিতাম।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ

২৬. (এ কারণেই) যখন কাফিররা তাদের অন্তরে জাহেলী ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করল, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর সান্ত্বনা নাযিল করলেন[১৭] এবং তাদেরকে তাকওয়ার নীতি মেনে চলতে বাধ্য করলেন।

১৬. এ কারণেই আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ায় যুদ্ধ হতে দেননি। মক্কায় সে সময় এমন অনেক মুসলমান নারী-পুরুষ ছিলেন, যারা নিজেদের ঈমান গোপন রেখেছিলেন। অথবা যাদের ঈমান প্রকাশ্যে জানা থাকলেও তারা নিরুপায় হওয়ার কারণে হিজরত করতে পারেননি এবং এর ফলে যুলুম-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হচ্ছিলেন। এ অবস্থায় যদি যুদ্ধ ঘটত এবং মুসলমানরা কাফিরদেরকে পিটিয়ে পবিত্র মক্কা শহরে ঢুকতেন, তাহলে কাফিরদের সাথে সাথে মুসলমানরাও অজ্ঞতাবশত মুসলমানদের হাতে মারা পড়ত। এ সময় যুদ্ধ হতে না দেওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করে মক্কা জয় করা পছন্দ করেননি; বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল দু বছরের মধ্যে সব দিক থেকে ঘেরাও করে তাদেরকে এমনভাবে নিরুপায় করে দেওয়া, যেন তারা কোনো বাধা ছাড়াই পরাজিত হয় এবং একেকটি গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে যেন আল্লাহর রহমতের মধ্যে দাখিল হতে পারে। মক্কা বিজয়ে তা-ই ঘটেছিল।

১৭. 'মুমিনদের দিলে সান্ত্বনা নাযিল করলেন' অর্থ– ধৈর্য ও শোভনীয় গাম্ভীর্য, যার সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ কাফিরদের জাহেলী দুঃসাহসের মুকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা কাফিরদের এই স্পষ্ট বাড়াবাড়িতে রাগের মাথায় সংযম হারিয়ে ফেলেননি এবং তাদের জবাবে এমন কিছু করেননি, যার দ্বারা সত্যের সীমা লংঘন হয় বা ইনসাফের খেলাফ হয় অথবা যার ফলে ব্যাপারটি সুন্দরভাবে সমাধা হওয়ার পরিবর্তে আরো জটিল হয়ে পড়ে।

بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

আর তারাই (এ নীতি মেনে চলার) সবচেয়ে বেশি হকদার ও উপযুক্ত। আল্লাহ সব কিছুরই জ্ঞান রাখেন।

রুকূ' ৪

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

২৭. বাস্তবিকই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সঠিক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণ সত্য ছিল।[১৮] ইনশাআল্লাহ তোমরা নিশ্চয়ই মাসজিদুল হারামে সম্পূর্ণ নিরাপদে প্রবেশ করবে— (কেউ কেউ) মাথা কামাবে, (কেউ কেউ) চুল কাটবে এবং তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না।[১৯] তিনি ঐ কথা জানতেন, যা তোমরা জানতে না। তাই তিনি (স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার আগে) তোমাদেরকে এ নিকটবর্তী বিজয় দান করেছেন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

২৮. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (রাসূল) ঐ দীনকে অন্য সব দীনের উপর বিজয়ী করেন। আর এ বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।[২০] যারা তাঁর সাথে আছে[২১] তারা কাফিরদের উপর কঠোর

১৮. এটি সেই প্রশ্নের উত্তর, যে প্রশ্ন মুসলমানদের অন্তরে বারবার জাগছিল। তাঁরা বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) স্বপ্নে দেখেছেন যে, তিনি মাসজিদে হারামের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং বাইতুল্লাহ তওয়াফ করেছেন। কিন্তু এটা কেমন হলো, আমরা ওমরা সম্পন্ন না করেই ফিরে চলেছি।

১৯. পরবর্তী বছর যিলকদ মাসে এ ওয়াদা পূরণ হয়েছিল। ইতিহাসে এ ওমরা 'ওমরাতুল কাযা' নামে বিখ্যাত।

২০. এখানে এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, হুদাইবিয়াতে যখন সন্ধির চুক্তিপত্র লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফিররা রাসূল (স)-এর সম্মানিত নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি লিখতে আপত্তি করেছিল। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রাসূল (স)-এর রাসূল হওয়া এমন এক মহাসত্য, যা কেউ মানুক বা না মানুক তাতে কিছু আসে-যায় না। যদি কিছু লোক তা মানতে না চায় তো না মানুক। এ বিষয়ের সত্য হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

২১. আরবী ভাষায় বলা হয়, 'ফুলানুন শাদীদুন আলাইহি' তথা অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর। অর্থাৎ তাকে চাপ দিয়ে নত করা ও বশে আনা অত্যন্ত কঠিন। সাহাবায়ে কেরাম (রা) কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ হচ্ছে– তাঁরা মোমের পুতুল নন যে কাফিররা যেদিকে ইচ্ছা করবে সেদিকে তাঁদেরকে ফেরাবে। তাঁরা কোমল ঘাস নন যে, কাফিররা সহজে তাদেরকে চিবিয়ে ফেলবে। কোনো ভয় দ্বারা তাঁদেরকে দাবানো যাবে না, কোনো লোভ ও উস্কানি দিয়ে তাঁদেরকে খরিদ করা যাবে না। যে মহান উদ্দেশ্যে তাঁরা জীবন-মরণ পণ করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য দাঁড়িয়েছেন তা থেকে তাঁদেরকে সরানোর শক্তি কাফিরদের নেই।

عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ
فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ
الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

এবং নিজেদের মধ্যে কোমল।[২২] তুমি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাদেরকে রুকূ'-সিজদা অবস্থায় এবং আল্লাহর মেহেরবানী ও সন্তুষ্টির তালাশে মগ্ন পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার আলামত[২৩] রয়েছে, যা থেকে তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাওরাতে তাদের এ পরিচয় রয়েছে। আর ইনজীলে তাদের উদাহরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, যেন একটি বীজ বপন করা হলো, যা থেকে প্রথমে অঙ্কুর বের হলো, তারপর তা মযবুত হলো, তারপর পুষ্ট হলো, এরপর নিজের কাণ্ডের উপর খাড়া হয়ে গেল। (এ দৃশ্য) চাষীকে খুশি করে দেয়, যাতে কাফিরদের (দিলে) জ্বালা সৃষ্টি হয়। এ লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের সাথে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

২২. অর্থাৎ তাঁদের যা কিছু কঠোরতা তা দীনের দুশমনদের জন্য, মুমিনের জন্য নয়। মুমিনদের জন্য তাঁরা কোমল, দয়ালু, স্নেহময়, সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল। নীতি ও আদর্শের ঐক্য তাঁদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও একতার মনোভাব সৃষ্টি করে দিয়েছে।

২৩. এর অর্থ কপালের সেই দাগ নয়, সিজদার ফলে কোনো কোনো নামাযীর কপালে যা দেখা যায়; বরং এর অর্থ খোদাভীতি, নরম মন, ভদ্রতা ও সুন্দর চরিত্রের ঐ সব চিহ্ন, যা আল্লাহর নিকট সিজদারত মানুষের চেহারায় ফুটে ওঠে। আল্লাহর বাণীর মর্ম হচ্ছে– মুহাম্মদ (স)-এর সাথীগণ তো এরূপ যে, তাঁদের দেখামাত্রই কোনো ব্যক্তি এ কথা বুঝতে পারে যে, এঁরা সৃষ্টির সেরা চরিত্রের মানুষ। কেননা, আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের নূর (জ্যোতি) তাঁদের চেহারায় উজ্জ্বল দেখায়।

৪৯. সূরা হুজুরাত

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ৪ নং আয়াতের 'আল হুজুরাত' শব্দ নিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন উপলক্ষে এ সূরার বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। আলোচ্য বিষয়ে মিল থাকায় সবক'টি একটি সূরার মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আরো বোঝা যায় যে, মাদানী যুগের শেষভাগেই এর বেশির ভাগ হুকুম নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মদীনার নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে সমাজজীবনের অনেক আদব-কায়দা এ সূরায় শেখানো হয়েছে। মানুষের মধ্যে যেসব দোষ থাকলে সমাজে বিবাদ, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং একে-অপরের সম্পর্ক খারাপ হয়, ঐসব দোষ চিহ্নিত করে তা থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৫ নং আয়াত পর্যন্ত মুমিনদেরকে শেখানো হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর সাথে কীভাবে আদব ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে কয়েকটি হুকুম দেওয়া হয়েছে :

১. প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা সবসময় ও সব বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর অনুগত হয়ে চলবে। এগিয়ে চলার চেষ্টা করবে না। এর অর্থ সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে ফায়সালা দেন, সে বিষয়ে মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য উচিত নয় যে, তারা তা থেকে আলাদা কোনো ফায়সালা করে। এ সূরায় আরো এক ধাপ এগিয়ে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর নির্দেশ জানার আগেই কোনো মুমিন যেন নিজেই ফায়সালা না করে।

   যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ঐ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহতে কোনো ফায়সালা দেওয়া হয়েছে কি না, তা তালাশ করাই হলো ঈমানদারদের প্রথম কর্তব্য। আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা জায়েয করার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীস ঘাঁটাঘাঁটি করা মুমিনদের নীতি হতে পারে না।

   এ ব্যাপারে ইসলাম যে নীতি দিয়েছে তা শুধু ব্যক্তি ও পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয়। মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ব্যাপারেই এ নীতি মেনে চলতে হবে। তাই এটা ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা।

২. ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপের সময় ঈমানদারগণ যেন পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের দিকে খেয়াল রাখে। রাসূল (স)-এর আওয়াজ থেকে যেন কারো

আওয়াজ বেশি উঁচু না হয়। তাঁর সাথে আলাপের সময় যেন মনে থাকে যে, কোনো সাধারণ লোকের সঙ্গে নয়, আল্লাহর রাসূলের সাথে আলাপ হচ্ছে। এ হুকুম তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে, যারা রাসূল (স) দুনিয়ায় থাকাকালে তাঁর সাথে দেখা করতেন। এ হুকুম পালন না করলে আমল বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রাসূল (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরও এ হুকুম পালন করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা খেয়াল রাখা উচিত :

এক. যখন কোথাও রাসূল (স) সম্পর্কে আলোচনা হয়, তখন আদবের সাথে শুনতে হবে।

দুই. যখন হাদীস শোনানো হয়, তখন অতি ভক্তিসহকারে তা শুনতে হবে। সেখানে কথাবার্তা বলতে থাকা উচিত নয়।

৩. ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা রাসূল (স)-এর প্রতি সম্মান দেখানোর কারণে নিচু আওয়াজে কথা বলে তারা ঈমানের পরীক্ষায় পাস। অর্থাৎ তাদের দিলে তাকওয়া আছে বলে প্রমাণিত হয়। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যার মনে রাসূল (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ নেই, তার অন্তরে তাকওয়াও নেই।

৪. ৪ ও ৫ নং আয়াতে যে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে তা ৩ নং টীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬ নং আয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত আছে। এর ব্যাখ্যা ৪ নং টীকায় রয়েছে।

এ আয়াতের পটভূমি এই যে, রাসূল (স) কোনো একজনকে 'বনূ মুস্তালিক' নামক গোত্র থেকে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠালেন। সে লোক কোনো কারণে ভয় পেয়ে গেল এবং জনগণের সাথে যোগাযোগ না করেই ধারণা করল যে, তারা যাকাত দিতে রাজি নয়। সে এসে জানাল, ঐ গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। রাসূল (স) তাদেরকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন এমন সময় ঐ গোত্রের সরদার রাসূল (স)-এর কাছে হাজির হয়ে গেলেন। সরদার থেকে জানা গেল, ঐ খবর মিথ্যা। তারা যাকাত দিতে রাজি।

এ থেকে এ নীতি মেনে চলার হুকুম দেওয়া হলো যে, কোনো খবর পেলে খবরের সত্যতা যাচাই না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। কেননা এর ফলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এবং এর জন্য পরে আফসোসও করতে হতে পারে।

৭ ও ৮ নং আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে সাবধান করা হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে যেন রাসূল (স)-এর উপর চাপ দেওয়া না হয়। এর পটভূমি ৬ নং আয়াতের সাথে জড়িত। বনূ মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করার খবর পেয়ে সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন তাড়াতাড়ি এর প্রতিকার করার জন্য দাবি জানাতে থাকেন। এ আয়াতে তাঁদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল যখন মওজুদ আছেন, তখন এত ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

অবশ্য অল্প কয়েকজন সাহাবী ছাড়া বাকি সবাই রাসূল (স)-এর উপর চাপ দেননি। সে কথা হুদাইবিয়ায় প্রমাণিত হয়েছে। মনে অস্থিরতা সত্ত্বেও সন্ধির শর্তাবলি বাতিল করার সামান্য চেষ্টাও তাঁরা করেননি। কারণ তাঁরা জানতেন যে, রাসূল (স)-কে আল্লাহ তাআলা নিজে পরিচালনা করেন।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা রাসূল (স)-এর পূর্ণ আনুগত্য করেন এবং রাসূল (স)-এর উপর কোনো চাপ দেন না, তাঁদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা ৭ নং আয়াতের দ্বিতীয় অংশে তাঁদের প্রতি

সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের অন্তরকে ঈমান দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন এবং কুফরী, ফাসিকী ও নাফরমানির বিরুদ্ধে তোমাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন। যারা এসব গুণের অধিকারী, তারাই সঠিক পথে আছে।

৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের এ মর্যাদা আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন, যিনি ইল্ম ও হিকমতের ভিত্তিতে ফায়সালা করেন যে, কারা এর হকদার। আল্লাহ তাঁর এ দান ও নিয়ামত যাকে-তাকে দেন না।

৯ ও ১০ নং আয়াত বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। ৫ নং টীকায় এর একটি কথার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে উল্লেখ করার দরকার নেই।

এ দুটো আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা থেকে যে হেদায়াত পাওয়া যায় তা হলো :

১. সত্যিকার মুসলমানদের মধ্যে দীনের ব্যাপারে মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু ঝগড়া-ফাসাদ ও লড়াই হওয়া স্বাভাবিক নয়। অবশ্য দুনিয়ার স্বার্থে কিছু লোক দলাদলি এমনকি লড়াইও করতে পারে।

২. এমন ধরনের লড়াই যদি লেগেই যায়, তাহলে যারা দুদলের কোনো পক্ষেই নেই এবং যাদের পক্ষে লড়াই বন্ধ করা ও আপস করানোর চেষ্টা করা সম্ভব, তারা যেন চুপ করে না থেকে মীমাংসার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালায়।

৩. লড়াই চলা অবস্থায় হয়ত দেখা যাবে যে, একপক্ষ বাড়াবাড়ি করছে এবং অন্য পক্ষের উপর যুলুম করছে। যালিমকে যুলুম করতে বাধা না দিয়ে মযলুমকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা মুসলিম সমাজের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। এ যুলুম বন্ধ করার জন্য সব রকম চেষ্টা করা কর্তব্য।

৪. লড়াই বন্ধ করিয়ে বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা তখনি ব্যর্থ হয়ে যায়, যখন যালিম পক্ষ বা সবল পক্ষ মীমাংসা মানতে অস্বীকার করে। এ অবস্থায় হাল ছেড়ে দিয়ে লড়াই চলতে দেওয়াও অন্যায়। এ অবস্থায় যালিমদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যাতে তারা মীমাংসায় আসতে বাধ্য হয়।

   শক্তি প্রয়োগ ও যালিমকে শায়েস্তা করা সরকার ও প্রশাসনেরই দায়িত্ব। যদি কোনো মযবুত সংগঠন বা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের পক্ষে মীমাংসায় পৌছানোর জন্য শক্তি বা চাপ সৃষ্টির যোগ্যতা থাকে, তাহলে তাদেরও এ দায়িত্ব পালন করা উচিত।

৫. 'যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে' বলা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, লড়াই বন্ধ করাই উদ্দেশ্য, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

৬. যদি তারা লড়াই বন্ধ করতে রাজি হয় তাহলে উভয়পক্ষের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা করতে হবে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, শুধু লড়াই বন্ধ করাই যথেষ্ট নয়।

এ ধরনের কোনো লড়াই রাসূল (স)-এর সময় হয়নি বলে এ জাতীয় পরিস্থিতিতে যা করা মুসলমানদের কর্তব্য, সে বিষয়ে ফিক্‌হবিদগণ হযরত আলী (রা)-এর সময়কার উদাহরণ থেকেই এ সমস্যার সমাধান তালাশ করেছেন।

৯ নং আয়াতে উপরে বর্ণিত হেদায়াত দেওয়ার পর ১০ নং আয়াতে দুনিয়ার সকল মুসলমান যে একই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শামিল সে কথা উল্লেখ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ ভাই-ভাই সম্পর্ক যখনি কোথাও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তখনি তা বহাল কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহ রহম করবেন এবং বিভেদ থেকে রক্ষা করবেন। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে উপাদান দিয়েছে, মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১ ও ১২ নং আয়াতে সমাজবিরোধী এমন কতক বদ অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য তাকীদ দেওয়া হয়েছে, যা সমাজে বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। যেমন–

১. ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। এর ব্যাখ্যা ৬ নং টীকায় দেওয়া হয়েছে।

   এখানে আরও একটু ব্যাখ্যা করা দরকার যে, ঠাট্টার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের কথা আলাদা করে কেন বলা হলো। মুমিনদেরকে বলা হলেই তো নারী-পুরুষ সবাইকে বোঝায়। এটা খুবই জরুরি প্রশ্ন। এর জবাব হলো, ইসলাম নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম করেছে। আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদের মধ্যেই হয়ে থাকে, যারা অবাধে মেলামেশা ও ওঠাবসা করে। পুরুষের মজলিস ও মহিলাদের বৈঠক আলাদা হওয়া উচিত বলেই আলাদাভাবে নারী ও পুরুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

   'হতে পারে যে তারা এদের চেয়ে ভালো'– এ কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, যারা অপরকে ঠাট্টা করে তারা নিজেদেরকে বড় এবং অপরকে হেয় মনে করে বলেই ঠাট্টা করে। অথচ কে কার চেয়ে ভালো তা একমাত্র আল্লাহর আইনই ফায়সালা করার অধিকারী।

২. একে অপরের প্রতি দোষারোপ করা : এর ব্যাখ্যা ৭ নং টীকায় রয়েছে। দোষ ধরে বেড়ালে একে-অপরের সম্পর্ক খারাপ হয় এবং শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

৩. খারাপ নাম নিয়ে ডাকা : ৮ নং টীকায় এর ব্যাখ্যা রয়েছে। এটা ঠাট্টার চেয়েও জঘন্য। এর দ্বারা মানুষের মনে অহেতুক ব্যথা দেওয়া হয়।

৪. বেশি বেশি অনুমান করা : ৯ নং টীকায় এর ব্যাখ্যা রয়েছে। অনুমানের ভিত্তিতে কুধারণা করা ও ঐ ধারণা অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আপনজনের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি হয়। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অনেক সময় অনুমানের কারণে বিনষ্ট হয়।

৫. অপরের গোপন বিষয় তালাশ করা : ১০ নং টীকায় এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৬. গীবত করা : ১১ নং টীকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

১৩ নং আয়াতে গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর আগের আয়াতগুলোতে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে হিদায়াত দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতে সকল মানুষকে মানুষ গণ্য করে সবাইকে একই আদি পিতামাতার সন্তান হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করার তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

এর আগের দুটো আয়াতে যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, সমাজে কাছাকাছি বসবাসকারী লোকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে সমাজে শান্তি কায়েম রাখা।

আর এ আয়াতে এক রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিতে বিভক্ত জনগণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত গোটা মানবজাতির মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি কী, তা জানানো হয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১৩ নং টীকায় আছে।

এ আয়াতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা মানবজাতির মধ্যে চালু না থাকার কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও কৃষ্টিতে এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজ সারা বিশ্বে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এমনকি একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে চরম অশান্তি ভোগ করছে। মানবতা আজ বিপন্ন। মানবিক মূল্যবোধ থেকে এ যুগে মানবজাতি বঞ্চিত।

১৪-১৮ নং আয়াতে মদীনার আশপাশের কতক বেদুইন গোত্রের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র মযবুত হওয়ার কারণে এবং কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার ফলে বেদুইন গোত্রগুলো মনে করল, মুসলিম হওয়ার মধ্যেই তাদের মঙ্গল রয়েছে। মুসলমানদের সাথে ভালো সম্পর্ক হলেই সব দিক দিয়ে সুবিধা পাওয়া যাবে। দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা বাস্তব জীবনে মুমিন হওয়ার প্রমাণ দিতে পারে না। কারণ, ইসলামের বিধান ঠিকমতো পালন করার মতো মানসিকতা তখনো তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না।

তাই ১৪ নং আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা তো ঈমান আননি। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত হয়েছ। যদি মনে-প্রাণে ঈমানদার হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালন কর, তাহলে তোমাদের আগের গুনাহ মাফ করে নেক আমলের বদলা দেওয়া হবে।

১৫ নং আয়াতে তাদেরকে সত্যিকার ঈমানদার হতে হলে কী করা দরকার, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৬ নং আয়াতের পটভূমি এই যে, এক বেদুইন সর্দার এসে রাসূল (স)-কে বলল, আমরা যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমান হয়েছি, সে কারণে আমাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে শিখিয়ে দিলেন, 'এদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা ইসলাম কতটুকু কবুল করেছ তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহকে সে খবর জানাতে হবে না। তিনি সব বিষয়েই জানেন।'

তারা মুসলমান হয়ে যেন রাসূল (স)-এর উপর দয়া করেছে– এমনভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করায় তাদেরকে বলার জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে ১৭ নং আয়াতের কথাগুলো শিখিয়ে দিলেন।

সবশেষে ১৮ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আসমান-জমিনের সব গায়েবি ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। তাই তোমরা কী করছ, কী উদ্দেশ্যে মুসলিম হতে বাধ্য মনে করেছ এবং রাসূল (স)-এর নিকট কিসের দাবিতে হাজির হয়েছ সবই আল্লাহর জানা আছে।

সূরা হুজুরাত

১৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেও না। আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।[1]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ②

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করো না এবং তোমরা নবীর সাথে সে রকম উঁচু আওয়াজে কথা বলবে না, যেভাবে একে অপরের সাথে বলে থাক। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে গেল অথচ তোমরা টেরও পেলে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③

৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজ নিচু রাখে তারা আসলে ঐসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন।[2] তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহান বদলা।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

৪. (হে রাসূল!) যারা আপনাকে হুজরার বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে তাদের বেশির ভাগ লোকেরই কাণ্ডজ্ঞান নেই।

১. অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেও না, পেছনে চল, অগ্রগামী হয়ো না, অনুসারী-অনুগত হয়ে থাক। নিজেদের ব্যাপারে নিজের থেকে ফায়সালা করতে লেগে যেও না। প্রথমে দেখ আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল (স)-এর সুন্নাতের মধ্যে এ সম্পর্কে কোনো হুকুম ও হেদায়াত পাওয়া যায় কি না।

২. অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহ তাআলার পরীক্ষায় পূর্ণভাবে পাস করেছেন এবং পরীক্ষায় পাস হয়ে যারা এ প্রমাণ দিয়েছেন যে, তাঁদের দিলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তাঁরাই কেবল আল্লাহর রাসূলের আদব ও সম্মান বজায় রাখেন। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে অন্তরে রাসূল (স)-এর প্রতি সম্মানবোধ নেই, সে অন্তরে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়াও নেই।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৫. যদি আপনার বের হওয়া পর্যন্ত তারা সবর করে থাকত তাহলে সেটা তাদেরই জন্য ভালো হতো।[৩] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِينَ ۝

৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যদি কোনো ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে তাহলে এর সত্যতা যাচাই করে নিও।[৪] এমন যেন না হয় যে, তোমরা না জেনে কোনো কাওমের ক্ষতি করে বস এবং তারপর যা করেছ সেজন্য আফসোস করতে থাক।

وَاعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُونَ ۝

৭. ভালো করে জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল মওজুদ আছেন। যদি তিনি বেশির ভাগ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা নিজেরাই মুশকিলে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি মহব্বত দান করেছেন, তা তোমাদের মনঃপূত করে দিয়েছেন এবং কুফরী, ফাসিকী ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন। এমন লোকেরাই সুপথে আছে।

৩. আরবের বিভিন্ন দিক থেকে যারা আসত তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা আদব-কায়দা ও ভদ্রতা না শেখার কারণে রাসূল (স)-এর সাথে দেখা করার জন্য কোনো খাদেমের মাধ্যমে বাড়ির ভেতরে খবর না দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর থাকার ঘরের চারপাশে ঘোরাফেরা করে বাইরে থেকেই তাঁকে চিৎকার করে ডাকত। এসব লোকের ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ (স) খুবই কষ্টবোধ করতেন; কিন্তু ভদ্রতা ও নম্রতাবশত তিনি বরাবর তা সহ্য করে নিতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ অভদ্র ব্যবহারের জন্য নিন্দা করে তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে দেখা করতে এসে যদি তাকে উপস্থিত না পাওয়া যায়, তবে চিৎকার করে না ডেকে তিনি বাইরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

৪. এ আয়াতে মুসলমানদের একটা নীতিগত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যখন কোনো লোক এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আসে, যার ফলে কোনো বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তা সত্য বলে মেনে নেওয়ার আগে এটা লক্ষ্য কর যে, খবরদাতা কেমন লোক। যদি সে কোনো ফাসিক লোক হয়ে থাকে অর্থাৎ এমন লোক, যাকে দেখে মনে হয় যে, তার কথা সঠিক নাও হতে পারে, তাহলে তার দেওয়া খবরের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আসল ব্যাপার কী তা খোঁজ করে দেখ।

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

৮. (এ সবই) আল্লাহর দান ও নিয়ামত হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সুকৌশলী।

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

৯. যদি ঈমানদারদের দুদল একে অপরের সাথে লড়াই করে[৫] তাহলে তাদের মধ্যে আপস করিয়ে দাও। এরপর যদি একদল অপর দলের সাথে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর; যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি (সে দলটি) ফিরে আসে তাহলে উভয় দলের মধ্যে ইনসাফের সাথে মিটমাট করে দাও। আর সুবিচার করো; যারা সুবিচার করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

১০. মুমিনরা তো একে অপরের ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক বহাল করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায়, তোমাদের উপর দয়া করা হবে।

রুকূ' ২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن

১১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! কোনো একদল পুরুষ যেন অপর পুরুষদেরকে ঠাট্টা[৬] না করে, হতে পারে যে

৫. এ কথা বলা হয়নি যে, 'ঈমানদারদের দুই দল যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে'; বরং বলা হয়েছে, 'যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দুটো দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়' এ বাক্যাংশ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করা মুসলমানদের রীতি নয়। এ কাজ তাদের শোভা পায় না। তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তারা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। অবশ্য যদি কখনো এরূপ ঘটে যায়, তবে সে অবস্থায় কী করতে হবে তা পরের আয়াতে বলা হয়েছে।

৬. ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার অর্থ কেবল মুখেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা নয় বরং কারো নকল করা, কারো প্রতি ইঙ্গিত করা, কারো কথায় বা কাজে কিংবা তার চেহারা বা তার পোশাক দেখে হাসা। অথবা কারো কোনো দোষ-ত্রুটির দিকে এমনভাবে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যেন লোকে তাকে দেখে হাসে। এ সবই বিদ্রূপের মধ্যে গণ্য।

نِسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑪

তারা এদের চেয়ে ভালো। কোনো এক দল মহিলাও যেন অপর মহিলাদেরকে ঠাট্টা না করে, হতে পারে তারা এদের চেয়ে ভালো। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না[৭] এবং একে অপরকে খারাপ নাম নিয়ে ডেকো না।[৮] ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা জঘন্য কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে ফিরে না আসে তারাই যালিম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ

১২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বিরত থাক।[৯] কারণ, কোনো কোনো অনুমান গুনাহের কাজ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় তালাশ করো না[১০]

৭. আঘাত করা, পরিহাস করা, অপবাদ দেওয়া, আপত্তি করা, ছিদ্র খুঁজে বেড়ানো এবং খোলাখুলিভাবে অথবা আকারে-ইঙ্গিতে কাউকে নিন্দার পাত্র বানানো– এসব কাজই এর ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত।

৮. এ হুকুমের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নাম দ্বারা ডাকা অথবা এরূপ উপাধি না দেওয়া, যার দ্বারা সে অপমানিত হয়। যথা– কাউকে ফাসিক বা মুনাফিক বলা, কাউকে খোঁড়া, কানা কিংবা অন্ধ বলা, কাউকে তার নিজের অথবা তার মা-বাবার কিংবা তার বংশের কোনো দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে নামকরণ করা, কেউ মুসলমান হওয়ার পরও তার পূর্বের ধর্মের ভিত্তিতে ইহুদি বা নাসারা বলা, কোনো ব্যক্তি কিংবা বংশ বা দলকে নিন্দাসূচক বা অপমানসূচক নাম দেওয়া। অবশ্য এমন কোনো নাম দেওয়া দোষের নয়, যা খারাপ শোনালেও নিন্দার উদ্দেশ্যে নয়; বরং চেনার জন্যই বলা হয়। যেমন– কোনো চক্ষুহীন হাফিযে কুরআনকে 'অন্ধ হাফিয' বলা। এখানে পরিচয়ই উদ্দেশ্য, নিন্দা উদ্দেশ্য নয়।

৯. অনুমান করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়নি; বরং খুব বেশি অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা এবং সব রকম অনুমানের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ, কোনো কোনো অনুমান পাপ। আসল কথা, যে অনুমান পাপ তা হচ্ছে বিনা কারণে কোনো মানুষের প্রতি কুধারণা করা অথবা কারো সম্পর্কে রায় কায়েম করার ব্যাপারে সব সময় কুধারণা দিয়ে শুরু করা। অথবা ঐসব লোকের ব্যাপারে কুধারণা নিয়ে কাজ করা, যাদেরকে দেখে মনে হয় যে, তারা সৎ ও সম্মানী লোক। এমন কোনো লোকের কোনো কথা বা কাজের মধ্যে যদি সমানভাবে ভালো ও মন্দের সম্ভাবনা থাকে, তবে কেবল কুধারণার বশবর্তী হয়ে তা মন্দ বলে স্থির করাও পাপ।

১০. অর্থাৎ মানুষের গোপন বিষয় তালাশ কর না। একে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। লোকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু ব্যক্তির আলাপ কান লাগিয়ে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উঁকি মারা এবং নানা উপায়ে অন্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চেষ্টা করা– এসবই অন্যায়।

لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ⑫

এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো গীবত[১১] না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে?[১২] তোমরা তা ঘৃণা করে থাক। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

১৩. হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পার।[১৩] আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে

১১. রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'গীবত' কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তুমি যদি নিজের ভাইয়ের কথা এমনভাবে উল্লেখ কর, যা শুনলে তার খারাপ লাগার কথা, তাহলে এরই নাম গীবত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আরয করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে তা বর্তমান থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ দিলে।

অবশ্য কোনো ব্যক্তির অগোচরে বা তার মৃত্যুর পর যদি তার কোনো দোষ বর্ণনা করার এরূপ কোনো দরকার হয়, যা সঙ্গত বলে গণ্য এবং গীবত ছাড়া যদি সে প্রয়োজন পূর্ণ করার কোনো পথ না থাকে বা যদি গীবত করা না হয় তবে গীবত থেকেও বড় ক্ষতি হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হয়, তাহলে এসব অবস্থায় গীবত হারাম নয়। নবী করীম (স) বলেন, কোনো মুসলমানের সম্মানের প্রতি না-হক আক্রমণ করা চরম যুলুম। না-হক (অন্যায়)-এর শর্ত দ্বারা বোঝা যায় যে, হকের ভিত্তিতে অর্থাৎ ন্যায়ভাবে এরূপ করা বৈধ। যেমন– যালিমের বিরুদ্ধে মযলুম এমন কোনো লোকের নিকট নালিশ করতে পারে, যার কাছ থেকে সে আশা করে যে, তিনি যুলুম বন্ধ করতে পারবেন। অথবা সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা দলের দোষ এরূপ লোকদের সামনে উল্লেখ করা, যাদের সম্পর্কে এ আশা করা যায় যে, তারা সে দোষ দূর করার জন্য কিছু করতে পারবে। অথবা ফতওয়া জানার জন্য কোনো মুফতির কাছে আসল ঘটনা বলতে গিয়ে কোনো লোকের মন্দ কাজের কথা উল্লেখ করতে বাধ্য হওয়া। কোনো ব্যক্তির বা দলের দুষ্টুমি থেকে লোকদের সতর্ক করা, যাতে লোকেরা তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। সেই লোকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আওয়াজ তোলা ও তাদের দোষের সমালোচনা করা– যারা দুষ্কৃতি, দুর্নীতি ও অনাচার করে বেড়াচ্ছে, বিদআত ও গুমরাহী প্রচার করছে, আল্লাহর সৃষ্টিকে ধর্মহীনতা ও যুলুম–জবরদস্তির ফিতনায় জড়িত করছে।

১২. গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে এজন্য উপমা দেওয়া হয়েছে যে, যার গীবত করা হয় সে বেচারা কে কোথায় তার ইজ্জতের উপর হামলা করছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর থাকে।

১৩. আগের আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করে ঐ হুকুম দেওয়া হয়েছিল, যা মুসলিমসমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য জরুরি। এখন এ আয়াতে গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করে সেই

أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

১৪. মরুবাসীরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল যে, আমরা অনুগত হয়েছি। তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান ঢোকেনি।[১৪] তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চল, তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমলের বদলা কম দেবেন না। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৫. তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোনো সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক।

মহাগুমরাহীর সংশোধন করা হয়েছে, যা সব যুগে দুনিয়ায় ফাসাদের কারণ হয়ে আছে। অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কুসংস্কার। এ ছোট আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে সম্বোধন করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত: তোমাদের সকলের মূল এক। একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি এবং বর্তমানে তোমাদের যত বংশই পৃথিবীর বুকে দেখা যায় তা আসলে একটি প্রাথমিক বংশের বিভিন্ন শাখা, যা এক মাতা ও এক পিতা থেকে শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: মূলে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি-গোত্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার দাবি কখনো এই ছিল না যে– এর ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত, বড় ও ছোটর পার্থক্য হবে, এক বংশ অন্য বংশের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করবে, এক রঙের মানুষ অন্য রঙের মানুষকে হীন ও ঘৃণ্য মনে করবে; এক জাতি অন্য জাতির উপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবে।

স্রষ্টা মানুষকে যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রের রূপ দান করেছেন তার কারণ হলো, এটাই তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিচিতির স্বাভাবিক পদ্ধতি।

তৃতীয়ত : মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার যদি কোনো ভিত্তি থাকে ও থাকতে পারে তবে তা হচ্ছে নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব।

১৪. সকল বেদুইন সম্পর্কে এ কথা বলা হয়নি; বরং এখানে কয়েকটি বিশেষ বেদুইন দলের কথা বলা হচ্ছে– যারা ইসলামের অগ্রগতি লক্ষ্য করে কেবল এ ধারণায়ই মুসলমান হয়েছিল যে, এভাবে

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. (হে রাসূল!) এসব (ঈমানের দাবিদার) লোকদেরকে বলুন, তোমরা কি তোমাদের দীনের খবর আল্লাহকে জানাচ্ছ? অথচ আল্লাহ জমিন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসকেই জানেন। আর তিনি সব জিনিস সম্পর্কেই জ্ঞানী।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. (হে রাসূল!) এরা (মনে করে যে,) ইসলাম কবুল করে আপনার উপর দয়া করেছে। তাদেরকে বলুন, তোমাদের ইসলাম দ্বারা আমাকে ধন্য করনি। তোমরা যদি ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে (তোমাদের বোঝা উচিত যে,) আল্লাহই ঈমানের দিকে হেদায়াত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ আসমান ও জমিনের গায়েবী জিনিসের ইলম রাখেন। আর তোমরা যাকিছু করছ তা সবই তিনি দেখছেন।

তারা মুসলমানদের আঘাত থেকে নিরাপদও থাকবে এবং ইসলামের বিজয়ের ফলও ভোগ করবে। এরা প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতার সাথে ঈমান আনেনি। কেবল মৌখিক ঈমানের স্বীকৃতি জানিয়ে সুবিধা ভোগের জন্য নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিল।

৫০. সূরা কাফ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার শুরুতে যে কাফ অক্ষরটি আছে তা থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময় জানা না গেলেও এর আলোচ্য বিষয় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরের সূরা। নবুওয়াতের চতুর্থ ও পঞ্চম বছরের পরিবেশের সাথে সূরাটির বক্তব্য খাপ খায়। ঐ সময় কাফিরদের বিরোধিতা খুব বেড়ে গেলেও তখন পর্যন্ত যুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

গোটা সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়ই হলো আখিরাত। অবশ্য শুরুতে রিসালাতের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে।

সূরাটির গুরুত্ব

সম্ভবত আখিরাতের উপর মযবুত বিশ্বাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রাসূল (স) এ সূরাটি প্রায়ই ফজর ও জুমুআর নামাযের ইমামতির সময় পড়ে শোনাতেন।

আলোচনার ধারা

১-৫ নং আয়াতের মধ্যে প্রথমেই কুরআনের কসম করে আল্লাহ তাআলা বলেন, কাফিররা অবাক হয়েছে এ কারণে যে, তাদেরই এক লোক আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী হয়ে গেল কেমন করে। তাই রাসূল (স)-এর প্রতি তারা ঈমান আনতে রাজি নয়।

শুরুতেই কুরআনের কসম করার উদ্দেশ্য–

আল্লাহ তাআলা কুরআনের কসম করে বোঝাতে চেয়েছেন এ কুরআনই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। কুরআনের ভাব ও ভাষা যে মানুষের রচনা নয়, এ কথা মানতেই হবে। মুহাম্মদ (স)-এর মুখ থেকে এ ধরনের কালাম বা কথা আগে কখনো শোনা যায়নি। এ কথা বোঝানোই কসমের উদ্দেশ্য।

৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতের কথা শুনে কাফিররা অবাক হয়ে বলছে, 'আমাদের দেহ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর আবার কেমন করে জীবিত করা হবে? এটা একেবারেই অসম্ভব।'

৪ নং আয়াতে এর জবাবে আল্লাহ বলেছেন, মাটির সাথে মিশে গেলেও আল্লাহ তা এমনভাবে হেফাযত করে রাখেন যে, আবার দেহ তৈরি করা মোটেই অসম্ভব নয়।

৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতের যুক্তি কাফিররা বুঝলেও দুনিয়ার লোভে তারা আসলে বিশ্বাসই করতে চায় না। তাদের কাছে সত্য আসার সাথে সাথেই তারা তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেও দেখল না। সত্য কবুল করার ইচ্ছাই তাদের নেই। তাই তারা সন্দেহ, বিভ্রান্তি ও ধাঁধায় পড়ে আছে।

৬-১১ নং আয়াতে আখিরাতের পক্ষে আফাকী যুক্তি পেশ করা হয়েছে। 'আফাক' মানে দিগন্ত। আল্লাহর সৃষ্টি থেকে উদাহরণ দিয়ে যে যুক্তি দেখানো হয় তা আফাকী যুক্তি বলে গণ্য।

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এদের চারপাশে আমার সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করলে কি তাদের বিবেক সাক্ষ্য দেবে না যে, যিনি এসব একবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে আবার সৃষ্টি করা সম্ভব?

আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছড়া, বৃষ্টির ফলে উৎপন্ন ফলমূল দ্বারা সাজানো সুন্দর পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা করলে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষে আখিরাতের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা কি বোঝে না যে, এসব সৃষ্টি করা হয়েছে তাদেরই রিয্কের ব্যবস্থা করার জন্য? তাদের বোঝা উচিত যে, মরা জমিনকে বৃষ্টির পানি দ্বারা জীবিত করে যেমন তাদের রিয্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, এভাবেই মরার পর আবার তাদেরকে সৃষ্টি করা হবে।

এ কয়েকটি আয়াতে আফাকী যুক্তি দ্বারা আখিরাতের 'ইমকান' বা সম্ভাবনা প্রমাণ করা হয়েছে।

১২-১৫ নং আয়াতে আখিরাতের পক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি পেশ করা হয়েছে। নূহ (আ) থেকে শুরু করে কয়েকজন নবীর কাওমের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, আখিরাতে বিশ্বাস না করার কারণে দুনিয়ায় তো তাদের উপর গজব নাযিল হয়েছেই, মরণের পর আরও বড় আযাব তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

ইতিহাস থেকে কয়েকটি অভিশপ্ত কাওমের কথা উল্লেখ করে এখানে মক্কার কাফিরদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, তারাও যদি আখিরাতের উপর ঈমান না আনে, তাহলে তাদেরও ঐ দশাই হবে। এটাই ইতিহাসের দাবি।

এ কয়েকটি আয়াতে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা আখিরাতের 'ওজূব' বা হওয়ার আবশ্যকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬-১৮ নং আয়াতে আখিরাতের পক্ষে 'আনফুস'-এর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। নাফ্সের বহুবচন আনফুস। নাফ্স মানে দেহের দাবি। আখিরাতকে যুক্তি হিসেবে কুরআনের বহু সূরায় মানুষের দেহ থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে, আদালতে আখিরাতে মানুষের বিচার করার জন্য আল্লাহ তাআলা মযবুত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রথমত, আল্লাহ তাআলা মানুষের মনের খারাপ নিয়ত বা ইচ্ছার খবর পর্যন্ত রাখেন। শয়তান তার মনে যে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দেয় তাও আল্লাহ জানেন। কে কোন্ নিয়তে কোন্ কাজ করছে তা ফেরেশতারা না জানলেও আল্লাহর নিজস্ব গোপন ফাইলে তা জমা করা হয়। মানুষের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত তিনি জানেন। মানুষ নিজেকে যতটুকু জানে, তার চেয়েও বেশি তিনি জানেন।

তাছাড়া দুজন ফেরেশতা সবসময় তাদের ডানে ও বাঁয়ে হাজির থেকে প্রতিটি কথা ও কাজের রেকর্ড রাখছে। আখিরাতে বিচার করার সময় বিচারক হিসেবে আল্লাহ তাআলা মানুষের নিয়ত ও আমল সম্পর্কে যা জানেন শুধু তার ভিত্তিতেই তিনি বিচার করবেন না। ইনসাফের দাবি পূরণের জন্য তিনি অপরাধীর হাত-পা থেকেও সাক্ষ্য নেবেন, ফেরেশতাদের রেকর্ডও সামনে রাখবেন এবং আরো অনেক তথ্য হাজির করবেন।

এ কয়েকটি আয়াতে আনফুসের যুক্তির আলোকে 'আখিরাতের ওকু' বা আখিরাত হওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করেছেন।

১৯-২৩ নং আয়াতে মৃত্যুর সময় থেকে শুরু করে হাশরের আদালতে হাজির হওয়া পর্যন্ত একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আখিরাতের সত্যতা তোমরা এখন যতই অস্বীকার কর– যখন মৃত্যু আসবে তখন থেকেই টের পাবে যে, তা কত কঠিন সত্য। তারপর হাশরের জন্য শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তখন তোমরা আবার জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে হাজির হবে। যে দুজন ফেরেশতা ডানে ও বাঁয়ে হাজির থেকে রেকর্ড করত তাদের একজন গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে, আরেকজন সাক্ষীর ভূমিকা পালন করবে এবং তোমার আমলের রেকর্ড সাথে নিয়ে যাবে। আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে গ্রেফতারকারী ফেরেশতা আসামিকে আদালতে সোপর্দ করবে।

২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা দুনিয়ায় এসব সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। আখিরাতের এ চিত্রকে তোমরা বিশ্বাসের চোখে দেখতে রাজি হওনি। এখন তোমাদের সামনে থেকে দুনিয়ার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। আজ খুব দেখতে পাচ্ছ। এ কয়েকটি আয়াতেও আখিরাত সংঘটনের বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

২৪ ও ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বিচারের পর আখিরাত অস্বীকারকারী লোকদেরকে দোযখে ফেলার সময় দুনিয়ায় তাদের অপকর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করা হবে। বলা হবে, তারা নেক কাজে বাধা দিত, আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করত এবং শিরক করত। এগুলোও 'আখিরাতের ওকু' প্রমাণ করে।

২৭-২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আদালতে আখিরাতে বিচারের সময় অপরাধীরা নিজেদের কুফরীর জন্য শয়তানকে দায়ী করবে। শয়তান বলবে, হে আল্লাহ! এরা নিজেরা গুমরাহ ছিল বলেই আমার কথা তাদের পছন্দ ছিল। তাই এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আল্লাহ বলবেন, আমার সামনে বিতর্ক ও ঝগড়া করবে না। আমি দুনিয়াতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, যে গুমরাহ হবে আর যে গুমরাহী করবে তারা সবাই যার যার পাপের শাস্তি পাবে। আমার ঐ আইনে কোনো রদবদল হবে না। তাই যাকে যে শাস্তি দিয়েছি তা ঠিকমতোই দেওয়া হয়েছে। আমি কারো উপর কোনো যুলুম করিনি। এখানেও 'আখিরাতের ওকু' তথা আখিরাত সংঘটনের বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

এ রুকূ'র ১৬ থেকে ২৮ নং আয়াতে যা বলা হয়েছে তাতে মক্কার কাফিরদের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, তোমরা আজ যে আচরণ করছ এর পরিণামে তোমাদের ঐ দশাই হবে, যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ তোমাদের মধ্যে এসব দোষই রয়েছে, যার শাস্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় রুকূ'

৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, শয়তান ও তার অনুসারীসহ জিন ও মানুষের মধ্যে বিরাটসংখ্যক অপরাধীকে দোযখে ফেলার পর দোযখকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তুমি কি ভরে গেছ, না আরো জায়গা খালি আছে?' জবাবে দোযখ বলবে, 'আরও আসামি আছে নাকি, থাকলে পাঠিয়ে দিন।' অথবা দোযখ অবাক হয়ে বলবে, 'এত লোক আসার পরও দোযখীর সংখ্যা শেষ হয়নি?'

৩১-৩৫ নং আয়াতে আখিরাতে কাফিরদের দুর্দশার বিরাট চিত্র তুলে ধরার পর মুত্তাকীদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যে বেহেশতের ওয়াদা তাদের জন্য করা হয়েছিল তা তাদের কাছে আনা হবে। তাদেরকে কষ্ট করে দূরে যেতে হবে না।

দোযখীদের কাছে যেমন তাদের অপকর্মের তালিকা তুলে ধরা হবে বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি এখানে মুত্তাকীদের গুণাবলি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য এ বেহেশতেরই ওয়াদা করা হয়েছিল। কারণ, তোমরা আল্লাহর দিকে মনোযোগী ছিলে, ভালো ও মন্দের ব্যাপারে

আল্লাহর দেওয়া সীমা মেনে চলেছ, না দেখেও আল্লাহকে ভয় করেছ, আর আজ আমার প্রতি মহব্বতপূর্ণ দিল নিয়ে হাযির হয়েছ। তোমরা নিশ্চিন্তে বেহেশতে প্রবেশ কর। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেখানে কোনো কিছুরই অভাব থাকবে না। যা চাইবে সবই পাবে। এ ছাড়াও এমন আরও বহু নিয়ামত সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো ধারণা নেই বলে চাইতেও জানবে না।'

৩৬-৩৮ নং আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, 'তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও যোগ্য জাতিকে অতীতে ধ্বংস করে দিয়েছি। যাদের চিন্তা করার মতো মন আছে অথবা যারা মন দিয়ে উপদেশ শুনে তারাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তোমরা যদি মনের কানে শুনতে না চাও, বিদ্বেষের কারণে যদি রাসূল (স)-এর শিক্ষাকে বিবেচনা করতেই না চাও, তাহলে তোমাদেরকেও ঐভাবেই ধ্বংস করা হবে।'

৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, সৃষ্টি করা ও ধ্বংস করা আমার জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। আমি ছয় দফায় ছয়টি যুগে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করতে আমার কোনো ক্লান্তি লাগেনি। তোমাদেরকে ধ্বংস করতেও আমার কোনো বেগ পেতে হবে না।

৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কাফিররা আখিরাত সম্পর্কে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তাতে আপনি মনে ব্যথা নেবেন না। সবরের সাথে দাওয়াতি কাজ করে যান। এ ধরনের বিরোধী পরিবেশে সবরের জন্য মনের যে শক্তি দরকার, তা যিকর ও তাসবীহ এবং নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় ও তাহাজ্জুদের মাধ্যমে হাসিল করুন।

৪১-৪৪ নং আয়াতে কীভাবে হাশর হবে সে বিষয়ে সংক্ষেপে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জমিন ফেটে যাবে, সব মানুষ কবর থেকে উঠে দলে দলে হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য জমায়েত হবে। সবারই মনে হবে যে, কাছে থেকেই তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।

৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হায়াত ও মওতের একমাত্র মালিক আমিই। সেদিন সবাইকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। সবাইকে একত্রিত করা আমার জন্য বড়ই সহজ কাজ।

সবশেষে ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, বিরোধীরা যা কিছু বলছে সবই আমার ভালোভাবে জানা আছে। তাদেরকে জোর করে হেদায়াত করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। ওদের কথায় আপনার পেরেশান হওয়ার কিছুই নেই। আপনি কুরআনের ভিত্তিতে উপদেশ দিতে থাকুন; যারা আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে তারা আপনার উপদেশ মেনে চলবে।

সূরা কাফ

৪৫ আয়াত, ৩ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤٥ رُكُوْعَاتُهَا ٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ①

১. কাফ, কসম কুরআন মাজীদের।

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ②

২. বরং এসব লোক এ কারণে অবাক হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী (কেমন করে) তাদের কাছে এসে গেল![1] তাই কাফিররা বলল, 'এটা তো আজব ব্যাপার!'

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③

৩. তবে কি আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে মিশে যাব (তখন আমাদেরকে আবার ওঠানো হবে)?[2] এ রকম ফিরে আসা তো বহু দূরের কথা!

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④

৪. (অথচ) মাটি তাদের (শরীরের) যতটুকু খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে। আমার কাছে (এমন) এক কিতাব আছে, যা সবই হেফাযত করে থাকে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑤

৫. বরং যখনই তাদের কাছে সত্য এল তখনই এরা তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। এ কারণেই এখন এরা সন্দেহে পড়ে আছে।

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ⑥

৬. আচ্ছা! এরা কি কখনো তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কেমন করে তা বানিয়েছি ও সাজিয়েছি? এর মধ্যে কোনো ফাঁক-ফোকর (বা ফাটল) নেই।

১. অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাত মান্য করতে অস্বীকার করেনি; বরং তারা এই অজুহাতে অস্বীকার করেছিল যে, তাদের মতোই একজন মানুষ ও তাদের কাওমেরই এক ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী হয়ে গেল– এটাতো একটা অবাক কাণ্ড!

২. এটা ছিল তাদের দ্বিতীয় বিস্ময়। একজন মানুষ আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছেন– এটা ছিল তাদের প্রথম বিস্ময়। তাদের পক্ষে আরো একটি অতিরিক্ত বিস্ময় ছিল এই যে, মৃত্যুর পর সব মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা ও সকলকে একত্রিত করে আল্লাহর আদালতে হাজির করার বিষয়টি।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧

৭. আর আমি (কেমন করে) জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি, আর তাতে সব রকমের সুন্দর গাছ-গাছড়া জন্মিয়েছি।

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝٨

৮. (এসব কিছুই) এমন প্রত্যেক বান্দাহর জন্য চোখ খুলে দেওয়ার মতো ও উপদেশ নেওয়ার মতো (বিষয়), যে (সত্যের দিকে) ফিরে আসে।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝٩ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝١٠

৯-১০. আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি নাযিল করেছি। তারপর তা দিয়ে বাগান ও ফসলাদি এবং উঁচু খেজুর গাছ জন্মিয়েছি, যার মধ্যে ফলের ছড়া থরে থরে থাকে।

رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ۝١١

১১. (এসব আমার) বান্দাহদের জন্য রিযকের ব্যবস্থা। আর (ঐ পানি দিয়ে) আমি মরা জমিনকে জীবিত করি। (মরা মানুষকে জমিন থেকে) বের করার ব্যাপারটা এভাবেই ঘটবে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝١٢ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝١٣ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝١٤

১২-১৩-১৪. এদের আগে নূহের কাওম, রাস্সের অধিবাসী, সামূদ, 'আদ, ফিরাউন ও লূতের কাওম এবং আইকাবাসী ও তুব্বা জাতি (রাসূলদেরকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। এদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল। অবশেষে (তাদের উপর) আমার শাস্তি সত্য হয়ে দেখা দিল।

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٥

১৫. তবে কি প্রথম বার সৃষ্টি করতে আমি অক্ষম ছিলাম? বরং এরা নতুন করে সৃষ্টি করার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝١٦

১৬. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে তাও আমি জানি। আর আমি তার ঘাড়ের শিরা থেকেও বেশি কাছে আছি।

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

১৭. (আমি তো সব জানিই, তা ছাড়াও) দু জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে সব কিছু টুকে নিচ্ছে।

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

১৮. তার মুখ থেকে যে শব্দই বের হয় তা (রেকর্ড করার জন্য) পাহারাদার হাজির রয়েছে।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

১৯. (তারপর দেখ) মওতের কষ্ট সত্য সত্যই এসে গেছে। এটাই ঐ জিনিস, যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

২০. এরপর শিঙায় ফুঁ দেওয়া হলো। এটাই ঐ দিন, যার ভয় তোমাকে দেখানো হতো।

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

২১. প্রত্যেক লোক (এ অবস্থায়) এসে গেছে যে, তার সাথে একজন চালক ও আরেকজন সাক্ষী রয়েছে।

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

২২. এ বিষয়ে তুমি উদাসীন ছিলে। তোমার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। আজ তোমার দৃষ্টি খুবই প্রখর।[৩]

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾

২৩. তার সাথী[৪] (ফেরেশতা) বলল, এই লোক এখানে হাজির রয়েছে, যার দায়িত্ব আমার উপর ছিল।

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾

২৪. (হুকুম দেওয়া হবে) প্রত্যেক সত্যবিরোধী কাফিরকে দোযখে ফেলে দাও;

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾

২৫. যে নেক কাজে বাধা দিত, সীমালঙ্ঘন করত ও সন্দেহ পোষণ করত।

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

২৬. আর যে আল্লাহর সাথে অন্যকেও ইলাহ বানিয়েছিল তাকে কঠিন আযাবে ছুড়ে ফেল।

৩. অর্থাৎ এখন তো তুমি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছ– আল্লাহর নবী তোমাকে যেসবের খবর দিতেন, তার সবকিছুই এখানে বর্তমান আছে।

৪. এখানে সাথী দ্বারা ঐ ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। ঐ ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার আদালতে পৌঁছে আবেদন করবে, 'এই ব্যক্তি আমার জিম্মায় ছিল। এখন আপনার দরবারে পেশ করা হলো।'

২৭. তার সাথী[৫] (শয়তান) বলল, হে আমার রব! আমি তাকে বিদ্রোহী বানাইনি; বরং সে নিজেই গোমরাহিতে বহু দূর চলে গিয়েছিল।

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

২৮. জবাবে আল্লাহ বলবেন, আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি আগেই তোমাদেরকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

২৯. আমার কথা রদবদল হয় না। আর আমি বান্দাহদের জন্য যালিম নই।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

রুকূ' ৩

৩০. ঐ দিন আমি যখন দোযখকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি ভরে গিয়েছ?' তখন সে বলবে, 'আরো কিছু আছে নাকি?'[৬]

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

৩১. আর বেহেশতকে মুত্তাকীদের কাছে আনা হবে, মোটেই দূরে থাকবে না।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

৩২-৩৩. (বলা হবে) এটাই ঐ জিনিস, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছিল; (এটা এমন) প্রত্যেক লোকের জন্য, যে (আল্লাহর দিকে) ফিরে এসেছিল,[৭] (আল্লাহর দেওয়া সীমার) হেফাযত করেছিল, আল্লাহকে না দেখেই ভয় করত এবং বিনীত মন নিয়ে (আমার সামনে এখন) হাজির হয়েছে।[৮]

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾

৫. এখানে সাথী দ্বারা ঐ শয়তানকে বোঝানো হয়েছে, যে দুনিয়ায় ঐ অপরাধীর পেছনে লেগে ছিল।

৬. এর দুটি অর্থ হতে পারে : প্রথমত, আমার মধ্যে এখন আর অতিরিক্ত মানুষের জন্য স্থান নেই। দ্বিতীয়ত, আরো অপরাধী থাকলে পাঠিয়ে দিন।

৭. এর দ্বারা এমন ব্যক্তি বোঝানো হয়েছে, যে অবাধ্যতা ও নাফ্সের লালসার পথ ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টির পথে ফিরে এসেছে আর যে খুব অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের সব ব্যাপারে তাঁর প্রতি নির্ভর করে।

৮. এর দ্বারা এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর দেওয়া সীমা, তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর দেওয়া দায়িত্ব ও আমানতের হেফাযত করে। যে সবসময় নিজেকে যাচাই করে দেখতে থাকে যে, কথা ও কাজে কোথাও আমার রবের নাফরমানী করছি কি না?

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝٣٤

৩৪. (আরো বলা হবে) তোমরা নিরাপদে বেহেশতে ঢুকে যাও। ঐ দিন থেকেই চিরস্থায়ী জীবন (শুরু হবে)।

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝٣٥

৩৫. (সেখানে) তারা যা চাইবে তা-ই পাবে। (তা ছাড়া তাদের জন্য) আমার কাছে আরো বহু কিছু আছে।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ۝٣٦

৩৬. আমি তাদের আগে এমন অনেক কাওমকে ধ্বংস করেছি, যারা এদের থেকেও অনেক শক্তিশালী ছিল। তারা বহু দেশে ঢুকে পড়েছিল। (শেষ পর্যন্ত) তারা কি কোথাও আশ্রয় পেয়েছিল?

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝٣٧

৩৭. ঐসব (ঘটনায়) এমন প্রত্যেক লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে, যার মন আছে অথবা যে মন দিয়ে শোনে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ۝٣٨

৩৮. আমি আসমান ও জমিন এবং এ দুটোর মাঝে যাকিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। এতে আমার মধ্যে কোনো ক্লান্তি আসেনি।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝٣٩

৩৯. (তাই হে রাসূল!) এরা যা বলাবলি করছে সে বিষয়ে আপনি সবর করুন এবং সূর্য ওঠার আগে ও সূর্য ডোবার আগে আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করতে থাকুন।[৯]

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝٤٠

৪০. আবার রাতের বেলায়ও তাঁর তাসবীহ করুন এবং (শেষ রাতের) সিজদার পরও (তাসবীহ করুন)।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝٤١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ

৪১-৪২. আর শোন! যেদিন ঘোষণাকারী (প্রত্যেক লোকের) কাছে থেকেই ডাক দেবে, যেদিন সবাই হাশরের ডাক ঠিক ঠিক

৯. এখানে প্রভুর হামদ (প্রশংসা) ও তাঁর তাসবীহ দ্বারা নামাযকে বোঝানো হয়েছে। সূর্য ওঠার আগে ফজর। সূর্য ডোবার আগে যুহর ও আসর। রাত্রিকালে মাগরিব ও ইশার নামায। তাহাজ্জুদও রাতের তাসবীহ্‌র মধ্যে গণ্য।

الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

শুনতে পাবে,[১০] সে দিনটিই হলো (কবর থেকে) বের হওয়ার দিন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৩-৪৪. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দিই। আর আমার দিকেই (সবাইকে) ঐ দিন ফিরে আসতে হবে, যেদিন জমিন ফেটে যাবে এবং মানুষ এর ভেতর থেকে বের হয়ে দৌড়াতে থাকবে। এভাবে হাশরে (সবাইকে একত্রিত করা) আমার জন্য খুবই সহজ।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে রাসূল!) এরা যাকিছু বলছে তা আমি ভালো করেই জানি। তাদেরকে জোর করে মানানোর দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়া হয়নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।

১০. মানুষ যেখানেই মারা যাক বা পৃথিবীর যেখানেই তার মওত আসুক, সেখানেই আল্লাহর ঘোষণাকারীর আওয়াজ পৌঁছবে, 'ওঠ, তোমার হিসাব দেওয়ার জন্য নিজের রবের কাছে চল।' এ শব্দ এমন ধরনের হবে, পৃথিবীর যেকোনো কিনারা থেকে মানুষ জীবিত হয়ে উঠুক না কেন সে অনুভব করবে, ঘোষণাকারী যেন তার নিকটবর্তী কোথাও থেকেই তাকে ডাকছে।

৫১. সূরা যারিয়াত

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দটি থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটিতে আলোচিত বিষয় ও এর বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, এ সূরা যখন নাযিল হয় তখন পর্যন্ত রাসূল (স)-এর দাওয়াতের বিরোধীরা যুলুম-অত্যাচার শুরু করেনি। তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যা প্রচারণা দ্বারাই বিরোধিতা করা হচ্ছিল। এ সময়টা নবুওয়াতের তৃতীয় বছর থেকে পঞ্চম বছরের মধ্যে ছিল।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। অবশ্য শেষদিকে তাওহীদের দাওয়াতও পেশ করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৬ নং আয়াত : আল্লাহ তাআলা প্রথম চার আয়াতে আসমান থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে জমিনে পানির ব্যবস্থা করার যে চমৎকার নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন, তার কসম করে ৫ ও ৬ নং আয়াতে আখিরাত যে অবশ্যই হবে সে কথা ঘোষণা করেছেন। এখানে আখিরাতের পক্ষে সৃষ্টিজগতের একটি বিষয়কে যুক্তি হিসেবে তিনি পেশ করেছেন। এ জাতীয় যুক্তিকে আফাকী যুক্তি বলা হয়।

এখানে আল্লাহ তাআলা ঐ বাতাসের কসম করেছেন, যা পানিভরা মেঘকে পানি বর্ষণ করার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ কসমের উদ্দেশ্য হলো, আখিরাতের পক্ষে মযবুত যুক্তি পেশ করা। আল্লাহ তাআলা বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি কোনো কাজ বিনা উদ্দেশ্যে করেন না। বাতাস, ধূলি, ঝড় ও মেঘের বিচরণের উদ্দেশ্য যেমন বৃষ্টি বর্ষণ, তেমনি মানুষকে ভালো ও মন্দের চেতনা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো আখিরাতের ভালো ও মন্দ কাজের বদলা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

এ দুনিয়ার সবকিছু মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন বলে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন। গোটা সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার জন্য মানুষকে সবচেয়ে উপযুক্ত দেহ দান করেছেন। এজন্যই তিনি তাকে এত বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়েছেন। আর কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা এত রকম যোগ্যতা ও সুযোগ দেননি। তিনি বিনা উদ্দেশ্যে মানুষকে এসব দেননি।

এ যোগ্যতা ও সুযোগকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে মানুষকে ভালো ও মন্দের সঠিক ধারণাও দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই মানুষ জানে যে, নেক উদ্দেশ্যে কাজ করলে দুনিয়ায় শান্তি কায়েম হয়, আর বদ উদ্দেশ্যে কাজ করলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

ভালো ও মন্দের এ চেতনা দিয়েছেন বলেই তিনি আখিরাতে আমলের হিসাব নেবেন। কে নেক আর কে বদ, সে হিসাব অনুযায়ী বদলা দেওয়া হবে। মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দের ধারণা অনর্থক দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা বিনা উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করেন না।

মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের যে উদাহরণ প্রথম চারটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে আখিরাতের আরও একটি গোপন যুক্তি রয়েছে। মাটি থেকে যেসব পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, তা যেমন ধ্বংস হয়ে যায় না বরং আবার পানি হয়েই ফিরে আসে, তেমনি মানুষ মরার পর তার দেহ মাটিতে মিশে গেলেও আবার এ দেহ সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য কোনো অসম্ভব কাজ নয়।

৭-৯ নং আয়াত : ৭ নং আয়াতে বিভিন্ন রূপ ধারণকারী আসমানের কসম করে আল্লাহ তাআলা বলতে চান, আসমানে যেমন বাতাসের কারণে মেঘগুলো অগণিত আকার ধারণ করে, তেমনি আখিরাত সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা বহু রকমের দেখা যায়। কেউ মনে করে, মানুষ মরে যাওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরপারে আর কিছুই নেই। কারো ধারণা, নেক লোক মরার পর আরো উন্নত মানুষ হয়ে আবার দুনিয়ায় ফিরে আসে এবং বদ লোক আরো নিকৃষ্ট জীব হয়ে জন্ম নেয়। এর নামই হলো জন্মান্তরবাদ। কতক লোক বিশ্বাস করে, আখিরাতে আমলের বিচার হবে এবং বেহেশত ও দোযখ সত্যিই আছে বটে, কিন্তু তাদের পক্ষে মযবুত সুপারিশকারী থাকায় তাদের কোনো ভয় নেই। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে, আল্লাহর ছেলে (?) যীশু তার উপর বিশ্বাসী সবার গুনাহর কাফফারা আদায় করে গেছেন বলে তাদেরকে দোযখে যেতে হবে না।

এ সকল বিভিন্ন মত থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়ে সঠিক ইল্‌ম তাদের নেই। তারা অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছে। একমাত্র আল্লাহই নবীর মাধ্যমে আখিরাত সম্বন্ধে সঠিক ধরনা দিয়েছেন।

নবম আয়াতে বলা হয়েছে, আমলের বদলা তো অবশ্যই হবে। যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তারা সে কথা মেনে নিতে রাজি হয় না। তারা যার যার খেয়াল অনুযায়ী বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকে।

১০-১৪ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আখিরাত সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে ফায়সালা করে তারা ধ্বংসের পথেই চলছে। তারা সঠিক ইল্‌ম রাখে না বলেই এত বড় একটা ব্যাপারে এমন অমনোযোগী হয়ে আছে। তারা ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে, ঐ বিচার দিবসটি কবে আসবে? তারা জানার জন্য জিজ্ঞেস করে না, আখিরাতকে অবিশ্বাস করার কারণেই তারা এভাবে পরিহাস করে। ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে এর জবাবে বলা হয়েছে, "আজ তোমরা ঠাট্টা করছ? যখন তোমাদেরকে দোযখে ফেলা হবে তখন টের পাবে যে, ঐ দিনটি কবে আসবে। তখন আরো বলা হবে, দুনিয়ায় যে ফিতনা (বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা) সৃষ্টি করেছিলে আজ এর মজা ভোগ কর। 'এ দিনটি কবে আসবে' বলে যে তাড়াহুড়া করেছিলে সে দিনটি এখন উপস্থিত হয়েছে।"

১৫-১৯ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে মুত্তাকীদের জন্য যেসব নিয়ামত রয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ায় তারা যেসব নেক আমল করার ফলে ঐসব নিয়ামত ভোগ করবে তার কয়েকটি ১৭ থেকে ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাত, বিশেষ করে শেষরাতে আল্লাহর দরবারে গুনাহ মাফ চাইত। তারা দুনিয়াত্যাগী বৈরাগী ছিল না। তারা অবশ্যই কামাই-রোজগার করত। যে মাল তাদের কাছে ছিল তা শুধু নিজেরাই ভোগ করত না; সমাজের বিশেষ করে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা অভাবী তাদের হকও ঐ মালের উপর ছিল বলে মনে করত এবং সে হক আদায় করত।

২০-২৩ আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে আখিরাতের পক্ষে আফাকী ও আনফুসের যুক্তি পেশ করা হয়েছে। সৃষ্টিজগতের বিষয়কে আফাক এবং মানুষের নিজের বিষয়কে আনফুস বলা হয়। কুরআন মাজীদে আসমান ও জমিনের বহু জিনিসের উল্লেখ করে আখিরাত ও তাওহীদের যুক্তি দেওয়া হয়েছে। আর মানুষের দেহ ও জীবনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেও তেমনিভাবে তাওহীদ ও আখিরাতের যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমানদাররা জমিনের মধ্যে আখিরাতের বহু প্রমাণ দেখতে পায়। এ আয়াতে ঐসব প্রমাণের কোনো বিবরণ নেই। এতে শুধু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বহু জায়গায় জমিনের মধ্যে যেসব নিশানা আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

জমিনকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত বানানোর জন্য কী বিরাট ব্যবস্থা করা হয়েছে সে বিষয়ে একটু চিন্তা করলে এ কথা বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, আল্লাহ একদিন এসব নিয়ামতের হিসাব অবশ্যই নেবেন। তেমনি মানুষ নিজের দেহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, এর মধ্যে আল্লাহর কত বড় দান রয়েছে। দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ বা অকেজো হলেই বোঝা যায় সুস্থ অবস্থায় এ অঙ্গটি কত বড় নিয়ামত ছিল। যিনি এসব নিয়ামত দান করেছেন। এগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হলো, এর হিসাব তিনি অবশ্যই একদিন নেবেন। এরই ইঙ্গিত ২১ নং আয়াতে রয়েছে।

২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে মানুষ! দুনিয়ায় যা না হলে তোমাদের চলে না তা সবই রিয্‌ক এবং তা একমাত্র আমারই হাতে রয়েছে। তেমনিভাবে আখিরাতে বদলা দেওয়ার যে ওয়াদা করা হয়েছে সে বিষয়েও ফায়সালার অধিকার আমার। এ দুটো বিষয়ে দুনিয়ার কারো কোনো হাত নেই। এর সিদ্ধান্ত আসমানেই হয়।

২৩ নং আয়াতে জমিন ও আসমানের মালিক আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের কসম করে বলেছেন, হে মানুষ! তোমরা যে কথা বলতে পারছ, এটা যেমন সত্য বলে মনে করছ, আখিরাতও তেমনি সত্য– যদিও তা তোমরা মানতে চাও না।

দ্বিতীয় রুকূ'

এ রুকূ'তে আখিরাতের পক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

মানবজাতির ইতিহাস থেকে এমন কয়েকটি জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আখিরাতকে অস্বীকার করার ফলে নবীগণের নিকট থেকে নৈতিক শিক্ষা কবুল করেনি বলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে দুটো মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন সূরায় বারবার ঐসব জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন :

১. দুনিয়ার সব জিনিস ও মানুষের শরীর যদিও বস্তুগত উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তবুও আল্লাহ তাআলা নৈতিক মানদণ্ডেই মানুষের বিচার করেন। কারণ, মানুষকে তিনি নৈতিক চেতনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহর নৈতিক বিধান যে জাতি অমান্য করে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করলেও ঐ সীমা লঙ্ঘন করলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ বস্তুজগতের পর মানুষকে নৈতিক অপরাধের জন্য আখিরাতে শাস্তি দেওয়া হবে। দুনিয়ায় যে আযাব দেওয়া হয় তা অপরাধের শাস্তি নয়, অপরাধীকে গ্রেফতার করা মাত্র।

২. নবীগণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের যে দাওয়াত মানবজাতির নিকট পেশ করেছেন তা যেসব জাতি কবুল করেনি, তারা স্বাভাবিক কারণেই নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতরে দিকে যেতে থাকে এবং একসময় ধ্বংসের যোগ্য হয়ে পড়ে। শুধু বস্তুগত উন্নতি কোনো জাতিকে চিরদিন উন্নত অবস্থায় রাখতে পারে না। শত শত বছর দেরিতে হলেও নৈতিক কারণেই ধ্বংস আসে।

২৪-৩০ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, একদল ফেরেশতা মানুষের বেশে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। ইবরাহীম (আ)-এর ভাইপো লূত (আ)-এর কাওমের উপর আযাব নাযিলের জন্যই তাঁদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। সেখানে যাওয়ার পথে ইবরাহীম (আ)-কে একটা সুখবর দেওয়ার জন্যই ফেরেশতারা তাঁর নিকট গেলেন।

অপরিচিত মেহমানদের সাথে সালাম দেওয়া-নেওয়ার পর ইবরাহীম (আ) মেহমানদারি করার জন্য খাবার পেশ করলেন। তাঁরা খাচ্ছেন না দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, এঁরা ফেরেশতা। তখন তিনি ভয় পেলেন। কারণ, আযাব নাযিল করার উদ্দেশ্যেই এভাবে ফেরেশতারা আসেন।

ফেরেশতারা ইবরাহীম (আ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনার ঘরে আল্লাহ একটি জ্ঞানী ছেলে দান করবেন। সে সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ বছর এবং তাঁর বিবির বয়স নব্বই বছর। ছেলে হওয়ার কথা শুনে তাঁর বিবি আফসোস করে মন্তব্য করলেন, 'আমি তো বন্ধ্যা, আর আমার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন। আমাদের ছেলে হবে কেমন করে?' তাঁরা জবাবে বললেন, 'আল্লাহ যখন ছেলে দেবেন বলেছেন তখন আর ভাবনার কী আছে? তিনি তো সবই করতে পারেন।'

৩১-৩৪ নং আয়াত : এরপর ইবরাহীম (আ) বললেন, 'হে ফেরেশতাগণ! আমাকে তো সুসংবাদ দিলেন, কিন্তু আপনারা কোথায় আযাব নাযিল করতে এসেছেন?' তাঁরা জবাবে বললেন, 'আমরা এক অপরাধী কাওমের উপর পাথর বর্ষণের জন্য এসেছি। যারা আল্লাহর দেওয়া নৈতিক সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদের জন্য এ শাস্তিই নির্দিষ্ট হয়ে আছে।'

৩৫-৩৭ নং আয়াত : এ তিনটি আয়াতে অতি সংক্ষেপে লূত (আ)-এর কাওমের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে এ বিষয়ে সূরা হূদ, হিজর ও 'আনকাবুতে পুরো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ ফেরেশতারা লূত (আ)-এর বাড়িতে পৌঁছার পর তাঁর কাওমের লোকেরা এ মেহমানদেরকে সুন্দর বালক মনে করে কীরূপ বেহায়াপনা করতে চেয়েছিল এবং এতে লূত (আ) কতটা পেরেশান হয়েছিলেন, সে বিবরণ সেখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু এ কথাই বলা হয়েছে, লূত (আ)-এর বাড়ি ছাড়া ঐ কাওমের মধ্যে আর কোনো মুসলিম পরিবার ছিল না। ঐ বস্তিকে ধ্বংস করার আগে মুমিনদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এরপর এমনভাবে ঐ কাওমকে ধ্বংস করা হয়েছে যে, তা মানবজাতির জন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ধ্বংস করার ব্যাপারে যে নীতি মেনে চলেন, সে বিষয়েও এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যতদিন জনগণকে সংশোধন করার জন্য অল্পকিছু লোকও চেষ্টা করতে থাকে এবং কিছু সংশোধনের সম্ভাবনাও বাকি থাকে, ততদিন তাদেরকে সময় দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহর দীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যখন এক দল লোকও সমাজে তৎপর থাকে না তখন ধ্বংসই সে জনপদের একমাত্র পরিণাম। অবশ্য যে কয়েকজন লোক দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকে, তাদেরকে আযাব নাযিলের আগেই অন্য জায়গায় হিজরত করার সুযোগ দেওয়া হয়।

৩৮-৪৬ নং আয়াত : আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল না করা এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে নৈতিকতাবিহীন জীবনযাপনের দরুন যখন লূত (আ)-এর কাওমকে ধ্বংস করা হয়েছে, তখন একই কারণে আরো অনেক কাওমকে ধ্বংস করার কথা এ রুকূ'তে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৮ থেকে ৪০ নং আয়াতে ফিরাউনের কাওম, ৪১ ও ৪২ নং আয়াতে 'আদ জাতি, ৪৩ থেকে ৪৫ নং আয়াতে সামূদ জাতি এবং ৪৬ নং আয়াতে নূহ (আ)-এর কাওমের ধ্বংসের বিবরণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে সাবধান হওয়ার জন্যই কুরআনে বারবার তাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় রুকূ'

দ্বিতীয় রুকূ'তে আখিরাতের পক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি পেশ করার পর এ রুকূ'তে আখিরাতের আফাকী যুক্তি আনা হয়েছে এবং ঐ একই যুক্তি তাওহীদের পক্ষেও দেখানো হয়েছে।

৪৭-৪৯ নং আয়াত : এ তিনটি আয়াতে তিনটি আফাকী যুক্তি পেশ করা হয়েছে। ৪৭ নং আয়াতে আসমান, ৪৮ নং আয়াতে জমিন ও ৪৯ নং আয়াতে সব জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। এ যুক্তির মর্মকথা যারা বুঝতে পারে, তারা আখিরাতকে অস্বীকার করতে পারে না।

এ পৃথিবীর বাইরে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা যে বিশাল মহাশূন্যে বিচরণ করছে, তাকেই আসমান বলা হয়। এখানে আল্লাহ বলতে চান, আমি একাই তো এসব সৃষ্টি করেছি। মানুষকে মরার পর আখিরাতে বিচারের জন্য আবার সৃষ্টি করা অসম্ভব মনে করার কি কোনো যুক্তি থাকতে পারে? পৃথিবীকে মানুষের জন্য আরামে থাকার যোগ্য করে আমি তৈরি করেছি। তাদের জীবনধারণের জন্য হাজারো জিনিস দিয়ে জমিনকে সাজিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের পর আবার আখিরাতে আরেক জগৎ তৈরি করা আমার জন্য কঠিন হবে কেন?

আমি সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। এরই ফলে সৃষ্টিজগৎ চালু আছে। মানুষ ও সকল জীবকে জোড়া হিসেবে নারী ও পুরুষ বানিয়েছি। সূর্যের তাপ ও বৃষ্টির পানির মিলনেই গাছপালা-তৃণলতা সৃষ্টি হচ্ছে। অতি ক্ষুদ্র এটমেও নিউট্রন ও প্রোটন জোড়া হিসেবে আছে বলেই তা চালু আছে। পজিটিভ ও নেগেটিভ তারের মিলনেই বিদ্যুৎ চলে। এত সব দেখেও তোমরা কেন এ কথা বোঝ না যে, দুনিয়ার এ জীবনের জোড়া হিসেবেই আখিরাত রয়েছে।

৫০ ও ৫১ নং আয়াত : এ দুটো আয়াতে রাসূল (স)-এর মুখ দিয়েই আল্লাহ তাআলা বলাচ্ছেন যে, 'হে মানুষ! আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে এ কথা বোঝানোর জন্যই এসেছি যে, আল্লাহই একমাত্র মাবুদ বা মুনিব। আসমান ও জমিন তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সব জিনিসকে তিনিই জোড়ায় জোড়ায় বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর দিকেই ফিরে এস। যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকেও অন্য কাওমের মতো ধ্বংস করবেন। এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

৫২-৫৫ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়ে বলেছেন, হে রাসূল! মক্কাবাসীরা যে আপনাকে জাদুকর বা পাগল বলছে তাতে কিছুই আসে-যায় না। এর আগেও আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি তাদেরকেও এরকম বলা হয়েছিল। এ থেকে কি এ কথা প্রমাণিত হয়, সব যুগের মানুষ একসাথে পরামর্শ করে রাসূলগণকে জাদুকর বা পাগল বলার ফায়সালা করেছে? এ রকম তো হতে পারে না। এটা অসম্ভব। তাহলে যুগে যুগে রাসূলগণের সাথে একই ধরনের আচরণ কী করে সম্ভব হলো?

এর আসল কারণ একটাই– যারা রাসূলের দাওয়াত কবুল করতে রাজি হয়নি, তারা জনগণকে রাসূলের নিকট থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য একই রকম হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। রাসূলের উন্নত চরিত্র ও আকর্ষণীয় বাণীর প্রভাবে যাতে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সেজন্যই রাসূলকে জাদুকর বলে ছোট করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর আখিরাতের কথাকে তারা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

৫৪ ও ৫৫ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে, হে রাসূল! যারা আপনাকে জাদুকর বা পাগল বলে গালি দিচ্ছে তাদের দরদে আপনার পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। আপনি দাওয়াত ও হেদায়াতের কাজ করতে থাকুন। কোনো অবস্থায়ই জনগণের মধ্যে দাওয়াতি কাজ বন্ধ রাখবেন না। ওরা তো এ কাজ বন্ধ করার জন্যই গালাগালি করছে। আপনি ওদের পরওয়া করবেন না। আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করতে থাকুন।

৫৬-৫৮ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা অতি চমৎকার ভঙ্গিতে মানুষকে এ কথা বোঝাচ্ছেন যে, হে মানুষ! তোমাদের নিজ স্বার্থেই আল্লাহর দাসত্ব করা উচিত। আমি যত কিছু সৃষ্টি করেছি তার মধ্যে শুধু মানুষ ও জিনকেই আমার হুকুম মেনে চলতে বাধ্য করিনি। তাদেরকে মানা ও না মানার ইখতিয়ার দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে কি তাদেরকে আমি অন্য কারো গোলামির জন্য সৃষ্টি করেছি? যারা আমার গোলামি করে না, তারা আসলে অন্যের গোলাম। তারা নাফস, ইবলিস, অন্য মানুষ, এমনকি তাদের হাতের তৈরি মূর্তিরও গোলামি করে। অথচ আমি তাদেরকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেন অন্য কিছুর গোলামি থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যই আমার দাসত্ব করা দরকার মনে করে।

আমি তো সব সৃষ্টিকে আমার মর্জিমতো চলার জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাই প্রতিটি সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য এর উপযোগী বিধান তৈরি করেছি। তবে মানুষ ও জিন ছাড়া সবার উপর রচিত বিধান আমি নিজেই জারি করেছি। সেসব বিধান আমি নবীর মারফতে পাঠাইনি। কিন্তু মানুষ ও জিনের জন্য আমি নবীর মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছি তা তাদের মঙ্গলের জন্য হলেও আমি তা তাদের উপর চাপিয়ে দিইনি। কিন্তু আমি এটাই চাই যে, তারা মেনে চলুক।

আমাকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে মুনিব বানিয়ে রেখেছে, তাদের প্রভুত্ব তাদের দাসদের সমর্থন ছাড়া চলে না। বাদশাহর বাদশাহী প্রজাদের সাহায্য ছাড়া কায়েম থাকে না। চাষীর খিদমত ছাড়া জোত্‌দারের ভাত জোটে না। শ্রমিকের মেহনত ছাড়া মালিকের পেট চলে না। পূজারীর সেবা ছাড়া দেব-দেবীর প্রসাদ জোগাড় হয় না। কিন্তু আমার মুনিবত্ব কারো মানার উপর নির্ভর করে না। আমি কারো মুখাপেক্ষী নই; বরং আমিই সবার রিযক সৃষ্টি করি।

৫৯ ও ৬০ নং আয়াত : এ দুটো আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে নিজেদের উপর যুলুম করেছে, তাদের উপর তেমন আযাবই হবে, যেমন এ জাতীয় লোকদের উপর হওয়া উচিত এবং এর আগে বহু জাতির উপরও হয়েছে। 'ঐ আযাবের দিনটি কবে আসবে' বলে ঠাট্টা করার দরকার হবে না এবং 'এখনও আযাব আসছে না কেন' বলে তাড়াহুড়া করা লাগবে না। সময়মতোই আসবে। যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যে দিনটির ভয় দেখানো হয়েছে, তা যখন আসবে তখন তাদের ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦٠ رُكُوْعَاتُهَا ٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١

১. কসম ঐসব বাতাসের, যা ধুলাবালি ওড়ায়।

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢

২. তারপর পানিভরা মেঘ বয়ে নিয়ে যায়।

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣

৩. তারপর সহজ গতিতে বহমান হয়।

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۝٤

৪. তারপর বড় এক কাজ (বৃষ্টি) বণ্টন করে।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝٥

৫. তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে তা অবশ্যই সত্য।

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٦

৬. এবং আমলের বদলা অবশ্যই (দেওয়া) হবে।[১]

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧

৭. কসম বিভিন্ন রূপ ধারণকারী আসমানের।

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨

৮. (আখিরাত সম্পর্কে) তোমাদের একের কথা অন্য থেকে ভিন্ন।[২]

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝٩

৯. যারা সত্য থেকে বিমুখ তারাই এর বিরোধী হয়।

---

১. এ কথার জন্যই শপথ করা হয়েছে। শপথের মর্ম হচ্ছে– যে অতুলনীয় শৃঙ্খলা ও নিয়ম পালনের মাধ্যমে সৃষ্টির এই বিরাট মহান ব্যবস্থা তোমাদের চোখের সামনে চলছে এবং যে জ্ঞান-কৌশল ও বিচক্ষণতা এর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে কার্যকর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা এ সত্যেরই সাক্ষ্য দান করে যে, এ জগৎ কোনো উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, খেলাঘর নয়। লাখ লাখ ও কোটি কোটি বছর ধরে এক মস্তবড় খেলা এমনিই আপনা-আপনি উদ্দেশ্যহীনভাবে চলে আসছে মনে করা নিতান্তই বোকামি। আসলে এটা এক পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কৌশলময় ব্যবস্থাপনা। এটা অসম্ভব কথা যে, মানুষকে পৃথিবীর বুকে এত ক্ষমতা দিয়ে শুধু এমনিই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনো তার কাছ থেকে এ হিসাব গ্রহণ করা হবে না যে, এসব ক্ষমতা ও অধিকার সে কীভাবে ব্যবহার করেছে।

২. অর্থাৎ আকাশে মেঘমালা এবং তারকাগুচ্ছের আকার যেমন বিভিন্ন রকম দেখা যায়, তেমনি পরকাল সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন প্রকার কথা বলে চলেছ এবং প্রত্যেকের কথা অন্যের কথা থেকে ভিন্ন। তোমাদের কথার এই বিভিন্নতা এটাই প্রমাণ করে যে, ওহী ও রিসালাতকে বাদ দিয়ে মানুষ যখনই নিজের ও এই দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে কোনো রায় কায়েম করেছে, তখন তারা জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই তা করেছে। তা না হলে মানুষের কাছে এ বিষয়ে সত্যিই যদি সরাসরি জ্ঞানের কোনো উপায় থাকত তবে পরস্পরবিরোধী এত মত-বিশ্বাসের সৃষ্টি হতো না।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. যারা অনুমানের ভিত্তিতে ফায়সালা করে তারা ধ্বংস হয়েছে।

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾

১১. যারা অজ্ঞতায় ডুবে অমনোযোগী হয়ে আছে।[৩]

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾

১২. এরা (ঠাট্টা করে) জিজ্ঞাসা করে 'ঐ বিচার দিবসটি (শেষ পর্যন্ত) কবে আসবে?'

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তা ঐ দিন আসবে, যখন তাদেরকে আগুনে ফেলা হবে।

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. (তাদেরকে বলা হবে) এখন তোমাদের নিজের ফিতনার শাস্তি ভোগ কর। এটা তো ঐ জিনিসই, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করেছিলে।[৪]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾

১৫. অবশ্য মুত্তাকী লোকেরা ঐ দিন বাগান ও ঝরনাসমূহের মধ্যে থাকবে।

اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তা তারা খুশি হয়ে নিতে থাকবে। তারা ঐ দিনটি আসার আগে (দুনিয়ায়) নেককার ছিল।

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. তারা রাতের বেলায় কমই ঘুমাত।

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর তারাই শেষ রাতে মাফ চাইত।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

১৯. এবং তাদের মালের মধ্যে ভিখারী ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল।[৫]

৩. অর্থাৎ নিজেদের এ ভুল অনুমানের কারণে তারা কোন্ পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান-ই নেই। আসলে আখিরাত সম্পর্কে ভুল রায় কায়েম করে যে পথই অবলম্বন করা হয় তা ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়।

৪. 'ঐ প্রতিফল দিবস কবে আসবে?'– কাফিরদের এ প্রশ্নের আসল কথা ছিল, 'সেদিন আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? যখন আমরা তা অস্বীকার করছি এবং তা অস্বীকার করার শাস্তি যখন আমাদের উপর আসবেই তখন সে শাস্তি শিগ্‌গিরই এসে যাচ্ছে না কেন?'

৫. অন্য কথায়, একদিকে তারা নিজেদের প্রভুর হক জানত ও তা পালন করত এবং অন্যদিকে বান্দাহদের সাথে তাদের ব্যবহার ছিল এরূপ যে, যা কিছু আল্লাহ তাআলা তাদের দিয়েছিলেন তা কম বা বেশি হোক তার মধ্যে তারা কেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হক আছে বুঝত না; বরং তাদের এ অনুভূতিও ছিল যে, আমাদের এই সম্পদের মধ্যে আল্লাহর যেমন হক আছে তেমনি আল্লাহর বান্দাহদেরও হক আছে।

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. মযবুত ঈমানদারদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর তোমাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে); তোমরা কি বুঝতে পার না?

وَفِي السَّمَاۗءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তোমাদের রিয্‌ক এবং ঐ জিনিস, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে[৬] তা আসমানেই আছে।

فَوَرَبِّ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতএব আসমান ও জমিনের মালিকের কসম, তোমাদের কথা বলার মতোই এটা পরম সত্য।

রুকূ' ২

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. (হে রাসূল!) ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি আপনার কাছে পৌঁছেছে?

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۭ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তারা যখন তাঁর কাছে আসলেন তখন বললেন, 'আপনাকে সালাম জানাই।' তিনি জবাব দিলেন, 'আপনাদের প্রতিও সালাম।' এ লোকেরা অপরিচিত মনে হচ্ছে।[৭]

৬. এখানে আসমান অর্থ ঊর্ধ্বজগৎ। রিযক (জীবিকা) অর্থ ঐ সবকিছু, যা পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ ও কাজ করার জন্য দেওয়া হয়। 'যে জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে' কথাটির অর্থ হলো কিয়ামত ও পুনরুত্থান, হিসাব ও কৃতকর্মের বিচার ও কৈফিয়ত তলব, শাস্তি ও পুরস্কার, বেহেশত ও দোযখ। সব আসমানী কিতাবে এসব হবে বলে ওয়াদা করা হয়েছে এবং কুরআনেও সে ওয়াদাই করা হচ্ছে।

আল্লাহর এ কথার অর্থ হচ্ছে– তোমাদের কাকে দুনিয়ায় কী দেওয়া হবে, উপর থেকেই এর ফায়সালা হয়ে থাকে এবং তোমাদের বিচারের ও কর্মফল দানের জন্য কবে তোমাদেরকে ডাক দেওয়া হবে তার সিদ্ধান্তও সেখান থেকেই হবে।

৭. এ কথাটির দু রকম অর্থ হতে পারে। প্রথমত, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজে মেহমানদের বলেছিলেন, 'আপনাদের সঙ্গে এর আগে কখনো পরিচয়ের সুযোগ হয়নি, আপনারা বোধ করি এ এলাকায় নতুন তাশরীফ এনেছেন।' দ্বিতীয়ত, তাদের সালামের উত্তর দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) মনে মনে বলেছেন অথবা মেহমানদের খাবার ব্যবস্থা করতে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে নিজের খাদেমদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'এরা অচেনা লোক, আগে কখনো এ এলাকায় এ ধরনের শরীফ চেহারা ও চালচলনের লোক দেখা যায়নি।'

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

২৬-২৭. তারপর তিনি চুপ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং একটা (ভাজা) মোটাতাজা বাছুর এনে তাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, 'আপনারা যে খাচ্ছেন না?'

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

২৮. তখন তিনি তাদের ব্যাপারে মনে মনে ভয় পেলেন। তারা বললেন, 'আপনি ভয় পাবেন না।' তারা তাঁকে একটি জ্ঞানী-গুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলেন।[৮]

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

২৯. এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী চিৎকার দিতে দিতে সামনে এলেন এবং নিজের গাল চাপড়িয়ে বললেন, 'এই বুড়ি ও বন্ধ্যার (ছেলে হবে)?'[৯]

قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা বললেন, তোমার রব তা-ই বলেছেন। তিনি সুকৌশলী এবং মহাজ্ঞানী।

পারা ২৭

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

৩১. ইবরাহীম বললেন, হে ফেরেশতাগণ! আপনারা কোন্ অভিযানে এসেছেন?

قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা বললেন, আমাদেরকে এক অপরাধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।[১০]

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. যেন তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি।

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. যা আপনার রবের নিকট সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে।[১১]

---

৮. সূরা হূদে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, এটা হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ।

৯. অর্থাৎ একে তো আমি বৃদ্ধা, তার উপর বন্ধ্যা। এখন আমার সন্তান কী করে হবে? বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী ঐ সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ এবং হযরত সারার বয়স নব্বই বছর ছিল।

১০. অর্থাৎ লূত (আ)-এর জাতি। তাদের অপরাধ এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, শুধু 'অপরাধী জাতি' শব্দটি বলা দ্বারাই কোন্ জাতির কথা বলা হচ্ছে তা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১১. অর্থাৎ প্রতিটি পাথরকে আপনার রবের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, কোন্‌টি কোন্ অপরাধীর মাথা ভেঙে দেবে।

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তারপর ঐ বস্তির মধ্যে যারা মুমিন ছিল তাদেরকে আমি বের করে আনলাম।[১২]

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আমি সেখানে একটি বাড়ি ছাড়া মুসলমানদের কোনো বাড়ি পাইনি।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এরপর আমি সেখানে শুধু একটা নিদর্শন ঐসব লোকদের জন্য রেখে দিলাম, যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে।[১৩]

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) মূসার কাহিনীর মধ্যে, যখন আমি তাকে স্পষ্ট সনদসহ ফিরাউনের নিকট পাঠালাম।[১৪]

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. তখন সে নিজের ক্ষমতায় মত্ত হয়ে গোঁ ধরে থাকল এবং বলল, 'এ লোকটি হয় জাদুকর, আর না হয় পাগল।'

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশেষে আমি তাকে এবং তার দলবলকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে ফেলে দিলাম। আর সে নিন্দনীয় হয়েই রইল।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

৪১-৪২. আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) 'আদ জাতির মধ্যে— যখন তাদের উপর এমন ক্ষতিকর বাতাস পাঠালাম, যা যে জিনিসের উপর দিয়েই বয়ে গেল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে গেল।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. আরো (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) ছামূদ জাতির মধ্যে— যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজা করে নাও।

---

১২. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছ থেকে ফেরেশতাগণ কীভাবে হযরত লূত (আ)-এর কাছে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে লূত (আ)-এর কাওম ও তাদের মধ্যে কী সব ব্যাপার ঘটেছিল, সে কাহিনী মাঝে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৩. 'একটি নিদর্শন' অর্থ মৃত সাগর (Dead sea)। আজও যার দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ বর্তমান আছে।

১৪. অর্থাৎ এরূপ স্পষ্ট মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছিলাম, যার দ্বারা এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না যে, তিনি আসমান-জমিনের স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন।

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. কিন্তু (এভাবে সাবধান করা সত্ত্বেও) তারা তাদের রবের হুকুম অমান্য করল। অবশেষে তাদের দেখতে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ভেঙে পড়ার মতো এক আযাব তাদের উপর এসে পড়ল।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এরপর তারা উঠে দাঁড়াতেও পারেনি, আত্মরক্ষাও করতে পারেনি।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর এসবের আগে আমি নূহের কাওমকে (ধ্বংস করেছি), কেননা তারা ফাসিক ছিল।

রুকূ' ৩

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আসমানকে আমি আমার নিজের ক্ষমতাবলে বানিয়েছি এবং আমি অবশ্যই এর ক্ষমতা রাখি।[১৫]

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর জমিনকে আমিই বিছিয়ে দিয়েছি। আর আমি সমান করে বিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কতই না ভালো!

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর আমি প্রতিটি জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি,[১৬] হয়তো তোমরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[১৭]

---

১৫. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, ওয়া ইন্না লামূসিউন'। মুসি'-এর অর্থ শক্তিমান ও ক্ষমতাশালীও হতে পারে এবং প্রসারকারীও হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুসারে এর মানে হচ্ছে– এ আসমান আমি অন্য কারো সাহায্যে নয় বরং নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেছি। আর এটা সৃষ্টি করা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। সুতরাং তোমাদের মগজে এ ধারণা কেমন করে হলো যে, আমি আবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারব না?

দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এর মর্ম হচ্ছে– এ পৃথিবীকে আমি একবার সৃষ্টি করে চুপ করে বসে নেই; বরং হামেশাই এর মধ্যে প্রসারতা সৃষ্টি করে চলেছি এবং প্রতি মুহূর্তেই এর মধ্যে আমার সৃষ্টির নব নব মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। এরূপ জবরদস্ত পরম স্রষ্টা সত্তাকে তোমরা আবার সৃষ্টি করতে অক্ষম মনে করছ কেন?

১৬. অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা দুনিয়ায় এ নিয়মই চলছে যে, কতক জিনিসের সঙ্গে কতক জিনিসের জোড়া লাগে। এ সংযুক্তির ফলে নানা প্রকার বিন্যাস ও গঠনের কারণ ঘটে। এখানে কোনো একক বস্তু নেই, যার জোড়ায় অন্য কোনো বস্তু নেই; বরং প্রত্যেকটি বস্তুই নিজের জোড়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে ফলপ্রসূ ও সার্থক হয়ে থাকে।

১৭. অর্থাৎ এ শিক্ষা যে– দুনিয়ার জোড় হচ্ছে আখিরাত, এছাড়া এ পার্থিব জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫০. সুতরাং আল্লাহর দিকে দৌড়াও। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট সাবধানকারী।

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

৫১. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ বানাবে না, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।[১৮]

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৫২. এ রকমই হয়ে এসেছে। এদের আগের জাতিসমূহের মধ্যেও যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তাকে তারা বলেছে, 'এ লোকটি হয় জাদুকর আর না হয় পাগল।'

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তাহলে তারা সবাই কি আপসে সমঝোতা করে নিয়েছে? না, বরং এরা সবাই বিদ্রোহী।[১৯]

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনার কোনো দোষ হবে না।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. অবশ্য নসীহত করতে থাকুন। কেননা, নসীহত ঈমানদারদের জন্য উপকারী।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা[২০] ছাড়া অন্য কারো গোলামির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।

১৮. এ কথাগুলো যদিও আল্লাহ তাআলার বাণী, তবুও এখানে বক্তা আল্লাহ তাআলা নিজে নন; বরং নবী করীম (স)। প্রকৃতপক্ষে যেন আল্লাহ তাআলা নবীর যবানে বলাচ্ছেন, 'আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছি।'

১৯. অর্থাৎ নবীগণের দাওয়াতের মুকাবিলায় হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের একই রূপ ব্যবহার করার কারণ এ হতে পারে না যে, এগুলো পূর্বের ও পরের সবাই একটি পরামর্শসভায় মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে স্থির করে নিয়েছিল যে, যখনই কোনো নবী এসে এ দাওয়াত পেশ করবে তখন তাকে একই উত্তর দেওয়া হবে। প্রকৃত কথা, এদের এক রূপ ব্যবহারের কারণ এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তাদের সকলের মধ্যে বিদ্রোহ, নাফরমানি ও অবাধ্যতার একই দোষ বর্তমান রয়েছে।

২০. আমি তাদেরকে অন্যের বন্দেগীর জন্য নয় বরং নিজের বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের স্রষ্টা, আর এ কারণেই আমার বন্দেগী করা তাদের কর্তব্য। অন্য কেউ যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেনি, তখন অন্যের বন্দেগী করার কি হক তাদের আছে? এবং তাদের পক্ষে কেমন করে এটা বৈধ হতে পারে যে, আমি তাদের স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্যদের বন্দেগী করতে থাকবে?

مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝٥٧

৫৭. আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রিয্ক চাই না এবং এ-ও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۝٥٨

৫৮. আল্লাহ্ নিজেই তো রিয্কদাতা, বিরাট ক্ষমতার অধিকারী।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۝٥٩

৫৯. অতএব যারা যুলুম করেছে[২১] তাদের জন্য তেমনি আযাব রয়েছে, যেমন তাদের মতো লোকেরা আযাব ভোগ করেছে। সুতরাং এরা যেন এর জন্য আমাকে তাড়া না দেয়।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۝٦٠

৬০. অবশেষে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য ঐ দিন ধ্বংস রয়েছে, যেদিনের ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে।

২১. এখানে যুল্ম অর্থ– প্রকৃত তত্ত্ব ও সত্যের প্রতি যুল্ম করা এবং নিজের ফিতরাত ও প্রকৃতির উপর যুল্ম করা।

৫২. সূরা তূর

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরা যারিয়াতের পরপরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরে যখন বিরোধিতা জোরেশোরে চলছিল বটে, কিন্তু অত্যাচার তখনও শুরু হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

প্রথম রুকূ'র আলোচ্য বিষয় আখিরাত। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে রাসূল (স)-এর বিরোধীদের অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৮ নং আয়াত : প্রথম ৬টি আয়াতে কতক জিনিসের নাম নিয়ে কসম করে ৭ ও ৮ নং আয়াতে আখিরাত যে হবেই হবে, সে কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আখিরাতকে এখানে আল্লাহর আযাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কথাগুলো কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। আর তাদের জন্য আখিরাত মানে তো আযাবই বটে।

আখিরাত যে হবেই হবে এবং এর হওয়াকে যে কেউ ঠেকাতে পারবে না, সে কথার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি জিনিসের কসম করেছেন।

প্রথমেই তূর পাহাড়ের কসম করে আল্লাহ তাআলা বলতে চেয়েছেন, আমি তূর পাহাড়ে মূসা (আ)-কে হুকুম করেছিলাম যে, ফিরাউন বিদ্রোহী হয়ে গেছে, তাকে হেদায়াত করার জন্য যাও। ফিরাউন উল্টো মূসা (আ)-কে কতল করতে চেষ্টা করায় আমি তাকে সেনাবাহিনীসহ ডুবিয়ে দিয়েছি। আখিরাতেই তার আসল বিচার হবে।

এরপর যুগে যুগে রাসূলগণের নিকট আল্লাহ যেসব কিতাব পাঠিয়েছেন সেসবেরই কসম করেছেন। হরিণ বা অন্যান্য জীবের চামড়া পাতলা করে পাকা করা অবস্থায় সে কিতাব লিখে রাখা হতো, যাতে সহজে নষ্ট না হয়। এসব কিতাবেই আখিরাতের কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তারপর তিনি বাইতুল মামূরের কসম করেছেন। মামূর মানে আবাদ ঘর, যা কখনো খালি থাকে না। এর দ্বারা জমিনের কাবাঘর ও আসমানে ফিরিশতাদের জন্য কিবলা হিসেবে যে বাইতুল মামূর রয়েছে তা-ই বোঝানো হয়েছে।

সবসময়ই কাবাঘরের তাওয়াফ করা হচ্ছে এবং তাকে কিবলা হিসেবে ব্যবহার করে নামায আদায় করা হচ্ছে বলে এ ঘর চিরআবাদ।

এ ঘর যে সত্যিই আল্লাহর ঘর তার বহু প্রমাণ রয়েছে। বাদশা আবরাহা হাতির বাহিনী নিয়ে এ ঘরকে ধ্বংস করতে এসে সদলবলে ধ্বংস হওয়ায় এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সূরা নাযিলের মাত্র ৪৫

বছর আগেই এ ঘটনা ঘটেছে। যারা নিজ চোখে তা দেখেছে তাদের অনেকেই তখনো মক্কায় বেঁচে ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কাবাঘরের মালিক যখন আখিরাত হবে বলছেন তা অবশ্যই সত্য।

সবশেষে আসমান ও সাগরের কসম করে আল্লাহ তাআলা এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, মহাশূন্যে যিনি পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণ বড় গ্রহ এবং সূর্যের চেয়েও বড় অগণিত তারকা সৃষ্টি করেছেন, আর পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি হওয়া সত্ত্বেও যিনি সে পানিকে তাঁর আইন মেনে চলতে বাধ্য করেছেন, সে মহা শক্তিমান আল্লাহ এ আসমান ও জমিন ধ্বংস করে আখিরাতে আরেক জগৎ কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না?

৯ ও ১০ নং আয়াত : এ দুআয়াতে আখিরাতের সূচনায় যে কিয়ামত হবে তার সামান্য নমুনা পেশ করে বলা হয়েছে, বর্তমান সুগঠিত আসমান তখন ভেঙে পড়বে এবং মযবুত পাহাড় তুলার মতো উড়তে থাকবে।

১১-১৬ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা পরকালে কেমন আচরণ করবেন তার একটি ভয়ানক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা দুনিয়ায় আখিরাতের কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাদেরকে হাঁকিয়ে দোযখের কিনারায় গিয়ে বলা হবে, 'এ আগুন সত্যি কি না, এখন বুঝে দেখ। তোমরা দুনিয়ায় দোযখের কথাকে মিথ্যা মনে করতে এবং জাদু বলে উড়িয়ে দিতে। যাও এ আগুনে জ্বলতে থাক। সহ্য করতে পারা না পারা এখন সমান। এ শাস্তি তোমাদের আমলেরই বদলা।

১৭-২০ নং আয়াত : উপরে কাফিরদের দুরবস্থার বিবরণ দেওয়ার পর এ কয়েকটি আয়াতে আখিরাতে মুত্তাকীদের সুখকর অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহ মাফ করে দিয়ে দোযখ থেকে বাঁচাবেন এবং তারা বেহেশতের বাগানে হাজারো নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। তারা সাজানো আসনে হেলান দিয়ে আরাম করবে এবং তাদেরকে সুন্দরী হুরদের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ সফলতাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলবেন, তোমরা দুনিয়ায় যে নেক আমল করেছিলে তারই বদলা তোমাদেরকে দেওয়া হলো।

২১ নং আয়াত : এ আয়াতটিতে নেককারদের জন্য এক মহা সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা ঈমান ও নেক আমলের কারণে বেহেশতের ভাগী হবে তাদের সন্তান যদি কম আমলের দরুন সমমানের বেহেশতের যোগ্য না হয় তাহলে তাদেরকে তাদের পিতামাতা যে মানের বেহেশতে আছে সেখানে তাদের সাথে মিলিত করা হবে। পিতা-মাতা ও সন্তানদেরকে একসাথে মিলানোর জন্য উপরের মানের লোকদেরকে নিচে নামিয়ে আনা হবে না।

এ আয়াতে এমন একটি আবেগময় বিষয়ে ঈমানদারদেরকে সুখবর দেওয়া হয়েছে, যা তাদের কলিজা ঠাণ্ডা করার মতো তৃপ্তিদায়ক। এখানে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে–

১. দুনিয়ায় পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে যে স্নেহ-মমতার আবেগপূর্ণ সম্পর্ক থাকে তা ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের মধ্যে মরণের পরও জারি থাকে। পিতামাতা ও সন্তানরা যদি ঈমানদার ও নেক হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা মারা যায় তাদের জন্য যারা জীবিত তারা দোআ করে। বেঈমান ও বদকার লোকেরা তা করে না। হাশরের ময়দানে ঈমানদার লোকেরা ডান হাতে আমলনামা পেয়ে তাদের পরিবারের ঈমানদারদেরকে খুশি হয়ে তা দেখাবে। (সূরা ইনশিকাক : ৯) আর বদ লোকেরা তাদের সন্তান-স্ত্রী-বাপ-মা-ভাই-বোনদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে (সূরা আবাসা : ৩৩-৩৪)। এতে বোঝা গেল, যারা নেক তাদের স্নেহ-মমতার সম্পর্ক মৃত্যুর কারণে শেষ হয়ে যায় না।

২. সূরা রা'দ-এর ২৩ নং আয়াত থেকে বোঝা যায়, ঈমানদার ও নেককার পিতামাতা ও সন্তানরা একই সাথে বেহেশতে যাবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, আমলের কম-বেশির কারণে পিতামাতা ও সন্তানরা একই মানের বেহেশতের যোগ্য না হলেও তাদেরকে একই সাথে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। তবে যারা উপরের মানের বেহেশতে থাকবে তাদেরকে নিচে নামিয়ে এনে একত্র করা হবে না; বরং যারা নিচের মানে থাকবে তাদেরকে উপরে তোলা হবে।

৩. নেক পিতামাতা ও সন্তানদের সম্পর্কটা এমন যে, বেহেশতেও একে অপর থেকে দূরে থাকা পছন্দ করবে না। আল্লাহ তাআলা যেহেতু বেহেশতীদেরকে কোনো অভাব বোধ করতে দেবেন না, সেহেতু তাদের দূরত্ব দূর করে নিকটে নিয়ে আসবেন।

৪. এর দ্বারা এ কথারও প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার মমতা এত গভীর যে– বেহেশতেও সন্তানদেরকে কাছে না পেলে তাঁরা মনে বেদনাবোধ করবেন। তাই এ বেদনা দূর করারও ব্যবস্থা হবে।

৫. এ আয়াতের যুক্তি এ কথারও দাবি করে যে, সন্তান যদি উপরের মানের বেহেশতের যোগ্য হয় তাহলে পিতামাতা নিচের মানে থাকলে তাদেরকে প্রমোশন দিয়ে উপরে নিয়ে সন্তানদের সাথে মিলনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. প্রায়ই দেখা যায়, পিতামাতা জীবিত থাকাকালে কোনো কোনো সন্তান তাঁদের খিদমত করার গুরুত্ব বোঝে না। ফলে ঐ সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায়ই পিতামাতা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। বাপ-মা চলে যাওয়ার পর যখন সন্তানদের চেতনা হয় তখন তাদের আবেগ জেগে ওঠে। দুনিয়ায় পিতামাতা তাদের জন্য যা কিছু করে গেছেন তার সুফল ভোগ করার সময় পিতামাতার প্রতি অবহেলার জন্য আফসোস হয়। হাদীসে আছে যে, পিতামাতার জন্য কাতরভাবে গুনাহ মাফের দু'আ করতে থাকলে এ ক্ষতি পূরণ হতে পারে।

কিন্তু এ আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সন্তানরা বেহেশতেও পিতামাতার প্রমোশনের কারণ হতে পারে– যদি তারা ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে পিতামাতার চেয়েও এগিয়ে যেতে পারে।

এ আয়াতের শেষাংশে একটি বিরাট বিষয় মাত্র কয়েকটি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের জান আল্লাহর নিকট বন্ধক আছে। একমাত্র তার নেক আমলই তাকে ছাড়িয়ে আনতে পারে। বন্ধকের উপমাটি ভালো করে বোঝা দরকার। যেমন–

কারো কাছ থেকে টাকা-পয়সা ধার চাইলে ধারদাতা কোনো জিনিস বন্ধক চাইতে পারে– যাতে কথামতো ফেরত না দিলে এর বদলে ঐ বন্ধকি জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যায়। যে ধার নেয় সে তার জিনিস ফেরত পেতে হলে ধারের টাকা শোধ করতে হবে।

তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় যত নিয়ামত, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দান করেছেন সেগুলো ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এর বদলে মানুষের জান আল্লাহর নিকট বন্ধক আছে। একমাত্র আল্লাহর পছন্দনীয় আমল দিয়েই ঐ ধার শোধ করতে হবে। যদি সে তা শোধ করতে না পারে তাহলে তার জান বন্ধক থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। ফলে তাকে আল্লাহর নিকট শাস্তি পেতে হবে।

[এ আয়াতের আলোচনায় তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্যকে সহজ করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছি।– অনুবাদক।]

২২-২৪ নং আয়াত : বেহেশতবাসী সেখানে যে অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করবে তার কয়েকটির কথা এ কয়টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের পছন্দনীয় ফল ও গোশত দেওয়া হবে। এমন শরাব তাদেরকে দেওয়া হবে, যা তারা উৎসাহের সাথে একে অপরের আগে এসে নেবে এবং যা পান করলে দুনিয়ার মদ্যপায়ীদের মতো অবস্থা হবে না। তা ছাড়া তাদের ফুট-ফরমাশ পালন করার জন্য এমন একদল কিশোর হামেশা তাদের আশপাশে থাকবে, যারা লুকিয়ে রাখা মণিমুক্তার মতো সুন্দর। তাদেরকে দেখে জান্নাতীদের চোখ জুড়াবে– যেমন পিতা-মাতা কিশোর সন্তানদের দেখে তৃপ্তিবোধ করে।

২৫-২৮ নং আয়াত : বেহেশতের নিয়ামত ভোগ করার সময় বেহেশতবাসীদের মনে কোন্ ধরনের ভাবের উদয় হবে সে কথাই এ কয়েকটি আয়াতে চমৎকার ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তারা দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের ভয়ে যে সাবধান হয়ে চলেছিল সে কথা মনে করে অপরের নিকট তা বলাবলি করবে। তারা বলবে, বিবি-বাচ্চার সুখ-সুবিধার দোহাই দিয়েই দুনিয়ায় মানুষ দুর্নীতির পথে চলে। আমাদের আল্লাহ তাওফীক দিয়েছিলেন বলে আমরা তা থেকে বেঁচে ছিলাম। আখিরাতের আযাবের ভয়ই আমাদেরকে রক্ষা করেছে। আজ আমরা আল্লাহরই মেহেরবানীতে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা পেলাম। এ মেহেরবানী পাওয়ার জন্যই দুনিয়ায় আমরা দু'আ করতাম।

দ্বিতীয় রুকূ'

রাসূল (স)-এর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও কুরআনের অমিয় বাণীর প্রভাব মক্কার জনগণকে ইসলামী দাওয়াতের দিকে যেভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাতে কাফির নেতারা অস্থির হয়ে রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযান চালাতে লাগল– যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। এ রুকূ'তে বিভিন্নভাবে এরই প্রতিবাদ করা হয়েছে।

তারা রাসূল (স) সম্পর্কে যা বলছে বা যেসব ধারণা পোষণ করছে, সেসব যে একেবারেই অসার এবং যুক্তির বিচারে সম্পূর্ণ অচল, তা এ রুকূ'তে চমৎকার ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিটি কথা উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন এবং নিজেই এর জবাব এমনভাবে দিয়েছেন, যাতে তাদের অপপ্রচার হাস্যকর প্রমাণিত হয় এবং জনগণ তাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে।

২৯-৩১ নং আয়াত : এ তিনটি আয়াতের প্রথম দুটি আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে কাফিরদেরকে শোনানোর জন্যই বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলতে চান, হে কাফির নেতারা! তোমরা মানুষকে রাসূল (স) থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁকে গণক বা পাগল কিংবা কবি বলে যতই প্রচার কর না কেন, তিনি যে এর কোনোটাই নন তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। গণকদের কাজ-কর্ম কেমন, তা জনগণ ভালো করেই জানে। পাগলের প্রলাপ, কবিদের কথার ধরনও কারো অজানা নয়। রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও আচরণ থেকে তাকে গণক বা পাগল কিংবা কবি হিসেবে প্রমাণ করার সাধ্য তোমাদের নেই। কারণ, তার উপর আমি ওহী দ্বারা যে মেহেরবানী করেছি তার ফলে তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবেই।

সুতরাং হে রাসূল! কাফির নেতাদের অপপ্রচারের পরওয়া না করে আপনি মানুষকে বোঝাতে থাকুন।

৩০ নং আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, কাফিররা কি এ আশায় আছে যে একসময় রাসূলের উপর তাদের দেব-দেবীর অভিশাপ পড়বে বা কেউ তাকে মেরে ফেলবে এবং তারা তখন এ 'আপদ' থেকে বেঁচে যাবে?

৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে রাসূল! আপনি ওদেরকে বলে দিন, তোমরা যেমন আমার ধ্বংসের অপেক্ষায় আছ, আমিও তোমাদের পরাজয়ের অপেক্ষা করছি। দেখা যাক, কার আশা পূরণ হয়।' এ কথা দ্বারা রাসূল (স)-এর ইসলামী আন্দোলনের বিজয়েরই আভাস দেওয়া হয়েছে।

৩২-৩৪ নং আয়াত : ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতে অপপ্রচারে লিপ্তদের আকল-বুদ্ধিকে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে, এরা যদি রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো একটি অপবাদ দিত এবং তা প্রমাণ করার উপযুক্ত যুক্তি দেখাত তাহলে অন্তত তা বিবেচনার যোগ্য হতো। একই লোককে একবার গণক, একবার পাগল, আরেকবার কবি বলার মানে কী? এর দ্বারা এ কথাই বোঝা গেল, আসলে রাসূল (স)-এর অন্ধ বিরোধিতাই এদের উদ্দেশ্য। তাই জেদের বশে যখন যে গালি মুখে আসে তা-ই দিচ্ছে।

এরা ঈমান আনতে চায় না বলেই কুরআনকে রাসূলের রচনা বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। নিজের কথাকে আল্লাহর কালাম বলে চালিয়ে দেওয়ার যে অপবাদ এরা দিচ্ছে, এর প্রতিবাদে ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের এ দাবিতে তোমরা সত্যবাদী হলে কুরআনের আয়াতের সমান মানের কথা তোমরা রচনা করে দেখাও। তোমাদের মধ্যে বড় বড় কবি আছে। মুহাম্মদ (স) তো কোনো সময় কবি ছিলেন না। যদি তিনি নিজে এমন উঁচু মানের কথা তৈরি করতে পারেন তাহলে তোমাদের আরও সহজেই পারা উচিত।'

এ চ্যালেঞ্জ কবুল করতে না পারায় জনগণের নিকট তাদের অপপ্রচারের কোনো ওজনই বাকি রইল না। তারা লা-জবাব হয়ে নীরবে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেও তাদের জেদের কারণে তারা ঈমান আনেনি।

[এ আয়াতের তাফসীর লিখতে গিয়ে তাফহীমুল কুরআনে এ সূরার ২৭ নং টীকায় কুরআনকে শ্রেষ্ঠ কিতাব প্রমাণ করার পক্ষে এমন বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা কর্তব্য।– অনুবাদক]

৩৫-৪৩ নং আয়াত : এ আয়াতক'টির প্রত্যেকটিতে একেকটি প্রশ্নের মাধ্যমে কাফির নেতাদের মিথ্যা প্রচারের অসারতা প্রমাণ করে জনগণের নিকট তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

৩৫ ও ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কী কারণে রাসূলের বিরোধিতা করছ? তিনি তো এ কথাই বলছেন যে, তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দাসত্ব কর। তোমরা তো এ দাবি করতে পারছ না যে, স্রষ্টা ছাড়াই তোমরা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছ অথবা তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা অথবা আসমান-জমিন তোমরাই সৃষ্টি করেছ। তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করার পর কোন্ যুক্তিতে তোমরা রাসূলের দাওয়াতকে অস্বীকার করছ?

৩৭ নং আয়াতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ'(স)-কে রাসূল বানানোর কারণে আপত্তি করার কী অধিকার তাদের আছে? মানুষের হেদায়াতের জন্য কাকে রাসূল বানানো হবে, এর ফায়সালা কি তারা করবে? তাহলে কি তারা দাবি করতে চায় যে, সব কিছুর ক্ষমতা তাদের হাতে?

৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতে আরো প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তারা রাসূল মারফতে পাঠানো ওহীর ইল্‌মকে কোন্ যুক্তিতে মানতে চায় না? তারা কি আসমান থেকে এমন কোনো ইল্‌ম হাসিল করেছে, যা যুক্তি হিসেবে পেশ করতে পারে? থাকলে প্রমাণ করুক।

হে কাফিররা! যদি তা প্রমাণ করতে না পার তাহলে তোমরাই বল, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করার পক্ষে কী যুক্তি আছে? তোমরা কন্যা জন্ম নেওয়া তো মোটেই পছন্দ কর না। তাহলে আল্লাহর জন্য তা পছন্দ করার কারণ কী?

৪০ নং আয়াতেও কাফিরদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, তারা কি মনে করে যে, রাসূল তাদের কাছে নিজের কোনো স্বার্থ চান? এরা যেভাবে তাঁর পেছনে লেগেছে, তাতে মনে হয় যেন রাসূলের কথা মেনে নিলে শুধু তাঁরই উপকার হবে আর তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। দুনিয়াদার ধর্মব্যবসায়ীরা তো হাদিয়া-তোহফা নিয়ে মানুষকে গুমরাহই করে। আর রাসূল (স) বিনা স্বার্থেই হেদায়াতের জন্য জান কুরবান করছেন। অথচ তারা তাঁকে মানছে না।

৪১ নং আয়াতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, রাসূল (স)-যেসব সত্য তাদের কাছে পেশ করছেন তা সত্য নয় বলে প্রমাণ করার জন্য তাদের কাছে কি কোনো গায়েবী ইল্‌ম আছে? কোন্ যুক্তিতে তারা এক আল্লাহর বদলে এত মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা বলে তারা কেমন করে জানল? তারা কি জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পারবে যে, আখিরাত নেই? তাদের সব দাবিই আসলে ভিত্তিহীন।

৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কাফিররা রাসূলের বিরুদ্ধে যত রকম ফন্দিই আঁটতে থাকুক, তা উল্টো তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। কুরআন মাজীদে যতগুলো স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আছে, এর মধ্যে এ আয়াতে একটি রয়েছে। রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনের প্রথমদিকে যখন অল্প কিছু লোক তাঁর সাথী হন এবং গোটা কাওম বিরোধী ছিল, তখন এ ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল (স)-এর জন্য বড়ই সান্ত্বনার বিষয় ছিল।

৪৩ নং আয়াতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এরা আল্লাহ ছাড়া কি অন্য সত্তাকে মা'বুদ মনে করে? তাদের জানা উচিত, তারা যে সত্তার দিক দিয়ে বা গুণাবলির দিক দিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে তা একেবারেই ডাহা মিথ্যা। আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় যাবতীয় শিরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

৪৪ নং আয়াত : এ আয়াতে একদিকে কুরাইশ নেতাদের হটকারী মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। ৩২ থেকে ৪৩ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে কাফির নেতাদের যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দেওয়ার পর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এসব লোক কোনো অবস্থায়ই ঈমান আনতে রাজি নয়। এমনকি যদি মুজিযা হিসেবে আসমানের কোনো টুকরা মাটিতে ফেলা হয় তাহলে তারা এরও কোনো উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে মানতে অস্বীকার করবে।

নেতারা হেদায়াত হলে জনগণ সহজেই এ পথে আসবে– এ ধারণার ফলে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম কোনো মুজিযা কামনা করতেন। আয়াতে বলা হয়েছে, তারা কোনো অবস্থায়ই হেদায়াত কবুল করার যোগ্য নয়।

৪৫-৪৬ নং আয়াত : এ দুটো আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে রাসূল! আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। বিরোধীদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দিন। তাদের জন্য চিন্তা করে লাভ নেই। আখিরাতে তাদেরকে আযাব দেওয়ার আগে ওদের হুঁশ হবে না। তখন ওদের কোনো চালবাজিই কোনো কাজে আসবে না এবং কেউ তাদেরকে সাহায্যও করবে না।

৪৭ নং আয়াত : এ আয়াতে একটি বিরাট বিষয় অল্প কথায় পেশ করা হয়েছে। দুনিয়ায় যেসব বালা-মুসীবত নাযিল হয়, তার উদ্দেশ্য এ আয়াতে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা সাজদার ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'ঐ বড় আযাবের আগে আমি এ দুনিয়ায়ই কোনো কোনো ছোট আযাবের মজা তাদেরকে অবশ্যই দেখাতে থাকব, হয়ত তারা বিদ্রোহীভাব থেকে ফিরে আসবে।'

দুনিয়ায় ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যেসব আপদ-বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তা এই চেতনা দান করার উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ক্ষমতার উপরও যে আরো এক বিরাট শক্তি রয়েছে।

কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না। তারা বুঝতে চায় না যে, আল্লাহর শক্তিকে স্বীকার করা কতর্ব্য। তারা ঐ সব আপদ-বিপদের নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয় এবং আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে এ বিপদ দিয়েছেন তা বোঝার চেষ্টা করে না। হাদীসে তাদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মনিব একসময় গাধাকে বেঁধে রাখে, আরেক সময় ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে বোঝে না যে, কেন তাকে বাঁধা হলো, আর কেনইবা ছেড়ে দেওয়া হলো।

৪৮ ও ৪৯ আয়াত : ৪৮ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে দুটো পরম সান্ত্বনাবাণী শোনানো হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, হে রাসূল! আপনার রবের উপর নির্ভর করে ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। তিনি সঠিক সময়ে আপনার সফলতার ফায়সালা করবেন; কিন্তু এর জন্য একটা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহ বিজয়ের জন্য যেসব শর্ত রেখেছেন তা পূরণ করার জন্য ধৈর্যের সাথে মেহনত করতে থাকুন। দ্বিতীয় কথাটি আরো বড় সান্ত্বনার বিষয়। আল্লাহ বলেছেন, হে রাসূল! আপনাকে ইকামাতে দীনের আন্দোলনের কঠিন ময়দানে ফেলে দিয়ে আমি দূরে সরে যাইনি। আমি হামেশা আপনার দিকে খেয়াল রাখছি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি।

আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে সবরের সাথে ইসলামী আন্দোলনের সকল স্তরে সফলতার সাথে পার হতে হলে যে মনোবল দরকার, তা আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই বিভিন্ন সময় তাসবীহ সহকারে নামায আদায় করার জন্য দুটো আয়াতেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য ৪৮ নং আয়াতের শেষাংশে 'যখন আপনি উঠেন বা দাঁড়ান' কথাটির কয়েক রকম অর্থ তাফসীরকারগণ করেছেন, যা পালন করার যোগ্য–

১. মজলিস থেকে ওঠার সময় 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা, আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা' পড়লে আলোচনার মজলিসে কোনো গুনাহ হয়ে থাকলে মাফ হয়ে যাবে বলে রাসূল (স) বলেছেন।

২. রাসূল (স) শিক্ষা দিয়েছেন, ঘুম থেকে উঠে পড়া উচিত– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

৩. যখন নামাযের জন্য দাঁড়ান তখন তাকবীরে তাহরীমার পর পড়া উচিত, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক।'

৪. যখন জনগণের নিকট দাওয়াত পেশ করার জন্য দাঁড়ান, তখন হামদ ও তাসবীহ দ্বারা শুরু করুন। তাই রাসূল (স) হামেশা হামদ ও তাসবীহ দ্বারা বক্তৃতা বা খুতবা শুরু করতেন।

সূরা তূর

৪৯ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤٩ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالطُّوْرِ ۝١

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨

يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٢

১. কসম তূর (পাহাড়ের)।

২-৩. আর কসম এমন এক খোলা কিতাবের, যা পাতলা চামড়ায় লেখা আছে।

৪. কসম বাইতুল মামূরের (চির আবাদ ঘরের)।

৫. কসম উঁচু ছাদের (আসমানের)।

৬. কসম ঢেউভরা সাগরের।

৭. তোমার রবের আযাব হবেই হবে;

৮. যাকে ঠেকাতে পারে এমন কেউ নেই।[১]

৯. এটা ঐদিন ঘটবে, যেদিন আসমান থরথর করে কাঁপবে,

১০. আর পাহাড়গুলো উড়ে বেড়াবে।

১১-১২. সেদিন ঐ মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস, যারা আজ খেলার ছলে তর্ক করে চলেছে।

১. এখানে 'রবের আযাব'-এর অর্থ হচ্ছে পরকাল। কেননা, অমান্যকারীদের পক্ষে আখিরাত হওয়াটাই আযাব। আখিরাত আসার ব্যাপারে পাঁচটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। কেননা, এ জিনিসগুলো পরকাল হওয়া সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ দান করে। যেমন–

ক. তূর পাহাড়– এখানে এক মযলুম জাতি তথা বনী ইসরাঈলের উত্থান ও এক যালিম জাতি তথা ফিরাউনের পতনের ফায়সালা করা হয়েছিল। এ ফায়সালা আল্লাহর রাজ্য যে খামখেয়ালি কোনো সত্তার রাজ্য নয়, সে সত্যেরই বাস্তব প্রমাণ।

খ. অতীতকালে পাতলা চামড়ায় লিখিত পবিত্র আসমানী কিতাবগুলো এ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পয়গাম্বরগণ আখিরাত হবে বলে বলেছেন।

গ. 'আবাদ ঘর' তথা কাবা ঘর– মরুভূমির বুকে এটা তৈরি হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা এটাকে এমন আবাদি দান করেছেন, যা দুনিয়ায় অন্য কোনো ঘরকে দান করা হয়নি। এ ব্যাপারটি এ সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহর পয়গাম্বরগণ ভিত্তিহীন কথা বলেন না। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন জনশূন্য পাহাড়সমূহের মধ্যে এ ঘর তৈরি করে হজ্জের জন্য ডাক দিয়েছিলেন তখন কেউ ধারণাও করতে পারত না যে, হাজার হাজার বছর ধরে জগদ্বাসী এর দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে।

ঘ. উচ্চ ছাদ তথা আসমান।

ঙ. 'উদ্বেলিত সমুদ্র'– আল্লাহর শক্তি-মহিমারই এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। এটা এ কথারই সাক্ষ্য দান করে যে, তার স্রষ্টা আখিরাত কায়েম করতে অক্ষম হতে পারে না।

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾

১৩. যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে যে) এটা ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে।

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

১৫. (এখন বল) এটা কি জাদু, নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. এখন যাও, এর মধ্যে ঝলসাতে থাক। তোমরা সহ্য করতে পার আর না পার, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান। তোমরা যেমন আমল করেছিলে তেমন বদলাই তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৭. মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগ-বাগিচা ও নিয়ামতের মধ্যে থাকবে।

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৮. তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তা থেকে তারা মজা নিতে থাকবে। আর তাদের রব তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাবেন।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যাকিছু করেছিলে তার বদলা হিসেবে তোমরা তৃপ্তিসহকারে খাও ও পান কর।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২০. তারা সারিবদ্ধ সুসজ্জিত আসনগুলোতে হেলান দিয়ে বসবে। আর আমি তাদেরকে সুন্দর চোখওয়ালা হূরদের সাথে বিয়ে দেব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

২১. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানেরাও ঈমানের দিক দিয়ে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সন্তানদেরকেও আমি (বেহেশতে) তাদের সাথে মিলিত করব। আর তাদের আমলের মধ্যে আমি কোনো কমতি করব না। প্রত্যেক মানুষ যা কামাই করে এর বদলে সে বন্ধক আছে।[২]

২. অর্থাৎ কেউ ধার শোধ না করে যেমন বন্ধকী বস্তু ছাড়াতে পারে না; তেমনি কেউ ফরয (অবশ্য পালনীয়) পালন না করে নিজেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারে না। সন্তান নিজে যদি সৎ না হয় তাহলে বাপ-দাদার নেকী তাকে বন্ধক থেকে মুক্ত করতে পারে না।

২২. ফল ও গোশতের মধ্যে তারা যা পছন্দ করবে তা আমি তাদেরকে বেশি করে দিয়ে যেতে থাকব।

وَأَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. তারা একে অপর থেকে এগিয়ে এগিয়ে পান-পাত্র নিতে থাকবে। (যা পান করলেও) কোনো বাজে কথা-বার্তা বলবে না এবং গুনাহের কাজও করবে না।[৩]

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আর তাদের খিদমতে এমন সব বালক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, যারা তাদের সেবার জন্যই নির্দিষ্ট। তারা লুকিয়ে রাখা মণি-মুক্তার মতোই (সুন্দর)।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা আপসে একে অপরের দিকে এগিয়ে (দুনিয়ায় যা ঘটেছিল সে বিষয়ে) জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. তারা বলবে যে, এর আগে আমরা নিজ পরিবারের লোকদের মধ্যে (আল্লাহর শাস্তিকে) ভয় করে চলতাম।[৪]

قَالُوْٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. অবশেষে আল্লাহ আমাদের প্রতি মেহেরবানী করলেন এবং আমাদেরকে আগুনেভরা বাতাসের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৮. আমরা বিগত জীবনে তাঁর কাছেই দু'আ করতাম। তিনি সত্যিই বড় মেহেরবান ও দয়াবান।

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۖ إِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾

৩. অর্থাৎ ঐ শরাবে নেশা হয় না বলে তা পান করলে বেহুদা কথা বলবে না বা গালি-গালাজ ও ঝগড়া-বিবাদ করবে না অথবা এমন অশ্লীল ও অশোভন আচরণ করবে না, যেমন দুনিয়ার মদ্যপায়ীরা করে থাকে।

৪. অর্থাৎ আমরা দুনিয়ায় আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে আখিরাতের কথা ভুলে জীবন কাটাইনি; বরং সবসময় আমরা সাবধান থাকতাম, যেন আমরা এমন কোনো কাজ করে না ফেলি, যার জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হয়। এখানে বিশেষভাবে নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্যে ভয়ে জীবন-যাপন করার কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির সুখ-সুবিধা ও তাদের দুনিয়া বানানোর চিন্তাতেই সবচেয়ে বেশি গুনাহ করে থাকে।

রুকূ' ২

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝٢٩

২৯. অতএব (হে রাসূল!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনার রবের মেহেরবানীতে আপনি গণকও নন, পাগলও নন।[৫]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝٣٠

৩০. তারা কি বলে যে, এ লোকটি কবি, যার উপর সময়ের চাকা ঘুরে আসার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি?

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝٣١

৩১. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝٣٢

৩২. তাদের আকল-বুদ্ধি কি এ ধরনের কথাই বলতে আদেশ করে? নাকি আসলেই এরা (অবাধ্যতায়) সীমালঙ্ঘনকারী লোক?[৬]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٣٣

৩৩. তারা কি বলে যে, এ লোকটি নিজেই কুরআন রচনা করেছে? আসল কথা হলো, এরা ঈমান আনতে চায় না।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝٣٤

৩৪. তারা যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে তারা এ মানের কোনো কথা বানিয়ে আনুক।

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝٣٥

৩৫. এরা কি কোনো স্রষ্টা ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে, নাকি এরা নিজেরাই তাদের স্রষ্টা?

৫. আখিরাতের চিত্র পেশ করার পর তখন মক্কার কাফিররা যেসব হঠকারী উপায়ে রাসূলুল্লাহর দাওয়াতের বিরোধিতা করত, এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে; কিন্তু আসলে তাঁর মাধ্যমে মক্কার কাফিরদেরকে শোনানোই উদ্দেশ্য।

৬. এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলো দিয়ে বিরোধীদের সব অপপ্রচারকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা হচ্ছে– কুরাইশ সর্দার ও শেখরা তো বড় বুদ্ধিমান সেজে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি তাদেরকে এ নির্দেশই দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বল; যাকে গোটা জাতি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি জানে তাকে পাগল বল এবং যার কাজের সাথে গণকের কাজ-কারবারের দূরতম সম্পর্কও নেই তাকে অনর্থক গণক বল। তা ছাড়া যদি তারা জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে এসব কথা বলত, তাহলে কোনো একটি কথাই বলত; একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী নানা কথা বলতে পারত না। একই লোক একই সময়ে কেমন করে কবি, পাগল ও গণক হতে পারে?

৩৬. অথবা আসমান ও জমিনকে কি এরাই সৃষ্টি করেছে? আসল কথা হলো, এরা বিশ্বাসই করে না।[৭]

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. (হে রাসূল!) আপনার রবের ধনভাণ্ডার কি তাদের হাতে আছে? অথবা এর উপর কি তাদের হুকুম চলে?[৮]

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. তাদের কাছে কি কোনো সিঁড়ি আছে, যার উপর চড়ে তারা (আসমানী কথা গোপনে) শুনে ফেলে? তাদের মধ্যে কেউ শুনে থাকলে স্পষ্ট দলীল নিয়ে আসুক।

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. (তোমাদের মতে কি) কন্যাসন্তান আল্লাহর জন্য, আর পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য?[৯]

أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. (হে রাসূল!) আপনি কি তাদের কাছে কোনো মজুরি চাচ্ছেন, যা জরিমানার মতো তাদের উপর বোঝা হয়ে আছে?

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. তাদের কাছে কি গায়েবী ইলম আছে, যার ভিত্তিতে তারা কিছু লিখছে?[১০]

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾

৭. অর্থাৎ তারা মুখে তো স্বীকার করে, তাদের ও সারা দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। কিন্তু যখন বলা হয়, একমাত্র সেই আল্লাহরই বন্দেগী কর, তখন তারা মারমুখী হয়ে যায়। তাদের এ ব্যবহারই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই।

৮. এটা মক্কার কাফিরদের ঐ আপত্তির জবাব যে, 'আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ (স)-কে কেন রাসূল বানানো হয়েছে?' এ উত্তরের মর্ম হচ্ছে– এদেরকে গুমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্য যেকোনো অবস্থায় কাউকে না কাউকে তো রাসূল নিয়োগ করতেই হতো। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কাকে নিজের রাসূল বানাবেন ও কাকে বানাবেন না– এ সিদ্ধান্ত করা কার কাজ? যদি এরা আল্লাহর বানানো রাসূলকে মানতে অস্বীকার করে তবে তার অর্থ দাঁড়ায়, হয় তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ক্ষমতার মালিক বলে মনে করে অথবা তাদের ধারণা মালিক আল্লাহ হলেও সে ব্যাপারে তাদেরই হুকুম চলবে।

৯. যদি রাসূলের কথা স্বীকার করতে তোমরা না চাও তবে তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য জানানোর জন্য কি অন্য কোনো উপায় আছে? তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কি উর্ধ্বজগতে পৌঁছে আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর ফেরেশতাদের কাছ থেকে সরাসরি এ কথা জেনে নিয়েছে যে, তোমরা যে বিশ্বাসের উপর তোমাদের ধর্মের ভিত্তি কায়েম করে রেখেছ তা সঠিক? যদি তোমরা এরূপ দাবি না করতে পার তবে তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর– জগতের প্রভু আল্লাহর জন্য সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করা কীরূপ হাস্যকর ধারণা? তাও আবার কন্যা সন্তান, যা তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে কর।

১০. অর্থাৎ তারা কি এ কথা লিখে দিতে পারবে যে, 'তারা গায়েবের (অদৃশ্য জগতের) পর্দা ভেদ করে দেখতে পেয়েছে যে, রাসূল অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা সত্য নয়? নাকি তারা তাদের সরাসরি জ্ঞানের ভিত্তিতেই রাসূলের কথাকে মিথ্যা বলছে?

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. এরা কি কোনো ফন্দি আঁটতে চায়? তাহলে তা উল্টো কাফিরদের বিরুদ্ধেই যাবে।

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আল্লাহ ছাড়া কি তাদের আরো কোনো মা'বুদ আছে? এরা যে শির্‌ক করছে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. এরা যদি আসমানের টুকরাও পড়তে দেখে তবুও বলবে যে, এটা তো থরে থরে সাজানো মেঘমালা।

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতএব (হে রাসূল!) তারা তাদের ঐ দিনে পৌঁছা পর্যন্ত তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দিন, যেদিন তাদের উপর বজ্র ফেলা হবে।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যেদিন তাদের কোনো চাল তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে কেউ সাহায্যও করবে না।

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর ঐ সময় আসার আগেও যালিমদের জন্য এক আযাব রয়েছে; কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

৪৮. (হে রাসূল!) আপনার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত সবর করুন। আপনি আমার চোখের সামনেই আছেন। আপনি যখন (নামাযের জন্য) দাঁড়ান, তখন আপনার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ করুন।[১১]

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

৪৯. রাতের বেলা এবং (রাত শেষে) তারকারাজি ডুবে গেলে তাঁর তাসবীহ করুন।[১২]

১১. অর্থাৎ যখন আপনি নামাযের জন্য দাঁড়ান তখন আল্লাহ তাআলার হাম্‌দ (প্রশংসা) ও তাস্‌বীহ (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা) দ্বারা নামায শুরু করুন। এ আদেশ পালনে রাসূলুল্লাহ (স) তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্ন শব্দগুলো দ্বারা নামায শুরু করতে আদেশ দিয়েছেন– 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া-তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গায়রুকা।

১২. এর অর্থ ফজর নামাযের সময়।

৫৩. সূরা নাজম

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এর প্রথম শব্দ থেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। 'নাজম' শব্দের মানে তারকা।

নাযিলের সময়

সিজদাওয়ালা সূরাগুলোর মধ্যে এ সূরাটিই প্রথম নাযিল হয়েছে। এটি ঐ বিখ্যাত সূরা, যা রাসূল (স) সর্বপ্রথম কা'বাঘরের সামনে কুরাইশদের এক সমাবেশে পড়ে শোনান। সেখানে মুমিন ও কাফির সবাই উপস্থিত ছিল। সূরার শেষ আয়াতটিই সিজদার আয়াত। রাসূল (স) যখন সূরাটির তিলাওয়াত শেষ করে সিজদা দিলেন তখন উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাসূল (স)-এর সাথে সিজদায় পড়ে গেল।

এ সূরাটি নাযিল হওয়ার আগেই নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল হাবশায় হিজরত করেন। রাসূল (স)-এর সাথে কাফিরদের সিজদা দেওয়ার খবর থেকে হাবশার মুহাজিরগণের ধারণা হলো যে, কুরাইশরা সবাই ইসলাম কবুল করেছে। তাই তাঁদের কয়েক জন শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিলে এলেন। কিন্তু তাঁরা যখন এসে দেখলেন যে, যুলুম-অত্যাচার আগের মতোই চলছে, তখন তাঁরা ফিরে গেলেন এবং আরো অনেক সাহাবী এ দ্বিতীয় হিজরতে শামিল হলেন।

এ ঘটনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রমযান মাসে নাযিল হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যখন প্রথম ওহী নাযিল হয় তখন থেকেই নবুওয়াতের সূচনা ধরা হয়। শুরু থেকে তিন বছর পর্যন্ত রাসূল (স) গোপনে অল্প লোকের মধ্যে কুরআন শোনাতেন এবং দীনের তাবলীগ করতেন। তৃতীয় বছরের শেষে সাফা পাহাড়ের উপর থেকে তিনি প্রথম জনসভায় বক্তৃতা করার পর কুরাইশ নেতাদের বিরোধিতার কারণে জনগণের সামনে প্রকাশ্যে কুরআন শোনানোর সুযোগ পেতেন না। বিরোধীরা একদিকে জোরেশোরে প্রচার করতে লাগল যে, 'মুহাম্মদ বিপথগামী হয়ে গেছে এবং জনগণকে গুমরাহ করতে চেষ্টা করছে', অপরদিকে কোথাও কুরআন শোনাতে চাইলে হৈচৈ করে শুনতেই দিত না।

এ অবস্থায় রাসূল (স) যখন একদিন কা'বার নিকট এক সমাবেশে এ সূরাটি তিলাওয়াত করা শুরু করলেন, তখন সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল এবং রাসূল (স)-এর সাথে সিজদা পর্যন্ত করে ফেলল। কাফির নেতারা নিজেদের মুখ রক্ষা করার জন্য আজেবাজে কথা বলে তাদের সিজদা করার বিষয়টা ব্যাখ্যা করে জনগণের সমালোচনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করল।

আলোচ্য বিষয়

মূল বিষয় রিসালাত। মক্কার কাফিররা কুরআন ও মুহাম্মদ (স)-এর যে বিরোধিতা করেছিল, এর প্রতিবাদ ও তাদের প্রতি সাবধানবাণীই সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়।

আলোচনার ধারা

১-৪ আয়াত : প্রথমেই ডুবন্ত তারার কসম করে আল্লাহ বলেছেন, রাসূল (স)-এর ভুল পথে চলার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ, তাঁকে আমার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তা-ই তিনি তোমাদের কাছে পৌছান। তিনি তোমাদেরকে নিজের মনগড়া কোনো কথা বলেন না।

এ কথাগুলো বলার আগে ডুবে যাওয়া তারকার কসম করার মানে কী, তা বোঝা দরকার। সকাল বেলা রাতের অন্ধকার যখন চলে যায়, তখনই তারকার আলো আর দেখা যায় না। তখন সূর্যের আলো ফোটার সময় হয়। সে সময় সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। অন্ধকার থাকলে কোনো জিনিস সঠিকভাবে দেখা যায় না। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছেন যে, রাসূলের নিকট যে ওহী নাযিল করা হচ্ছে তা এমন সুস্পষ্ট হেদায়াত, যাদের বোঝার মতো মন আছে তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন নয়। যেমন– যাদের দেখার চোখ আছে তারা সকালে কোনো জিনিস দেখতে ভুল করে না। তিনি যা তোমাদেরকে বলেন তা তাঁর বানানো কথা নয়; আমার শেখানো কথা।

কুরাইশ নেতাদেরকে লক্ষ্য করেই দ্বিতীয় আয়াতে রাসূল (স)-কে 'তোমাদের সাথী' বলা হয়েছে। তাদের বিবেকের নিকট আপিল করে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (স) তোমাদের বংশেরই লোক। তিনি তোমাদের নিকট অপরিচিত নন। তোমরাই তাঁকে আল আমীন ও আস সাদিক বলে প্রশংসা করতে। আমার রাসূল হিসেবে তাঁকে বিশ্বাস করতে বলায় কী দোষ হলো, যার কারণে তোমরা তাঁর দুশমনি করছ?

রাসূল যা বলেন সবই কি ওহী?

তৃতীয় আয়াতের কথাটির একটু ব্যাখ্যা দরকার। রাসূল (স)-এর মুখ থেকে যেসব কথা বের হতো তা তিন ধরনের ছিল :

১. তিনি দীনের তাবলীগের উদ্দেশ্যে যা বলতেন তা কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তাই তাঁর ওয়ায ও নসীহত সবই ওহীর ভিত্তিতেই হতো– যদিও এসব কুরআনের মতো আল্লাহর রচিত ভাষা নয়। কিন্তু এর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই শেখানো হতো।

২. ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী জামায়াতের নেতা বা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে যত কথা বলতেন তা-ও তিনি আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর মর্জি মোতাবেকই বলতেন। এ ব্যাপারেও তিনি নিজের যা ইচ্ছা তা বলতেন না।

   অবশ্য এর মধ্যে কয়েক রকম কথা এমন আছে, যা ওহী হিসেবে গণ্য নয়। যেমন–

   ক. যেসব কথা ওহী নয় বলে তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন।

   খ. যেসব কথা সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ হিসেবে তিনি কবুল করেছেন।

   গ. যে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর কোনো কথা বা কাজকে সরাসরি ওহী দ্বারা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

৩. একজন মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে গিয়ে যেসব কথা ওহী নাযিলের আগেও বলতেন, পরেও বলতেন সেসব কথাও কি ওহীর দ্বারা পরিচালিত ছিল? কাফিররা কিন্তু এসব কথা নিয়ে আপত্তি করত না। তারা উপরে বর্ণিত দু রকম কথারই বিরোধিতা করত। তাই এ আয়াতে ঐ দু রকম কথা সম্পর্কেই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় রকমের কথা এখানে আলোচ্য নয়।

যদিও এ তৃতীয় ধরনের কথাগুলো ওহী নয়; তবু এ কথা সত্য যে, কোনো বিষয়েই সত্যের খেলাফ কোনো কথা রাসূল (স)-এর মুখ থেকে বের হতো না।

৫-১০ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে রাসূল (স)-এর সাথে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সরাসরি দেখা হওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কাফিররা দাবি করত, কোনো লোক রাসূল (স)-কে গোপনে এসব কথা শেখায়, যা তিনি ওহী বলে প্রচার করেন। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল ওহী পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করে।

রাসূল (স)-এর সাথে জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তখন জিবরাঈল তার নিজ রূপে হাজির হয়েছিলেন। প্রথম দূর-দিগন্তে তাকে দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে এতটা কাছে এলেন, মাত্র কয়েক হাত দূরে অবস্থান করলেন। অর্থাৎ অতি কাছে এসে ওহী পৌঁছালেন।

১১ ও ১২ নং আয়াত : ১১ নং আয়াতে জিবরাঈল (আ)-কে দেখার সময় রাসূল (স)-এর মনের যে অবস্থা ছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি যে সত্যি জিবরাঈল (আ)-কেই দেখছেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে সামান্য সন্দেহও হয়নি। এ বিষয়ে এত মযবুত ইয়াকীনের কারণ হচ্ছে–

১. দিনের স্পষ্ট আলোতে তিনি দেখেছিলেন, যার কারণে চোখের ধোঁকা মনে হয়নি।

২. মনের দিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, যার ফলে মনের ধোঁকা বলে ধারণা হওয়ারও কারণ ছিল না,

৩. জিবরাঈল (আ) ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর যে বাণী পৌঁছালেন তা রাসূল (স)-এর নিকট পরিচিত। এসব বাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না বলে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।

৪. জিবরাঈল (আ)-কে তিনি তাঁর আসল রূপে দেখে বুঝতে পারলেন যে, এমন বিরাট মহান ও সুন্দর সুরত তাঁর কল্পনার সৃষ্টি হতে পারে না– অবশ্যই বাস্তব ঘটনা, যা সন্দেহাতীত।

৫. সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা যাকে রাসূল বানান তাঁর মনকে সব রকম সন্দেহ ও খটকা থেকে পবিত্র করে দেন এবং তাঁর মগজকে এমন সুস্থ-সবল করেন, যাতে ওহীর বাণীকে বুঝতে সামান্য অসুবিধাও না হয়।

১২ নং আয়াতে আল্লাহ কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, রাসূল (স) দিনের বেলায়, সজাগ অবস্থায়, সুস্থ-সবল মন নিয়ে ওহীর বাহক জিবরাঈলকে দেখলেন, অথচ তোমরা কোন্ যুক্তিতে এ বিষয়ে বিতর্ক করছ? যিনি দেখলেন তাঁর মনে কোনো সন্দেহ জাগল না, আর তোমরা অনর্থক তর্ক করছ কেন?

১৩-১৮ নং আয়াত : আরেকবার যে রাসূল (স) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর আসল রূপে দেখেছিলেন এর বিবরণ এ কয়েকটি আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছে, সেবার তিনি জিবরাঈল (আ)-কে জান্নাতুল মাওয়ার নিকটে সিদরাতুল মুনতাহার পাশে দেখেছিলেন।

'জান্নাত' মানে বাগান বা বেহেশত। 'মাওয়া' মানে স্থায়ী বাসস্থান বা ঠিকানা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা তাফসীরে পাওয়া যায়। কারো মতে, হাশরে বিচারের পর যে জান্নাতে নেক লোকদেরকে পাঠানো হবে, এটা ঐ জান্নাত নয়। এ জান্নাত নেক লোকদের বা শহীদদের রূহের বাসস্থান।

আর 'সিদরাতুল মুনতাহা'র সঠিক মানেও বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। সিদরাতুন মানে কুল বা বরই। মুনতাহা মানে শেষ সীমা। তাহলে সিদরাতুল মুনতাহা মানে ঐ বরই গাছ, যা এ বস্তুজগতের শেষ সীমানায় রয়েছে। হয়ত এ সীমানার পরেই জান্নাতুল মাওয়া আছে। এর চেয়ে বেশি বোঝার সাধ্য নেই।

১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর নূরের যে ঝলক ঐ গাছকে ঢেকে রেখেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

১৭ ও ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (স) আল্লাহর বড় বড় নিদর্শন দেখার সময় তাঁর চোখ ঝলসেও যায়নি, সীমা ছাড়িয়েও যায়নি। এত বড় ঘটনায় রাসূল (স) ধীরস্থির ছিলেন। তাঁর চোখও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। এমন অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও বিচলিত হননি; বরং প্রশান্ত মনে ও সচেতন চোখে তিনি সবই দেখেছিলেন।

রাসূল (স) বহুবার জিবরাঈল (আ)-কে মানুষের রূপে দেখেছেন। এ সূরা থেকে জানা গেল, তিনি তাঁকে তাঁর আসল রূপে দুবার মাত্র দেখেছেন। হাদীসেও ঐ রূপ বিবরণই পাওয়া যায়।

১৯-২২ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা লাত, মানাত ও উয্যাকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছ। তোমরা কি এই সামান্য কথাটুকুও বুঝতে পার না যে, এসবকে মাবুদ মনে করাটা কত বড় বোকামি? রাসূল (স) যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা তোমরা কোন্ যুক্তিতে মেনে নিচ্ছ না? তাকে অমান্য করে যে তোমরা নিজেদের ক্ষতি করছ সে কথা বোঝার যোগ্যতাও তোমাদের নেই।

এসব মা'বুদকে আল্লাহর কন্যা মনে করে তোমরা আরও বড় ধরনের বোকামির পরিচয় দিচ্ছ। এটা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, তোমাদের কন্যাসন্তান জন্ম নিলে তোমরা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে থাক; অথচ আল্লাহর বেলায় তোমাদের পছন্দ আরেক রকম কেন? আল্লাহর জন্য পুত্রসন্তানের বদলে কন্যাসন্তান বানাচ্ছ কোন্ যুক্তিতে? এটা তো মস্ত বড় ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়।

২৩-২৫ নং আয়াত : পূর্বের কয়েকটি আয়াতে কাফিরদের মনগড়া মা'বুদ সম্পর্কে কতক প্রশ্ন তুলে তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে বিদ্রূপ করার পর এ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ নিজেই ঐ সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বলা হয়েছে, ঐ সব মা'বুদ তোমাদের বাপ-দাদার মনগড়া কতক নাম। এর পক্ষে সামান্য কোনো দলিল-প্রমাণও তোমাদের কাছে নেই। আর আল্লাহ তো এর পক্ষে কোনো সনদই নাযিল করেননি।

আসল কথা হলো, এরা এদের নাফসের দাস। তাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হেদায়াত আসার পরও এমন মনগড়া ধারণা পোষণ করা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নাফসের গোলামি করাই এদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এদের ভেবে দেখা উচিত ছিল, মন যা চায় তা-ই কি মানুষের জন্য ভালো?

যে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতের একমাত্র মালিক তার হেদায়াতকে অমান্য করে যারা নিজেদের মনগড়া পথে চলে তারা সঠিক পথ পেতে পারে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

২৬ নং আয়াত : এ আয়াতে 'শাফাআত' সুপারিশ সম্পর্কে মুশরিক ও কাফিরদের ভুল ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা ফেরেশতাদেরকে এ আশায় মা'বুদ হিসেবে মানে যে, তারা এদের পক্ষে সুপারিশ করবে। অথচ তাদের এ ব্যাপারে কোনো ক্ষমতাই নেই। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। এমনকি যে ধরনের বা যতটুকু সুপারিশ তিনি শুনতে রাজি হবেন না, তা তাঁর দরবারে পেশ করার সাধ্যও কারো হবে না।

২৭ ও ২৮ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে সুপারিশকারী মনে করে মস্ত বড় ভুলই করেছে। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করে আরও বড় অন্যায় করেছে। এরা নিছক আন্দাজ-অনুমানের উপর এত বড় বিষয়ে সিদ্ধান্ত কেমন করে নিচ্ছে? এরা কি এটুকু কথাও বুঝতে পারে না যে, যা সত্য ও সঠিক তা শুধু অনুমান করে জানা যায় না।

সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান ছাড়া সত্যকে জানার কোনো উপায় নেই। আখিরাতের মতো বিরাট বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যকে জানার চেষ্টা না করে অনুমানের উপর নির্ভর করা চরম বোকামি। যা সত্য তা সবসময়ই সত্য। এর বিপরীত ধারণা কখনও সত্য হতে পারে না, আর অনুমান দ্বারা সত্য বদলে যায় না।

২৯-৩০ নং আয়াত : এ দুটো আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তাআলা উপদেশ দিচ্ছেন যে, হে রাসূল! আমার দেওয়া হেদায়াত থেকে যে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার পেছনে আপনার মেহনত করার দরকার নেই। যারা হেদায়াত কবুল করতে আগ্রহ রাখে তাদের দিকেই আপনি মনোযোগ দিন।

যারা আমার বাণী ও আপনার উপদেশ শুনতে পছন্দ করে না, তারা আসলেই দুনিয়ার পূজারী। তারা দুনিয়ার জীবনের মজা নিয়েই মত্ত। বস্তুজগতের সুখ-সুবিধা ছাড়া আর কিছুই তারা চায় না। তাদের জ্ঞান এ দুনিয়ায়ই সীমাবদ্ধ। দুনিয়ার পরপারে কী হবে সে চিন্তা তাদের নেই। তাই ওদেরকে হেদায়াত করার চেষ্টা করে লাভ নেই। তাদেরকে তাদের হালেই ছেড়ে দিন।

হে রাসূল! আমি সঠিকভাবে জানি যে, কে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য আর কে গুমরাহ হওয়ার উপযুক্ত। আমার সে জ্ঞানের ভিত্তিতেই আপনাকে এ উপদেশ দিচ্ছি।

৩১ ও ৩২ নং আয়াত : এ দুটো আয়াতে মানুষের কর্মজীবন বা আমলী যিন্দেগী সম্পর্কে এমন দুটো কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যা সঠিক পথে চলার জন্য বড়ই জরুরি। কথা দুটি হলো–

ক. আসমান ও জমিনের মালিক যেমন একমাত্র আল্লাহ তেমনি কে সঠিক পথে আছে আর কে বিপথে আছে, সে বিষয়েও একমাত্র তিনিই ফায়সালা দেওয়ার মালিক। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার অন্য কারো নেই। মানুষ হাজারো মত পোষণ করে, বিভিন্ন পথে চলে ও বিচিত্র চিন্তাধারা প্রকাশ করে।

পরোক্ষভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! বিরোধীরা আপনাকে কবি, পাগল, গণক, পথহারা ইত্যাদি যতই বলুক– আপনি এর কোনো পরওয়া করবেন না। ওরা নিজেদেরকে সঠিক পথে আছে বলে যতই ধারণা করুক, আসল ফায়সালা ওদের হাতে নয়।

খ. নবী ছাড়া কোনো মানুষই মাসূম বা নিষ্পাপ নয়। গুনাহ করা মানুষের স্বভাব। ভালো ও মন্দের ধারণা থাকা সত্ত্বেও নফসের ধোঁকায় ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার দরুন মানুষ গুনাহ করে ফেলে। গুনাহ হয়ে গেলে শাস্তি থেকে অন্য কোনো উপায়েই রেহাই পাওয়া যাবে না বলে ধারণা হলে মানুষ নিরাশ হয়ে 'নেক আমল করে আর কী লাভ হবে' মনে করতে পারে। তাই এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে জানাচ্ছেন যে–

আল্লাহ তাআলা ভালো ও মন্দ কাজের বদলা অবশ্যই দেবেন। কিন্তু বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে যারা বেঁচে থাকবে তাদের ছোট গুনাহও তিনি মাফ করে দেবেন। অবশ্য আল কুরআনের বহু জায়গায় এ সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে যে, খাঁটি দিলে তাওবা করলে কবীরা গুনাহও মাফ করা হবে।

৩২ নং আয়াতে কবীরা ও সগীরা গুনাহের মধ্যে কতটুকু তফাত, তা-ই বোঝানো হয়েছে। হাদীসে এ আয়াতের বিস্তর ব্যাখ্যা রয়েছে, যার সারকথা হলো–

কুরআন ও হাদীসে যেসব কাজকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, যেসব কাজের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) দুনিয়ায় শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন ও আখিরাতে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন, যেসব কাজ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে লা'নত বা অভিশাপ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেসব কাজের পরিণামে দুনিয়ায়ই আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে, সেসব কাজই কবীরা গুনাহ।

এ ছাড়া অন্য যত কাজ শরীআতে অপছন্দনীয় আছে, সবগুলোই সগীরা বা ছোট গুনাহর মধ্যে গণ্য। এমনকি কবীরা গুনাহর ইচ্ছা করে তা না করলে বা এগিয়ে গিয়ে তা থেকে ফিরে এলে তা সগীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে।

অবশ্য সগীরা গুনাহও কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। শরীআত যে কাজকে অপছন্দ করেছে, কেউ যদি সে শরীআতকেই হেয় মনে করে অথবা দাপট দেখিয়ে বেপরোয়া ভাব নিয়ে ঐ কাজ করে, তাহলে ঐ কাজটি ছোট গুনাহ হলেও ঐ মনোভাবের কারণে তা কবীরা গোনাহ বলে গণ্য হতে পারে।

'আপনার রব মাফ করার বেলায় বড়ই উদার' কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সগীরা গোনাহ এমনি মাফ করার কারণ এটা নয় যে, সগীরা গোনাহ কোনো গোনাহই নয়। আসল কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা বড়ই উদার। যারা বড় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে তাদের এ আনুগত্যের খাতিরে ছোট গোনাহকে তিনি মাফ করে দেন।

৩২ নং আয়াতের শেষের অংশটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদেরকে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। মানুষ কিছু নেক কাজ করলেই শয়তানের প্ররোচনায় নিজেকে বড় মুত্তাকী ও পাক-পবিত্র বলে ধারণা করে বসে। এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সত্যিকার মুত্তাকী কে, তা আল্লাহই ফায়সালা করবেন। আল্লাহর মর্জিমতো চলার শত চেষ্টা করলেও মানবিক দুর্বলতার দরুন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবেই। তাই প্রকৃত মুত্তাকী ব্যক্তি কখনও নিজের তাকওয়ার বাহাদুরি করে না; বরং এ পথে যতই এগিয়ে যায় ততই বিনয়ী হয়। সে নিজের নাফসকে পবিত্র মনে করা যে ধৃষ্টতা তা বুঝতে পারে।

এখানে এ কথারও ইশারা পাওয়া যায় যে, আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত একপর্যায়ে মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে। তাই এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, আল্লাহ তাআলার উন্নত মান বজায় রেখে চলতে সক্ষম নয়। তাই রাসূল (স) মা'সূম হওয়া সত্ত্বেও গুনাহ মাফ চেয়েছেন।

তৃতীয় রুকূ'

৩৩-৩৭ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে কুরাইশনেতা ওলীদ বিন মুগীরার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যারা আখিরাতের কোনো পরওয়া করে না বা আখিরাতকে গুরুত্ব দেয় না, তারা কেমন নির্বোধের মতো আচরণ করে থাকে। ওলীদ বিন মুগীরা একসময় রাসূল (স)-এর মুখে কুরআনের সূরা শুনে ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে গেল। এ কথা জানতে পেরে তার এক মুশরিক বন্ধু বলল, আমাকে এ পরিমাণ টাকা দাও; এর বদলায় আখিরাতে তোমার পক্ষ থেকে আমি আযাব ভুগতে রাজি আছি। তবু তুমি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ কর না। ওলীদ এ কথা মেনে নিল বটে, কিন্তু অল্প কিছু টাকা দিয়ে বাকি টাকা আদায় করল না।

এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ কয়টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে রাসূল! ওলীদ কীভাবে জানল যে, এভাবে দুনিয়ায় টাকা দিয়ে আখিরাতে একজনের শাস্তি আরেকজন নিজের ইচ্ছায় ভোগ করার দায়িত্ব নিতে পারে? এ বিষয়ে কুরআনের আগে মূসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর নিকট প্রেরিত কিতাবে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ওলীদ কি কিছুই শুনেনি? সে যদি আখিরাতে বিশ্বাসী হতো তাহলে কখনো এত হালকাভাবে এ বিষয়টিকে বিবেচনা করতে পারত না।

৩৮-৫৫ নং আয়াত : এ কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআন যে শিক্ষা দিচ্ছে তা হযরত ইবরাহীম (আ) ও মূসা (আ)-এর সহীফাতেও ছিল।

৩৮-৪২ নং আয়াতে মূসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে আখিরাতের যে খবর দেওয়া হয়েছিল, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কুরআনও একই শিক্ষা দিচ্ছে। ঐ শিক্ষার সারকথা হলো–

১. আখিরাতে প্রত্যেকেই নিজের দোষের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। সেখানে একজনের দোষ অন্যের উপর চাপানো হবে না। কেউ চাইলেও অন্যের পাপের বোঝা নিজে বইতে পারবে না। কোনো ব্যক্তির গুনাহের শাস্তি অন্য কেউ ভুগতে রাজি হলেই ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

২. যে যেমন আমল করেছে সে তেমন ফল পাবে। একজনের আমলের ফল আরেকজন পাবে না। কেউ চেষ্টা ও আমল ছাড়া কোনো ফল পেতে পারে না। (৩৯ নং আয়াত)

৩. আখিরাতে মানুষের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা যাচাই করে প্রত্যেককে তার পাওনা অনুযায়ী পুরোপুরি বদলা দেওয়া হবে। যে যতটুকু ভালো কাজ করেছে তার সঠিক হিসাব করে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে; তাকে একটুও ঠকানো হবে না। যে মন্দ কাজ করেছে তার সঠিক বিচার করে যথার্থ শাস্তি দেওয়া হবে। আমলের পরিমাণের অতিরিক্ত শাস্তি কাউকে দেওয়া হবে না। (৪০ ও ৪১ নং আয়াত)

৪. আসল কথা হলো, সবাইকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে হাজির হতেই হবে। দুনিয়ায় আল্লাহর দেওয়া সামান্য স্বাধীনতা ও ইখতিয়ারটুকু যে যেভাবেই ব্যবহার করুক, একদিন তাকে এখান থেকে বিদায় হতেই হবে এবং হাশরের ময়দানে তাকে দুনিয়ার জীবনের হিসাব দিতেই হবে।

৩৯ নং আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, 'ইসালে সওয়াব' সম্ভব কি না, অর্থাৎ একজনের আমলের সওয়াব আরেকজনকে দান করার জন্য দু'আ করলে সে সওয়াব তার কাছে পৌঁছবে কি না? ঐ দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো–

১. ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, নামায ও রোযার মতো দৈহিক ইবাদতের সওয়াব অন্যের কাছে পৌঁছে না। সদকা, দান-খয়রাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি এবং এ জাতীয় ইবাদতের সওয়াব পৌঁছে।

২. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সব রকমের নেক আমলের সওয়াবই দান করা যায়। যেমন– কোনো শ্রমিক কারো অধীনে কাজ করে যে বেতন পাওনা হয়, তা অন্য কোনো লোককে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে মালিক তা দিতে আপত্তি করার কারণ নেই। তেমনি যেকোনো নেক আমল করে তার সওয়াব অন্য কোনো লোককে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করলে তা কবুল না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। এ মতের পক্ষে বহু হাদীস রয়েছে।

৩. যারা আল্লাহর নিকট নেক লোক হিসেবে গণ্য তাদের কাছেই সওয়াব পৌঁছে। যারা পাপী হিসেবে আসামির তালিকায় আছে তাদের কাছে কোনো সওয়াব পৌঁছে না। যে ব্যক্তি জীবিত থাকাকালে হজ্জ করা ফরয বলে স্বীকারই করেনি তার পক্ষে বদলি হজ্জ কবুল হতে পারে না।

৪. ঐ আমলের সওয়াবই পৌঁছে, যা আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়। মৃতের জন্য টাকার বিনিময়ে যদি কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে, তাহলে এর কোনো সওয়াবই পৌঁছে না। কারণ, এ তিলাওয়াতে সওয়াবই হয় না, আর সওয়াব না হলে কী করে পৌঁছবে?

৫. যেসব আমলকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) নেক আমল বলে গণ্য করেন না, তারও কোনো সওয়াব হয় না বলে তাও পৌঁছবে না। শরীআত অনুযায়ী আদায়কৃত আমলের সওয়াবই শুধু পৌঁছে।

৬. ইসালে সওয়াব সম্ভব হলেও ইসালে আযাব সম্ভব নয়। কেউ গুনাহ করে এর শাস্তি অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার দোয়া করলে তা আল্লাহ কবুল করেন না।

৭. নেক আমলের দু'রকম উপকার আছে। একটি হলো, নেক আমলকারীর মন-মগজ পবিত্র হয়, চরিত্র উন্নত হয় এবং রূহ শক্তিশালী হয়। এসবের পুরস্কারও আল্লাহ তাআলা তাকে দেবেন।

আরেকটি উপকার হলো, ঐ নেক কাজের বদলা হিসেবে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেবেন। প্রথম উপকারটি অন্যকে দেওয়ার উপায় নেই। ইসালে সওয়াব দ্বিতীয় উপকারটির বেলায়ই প্রযোজ্য।

৮. একজনের পক্ষ থেকে আরেকজন আমল করলে এর সওয়াব পৌঁছার ব্যাপারে হানাফী ফিক্‌হের মতে, নিছক দৈহিক ইবাদত যেমন– নামায, রোযা ও তিলাওয়াত অন্যের পক্ষ থেকে করা চলে না। মালী ইবাদত যেমন– যাকাত স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী দিতে পারবে। দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত যেমন– হজ্জ একজনের পক্ষ থেকে আরেকজন করতে পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যে ব্যক্তি নেক আমল করতে চায় কিন্তু কোনো অক্ষমতার কারণে করতে পারে না, তার পক্ষ থেকেই বদলি আমল কবুল হতে পারে। যে আমল করতে আগ্রহী নয় তার পক্ষ থেকে কোনো আমল কবুল হতে পারে না।

৪৩-৪৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের কিসমতের যাবতীয় ফায়সালা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। ইবরাহীম (আ) এবং মূসা (আ)-ও এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখ ও জীবন-মরণ একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এসব ব্যাপারে অন্য কোনো শক্তির সামান্য ক্ষমতাও নেই। বীর্যের নগণ্য এক ফোঁটা থেকে পুরুষ সৃষ্টি করা হবে, নাকি নারী– সে সিদ্ধান্তও তিনি একাই করেন। মরণের পর মানুষকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই। মানুষের অগণিত প্রয়োজন পূরণ করে তাদের অভাব দূর করা একমাত্র তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে।

মক্কা ও অন্যান্য এলাকার যারা 'শে'রা' নামক তারকাকে ভাগ্যের দেবতা বলে পূজা করে, তাদের জানা উচিত– ঐ তারকার রবও একমাত্র আল্লাহই। ঐ তারকার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই।

৫০-৫৫ নং আয়াতে আল্লাহর যেসব নাফরমান জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের কাহিনীও ইবরাহীম (আ) এবং মূসা (আ)-এর কিতাবে ছিল। নবীর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর শিক্ষা কবুল করার বদলে নবীবিরোধিতা করার দরুন 'আদ ও ছামূদ জাতি এবং নূহ (আ) ও লূত (আ)-এর কাওমকে যেমন ধ্বংস করা হয়েছিল, তেমনি মুহাম্মদ (স)-এর বিরোধিতা করার কারণে মক্কাবাসীকেও ধ্বংস করার ক্ষমতা আল্লাহর অবশ্যই ছিল এবং আছে।

সুতরাং হে মানুষ! একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আন, যিনি দুনিয়ার সব নিয়ামত দান করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে মানুষের হেদায়াতের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন। রাসূলের আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করে যারা রাসূলের বিরোধিতা করছে, তারা আসলেই আল্লাহর মহান নিয়ামতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে।

৫৬-৬২ নং আয়াত : এ সূরার শেষ কয়েকটি আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে কুরআনের হেদায়াত কবুল করার এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সিজদায় রত হওয়ার আহ্বান জানানো উপলক্ষে বলা হয়েছে :

১. কুরআন কোনো নতুন বা আজব জিনিস নয়; পূর্বের নবীদের মারফতে যেমন সতর্কবাণী পাঠানো হয়েছে, কুরআনও তেমনি এক সাবধানবাণী।

২. তোমরা যদি এ কুরআনকে মানতে অস্বীকার কর তাহলে শিগগির তোমাদের ব্যাপারে এমন ফায়সালা করা হবে, যা থেকে কেউ তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না।

৩. এ সতর্কবাণী শুনে তোমরা অবাক হচ্ছ? যদি তোমরা বিশ্বাস করতে, তাহলে এসব কথাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতে না। তোমাদের পরিণাম চিন্তা করে যেখানে কাঁদা উচিত ছিল, সেখানে তোমরা নির্বোধের মতো হাসছ।

৪. রাসূলের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে তোমরা এড়িয়ে চলছ। অথচ আল্লাহর দাসত্ব করে রাসূলের তরীকা অনুযায়ী ইবাদত করা ও সিজদা করাই তোমাদের কর্তব্য ছিল। এখনও সময় আছে, হঠকারী আচরণ থেকে বিরত হও এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ কর।

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦٢ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ﴿١﴾

১. তারার কসম, যখন সে ডুবে গেল।[১]

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾

২. তোমাদের সাথী বিভ্রান্তও হননি, বিপথেও যাননি।[২]

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾

৩. তিনি মনগড়া কথা বলেন না।

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ﴿٤﴾

৪. এটা তো ওহী, যা তাঁর উপর নাযিল করা হয়।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿٥﴾ ذُوْ مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوٰى ﴿٦﴾

৫-৬. তাঁকে এমন এক শক্তিশালী সত্তা শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি বড়ই সুকৌশলী[৩], যিনি সামনে এসে খাড়া হলেন।

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ﴿٧﴾

৭. তখন তিনি উচ্চ দিগন্তে ছিলেন।[৪]

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ﴿٨﴾

৮. তারপর তিনি কাছে এলেন এবং উপরে ঝুলে রইলেন।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ﴿٩﴾

৯. এমনকি দুই ধনুকের সমান বা তা থেকে কিছু কম দূরত্ব রয়ে গেল।[৫]

---

১. অর্থাৎ যখন শেষ তারা ডুবে গেল এবং ভোরের আলো ফুটে উঠল।

২. রফীক (সাথী) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)। তাঁকে সাথী বলা হয়েছে এজন্য যে, তিনি মক্কার কাফিরদের কাছে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না; বরং তিনি তাদের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়ে বাল্যকাল থেকে যৌবন ও যৌবন থেকে প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদের জানা-শোনা অতি পরিচিত ব্যক্তি। ফর্সা ভোরের মতো এ কথা অতি স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, তিনি পথভ্রষ্ট মানুষ নন।

৩. এখানে আল্লাহ তাআলাকে বোঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তী বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্টতই প্রকাশ পায়।

৪. দিগন্ত অর্থাৎ আসমানের পূর্ব কিনারে, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো ফুটে ওঠে। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-কে যখন প্রথমবার নবী করীম (স) দেখতে পান তখন তাঁকে আসমানের পূর্ব কিনারে দেখেছিলেন।

৫. অর্থাৎ আসমানের পূর্ব কিনার থেকে জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহর মাথার উপর শূন্যে উপস্থিত হলেন। তারপর তিনি তাঁর দিকে নেমে এসে তাঁর এত কাছে আসলেন যে, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুই ধনুক বা তার থেকে একটু কম দূরত্ব বর্তমান ছিল। সব ধনুক এক আকারের হয় না, সেজন্যে দূরত্বের পরিমাপ বলতে গিয়ে দুই ধনুকের সমান বা তার থেকে কিছু কম বলা হয়েছে।

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

১০. তখন তিনি আল্লাহর বান্দাহকে ঐ ওহী পৌঁছালেন, যা পৌঁছানোর (কথা) ছিল।

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾

১১. তিনি যা (চোখে) দেখলেন, মন তাতে মিথ্যা আরোপ করেনি।[৬]

أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾

১২. এখন যা তিনি দেখছেন তা নিয়ে তোমরা কি তাঁর সাথে ঝগড়া করছ?

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾

১৩-১৪. আরো একবার তিনি তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহা[৭]'র পাশে নাযিল হতে দেখেছেন।

عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ﴿١٥﴾

১৫. যার পাশেই জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে।

إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾

১৬. তখন সিদরাকে যা দিয়ে ঢাকা যায় তা এর উপর ছেয়ে রইল।

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

১৭. দৃষ্টি ঝলসিয়েও যায়নি, সীমা ছাড়িয়েও যায়নি।

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিলেন।[৮]

৬. অর্থাৎ দিনের আলোতে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় খোলা চোখে মুহাম্মদ (স) যা দেখলেন, সে বিষয়ে তাঁর মন এ সাক্ষ্য দিল না যে, এটা চোখের ধোঁকা বা দেখার ভুল কিংবা কোনো দানব বা শয়তান আমার সামনে হাজির হয়েছে অথবা আমার সামনে কোনো কাল্পনিক মূর্তি উদিত হয়েছে এবং আমি জেগে থাকা অবস্থায় কোনো স্বপ্ন দেখছি; বরং তাঁর চোখ যা দেখছিল তার মনও ঠিক তা-ই বুঝতে পেরেছিল। এ বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় ছিল না যে, তিনি যাঁকে দেখছিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল (আ) ছিলেন এবং যে বাণী নিয়ে তিনি এসেছিলেন তা আসলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী ছিল।

৭. আরবী ভাষায় বরই গাছকে 'সিদরা' বলে। মুনতাহা অর্থ শেষ। 'সিদরাতুল মুনতাহা'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– 'সেই বরই গাছ, যা শেষ প্রান্তে আছে' জড়জগতের শেষ কিনারে অবস্থিত সেই বরই গাছ কী রকম এবং তার আসল রূপ ও প্রকৃতি কী, তা আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। এ হচ্ছে আল্লাহর বিশ্ব কারখানার ঐসব গোপন রহস্যের ব্যাপার, যা আমাদের বোঝার কোনো সাধ্য নেই। যাহোক, অন্তত এতটুকু বোঝা যায় যে– এটা এরূপ কোনো বস্তু, যা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা বরই শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ সঠিক মনে করেননি।

৮. এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তাআলাকে নয় বরং তাঁর মহান নিদর্শনসমূহ দেখেছিলেন এবং যেহেতু পূর্বাপর প্রসঙ্গ অনুযায়ী এ দ্বিতীয় সাক্ষাৎও সেই সত্তার সঙ্গেই হয়েছিল, যাঁর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল– সেজন্য বাধ্য হয়ে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, আকাশে প্রথম বার তিনি যাঁকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না, এবং দ্বিতীয় বার তিনি সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকটে যাঁকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ নন। রাসূলুল্লাহ যদি কোনো অবস্থায় আল্লাহ জাল্লাশানুহুকে দেখতেন তবে তা তো এত বড় ব্যাপার ছিল যে, এখানে অবশ্যই তা পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করা হতো।

أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

১৯-২০. এখন বল, তোমরা কি ‘লাত’, ‘উয্যা’ ও তৃতীয় এক দেবী ‘মানাত’-এর ব্যাপারে কখনো ভেবে দেখেছ?[৯]

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾

২১. (তোমরা কি মনে কর) পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য, আর কন্যাসন্তান আল্লাহর জন্য?[১০]

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾

২২. এ রকম বাটোয়ারা তো বড়ই ধোঁকাবাজি।

إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾

২৩. আসলে এসব কিছুই নয়; শুধু কতক নাম, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে দিয়েছে। আল্লাহ এর জন্য কোনো সনদ নাযিল করেননি। ব্যাপার হলো এই যে, এরা নিছক আন্দাজ-অনুমানের পেছনেই চলছে এবং তাদের নাফস যা চায় তা-ই করছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হেদায়াত এসে গেছে।

أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

২৪. মানুষ যা চায়, তার জন্য কি তা-ই সঠিক?[১১]

فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

২৫. দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক তো আল্লাহই।

৯. অর্থাৎ মুহাম্মদ (স) যে শিক্ষা তোমাদেরকে দিচ্ছেন, তোমরা তাকে ভুল ও গুমরাহী বলে মনে করছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই তাঁকে এ শিক্ষা দান করা হচ্ছে এবং তিনি যেসব সত্যের সাক্ষ্য তোমাদের সামনে দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর নিজের চোখে তা দেখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যে ধারণা ও বিশ্বাসের জন্য তোমরা জেদ করে চলেছ তা কীরূপ অযৌক্তিক এবং এর মোকাবিলায় যে ব্যক্তি তোমাদের সরল পথ দেখাচ্ছেন তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা শেষ পর্যন্ত কার ক্ষতি করছ?

১০. অর্থাৎ এই দেবীগুলোকে তোমরা বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তাআলার কন্যা মনে করে নিয়েছ এবং অর্থহীন ভুল মনগড়া ধারণা করার সময় তোমরা এ কথাও চিন্তা করনি যে, তোমাদের নিজেদের জন্য তো তোমরা কন্যাসন্তানের জন্মকে অপমানকর মনে কর এবং কামনা কর যে, তোমাদের পুত্রসন্তান লাভ হোক। কিন্তু আল্লাহ তাআলার জন্য যখন তোমরা সন্তান কল্পনা কর তখন কন্যাসন্তানই কল্পনা করে থাক।

১১. এ আয়াতের আর একটা অর্থ এটাও হতে পারে যে, মানুষের কি এ অধিকার আছে যে, সে যাকে ইচ্ছা তাকেই মা'বুদ বানিয়ে নেবে? এর আরও এক অর্থ হতে পারে যে, মানুষ এসব মা'বুদের কাছ থেকে যা কিছু পাওয়ার আশা করে তা কি কখনো পূর্ণ হতে পারে?

রুকূ’ ২

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

২৬. আসমানে কতই না ফেরেশতা আছে! তাদের শাফাআত কোনো কাজে আসতে পারে না; যদি আল্লাহ এমন কোনো লোকের পক্ষে অনুমতি না দেন, যার পক্ষে তিনি আবেদন শুনতে চান এবং তা পছন্দ করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾

২৭. যারা আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না, তারা মেয়েদের (দেবীদের) নামে ফেরেশতাদের নাম রাখে।

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কিছুই জানা নেই। এরা নিছক আন্দাজ-অনুমানের উপর চলছে। আর অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনো কাজে লাগে না।

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২৯. অতএব (হে রাসূল!) যে আমার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া অন্য কিছুই চায় না, তাকে এ হালেই পড়ে থাকতে দিন।

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾

৩০. তাদের ইলমের দৌড় এ পর্যন্তই।[১২] আপনার রবই এ কথা বেশি জানেন যে, তাঁর পথ থেকে কে হটে গেছে, আর কে সঠিক পথে আছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

৩১. আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে আল্লাহই এর মালিক। যাতে[১৩] যারা মন্দ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে মন্দ বদলা দেন এবং যারা নেক কাজ করে তাদেরকে ভালো বদলা দান করেন।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ

৩২. যারা মামুলি অপরাধ ছাড়া বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরে থাকে– (হে রাসূল! তাদের জন্য) আপনার রব মাফ

১২. ভাষণের ধারাবাহিকতা বাদ দিয়ে মাঝখানে আগের কথার ব্যাখ্যা হিসেবে এ কথাটি বলা হয়েছে।

১৩. উপর থেকে যে ভাষণ চলে আসছিল এখান থেকে সে ভাষণের ধারা পুনরায় শুরু হয়েছে। অর্থাৎ মাঝখানে বলা কথাটি বাদে ভাষণের বক্তব্য হচ্ছে– ‘তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ তাদের বদ আমলের বদলা দিতে পারেন।’

إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

করার বেলায় বড়ই উদার। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে, তখন থেকে তিনি তোমাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের নাফসকে পবিত্র বলে দাবি করো না। সত্যিকার মুত্তাকী কে, তা তিনিই ভালো জানেন।

রুকূ' ৩

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৩-৩৪. (হে রাসূল!) আপনি কি ঐ লোককে দেখেছেন (যে আল্লাহ থেকে) ফিরে গেছে এবং অল্প কিছু দিয়ে ক্ষান্ত করেছে?[১৪]

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৫. তার কাছে কি গায়েবী ইলম আছে যে, সে (আসল ব্যাপার) দেখতে পায়?

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾

৩৬-৩৭. তার কাছে কি ঐ খবর পৌঁছেনি, যা মূসার কিতাবে আছে এবং ঐ ইবরাহীমের কিতাবেও আছে, যে ওয়াদা পালনের হক আদায় করে দিয়েছে?[১৫]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

৩৮. (সে খবর এই যে) কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।[১৬]

১৪. এখানে কুরাইশদের এক বড় সরদার ওলীদ বিন মুগীরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ব্যক্তি প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু যখন তার এক মুশরিক বন্ধু এ কথা জানতে পারল, তখন সে তাকে বলল, তুমি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করো না। যদি তোমার পরকালের শাস্তির ভয় হয় তবে আমাকে এ পরিমাণ টাকা দাও, আমি তোমার বদলে সেখানে শাস্তি ভোগ করার দায়িত্ব নিচ্ছি। ওলীদ এ কথা মেনে নিল এবং আল্লাহর পথে আসা থেকে ফিরে গেল। কিন্তু সে তার মুশরিক বন্ধুকে যে টাকা দেওয়ার ওয়াদা করেছিল, তাও মাত্র কিছু পরিমাণ দিয়ে বাকিটা আর দিল না।

১৫. এরপর সেই শিক্ষাসমূহের সারকথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা হযরত মূসা (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় নাযিল হয়েছিল।

১৬. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের আমলের জন্যই দায়ী। এক ব্যক্তির বোঝা অন্যের উপর চাপানো যেতে পারে না। কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও অন্য ব্যক্তির আমলের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে বহন করতে পারে না। কোনো দোষীর বদলে অন্য কোনো লোক শাস্তি ভোগ করার জন্য নিজেকে পেশ করার কারণে আসল দোষীকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে না।

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর মানুষ যার জন্য চেষ্টা করেছে তা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই নেই।[১৭]

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. আর তার চেষ্টা-সাধনা শিগ্‌গিরই দেখা হবে।

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৪১. তারপর এর পুরো বদলা তাকে দেওয়া হবে।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

৪২. আর শেষ পর্যন্ত তোমার রবের কাছেই পৌঁছতে হবে।

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।[১৮]

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾

৪৪. আর তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান।

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

৪৫-৪৬. আর তিনিই পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এক ফোঁটা বীর্য থেকে, যখন তা নিক্ষেপ করা হয়।

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর আবার সৃষ্টি করাও তাঁরই দায়িত্ব।

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তিনিই অভাব দূর করেন ও ধন-সম্পদ দান করেন।

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর তিনিই শি'রা নামক তারকার রব।[১৯]

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾

৫০. আর তিনিই আদি আদ জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন।

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

৫১. এবং সামূদ জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করেছেন, তাদের কাউকে বাকি রাখেননি।

১৭. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু পাবে, নিজের আমলের ফলই পাবে। একজনের কর্মফল অন্যজন পাবে না। চেষ্টা ও কর্ম ছাড়া কোনো ব্যক্তি কিছু পেতে পারে না।

১৮. অর্থাৎ সুখ-দুঃখ উভয়ের কারণই তাঁর পক্ষ থেকে ঘটে থাকে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উৎসমূল তাঁরই হাতে। এ বিশ্ব জগতের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ নেই, ভাগ্যের ভাঙাগড়ায় যার কোনো রকম সামান্যতম ক্ষমতাও থাকতে পারে।

১৯. 'শি'রা' অর্থ– আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা। মিসর ও আরববাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, এ তারকা মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে। এ জন্য এ তারকা তাদের উপাস্য দেবতার মধ্যে গণ্য হতো।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾

৫২. আর এর আগে নূহের কাওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা বড়ই যালিম ও অবাধ্য লোক ছিল।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা বস্তিগুলোকে উপরে তুলে ছুড়ে ফেললেন।

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

৫৪. তারপর তাদের উপর ঐ জিনিস ছড়িয়ে দিলেন, যা (তোমরা জান যে) কী ছড়িয়ে দিলেন।[২০]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

৫৫. অতএব (হে মানুষ!) তোমার রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতের উপর তুমি সন্দেহ পোষণ করবে?

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

৫৬. এ (কুরআন) আগের সাবধানবাণীর মতোই এক সাবধানবাণী।

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾

৫৭. আসার মুহূর্তটি কাছে এসে গেছে।

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. আল্লাহ ছাড়া তা হটাতে পারে এমন কেউ নেই।

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তবে কি এসব কথায়ই তোমরা অবাক হচ্ছ?

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. তোমরা হাসছ! অথচ কাঁদছ না?

وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾

৬১. তোমরা একে হেলা করে এড়িয়ে চলছ।

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

৬২. আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করো এবং তাঁরই ইবাদাত করো। (এ আয়াত পড়ার পর সিজদা করা ওয়াজিব)

২০. 'উপুড় হয়ে থাকা জনবসতি' অর্থাৎ লূত (আ)-এর কাওমের বসতি। আর 'ছড়িয়ে দিলেন তাদের উপর ঐ জিনিস' মানে সম্ভবত মৃতসাগরের জলরাশি যা জমিন ধসে যাওয়ার পর তাদের বসতিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত ঐ এলাকাকে ডুবিয়ে রেখেছে।

৫৪. সূরা কামার

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'ওয়ান শাক্কাল কামার' থেকে 'কামার' শব্দটি নিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

চাঁদ দু টুকরা হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে হাদীস ও তাফসীরকারগণ একমত যে, মক্কার নিকট মিনা নামক স্থানে হিজরতের পাঁচ বছর আগে ঐ ঘটনা ঘটেছে। এ দ্বারা সূরাটির নাযিল হওয়ার সময় সঠিকভাবে জানা যায়। ঐ সময় ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা জোরেশোরে চলছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় কিয়ামত ও আখিরাত। মক্কার কাফিররা এ কথা বিশ্বাস করতে কিছুতেই রাজি ছিল না যে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা সাজানো এ জগৎ একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এক সময় হাশরের ময়দানে সব মানুষের বিচার হবে।

চাঁদের দু টুকরা হয়ে যাওয়ার আজব ঘটনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। কাফিররা এ ঘটনা দেখেও এটাকে রাসূল (স)-এর জাদু বলে মন্তব্য করল। অথচ এ ঘটনা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কিয়ামতের সময় কাছেই এসে গেছে।

এ সূরায় কিয়ামত ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদের সময় যেমন অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, মক্কাবাসী কাফিরদেরও সে দশাই হবে। রাসূল (স)-এর মারফতে কুরআন পেশ করে তাদেরকে হেদায়াত পাওয়ার যে সহজ সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা যদি তারা গ্রহণ না করে তাহলে ধ্বংসই তাদের পরিণতি।

এ সূরায় চার বার এ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি।' এ কথাটি বড়ই গভীর অর্থপূর্ণ। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, কুরআন এমন সহজ কিতাব যে, আরবী ভাষা না জানলেও যেকোনো লোক অতি সহজেই কুরআন বুঝতে ও এ থেকে উপদেশ নিতে সক্ষম।

এ কথাটির সঠিক মর্ম বুঝতে হলে লক্ষ রাখতে হবে যে, আখিরাতকে বিশ্বাস না করার কারণে এক-একটি জাতি ধ্বংস করার কথা উল্লেখ করার পরপরই ঐ কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং এ কথাটির সারমর্ম হলো এই যে, 'আখিরাতে বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী হেদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যদি কুরআন থেকে কেউ আখিরাত সম্পর্কে উপদেশ নিতে রাজি থাকে তাহলে তাকে ধ্বংস হতে হবে না। তাই কুরআন থেকে পথ পাওয়াই সহজ। কিন্তু যদি কেউ কুরআন থেকে উপদেশ না নেয় তাহলে তাকে আখিরাত সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আযাব নাযিল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আযাব দেখার পরই সে আখিরাতকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। সুতরাং আযাব এসে গেলে উপদেশ কোনো কাজে আসবে না বলে কুরআনের উপদেশ থেকে আখিরাতকে বিশ্বাস করাই সহজ।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াত : প্রথম তিন আয়াতে মিনায় এক সন্ধ্যায় চাঁদ দু টুকরা হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার মিলিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যারা নাফসের গোলাম, তারা যুক্তির ধার ধারে না। চোখে দেখা সত্যকেও তারা জাদু বলে উড়িয়ে দিতে চায়। যা তারা মানতে চায় না তা সত্য ও যুক্তিপূর্ণ হলেও তারা তাদের মনোভাব বদলায় না।

রাসূল (স) কিয়ামত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য যে দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তা যারা কিছুতেই কবুল করতে প্রস্তুত ছিল না তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে তৃতীয় আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, সব বিষয়ের একটা পরিণাম আছে। আজ আল্লাহর রাসূল (স)-কে যারা অস্বীকার করছে এবং তাঁর কাছে পাঠানো ওহীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে তাদের জানা উচিত যে, প্রত্যেক কাজেরই পরিণাম রয়েছে। একদিন এ কথা অবশ্যই চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হবে যে, কারা সত্যের ধারক আর কারা মিথ্যার বাহক।

৪ ও ৫ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, যারা ঈমান আনতে রাজি হচ্ছে না, তারা যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে অতীতের কাফির কাওমগুলোর ইতিহাস অধ্যয়ন করত তাহলে তা থেকে তারা অবশ্যই যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। ইতঃপূর্বে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় নূহ (আ), হূদ (আ), শুয়াইব (আ) ও আরো অনেক নবীকে অস্বীকার করার যে করুণ পরিণতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা উপদেশ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যারা হঠধর্মী, যারা বিবেক দিয়ে বিচার করতেই চায় না এবং যারা নাফসের গোলামিতেই মগ্ন, তারা কখনো ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোনো সতর্কবাণীই তাদের কোনো কাজে আসে না।

৬-৮ নং আয়াত : ৬ নং আয়াতের প্রথমাংশে রাসূল (স)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান না এনে আপনাকে জাদুকর বলছে এবং আখিরাতকে স্বীকার করছে না, তাদের থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদেরকে শুধু বোঝানোর দায়িত্বই আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং সে দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। তাদেরকে হেদায়াত করার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হয়নি। হেদায়াত গ্রহণ করা তাদের দায়িত্ব। তারা বেঈমান থাকার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছে তখন তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই থাকতে দিন।

এ তিনটি আয়াতে কাফিরদের দশা আখিরাতে কেমন হবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের পর যখন বিচার দিবস শুরু হবে তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে কবরবাসী সব মানুষকে হাশরের ময়দানে হাজির হওয়ার জন্য ডাকতে থাকবে। তখন গর্ত থেকে উই পোকার দল যেভাবে বের হয়ে আসে তেমনি দলে দলে মানুষ বারযাখের অবস্থা থেকে বের হয়ে আসবে। কাফিরদের অবস্থা বড়ই করুণ হবে। ভীত ও নত চোখে তারা হতবাক হয়ে দৌড়াতে থাকবে। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হবে যে, এমন দুর্দশার জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এ ধরনের অপছন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে বলে তারা কল্পনাও করেনি। এ দিনটিকে তারা দুনিয়াতে অস্বীকার করে এসেছে। আজ তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে, কত কঠিন দিন তাদের সামনে উপস্থিত।

৯-৪০ নং আয়াত : ৯ থেকে ৪০ নং আয়াত পর্যন্ত নূহ (আ), হূদ (আ), শুয়াইব (আ) ও লূত (আ)-এর কাওমের উদাহরণ পেশ করে মক্কার কাফিরদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, নবীগণের

প্রতি ঈমান না আনার যে পরিণাম ঐ সব কাওমের হয়েছে, তোমাদেরও সে দশাই হবে, যদি রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান না আন। এক-এক কাওমের কথা উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, তাদেরকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।

প্রত্যেক কাওমের ধ্বংসের বিবরণ দেওয়ার পর ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নং আয়াতে এ কথাটি বলা হয়েছে, 'আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি, এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?'

এভাবে মক্কার কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, এখনো সময় আছে, তোমরা কুরআন থেকে উপদেশ নিতে পার। এটাই তোমাদের জন্য সহজ উপায় হিসেবে দান করেছি। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছ?

যদি হেদায়াত পাওয়ার পর এ সহজ উপায়টি তোমরা কাজে না লাগাও তাহলে ঐ চার জন নবীর কাওমের মতো তোমাদের উপরও আযাব নাযিল করা হবে। যখন আযাব এসে পড়বে তখন নিশ্চয়ই তোমাদের টনক নড়বে এবং উপদেশের মূল্য বুঝবে। কিন্তু তখন বুঝলেও কোনো লাভ হবে না। তোমরা যদি কুরআনের বদলে আযাবকেই পছন্দ কর তাহলে তা তোমাদের মর্জি। তবে আমি কুরআনকেই সহজ উপায় বানিয়েছি। তোমরা কঠিন উপায়কে বাছাই করে নিলে আমার কিছুই বলার নেই।

৯-১৭ নং আয়াতে নূহ (আ)-এর কাওমের কী দশা হয়েছিল, এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, আমার বান্দাহ নূহ আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছিল। নূহের কাওম আখিরাতকে মিথ্যা মনে করে নূহকে পাগল বলে গালি দিল এবং তাকে ধমক দিয়ে দাওয়াত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করল। তারা নানা রকমের বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে নূহকে এমন কাবু করে ফেলল যে, শেষ পর্যন্ত নূহ অতিষ্ট হয়ে আমার দরবারে ফরিয়াদ করতে বাধ্য হলো। নূহ বলল, 'হে আমার রব! আমি ওদের শয়তানির সাথে পাল্লা দিতে পারলাম না। তুমিই তাদের উপর প্রতিশোধ নাও।'

নূহ (আ)-এর এ ফরিয়াদ আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন এবং নূহের কাওমের উপর যে আযাব নাযিল করলেন তা ১১ ও ১২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আসমান থেকে অবিরাম বৃষ্টিধারা ও মাটি ফাটিয়ে হাজারো ঝরনাধারা মহা প্লাবন সৃষ্টি করে গোটা কাওমকে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিল। ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নূহকে আমি একটি নৌকায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। ঐ মহাপ্লাবনে নৌকাটিকে আমিই রক্ষা করেছিলাম। যারা নূহকে মানল না তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হলো।'

১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ নৌকাটিকে মানবজাতির জন্য উপদেশের উপায় বানিয়ে রাখা হয়েছে। জুদী পাহাড়ের উপর নৌকাটি চিরকাল থাকবে। কিন্তু কেউ কি এ থেকে উপদেশ নেওয়ার মতো আছে? এর মধ্যে এ উপদেশই রয়েছে যে, আল্লাহর যেসব বান্দাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে মেহনত করে, তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ায় এভাবেই হেফাযত করেন। আর যারা আখিরাতের জিন্দেগিকে অস্বীকার করে, তাদের উপর দুনিয়াতেই আল্লাহ আযাব নাযিল করেন।

হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইরাক বিজয়ী মুসলমানগণ ঐ নৌকাটি দেখেছেন। বর্তমান যুগেও ঐ এলাকার পাহাড়ের উপর নৌকাটি বিমান থেকে দেখা গেছে বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন।

১৬ নং আয়াতে আল্লাহ ঐ আযাবের ভয়াবহতার দিকে ইশারা করে বলছেন, মানুষ যেন চিন্তা করে যে, আল্লাহর সাবধানবাণী কত সত্য ও তাঁর আযাব কত মারাত্মক।

১৭ নং আয়াতে ঐ কথাটি বলা হয়েছে, যা এ সূরায় আরো তিনটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। নূহের কাওম ওহী থেকে উপদেশ না নেওয়ার কারণে আযাবের শিকার হলো। কিন্তু আযাব থেকে উপদেশ নেওয়ার কোনো উপায় তাদের ছিল না। আযাব তাদেরকে ধ্বংস করেই ছেড়েছে। আজো যারা কুরআন থেকে উপদেশ নেয় না, তাদেরও ঐ দশাই হবে।

১৮-২২ নং আয়াতে 'আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, আখিরাতকে মিথ্যা মনে করার কারণে 'আদ জাতিকে ভয়ানক তুফানের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলাম। ঐ তুফান এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মানুষগুলোকে উপরে তুলে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলল। আমার আযাব এমন কঠোরই হয়ে থাকে। যারা কুরআন থেকে উপদেশ নেয় না, তাদের জন্য আযাবই একমাত্র পরিণাম। উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনই সহজ উপায়।

দ্বিতীয় রুকূ'

২৩-৩২ নং আয়াতে ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২৩ থেকে ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ছামূদ জাতি আখিরাতকে অবিশ্বাস করল এবং তাদের হেদায়াতের জন্য যে নবী পাঠানো হয়েছিল তাঁকেও মিথ্যাবাদী বলে গালাগালি করল। শুআইব (আ)-কে অমান্য করার জন্য তারা যুক্তি দিল যে, 'সে তো আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। যদি আমরা তাকে মেনে চলি তাহলে বোঝা গেল, আমরা গুমরাহ হয়ে গেছি অথবা আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' তারা ঠাট্টা করে আরো বলল যে, সে ছাড়া কি আর কোনো লোক পাওয়া গেল না, যার উপর হেদায়াত নাযিল হতে পারে?

২৬ থেকে ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, হে শুআইব! এরা তোমাকে মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট বলে গালি দিচ্ছে বলে মনে দুঃখ নিও না। কালই তারা টের পাবে, কে মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট। আমি তাদের উপর আযাব নাযিলের ফায়সালা করেছি। তারা যে কত অবাধ্য, সে কথা প্রমাণ করার জন্য আমি একটি উটনী পাঠাব। তুমি এ কথা তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, এ উটনী আল্লাহর। কেউ যেন উটনীর কোনো ক্ষতি না করে। তারা যে পানি ব্যবহার করে তা প্রতিদিন তারা পাবে না। একদিন এ উটনী পানি খাবে। সেদিন যেন ওরা পানি না নেয়। অন্যদিন তারা পানি নেবে। হে নবী! তুমি একটু সবর করে দেখতে থাক, তাদের কী দশাটা হয়। এ বিষয়ে তারা তোমার হুকুম পালন না করলে তাদের উপর আযাব নাযিল করা হবে।

২৯ থেকে ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সামূদ জাতি উটনীটির উপর খেপে গেল। যেদিন উটনী পানি পান করে, সেদিন তারা পানি পায় না বলে শেষ পর্যন্ত তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেলল। তারা সাবধানবাণী মানল না বলে তাদের উপর এমন এক বিকট আওয়াজ ছুড়ে মারা হলো, যার ফলে তারা পিষে ফেলা ভুসির মতো হয়ে গেল। ওহী থেকে উপদেশ নেওয়াই তাদের জন্য সহজ ছিল। তাহলে আযাবের মতো কঠোর উপদেশের দরকার হতো না।

৩৩ থেকে ৪০ নং আয়াতে লূত (আ)-এর কাওমের ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৩৩-৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, লূত (আ)-এর কাওমও আখিরাতকে অবিশ্বাস করেছিল। তাই তাদের উপর এমন তুফান পাঠানো হলো, যা পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। অবশ্য নবী ও তাঁর পরিবারের ঈমানদারদেরকে আযাব শুরু হওয়ার আগেই শেষ রাতে ঐ এলাকা থেকে বের হয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে বলা হয়। যারা আল্লাহর নেক বান্দাহ, তাদের উপর এভাবেই নিয়ামত বর্ষণ করা হয়ে থাকে।

লূত (আ) তাঁর কাওমকে আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করেনি; বরং হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিল।

৩৭ নং আয়াতে লূত (আ)-এর কাওমের উপর আযাব নাযিলের পূর্বক্ষণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একদল ফেরেশতা সুন্দর বালকের আকারে লূত (আ)-এর বাড়িতে এলেন। লূত (আ) মেহমানদের ব্যাপারে পেরেশান হলেন। কারণ, তিনি তাঁর কাওমের বদ আমলের কথা জানতেন। তারা সুন্দর বালকদেরকে বদ কাজের উদ্দেশ্যে ধরে নেওয়ার জন্য দল বেঁধে হাজির হলো। লূত (আ) তাদেরকে ফেরানোর চেষ্টা করলেন। যখন তারা কিছুতেই কোনো কথা মানতে রাজি হলো না, তখন আল্লাহ তাদের চোখ নষ্ট করে দিলেন।

৩৮ থেকে ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, লূত (আ) শেষ রাতে এলাকা থেকে চলে যাওয়ার পর সকালেই 'পাথর বৃষ্টি'র আযাব নাযিল হলো। ওহী থেকে উপদেশ নিলে তাদের এ দশা হতো না। তেমনি কুরআনও উপদেশ নেওয়ার জন্য সহজ উপায়। মক্কাবাসীরা যদি এ থেকে উপদেশ না নেয় তাহলে তাদেরও ঐ দশাই হবে।

তৃতীয় রুকূ'

৪১ ও ৪২ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে ফিরাউনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সাবধানবাণী ও তাঁর নিদর্শনকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার পরিণামে ফিরাউন বংশকে আল্লাহ শক্ত হাতে পাকড়াও করে ধ্বংস করে দিলেন।

৪৩ ও ৪৪ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে মক্কাবাসী কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, যেসব কারণে পূর্ববর্তী ঐসব কাওমকে ধ্বংস করা হয়েছে, সে একই ধরনের অন্যায় তোমরা করছ। তোমরা কোন্ সাহসে সাবধান হচ্ছ না? আল্লাহর কিতাবে তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে বলে কি কোথাও বলা হয়েছে? অথবা তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমন মযবুত বাহিনী রয়েছে, যার সাহায্যে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে? তোমরা নূহের কাওম, 'আদ, সামূদ, লূতের কাওম ও ফিরাউনের বংশের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে ভালো, যার কারণে তাদের মতো হঠকারী অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে?

৪৫ নং আয়াত : এ আয়াতে রাসূল (স)-এর বিরোধী মক্কাবাসী কাফিরদের পরাজয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা নিজেদেরকে যত বড় বাহাদুর ও শক্তিমান মনে করুক, আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই এদেরকে পরাজিত করবেন।

হিজরতের পাঁচ বছর আগে এ আয়াতে এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী যখন দেওয়া হয়, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, এমনটা হতে পারে। সে সময় সাহাবায়ে কেরামের একদল যুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মক্কা থেকে হিজরত করে চলে যেতে বাধ্য হলেন। যাঁরা মক্কায় রয়ে গেলেন, তাঁরা রাসূল (স)-এর হাশিম বংশের সাথে আবূ তালিব নামক উপত্যকায় জেলের চেয়েও কঠিন অবরোধ অবস্থায় কাটাচ্ছিলেন।

হযরত ওমর (রা) বলেন, 'এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে, এখানে কাদের পরাজয় হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হলো? কিন্তু মাত্র ছয়-সাত বছর পরই বদরের যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর পরাজয়ের সময় যখন রাসূল (স) এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করলেন, তখন বুঝতে পারলাম যে, এ সুসংবাদই ঐ সময় আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যখন আমরা কঠিন দুর্গতি ভোগ করছিলাম।'

৪৬-৪৮ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে, ঐ পরাজয় তো শাস্তি নয়; তাদের আসল শাস্তির সময় হলো আখিরাত। সে শাস্তি এ থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক ও কষ্টদায়ক। আখিরাতকে বিশ্বাস না করার ফলে এরা দুনিয়ার ধান্দায় পড়ে আছে। তাই সুস্থ চিন্তা করার যোগ্যতা এদের নেই। ওদের মাথা ঠিক নেই বলেই এরা ভুল ধারণায় পড়ে আছে। এদেরকে উপুড় করে যখন দোযখে ফেলা হবে তখন তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা এ দোযখকে সত্য মনে করনি, এখন এর মজা বোঝ।

৪৯ ও ৫০ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা অল্প কথায় স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। বলা হয়েছে, দুনিয়ার কোনো জিনিসই বিনা পরিকল্পনায় সৃষ্টি করা হয়নি। প্রতিটি জিনিসেরই তাকদীর রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক জিনিস এক নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্রমোন্নতি লাভ করে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকে এবং বিশেষ এক সময় খতম হয়ে যায়। স্বয়ং এ দুনিয়ার ব্যাপারেও এ নিয়মই নির্ধারিত রয়েছে। দুনিয়াও এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালু থাকবে এবং এক সময় তাকেও খতম করা হবে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের এক মুহূর্ত আগেও শেষ হবে না এবং এক মুহূর্ত দেরিও করা হবে না। অর্থাৎ, এ দুনিয়া আদিতেও ছিল না এবং অনন্তকালও টিকে থাকবে না। আল্লাহর দেওয়া নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটা চালু থাকবে। তোমরা দাবি করলেই কিয়ামত হাজির হয়ে যাবে না। এ বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। দুনিয়ার এ কারখানা ধ্বংস করে কিয়ামতের ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহকে বিরাট কোনো প্রস্তুতি নিতে হবে না বা লম্বা সময় লাগাতে হবে না। আল্লাহর একটি হুকুমই এর জন্য যথেষ্ট। তাঁর হুকুম হয়ে গেলে চোখের পলকেই তা জারি হয়ে যায়।

৫১-৫৩ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে কাফিরদেরকে কঠোর সাবধানবাণী শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের মতো নাফরমান বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাহিনী তোমাদের কাছে পৌঁছা সত্ত্বেও কি উপদেশ নেওয়ার মতো কেউ নেই? তোমরা এ কথা মনে করবে না যে, এ দুনিয়ার মালিক কোনো খামখেয়ালি মেজাজের অধিকারী। তিনি তোমাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই মন্দ জেনেও যারা তা করছ এবং ভালো কোন্‌টা তা চিনেও যারা তা করছ না– এ বিষয়ে একদিন তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে। এ জন্যই দুনিয়ায় তোমরা কে কী করছ তা রেকর্ড করে রাখা হচ্ছে। ছোট-বড় কোনো কাজই রেকর্ড থেকে বাদ পড়বে না।

৫৪ ও ৫৫ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে মুত্তাকী লোকদেরকে সুখকর ও অতি সম্মানজনক পরিণামের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা এমন বেহেশতে থাকবে, যেখানে সুন্দর বাগান ও বহমান ঝরনা থাকবে। তারা মহান ও শক্তিমান বাদশাহর কাছে সত্যিকার ইজ্জতের সাথে বসবাস করবে। তাই তাদের এ সুখের জীবন স্থায়ী হবে এবং সুখ ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٥٥ رُكُوْعَاتُهَا ٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

১. কিয়ামতের সময় কাছে এসে গেছে এবং চাঁদ ফেটে গেছে।[১]

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ②

২. (কিন্তু এদের অবস্থা হলো) এরা স্পষ্ট কোনো নিদর্শন দেখলেও মুখ ফিরিয়ে নেয়; আর বলে যে, এটা তো চিরাচরিত জাদু।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ③

৩. এরা (এ ঘটনাকেও) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের নাফসের দাবিই মেনে চলছে। আর প্রত্যেক বিষয়কে শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতিতে পৌঁছতেই হয়।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ④

৪. এদের সামনে (অতীতের কাওমগুলোর) ঐ অবস্থার খবর পৌঁছেছে, যার মধ্যে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখার মতো শিক্ষণীয় উদাহরণ রয়েছে।

حِكْمَةٌ ۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ⑤

৫. আর এমন হিকমত (গভীর জ্ঞান) রয়েছে, যা উপদেশের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে; কিন্তু সতর্কবাণী তাদের কোনো কাজে আসে না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ⑥ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ⑦

৬-৭. অতএব (হে রাসূল!) এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকারী এক ভীষণ অপছন্দনীয় জিনিসের দিকে ডাকবে, সেদিন মানুষ ভীত ও নত চোখে কবর থেকে এমনভাবে বের হবে, যেন তারা ছিটকে পড়া পঙ্গপাল।

১. অর্থাৎ, চাঁদ ফেটে যাওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ। যেকোনো সময় এমনটা ঘটা সম্ভব। এ কথাটি ও এর পরে যা বলা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে সময় চাঁদ সত্যিই ফেটে গিয়েছিল। যারা নিজের চোখে ঘটনাটি দেখেছিল তারা বর্ণনা করেন, ১৩তম রাতে উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চাঁদ দু টুকরা হয়ে গেল এবং তার দুটি খণ্ড সামনের পাহাড়ের দুদিকে দেখা গেল। পরমুহূর্তেই দুটি খণ্ড আবার এক সাথে মিলে গেল। হাদীস অনুসারে দেখতে গেলে, এ বর্ণনার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই যে, এ ঘটনা রাসূল (স)-এর ইঙ্গিতেই ঘটেছিল বা মক্কার কাফিররা মুজিযার দাবি করলে এ মুজিযা দেখানো হয়েছিল।

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে যেতে থাকবে এবং কাফিররাই (যারা দুনিয়ায় এ দিনটিকে স্বীকার করত না) তখন বলবে, এ দিনটি তো বড়ই কঠিন।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾

৯. এর আগে নূহের কাওম মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। তারা আমার বান্দাহকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং বলেছিল, এ (লোকটি) তো পাগল। আর তাকে ধমক দেওয়া হয়েছিল।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾

১০. তখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি তো অপারগ হয়ে পড়েছি। তাই তুমিই এদের উপর প্রতিশোধ নাও।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

১১. তারপর আমি মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম।

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

১২. এবং জমিনকে ফাটিয়ে দিয়ে ঝরনায় পরিণত করলাম। আর এসব পানি ঐ কাজটি পুরা করার জন্য একত্র হয়ে গেল, যা (আগেই) ঠিক করে রাখা হয়েছিল।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾

১৩. আর নূহকে আমি কাঠ ও পেরেক দিয়ে তৈরি বস্তুর উপর সওয়ার করে দিলাম।[২]

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

১৪. নৌকাটি আমার দেখাশোনার মধ্যেই ভেসে চলছিল। যাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, (সে নূহের) খাতিরে এটা ওদের উপর বদলা নেওয়ার জন্যই দেওয়া হয়েছিল।

وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾

১৫. ঐ নৌকাটিকে আমি একটি নিদর্শন বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। (এ থেকে) উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٦﴾

১৬. (দেখে নাও,) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

১৭. আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?[৩]

২. অর্থাৎ, তুফান আসার আগেই আল্লাহ তাআলার হুকুমে হযরত নূহ (আ) যে নৌকা তৈরি করেছিলেন।

৩. অর্থাৎ, অবাধ্য জাতিদের উপর আল্লাহর যে শিক্ষণীয় আযাব নাযিল হয়েছে, তা তো উপদেশ দেওয়ার একটা ধরন, যা বড়ই কঠিন। কিন্তু উপদেশের আরেকটি ধরন হচ্ছে এ কুরআন, যা যুক্তি-

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾

১৮. 'আদ জাতি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। (দেখ,) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

১৯. আমি অবিরাম চলতে থাকা এক অশুভ দিনে কঠিন ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম।

تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

২০. যা লোকগুলোকে উপরে তুলে এমনভাবে ছুড়ে ফেলেছিল, যেন তারা উপড়িয়ে ফেলা খেজুর গাছের গুঁড়ি।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

২১. (দেখে নাও,) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

২২. আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?

রুকূ' ২

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৩. সামূদ জাতি সাবধানবাণীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

فَقَالُوْۤا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আর তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই একজন লোকের পেছনে চলব? যদি তা করি তাহলে এর মানে এই হবে যে, আমরা বিপথগামী হয়ে গেছি অথবা আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আমাদের মধ্যে কি শুধু এ লোকটিই ছিল, যার উপর হেদায়াত নাযিল করা হলো? না, বরং সে বড়ই মিথ্যাবাদী ও ভয়ানক দুষ্ট।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৬. (তখন আমি আমার রাসূলকে বললাম,) কালই তারা জানতে পারবে যে, কে বড় মিথ্যাবাদী ও ভয়ানক দুষ্ট।

প্রমাণ, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তোমাদেরকে সোজা-সরল পথ দেখাচ্ছে। প্রথম ধরনের তুলনায় দ্বিতীয়টা খুবই সহজ। তবে কেন তোমরা এর থেকে উপকার গ্রহণ না করে আল্লাহর আযাব দেখার জন্য জিদ ধরে আছ।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৭. আমি একটি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা হিসেবে পাঠাচ্ছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে দেখুন যে, তাদের কী দশা হয়।

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. তাদেরকে জানিয়ে দিন, তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি ভাগ করা হবে। প্রত্যেকেই যার যেদিন পালা সেদিন (পানির কাছে) হাজির হবে।[4]

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

২৯. শেষ পর্যন্ত তারা তাদের লোকটিকে ডাকল। সে এ কাজের ভার নিল এবং উটনীকে মেরে ফেলল।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩০. (দেখে নাও,) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩১. আমি তাদের উপর একটি মাত্র বিকট আওয়াজ ছুড়ে মেরেছিলাম। ফলে তারা খোঁয়াড়ে পিষে ফেলা ভুসির মতো হয়ে গেল।[5]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩২. আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৩. লূতের কাওম সাবধানবাণীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৪-৩৫. আমি তাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়েছিলাম। শুধু লূতের পরিবার তা থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমার বিশেষ নিয়ামত হিসেবে আমি তাদেরকে শেষ রাতে উদ্ধার করে

৪. এটা আল্লাহর ঐ কথার ব্যাখ্যা যে– 'আমি উটনীকে তাদের জন্য পরীক্ষা হিসেবে পাঠাচ্ছি।' পরীক্ষাটি এই– হঠাৎ একটি উটনী এনে তাদের সামনে হাজির করে দিয়ে তাদেরকে বলা হলো– 'একদিন একা এ উটনী পানি পান করবে, এবং দ্বিতীয় দিন তোমরা সব লোক নিজেদের জন্য ও নিজেদের পশুদের জন্য পানি নেবে। যেদিন উটনী পানি খাবে সেদিন তোমরা ও তোমাদের পশু যেন ঝরনা বা কূপে না আসে।' এ চ্যালেঞ্জ ঐ লোকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল, যার সম্পর্কে তারা বলত যে, এ লোকটির কোনো সৈন্যবাহিনীও নেই, কোনো বড় দলও নেই।

৫. যারা বাড়িতে পশু পালন করে তারা পশুদের থাকার জায়গায় বেড়া দিয়ে তাতে ঘাস খেতে দেয়। ঐ সব ঘাস এক সময় শুকিয়ে যায়। তখন পশুদের পায়ের চাপে তা ভুসি হয়ে যায়। সামূদ জাতির লাশগুলোকে ঐ ভুসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

এনেছিলাম। এভাবেই আমি তাদেরকে বদলা দিয়ে থাকি, যারা শোকর আদায় করে।

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৬. লূত নিজের কাওমকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল; কিন্তু তারা যাবতীয় সাবধানবাণীকে সন্দেহজনক মনে করে কথায় কথায় উড়িয়ে দিচ্ছিল।

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারপর তারা তাঁকে তাঁর মেহমানদেরকে রক্ষা করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ নষ্ট করে দিলাম। এখন আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা বুঝ।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

৩৮. সকাল সকালই এক বিরামহীন আযাব তাদেরকে ধরে ফেলল।

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾

৩৯. অতএব আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা বুঝ।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

৪০. আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?

রুকূ' ৩

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

৪১. আর ফিরাউন বংশের লোকদের কাছেও সাবধানবাণী এসেছিল।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৪২. কিন্তু তারা আমার সব নিদর্শনকেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। অবশেষে আমি এমনভাবে তাদেরকে পাকড়াও করলাম, যেভাবে কোনো বিরাট শক্তির অধিকারী ব্যক্তি পাকড়াও করে থাকে।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৩. তবে কি তোমাদের কাফিররা ঐ লোকদের চেয়ে ভালো?[৬] নাকি আসমানি কিতাবগুলোতে তোমাদেরকে ক্ষমা করার কথা লিখিত আছে?

৬. কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে এমন কী ভালো গুণ আছে যে অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা ও হঠকারিতার পথে চলার কারণে যখন অন্যান্য জাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তখন একই পথে চললেও তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না?

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۝

৪৪. অথবা তারা কি এ কথা বলে যে, আমরা একটা মযবুত বাহিনী— আমরা নিজেরাই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারব?

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝

৪৫. শিগ্‌গিরই এ বাহিনী পরাজিত হবে এবং পেছনে ফিরে পালিয়ে যাবে।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۝

৪৬. বরং কিয়ামতই (তাদের শাস্তির জন্য) আসল সময় ঠিক করা হয়েছে। আর তা অতি বড় বিপদ ও অতি বেশি তেঁতো।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝

৪৭. এ অপরাধীরা আসলে ভুল ধারণায় পড়ে আছে এবং এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝

৪৮. যেদিন এদেরকে উপুড় করে দোযখে টেনে ফেলা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে যে, এখন তোমরা দোযখের আগুনের যন্ত্রণা ভোগ কর।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝

৪৯. আমি প্রতিটি জিনিস এক তাকদীরের সাথে সৃষ্টি করেছি।[৭]

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝

৫০. আর আমার হুকুম তো একই হুকুম হয়ে থাকে এবং চোখের পলকে তা জারি হয়ে যায়।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

৫১. তোমাদের মতো অনেককেই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝

৫২. এরা যাকিছু করেছে তা সবই খাতায় লেখা আছে।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝

৫৩. আর ছোট-বড় প্রতিটি কথাই লেখা আছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝

৫৪. নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোকেরা বাগান ও ঝরনার মধ্যে থাকবে।

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

৫৫. সত্যিকার ইজ্জতের জায়গায় এবং মহাশক্তিশালী বাদশাহর কাছে (থাকবে)।

৭. অর্থাৎ, দুনিয়ার কোনো বস্তুই বিনা পরিকল্পনায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়নি; বরং প্রত্যেক জিনিসের একটি তাকদীর, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ আছে। সে অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা সৃষ্টি হয়, তাকে একটি বিশেষ আকার দান করা হয়, এক বিশেষ সীমা পর্যন্ত তা বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকি থাকে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায়।

৫৫. সূরা আর রাহমান

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা ঐ সূরা, যা 'আর রাহমান' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অবশ্য এ নামের সাথে সূরাটির আলোচ্য বিষয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কুদরত, রহমত ও মেহেরবানীর বিবরণ রয়েছে।

নাযিলের সময়

কুরআনের তাফসীরকারগণ সাধারণত এ সূরাকে মাদানী বলে মনে করেন। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে। হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কাবা শরীফে কুরাইশ সরদারদেরকে এ সূরাটি পড়ে শোনানোর সময় তারা পাথর মেরে তাঁর চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মাক্কী যুগেই ঘটেছিল।

আলোচ্য বিষয়

একমাত্র এ সূরাটিতেই মানুষের সাথে সাথে জিনকেও সম্বোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন সূরা থেকে জানা যায় যে, জিন জাতির উপরও আল্লাহর রাসূল ও কিতাবের উপর ঈমান আনার দায়িত্ব রয়েছে, যদিও তাদের উপর খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ সূরাটি ছাড়া আর কোথাও তাদেরকে সম্বোধন করে সরাসরি কোনো কথা বলা হয়নি। অবশ্য প্রথম বারোটি আয়াতে শুধু মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

১৩ নং আয়াত থেকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের পরিপূর্ণতা ও তাঁর অগণিত মেহেরবানীর কথা উল্লেখ করে ও আখিরাতে তাঁর নিকট জবাবদিহি করার চেতনা সৃষ্টি করে জিন ও মানুষকে তাঁর নাফরমানির মন্দ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে এবং তাঁর আনুগত্যের অতি আকর্ষণীয় পুরস্কারের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

এ সূরাটির সব আয়াতে এমন আকর্ষণীয় ছন্দ রয়েছে যে, পাঠকের পক্ষে মুখস্থ করা সহজ মনে হয়। বিশেষ করে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ও তাঁর কুদরতের কথা উল্লেখ করে কয়েক আয়াত পরপরই একটি আয়াত ৩১ বার আনা হয়েছে। এ আয়াতটির শব্দ একই রকম হলেও সব জায়গায় একই অর্থ বোঝায় না। তাই 'ফাবি আইয়্যি আ-লা-য়ি রাব্বিকু মা-তুকায্যিবা-ন'–এ আয়াতটির অনুবাদ করতে গিয়ে যেখানে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সে অনুযায়ীই অনুবাদ করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৪ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ কুরআনের শিক্ষা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে। আর মানবজাতির হেদায়াতের উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা করা আল্লাহর মেহেরবানীর দাবি। কারণ, তিনিই মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সৃষ্টি করেছেন, যার দরুন মানুষ কথা বলার মাধ্যমে জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চা করতে পারে। ভালো ও মন্দের পার্থক্য বোঝার শক্তি দিয়েছেন বলেই তা প্রকাশ করার জন্য কথা বলার যোগ্যতাও দান করেছেন।

আল্লাহ অবশ্যই অতি বড় মেহেরবান। আর তাঁর দয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো যে, তিনি কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের ইলম দান করেছেন। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা অগণিত নিয়ামত দান করেছেন; গোটা সৃষ্টিজগৎটাই মানুষকে নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ইসলাম। আল্লাহ যে আর রাহমান, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণই হলো দীন ইসলাম, যা তিনি কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।

৫ ও ৬ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহর হুকুমমতো চলছে। জমিন ও আসমানের প্রতিটি জিনিস তাঁর মর্জিমতো চলছে। এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্ব চলে না। সূর্য ও চন্দ্রের মতো বিরাট সৃষ্টি তাঁরই দেওয়া সীমারেখা মেনে চলতে বাধ্য। আর গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পবর্ত, আগুন-বাতাস সবই তাঁর গোলামি করছে।

চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দেওয়া নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলছে বলেই মানুষ সময়, দিন, তারিখ ও ঋতুর হিসাব রাখতে পারছে। চন্দ্র ও সূর্যকে জমিন থেকে নির্দিষ্ট দূরে রাখা হয়েছে বলেই জীব-জন্তু ও গাছ-পালা বেঁচে আছে। এর একটু কম বা বেশি হলে কোনো প্রাণী ও গাছই বাঁচবে না। চন্দ্র ও সূর্য এক স্থায়ী ক্যালেন্ডার হিসেবেই বিরাজ করছে, যার ফলে চান্দ্রমাস ও সৌরমাস এবং বছরের হিসাব করা যাচ্ছে।

৭-৯ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগৎকে ইনসাফের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। আসমান ও জমিনে যত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, এর মধ্যে যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সবাই তা পূরণ করে চলছে। যদি কেউ আল্লাহর বিধান সামান্য একটুও অমান্য করে, তাহলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। চন্দ্র যদি সূর্যকে ডিঙ্গিয়ে চলতে চায় বা রাত যদি দিন শেষ হওয়ার আগেই হাজির হয়ে যায়, তাহলে সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য খতম হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি সৃষ্টিকে আল্লাহর বিধান মানতে বাধ্য করা হয়েছে, যাতে ঐ ইনসাফ ও ভারসাম্য বজায় থাকে।

হে মানুষ! তোমাদের জন্যও আল্লাহ তাআলা ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছেন। ইনসাফের দাবি এটাই যে, তোমাদেরও ঐ বিধান মেনে চলা উচিত। আল্লাহ যার জন্য যতটুকু হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার মধ্যে কম-বেশি করলে ইনসাফের খেলাফ হবে। গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর বিধান মেনে চলছে বলেই সেখানে ইনসাফ কায়েম আছে। তোমরাও যদি তা মেনে চল, তাহলে তোমাদের জীবনেও ভারসাম্য বহাল থাকবে। যদি প্রত্যেকেই ইনসাফের সাথে অন্যের সাথে আচরণ কর তাহলে সবাই শান্তিতে থাকবে। তাই সব ব্যাপারেই ঠিক ঠিক হিসাব করে আল্লাহর বিধান মেনে চল। এমনকি বেচা-কেনার সময়ও মাপে কম-বেশি করো না। সৃষ্টিজগতের অন্য সবাইকে যেমন আল্লাহর বিধান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়েছে, তোমাদেরকে তেমন বাধ্য করা না হলেও যদি নিজের ইচ্ছায় মেনে চল, তাহলে তোমাদের জীবনেও আসমান ও জমিনের সবকিছুর মতো ইনসাফ ও ভারসাম্য কায়েম থাকবে এবং তোমরা শান্তিতে থাকতে পারবে।

১০-২৫ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে আল্লাহ তাআলার ঐসব নিয়ামত ও মেহেরবানী এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা ও কুদরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা জিন ও মানুষ উপকার লাভ করছে। আর এসবের স্বাভাবিক ও নৈতিক দাবি এই যে, ঈমান আনা ও কুফরী করার ইখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও নিজের আগ্রহ ও ইচ্ছায় মনিবের গোলামির পথে চলা জিন ও মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

১০ থেকে ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, জমিনকে সব প্রাণীর জন্য বানানো হয়েছে। এর মধ্যে সব রকম ফল, শস্য ও ভুসি রয়েছে, যা জিন, মানুষ, পশু ও পাখি সবাই ভোগ করে থাকে। তাই হে জিন ও মানুষ! তোমাদের এসব নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে আল্লাহর হুকুমমতো চলা উচিত। কারণ, এর কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আরবী 'আ-লা-উন' শব্দের অর্থ ব্যাপক নিয়ামত, মেহেরবানী, কুদরত, গুণাবলি ইত্যাদি। আল্লাহর নিয়ামত ও কুদরতকে অস্বীকার করার কয়েক রকম অর্থ হতে পারে :

১. সৃষ্টিজগতের স্রষ্টাকে অস্বীকার করা। সবকিছু আপনিই সৃষ্টি হয়েছে মনে করে আল্লাহকে অস্বীকার করা।
২. আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যান্য শক্তিকে আল্লাহর সাথে শরীক করা।
৩. আল্লাহকে সবকিছুর খালিক ও মালিক বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও সবক্ষেত্রে তাঁকে হুকুমকর্তা ও বিধানদাতা হিসেবে মানতে অস্বীকার করা।
৪. আল্লাহকে খালিক, মালিক, হাকীম ও বিধানদাতা বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে তাঁর আদেশ ও নিষেধ না মানা।

১৪ থেকে ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে মাটি থেকে এবং জিনকে আগুন দিয়ে তৈরি করেছেন। সুতরাং হে জিন ও মানুষ! যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন তাঁর এ ক্ষমতাকে তোমরা কেমন করে অস্বীকার করবে? তিনি মাটি থেকে মানুষ ও আগুন দিয়ে জিন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও উভয়কে যেসব দৈহিক ও মানসিক গুণাবলি ও যোগ্যতা দান করেছেন, তা তোমরা কি অস্বীকার করতে পার? এ সবের শুকরিয়া আদায় করা কি কর্তব্য নয়?

১৭ ও ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও সূর্যের মালিক হিসেবে দিন ও রাতের ব্যবস্থা করে একদিকে তাঁর কুদরতের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণিজগৎকে জীবন ধারণের উপযোগী অগণিত নিয়ামত দান করেছেন।

এখানে দুটো পূর্ব ও দুটো পশ্চিম দ্বারা শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অথবা পৃথিবীর এক অর্ধেকে একবার এবং অপর অর্ধেকে আরেকবার সূর্যের উদয় ও অস্তকে বোঝানো হয়েছে। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমদিকে ডোবে। শীতকালের সবচেয়ে ছোট দিনে এবং গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে বড় দিনে সূর্যের উদয় হওয়ার ও অস্ত যাওয়ার স্থান ভিন্ন হয় বলে দুটো পূর্ব ও দুটো পশ্চিম বলা হয়েছে। অর্থাৎ শীতের পূর্ব ও পশ্চিম এবং গ্রীষ্মের পূর্ব ও পশ্চিম।

দুটো পূর্ব এবং দুটো পশ্চিমের আরো এক অর্থ হতে পারে। পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে সারা পৃথিবীতে একই সময় সূর্য দেখা যায় না। একদিকে যখন সূর্য ওঠে তখন অপর অর্ধেক এলাকায় রাত হয়। তাই দু অর্ধেক এলাকায় সূর্য দু বার ওঠে ও ডোবে।

পৃথিবী ও সূর্য যে আল্লাহর হুকুমে চলে, তাঁর কুদরত ও নিয়ামতকে জিন ও মানুষ কী করে অস্বীকার করবে?

১৯ থেকে ২১ নং আয়াতে আল্লাহর এক আজব কুদরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে কোনো বড় নদীর পানি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে সেখানে দেখা যায় যে, উভয়ের মিলিত হওয়ার জায়গায়ও নদীর মিঠা পানি ও সমুদ্রের লোনা পানি মিশে একাকার হয়ে যায় না। মাঝখানে এমন একটা চিহ্ন থেকে যায় যে, একটা থেকে অন্যটাকে আলাদাভাবে চেনা যায়।

[বাংলাদেশে চাঁদপুর ও বরিশালের সীমান্তে পদ্মা ও মেঘনার পানি যেখানে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানেও একটা স্পষ্ট রেখা দেখা যায়, যা উভয় নদীর পানিকে পৃথক করে রেখেছে।– অনুবাদক]

সমুদ্রের তীব্র লবণাক্ত পানির মাঝেও মিঠা পানির পৃথক ধারা বহমান পাওয়া যায়, যেখান থেকে নাবিকেরা খাবার পানি জোগাড় করে থাকে। সৌদি আরবের দাহরানের পাশে পারস্য উপসাগর থেকে এ জাতীয় মিঠা পানি তোলা হতো। বাহরাইনের নদীতেও এরূপ মিঠা পানি পাওয়া যেত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ আলাদা করে খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আগের মতো সমুদ্র থেকে মিঠা পানি আর তালাশ করার দরকার হচ্ছে না।

এ কথা উল্লেখ করে জিন ও মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এমন আজব নিয়মে খাবার পানির ব্যবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কে করতে পারে? সুতরাং তারা আল্লাহর এ কুদরত ও নিয়ামতকে কেমন করে অস্বীকার করবে?

২২ ও ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রের পানি থেকে যে মণি-মুক্তা তোলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া আর কে সৃষ্টি করে? যে আল্লাহ মানুষের পিপাসা মেটানোর জন্য এত মূল্যবান জিনিসের ব্যবস্থা করেছেন তার কুদরত ও নিয়ামতকে কীভাবে অস্বীকার করা যায়?

২৪ ও ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ের উপর পাহাড়ের মতো উঁচু জাহাজে চড়ে বেড়ানোর ব্যবস্থা আল্লাহই করেছেন। যেসব জিনিস দিয়ে জাহাজ তৈরি করা হয় তাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জাহাজ বানানোর কৌশল তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন এবং সমুদ্রের পানিকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর এ কুদরত ও নিয়ামতকে কীভাবে অস্বীকার করা চলে?

দ্বিতীয় রুকূ'

২৬-৩০ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে জিন ও মানুষকে এ মহাসত্য কবুল করার জন্য বলা হয়েছে যে, গোটা বিশ্বে এক আল্লাহ ছাড়া চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব অন্য কেউ নেই। ছোট-বড় এমন কোনো জিনিস নেই, যা আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। আসমান ও জমিনে যাকিছু হচ্ছে তা সবই একমাত্র তাঁর কীর্তি।

আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিলোকের সবই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার যখন তিনি চাইবেন, তখন যা সৃষ্টি করতে চান করবেন। শুধু তাঁর অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। আর সবার অস্তিত্ব তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

এসব কথার ভেতর দিয়ে আল্লাহ তাআলা জিন ও মানুষকে দুটো মহাসত্যের সন্ধান দিয়েছেন :

১. ইতিহাস ও গোটা বিশ্বজগৎ এ কথার সাক্ষী যে, তোমরা কেউ চিরকাল দুনিয়ায় থাকবে না। আর যতকিছু তোমরা ভোগ করছ এর কোনোটাই চিরস্থায়ী নয় । এ অবস্থায় যদি কোনো জিন বা মানুষ নিজেকে বড় মনে করে আর কিছু লোকের মুনিব সাজার চেষ্টা করে তাহলে তা কয়দিন স্থায়ী থাকতে পারে? ৫০ ও ৬০ বছর দুনিয়ায় দাপট দেখানোর পর তার পতন তো অবশ্যই হবে। তাহলে এ বাহাদুরি করার বোকামিতে কী লাভ হবে? এর পরিণামে অনন্তকাল চরম যাতনা সইতে হলে এ বাহাদুরি কী কাজে আসবে?

২. আল্লাহ ছাড়া আর যত কিছুকে তোমরা মা'বুদ, নাজাতদাতা, বিপদের সহায়, করুণা নিধান, অগতির গতি বানিয়ে নিয়েছ, তাদের কারো কোনো ক্ষমতা নেই। ফেরেশতা, জিন, নবী, ওলী,

চন্দ্র, সূর্য বা অন্য যাকেই তোমরা ডাক তাদের কেউ তোমাদের সামান্য প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা রাখে না। এরা তো সবাই আল্লাহর দয়ার কাঙ্গাল। এরা কেউ নিজের প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা রাখে না, অপরের জন্য তারা কী কাজে লাগতে পারে? দুনিয়ায় যাকিছু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে। তাই হে জিন ও মানুষ! তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ কুদরত ও নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩১-৩৬ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে জিন ও মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, শীঘ্রই তোমাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার সময় আসবে। দুনিয়ার জীবনে তোমরা যাকিছু করে বেড়াচ্ছ ..., তন্ন করে সে বিষয়ে আখিরাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বিচারের কাঠগড়া থেকে কোথাও তোমরা পালিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহর ক্ষমতা তোমাদেরকে সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এ ঘেরাও থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে পালানোর চেষ্টা করে দেখতে পার।

৩১ নং আয়াতে জিন ও মানুষকে 'জমিনের বোঝা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দুনিয়ার অন্যসব সৃষ্টি বাধ্য হয়ে আল্লাহর মর্জিমতো চলছে। তারা জগতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। আল্লাহর গতিশীল দুনিয়ায় অবিরাম তারা আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করে চলছে। তাদের অস্তিত্ব ও তাদের কার্যাবলি পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়মে কোনো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহর মর্জির খেলাফ স্বাধীনভাবে চলার জন্য মানুষকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে বলে তারা গোটা সৃষ্টিজগতের সাবলীল গতিধারা থেকে ভিন্ন। প্রকৃতিকে তারা আল্লাহর পছন্দের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করে বলে তারা জগতের বোঝা বা প্রকৃতির নিকট অপছন্দনীয়।

৩১ নং আয়াতের শেষদিকে 'তোমাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার জন্য আমি অবসর নিচ্ছি' বলা হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ এখন ব্যস্ত আছেন এবং হিসাব নেওয়ার জন্য অবসরের অপেক্ষা করছেন। এ কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতির ব্যাপারে যে 'টাইম টেবল' তৈরি করেছেন, তাতে বর্তমান দুনিয়ায় তিনি হিসাব নেবেন না।

আল্লাহ তাআলা জিন ও মানুষের জন্য যে সময়সীমা ঠিক করেছেন তার তিনটি অংশ রয়েছে। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত দুনিয়ায় মানুষের স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কিয়ামতের পর থেকে হাশরের পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ। হাশরের ময়দানে জিন ও মানুষের দুনিয়ার জীবনের হিসাব নেওয়া হবে– এটা শেষ অংশ।

আল্লাহ তাআলা বলতে চাচ্ছেন যে, তোমাদের হিসাব-নিকাশের সময় নির্দিষ্ট আছে। আমি এখন তোমাদের হিসাব নিচ্ছি না বলেই কি তোমরা আমার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পার?

৩৭ ও ৩৮ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে জিন ও মানুষের হিসাব নেওয়ার পূর্বে কিয়ামত হবে। আসমান ও জমিনের যে কারখানা এখন চালু রয়েছে, সেদিন তা ভেঙে দেওয়া হবে। গ্রহ-উপগ্রহে ভরপুর গোটা সৃষ্টিজগৎ বর্তমানে যেভাবে আল্লাহর হুকুমে নিয়মিত চলছে, তা তছনছ করে দেওয়া হবে। ঐ ধ্বংসলীলা চলার সময় গোটা আসমান লাল চামড়ার মতো দেখাবে। অর্থাৎ মনে হবে যে, উপরে চারদিকে যেন আগুন লেগে আছে। নীল আসমানের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

৩৯-৪৫ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর নাফরমানি করে বেড়াচ্ছিল তাদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা পাপী ও দোষী তাদের পেরেশান চেহারা, ভীতসন্ত্রস্ত চোখ ও অস্থিরভাব দেখেই বোঝা যাবে যে, কারা অপরাধী। তাদেরকে চিনে নেওয়ার জন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তখন তাদের মাথার চুল ধরে টেনে ও পায়ে শিকল লাগিয়ে হেঁচড়িয়ে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন দেখা যাবে, তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মেহেরবানী ও ক্ষমতার কথা তোমরা অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পার। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যে দোযখকে মিথ্যা মনে করতে তা এখন দেখে নাও। এ কথা বলে যখন তাদেরকে দোযখে ছুড়ে ফেলা হবে তখন তারা আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকবে। আগুন থেকে বাঁচার আশায় তারা পানির দিকে দৌড়িয়ে যাবে; কিন্তু ফুটন্ত পানি দেখে ফিরে আসবে। এভাবে দৌড়াতেই থাকবে।

তৃতীয় রুকূ'

৪৬-৭৭ নং আয়াত : এ রুকূ'তে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার জীবন যাপন করেছে এবং আখিরাতে হিসাব দেওয়ার চেতনা নিয়ে আমল করেছে তাদেরকে কী কী নিয়ামত দেওয়া হবে, এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এক-একটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা কি তা অস্বীকার করতে পার?

আল্লাহকে ভয় করে যারা চলে তারা মনে করে যে, আখিরাতে আল্লাহর দরবারে সব কিছুরই হিসাব দিতে হবে। যার এ বিশ্বাস আছে, সে অবশ্যই নাফসের গোলামি থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। সে হক ও বাতিল, যুলুম ও ইনসাফ, পাক ও নাপাক, হালাল ও হারাম ইত্যাদি বাছাই করে চলে। এমন লোকদের জন্য কী কী পুরস্কার রয়েছে তার বিবরণই এ রুকূ'তে দেওয়া হয়েছে।

৪৬ থেকে ৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের জন্য এমন দুটো বাগান রয়েছে, যার গাছগুলো সবুজ ডালপালায় ভরপুর থাকবে; সেখানে ঝরনাধারা বহমান থাকবে এবং প্রতিটি ফল দু রকমের হবে (একরকম হয়তো দুনিয়ার পরিচিত ফলের মতোই হবে, যদিও এর স্বাদ অনেক উন্নত এবং আরেক রকম হয়তো নতুন ধরনের হবে)।

বেহেশতী লোকেরা রেশমি বিছানায় আরামে বসে থাকবে এবং গাছের ফলগুলো ডালাসহ তাদের দিকে ঝুঁকে থাকবে, যাতে বিনা কষ্টে তারা তাদের পছন্দানুযায়ী ফল তুলে নিতে পারে। এমনকি তারা চাইলে গাছের ডালা ফলসহ তাদের সামনে এগিয়ে আসবে।

৫৬ থেকে ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বেহেশতী পুরুষদের সাথী হিসেবে এমন বিবি দেওয়া হবে, যারা যে বয়সেই মরে থাকুক, সেখানে তাদেরকে কুমারী ও যুবতী বানিয়ে দেওয়া হবে। যে পুরুষের জন্য যে নারী সাথী হিসেবে দেওয়া হবে সে পুরুষ ছাড়া ঐ নারীর সাথে বেহেশতের অন্য কোনো পুরুষের সম্পর্ক থাকবে না। মানুষের মতো জিনদের জন্যও তাদের জাতি থেকে সাথী দেওয়া হবে। বেহেশতী বিবিদের সবচেয়ে বড় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা লাজুক হবে। স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি তারা আকৃষ্ট নয়। সুন্দরী হওয়ার চেয়ে এ গুণটিই নারীর বড় ভূষণ।

বেহেশতী নারীরা হিরা ও মণি-মুক্তার মতো সুন্দর হবে। লাজুক হওয়ার কারণেই তাদের সৌন্দর্যকে মণি-মুক্তা ও হিরার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মণি-মুক্তা পথে-ঘাটে ফেলে রাখা হয় না; যত্ন করে কৌটায় রাখা হয়। বেহেশতী নারীরা শুধু তাদের স্বামীর কাছেই মণি-মুক্তার মতো সযত্নে থাকবে।

৬০ ও ৬১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করছেন যে, যারা নেক আমল করল, তাদের বদলা নেকী ছাড়া আর কী হতে পারে? যারা দুনিয়ায় আমার মর্জিমতো চলার জন্য এত ত্যাগ করল, নাফসের দাবি অস্বীকার করে যাতনা ভোগ করল, বেহেশতের আশায় দুনিয়ার মজা বাদ দিল– আখিরাতে আমি তাদেরকে কি পুরস্কার না দিয়ে পারি?

৬২ থেকে ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ঐ দুটো বাগান ছাড়া আরো দুটো বাগান থাকবে, যা সবুজ ও সতেজ হবে। সেখানে ফোয়ারার মতো ঝরনা থাকবে এবং প্রচুর ফলমূল, খেজুর ও ডালিম থাকবে।

হাদীসের বিবরণ থেকে মনে হয় যে, প্রথমে যে দুটো বাগানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় লোকদের জন্য, যাদেরকে সূরা ওয়াকিআতে 'সাবিকূন' ও 'মুকাররাবূন' বলা হয়েছে। এবং শেষে যে দুটো বাগানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ঐ নেক লোকদের জন্য, যাদেরকে 'আসহাবুল ইয়ামীন' বা 'আসহাবুল মাইমানা' বলা হয়েছে।

৭০ থেকে ৭৭ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, এ দুটো বাগানে যারা থাকবে তাদের জন্যও নেক ও সুন্দরী স্ত্রী থাকবে, আর হূরেরা সাজানো তাঁবুতে বাস করবে। এসব স্ত্রী ও হূরকে যাদের সাথী হিসেবে দেওয়া হবে তাদের পূর্বে ঐ সব স্ত্রী ও হূরদেরকে অন্য কোনো পুরুষ কখনো স্পর্শ করেনি। এখানেও বেহেশতীরা সবুজ গালিচা ও আরামদায়ক বিছানায় হেলান দিয়ে বসে বেহেশতী ফল ভোগ করবে।

হূরদের কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে যে, তারা তাঁবুতে থাকবে। এতে বোঝা যায়, বেহেশতী পুরুষরা তাদের স্ত্রীর সাথে বালাখানা বা প্রাসাদে বাস করবে। আর হূরগণ তাঁবুতে থাকবে। এতে মনে হয় যে, দুনিয়ায় যেসব পুরুষ ও নারী নেক আমল করেছে তারাই বেহেশতে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে থাকবে। তারা দুনিয়ার কাজের পুরস্কার হিসেবেই বেহেশতে যাবে।

হূর জিন বা মানুষ জাতির বাইরে কোনো এক বিশেষ সৃষ্টি। এরা নেক আমলের পুরস্কার হিসেবে বেহেশতে যাবে না। এরা দুনিয়ায় বসবাসও করেনি। বেহেশতীদের জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হবে। কোনো কোনো হাদীস থেকে মনে হয় যে, অমুসলিমদের যে মেয়েরা অল্প বয়সে মারা গেছে তারা কোনো পাপ না করায় তাদের পিতা-মাতার সাথে তাদেরকে দোযখে ফেলে দেওয়া হবে না, তাদেরকে হূর বানিয়ে বেহেশতে রাখা হবে, যেমন অমুসলিমদের ছেলে, যারা বালেগ হওয়ার আগে মারা গেছে তাদেরকে বেহেশতীদের খাদেম বানিয়ে দেওয়া হবে।

৭৮ নং আয়াত : সূরার শেষ আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনার রব বড়ই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নাম বড়ই বরকতময়। তাই তাঁর নামের তাসবীহ পড়ুন।

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٧٨ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝

১-২. অতি বড় মেহেরবান আল্লাহ এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

৩-৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

৫. চন্দ্র ও সূর্য একটা হিসাব মেনে চলতে বাধ্য।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝

৬. আর তারকা ও গাছপালা সিজদায় রত আছে।[1]

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝

৭. তিনি আসমানকে উঁচু করেছেন এবং ভারসাম্য কায়েম করেছেন।[2]

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝

৮. (এর দাবি এই যে,) তোমরা ভারসাম্য বিনষ্ট করো না।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝

৯. আর ইনসাফের সাথে ঠিক ঠিক ওজন করো এবং মাপে কম দিও না।[3]

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝

১০. জমিনকে তিনি সব সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝

১১. এর মধ্যে সব রকমের ফল রয়েছে। আর খেজুর গাছ রয়েছে, যার ফল পাতলা আবরণে ঢাকা।

১. অর্থাৎ অনুগত, আল্লাহর আদেশ একটুও অমান্য করে না।

২. প্রায় সকল তাফসীরকার এখানে 'মীযান' (তুলাদণ্ড)-এর অর্থ 'ন্যায়বিচার' গ্রহণ করেছেন এবং মীযান কায়েম করার এ অর্থ তাঁরা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টিজগৎকে ন্যায়বিচারের উপর কায়েম রেখেছেন।

৩. অর্থাৎ যেহেতু তোমরা এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছ, যার গোটা ব্যবস্থাপনা ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু তোমাদেরও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। যে সীমারেখার মধ্যে তোমাদের স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যদি তোমরা অন্যায়-অবিচার কর, তবে তোমাদের পক্ষে তা হবে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি বিদ্রোহ।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

১২. সব রকমের শস্য রয়েছে, যার মধ্যে ভুসিও হয়, দানাও হয়।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

১৩. অতএব (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?[৪]

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. মানুষকে তিনি মাটির পাত্রের মতো শুকনো কাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾

১৫. আর জিনকে তিনি আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

১৬. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ আজব ক্ষমতাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

১৭. তিনিই উভয় উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক।[৫]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

১৮. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ কুদরতী শক্তিকে তোমরা অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

১৯. তিনি দুটি দরিয়াকে বহমান করেছেন, যারা একে অপরের সাথে মিশে যায়।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

২০. তবু উভয়ের মাঝে এমন এক পর্দা আড়াল হয়ে আছে, যা তারা ভেদ করে না।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

২১. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কুদরতের কোন্ কোন্ আজব কাজকে তোমরা অস্বীকার করবে?

৪. মূলে আ-লা-ই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এ শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এর অনুবাদে বিভিন্ন স্থানে এর মর্ম বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ নিয়ামতসমূহও হয়, শক্তি ও মহিমার পূর্ণতাও হয় এবং প্রশংসনীয় গুণাবলিও হয়। প্রসঙ্গ অনুযায়ী যেখানে যে অর্থ বেশি উপযোগী মনে হয়, সেখানে সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

৫. 'উভয় উদয়াচল এবং অস্তাচল' তথা 'দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম'-এর অর্থ শীতকালের সবচেয়ে ছোট দিন ও গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে বড় দিনের পূর্ব (উদয়স্থল) ও পশ্চিম (অস্তস্থল) হতে পারে এবং পৃথিবীর গোলার্ধের দুটো পূর্ব ও দুটো পশ্চিমও হতে পারে।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২২. উভয় দরিয়া থেকে মণি-মুক্তা ও প্রবাল বের হয়ে আসে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

২৩. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কুদরতের কোন্ কোন্ কৃতিত্বকে তোমরা অস্বীকার করবে?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৪. সাগরে পাহাড়ের মতো উঁচু যে জাহাজ রয়েছে, তার মালিক তিনিই।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

২৫. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মেহেরবানীকে তোমরা অস্বীকার করবে?

রুকূ' ২

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

২৬. প্রতিটি জিনিস, যা দুনিয়ায় আছে তা ধ্বংসশীল।

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৭. (হে রাসূল!) শুধু আপনার রবের মহান ও সম্মানিত সত্তাই বাকি থাকবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

২৮. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মহিমাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. আসমান ও জমিনে যারাই আছে, তারা সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁরই নিকট চায়। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুন মহিমায় বিরাজ করেন।[৬]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

৩০. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ গুণ-গরিমাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

৬. অর্থাৎ, সব সময় এ বিশ্ব-কারখানার মধ্যে তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিরামহীনভাবে চালু আছে। তিনি সীমাহীন অসংখ্য বস্তু নতুন নতুন ভঙ্গি, আকৃতি ও গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর দুনিয়া কখনো একই অবস্থায় নেই, প্রতি মুহূর্তে তার অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার স্রষ্টা প্রত্যেক বারই তাকে এক নতুন আকারে গঠন করছেন, যা পূর্ববর্তী সব আকার থেকে আলাদা।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾

৩১. হে জমিনের দু বোঝা![৭] শিগ্‌গিরই তোমাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার জন্য আমি অবসর নিচ্ছি।[৮]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾

৩২. (তখন আমি দেখে নেব) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মেহেরবানীকে তোমরা অস্বীকার করতে পার।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۗ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে জিন ও মানবসমাজ! যদি আসমান ও জমিনের সীমানা পার হয়ে তোমরা পালিয়ে যেতে পার, তাহলে পালাও দেখি। কিছুতেই পালাতে পারবে না। এর জন্য অনেক শক্তি লাগবে।[৯]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ কুদরতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

৩৫. (যদি তোমরা পালাতে চেষ্টা কর তাহলে) তোমাদের উপর আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া হবে। তোমরা তা ঠেকাতে পারবে না।

৭. মূলে 'ছাকালান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাহনের উপর চাপানো বোঝাকে ছাকালুন বলে। 'ছাকালান'-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'দুটো চাপানো বোঝা'। এখানে এ শব্দ জিন ও মানুষকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এরা উভয়েই জমিনের উপর বসবাস করছে। এখানে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য জিন ও মানুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ যেন দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা তাঁর অযোগ্য দলকে ডেকে বলেছেন, হে জিন ও মানুষের দল! তোমরা যারা আমার পৃথিবীর বোঝা হয়ে আছ, আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে দেখে নেওয়ার জন্য অবসর হয়ে নিচ্ছি।

৮. এর মর্ম এই নয় যে, এ সময় আল্লাহ তাআলা এত ব্যস্ত যে, অবাধ্য বান্দাদের কৈফিয়ত নেওয়ার জন্য তাঁর অবসরই মিলছে না; বরং এর আসল অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এর জন্য একটি সময়সূচি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে হিসেবে মানুষ ও জিনের শেষ বিচারের সময় এখনো আসেনি।

৯. 'জমিন' ও 'আসমান'-এর অর্থ বিশ্বজগৎ বা অন্য কথায় আল্লাহর গোটা সৃষ্টিলোক। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য তোমাদের নেই। যে বিচারের খবর তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তার সময় এলে তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমাদেরকে ধরে আনা হবে। এ পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে হলে তোমাদেরকে আল্লাহর রাজ্য থেকে পালিয়ে যেতে হবে; কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি নিজেদের মনে এরূপ শক্তির অহঙ্কার তোমাদের থাকে, তবে শক্তি প্রয়োগ করে একবার দেখ না।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতএব (হে জিন ও মানুষ,) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারপর যখন আসমান ফেটে যাবে[10] এবং লাল চামড়ার মতো রঙ ধারণ করবে (তখন কী দশাটা হবে?)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾

৩৮. অতএব (হে জিন ও মানুষ,) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾

৩৯. ঐ দিন কোনো জিন ও মানুষকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার দরকার হবে না।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾

৪০. অতএব (হে জিন ও মানুষ! তখন দেখা যাবে যে, সেদিন) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মেহেরবানীকে তোমরা অস্বীকার করতে পার।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

৪১. অপরাধীরা সেখানে তাদের চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে এবং তাদের কপালের চুল ও পা ধরে হেঁচড়ানো হবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

৪২. (তখন) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. (তখন বলা হবে,) এটাই ঐ দোযখ, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা মনে করত।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. ঐ দোযখ ও ফুটন্ত পানির মাঝে তারা ছোটাছুটি করতে থাকবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

১০. আসমান ফেটে যাওয়ার অর্থ আকাশের বাঁধন খুলে যাওয়া, প্রাকৃতিক বিধান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া, তারকা ও গ্রহসমূহ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

রুকূ’ ৩

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর যে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখে[১১] তার জন্য দুটো বাগান রয়েছে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

৪৭. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. দুটোই সবুজ-সতেজ ডালপালায় ভরপুর।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

৪৯. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

৫০. দু বাগানেই দুটো ঝরনা বহমান আছে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾

৫১. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

৫২. উভয় বাগানে প্রতিটি ফল দু রকমের হবে।[১২]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

৫৩. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. (জান্নাতী লোকেরা সেখানে) এমন বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে, যার ভেতরের কাপড় মোটা রেশমের হবে। আর উভয় বাগানের ডালপালা ফলের ভারে ঝুঁকে পড়তে থাকবে।

---

১১. যে আল্লাহকে ভয় করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে এবং এ কথা বুঝে কাজ করেছে যে, একদিন আমাকে নিজের প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের কাজের হিসাব দিতে হবে।

১২. এর এক অর্থ হতে পারে, দুটি বাগানের ফলের ধরন আলাদা হবে। একটিতে গেলে দেখা যাবে, ডালপালা এক ধরনের ফলের ভারে ঝুঁকে আছে; আরেক বাগানে গেলে দেখা যাবে, এর ফলের ধরন অন্য রকম। দ্বিতীয় অর্থ এ-ও হতে পারে, উভয় বাগানেই এক প্রকারের ফল থাকবে, যা পরিচিত, দুনিয়ায় যে ফল সম্পর্কে জানা ছিল, স্বাদে তা দুনিয়ার ফল থেকে যতই ভালো হোক না কেন। আরেক রকম ফল হবে অসাধারণ, দুনিয়ায় যা কখনো কেউ স্বপ্নেও দেখেনি, কল্পনাও করেনি।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٥	৫৫. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٥٦	৫৬. এসব নিয়ামতের মধ্যে চোখ নিচু করে থাকা মেয়েরা থাকবে[১৩], যাদেরকে (এই জান্নাতী লোকদের) আগে কখনো কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।[১৪]
فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٧	৫৭. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝٥٨	৫৮. তারা হীরা ও মণি-মুক্তার মতো (সুন্দর)।
فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٩	৫৯. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝٦٠	৬০. নেকীর বদলা নেকী ছাড়া আর কী হতে পারে?
فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦١	৬১. অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মহৎ গুণকে তোমরা অস্বীকার করবে?
وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝٦٢	৬২. ঐ দুটো বাগান ছাড়া আরো দুটো বাগান থাকবে।[১৫]
فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٣	৬৩. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?
مُدْهَآمَّتٰنِ ۝٦٤	৬৪. ঘন সবুজ-সতেজ দুটো বাগান।

১৩. নারীর আসল সৌন্দর্য হচ্ছে বে-শরম না হওয়া, তার চক্ষুতে লজ্জা থাকা। এ কারণে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের নিয়ামতের মধ্যে নারীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের নয় বরং তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। রূপবতী নারীগণ তো ক্লাবে ও সিনেমা স্টুডিওতেও জমা হতে পারে। রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় তো বেছে বেছে রূপবতী নারীদের নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কু-রুচি ও কু-স্বভাববিশিষ্ট লোকেরাই মাত্র তাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। ঐ রূপ ও সৌন্দর্য কোনো ভদ্র মানুষের মন আকর্ষণ করতে পারে না, যা প্রতিটি চোখকে দেখার জন্য দাওয়াত দেয় এবং প্রতিটি কোলের সজ্জা হতে প্রস্তুত।

১৪. এ থেকে জানা গেল, সৎ মানুষদের মতো সৎ জিনও বেহেশতে যাবে। মানুষের জন্য মানবী স্ত্রীলোক ও জিনদের জন্য থাকবে জিন জাতীয় নারী এবং আল্লাহর কুদরতে (শক্তিমহিমায়) সকলকে কুমারী করে দেওয়া হবে।

১৫. সম্ভবত প্রথম দুটো বাগান বসবাস করার জন্য এবং অপর দুটো বাগান আমোদ-প্রমোদের জন্য।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾

৬৬. উভয় বাগানের মধ্যে দুটো ঝরনা ফোয়ারার মতো উথলিত হতে থাকবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

৬৭. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. এ দুটো বাগানে প্রচুর ফলমূল, খেজুর ও ডালিম থাকবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

৬৯. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

৭০. এসব নিয়ামতের মধ্যে সচ্চরিত্রা ও সুন্দরী স্ত্রীরা থাকবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

৭১. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭২. হূরেরা সাজানো তাঁবুতে থাকবে।[১৬]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

৭৩. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

৭৪. এই (জান্নাতী) লোকদের আগে কখনো কোনো মানুষ বা জিন তাদেরকে স্পর্শ করেনি।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

৭৫. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. (ঐ বেহেশতী লোকেরা) সবুজ গালিচা ও মূল্যবান সুন্দর বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

৭৭. অতএব তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমার মহিমাময় ও সম্মানিত রবের নাম খুবই বরকতময়।

---

১৬. সম্ভবত তাঁবুর দ্বারা ঐ রকমের শিবিরকে বোঝানো হয়েছে, যা রাজা-বাদশাহদের জন্য সফরের সময় তৈরি করা হয়। ঐসব তাঁবুতে হূরগণ বেহেশতীদেরকে আনন্দ দান করবে।

৫৬. সূরা ওয়াকি'আহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'ওয়াকিয়াহ' থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো 'ঘটনাটি'।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি হযরত উমর (রা)-এর ঈমান আনার পূর্বে নাযিল হয়েছে। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তিনি একদল মুসলমানের প্রথম হিজরতের পর নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে ঈমান আনেন। হযরত উমরের ঈমান আনার ঘটনা ইতিহাসবিখ্যাত। তিনি তাঁর বোন ফাতিমা (রা) ও ভগ্নিপতি ঈমান এনেছে শুনে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য গেলেন। ঐ সময় তাঁরা সূরা ত্বা-হা তিলাওয়াত করছিলেন। হযরত উমরের আগমন টের পেয়ে তাঁরা লিখিত সূরাটি লুকিয়ে ফেলেন। হযরত উমর প্রথমে ভগ্নিপতিকে মারধর করতে লাগলেন। তাঁর বোন বাধা দিলে তাঁকেও মারেন। বোনের মাথা ফেটে রক্ত পড়তে দেখে তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা! তোমরা কী পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও।' বোন বললেন, 'আপনি নাপাক অবস্থায় আছেন। আপনার হাতে তা দেওয়ার আগে গোসল করে আসুন। কারণ, যারা পাক-সাফ তারা ছাড়া আর কেউ এটাকে স্পর্শ করতে পারে না বলে আল্লাহ বলেছেন।'

এ কথাটি সূরা ওয়াকি'আর ৭৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর (রা)-এর ঈমান আনার পূর্বেই এ সূরাটি এবং সূরা ত্বা-হা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত– তিনটি বিষয়েই এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। তবে আখিরাতই এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এরপর তাওহীদ এবং শেষদিকে কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

কাফির ও মুশরিকদের নিকট সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাসের বিষয়ই ছিল আখিরাত। মরার পর আবার সবাইকে জীবিত করে ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে বলে তারা মোটেই বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না। কিন্তু 'যখন ঐ ঘটনা ঘটে যাবে, তখন তারা কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না।'– এ কথা দিয়েই সূরাটি শুরু করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১ ও ২ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, যখন কিয়ামত হবে তখন তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার কেউ বাকি থাকবে না। রাসূল (স)-এর নিকট থেকে আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর কালাম বারবার শোনার পরও কাফিররা তা বিশ্বাস করতে রাজি হচ্ছিল না। এটা কিছুতেই সম্ভব বলে তারা মনে করত না। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন যে, এখন তোমরা যতই অবিশ্বাস কর না কেন, সত্যিই যখন তা ঘটে যাবে তখন তা অস্বীকার করার কোনো উপায়ই থাকবে না।

৩-৬ নং আয়াত : ৩ থেকে ৬ নং আয়াতে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিররা বলত যে, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, চাঁদ-সুরুজ কোথায় চলে যাবে? লাখ লাখ বছর যত মানুষ মরেছে তারা আবার কী করে জীবিত হবে? তারা এসব কথাকে যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত মনে করত। এরই জবাবে এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন গোটা পৃথিবীকে এমনভাবে ওলট-পালট করে দেওয়া হবে যে, বিশাল পাহাড়গুলো পর্যন্ত ধুলায় পরিণত হবে।

৭-১১ আয়াত : এ কয়টি আয়াতে হাশরের ময়দানে আল্লাহর যে আদালত বসবে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সব মানুষই সেখানে হাজির হবে এবং তাদেরকে তিন দলে ভাগ করা হবে। একদল ডানদিকে, একদল বাঁদিকে, আরেকদল সামনের দিকে থাকবে।

আরবী ভাষায় 'ডানদিকের লোক' বলতে সম্মানিত ও ভাগ্যবান লোক বোঝায় এবং 'বাঁদিকের লোক' দ্বারা নিকৃষ্ট ও হতভাগা লোক মনে করা হয়। আল্লাহ তাআলার ঐ দরবারের চিত্র তাহলে এমন হবে যে, নেক লোকেরা ডানপাশে এবং বদ লোকেরা বাম পাশে থাকবে। আর আল্লাহর সামনে যে দলটি থাকবে তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী লোক।

সামনে বা সবার আগে যারা থাকবে তারা ঐসব লোক, যারা দুনিয়ায় সব ভালো কাজে সবার আগে তৎপর ছিল। তারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সবার আগে সাড়া দিয়েছে। জিহাদ, দান-খয়রাত, জনসেবা, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ইত্যাদি সব নেক কাজে তারা অগ্রসর হয়ে কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছে।

১২-১৪ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে বর্ণিত তিন রকম লোকের মধ্যে যারা সামনে ও অগ্রবর্তী থাকবে এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী বলে গণ্য হবে তাদের কথা বলা হয়েছে। তারা নিয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতে বসবাস করবে। ঐ নিয়ামতের বিবরণ ১৫ থেকে ২৬ নং আয়াতে রয়েছে।

১৩ ও ১৪ নং আয়াতে আল্লাহর এই অগ্রবর্তী ও নিকটবর্তী লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, আগের যুগের লোকদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশি এবং পরের যুগে তাদের সংখ্যা কম হবে।

এখানে আগের যুগ ও পরের যুগ বলতে কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে তাফসীরকারগণের মাঝে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। একটি মতে, আদম (আ) থেকে শেষ নবীর আগ পর্যন্ত হলো আগের যুগ, আর মুহাম্মদ (স) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হলো পরের যুগ। এ মত অনুযায়ী অগ্রবর্তী লোকের মোট সংখ্যার বেশির ভাগ শেষ নবীর পূর্বের সকল নবীদের উম্মতের মোট সংখ্যার মধ্যে শামিল রয়েছে। তাদের তুলনায় শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী লোকের সংখ্যা কম হবে।

আরেকটি মতে, শেষ নবীর উম্মত সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও এর কাছাকাছি যুগ হলো আগের যুগ এবং এ যুগের ঈমানদারদের মধ্যে অগ্রবর্তী লোকের সংখ্যা বেশি হবে, আর এর পরের যুগে সে তুলনায় কম হবে।

আরও একটি মতে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, যুগে যুগে মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে, সে হিসেবে আগের যুগে যে হারে অগ্রবর্তী লোক পাওয়া গেছে, পরবর্তী যুগে এর হার কমে যাবে। অর্থাৎ জনসংখ্যা যে হারে বাড়বে, অগ্রবর্তীদের সংখ্যা সে হারে বাড়বে না। মানুষের সংখ্যার অনুপাতে অগ্রবর্তীদের হার ক্রমেই কমতে থাকবে।

১৫-২৬ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে এই অগ্রবর্তী লোকদের জন্য যে বেহেশত রয়েছে, সেখানে কেমন নিয়ামত তারা ভোগ করবে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারা মণিমুক্তাখচিত আসনে আরামে হেলান দিয়ে বসবে। চির কিশোর ছেলেরা তাদেরকে এমন শরাব পান করতে দেবে, যা দুনিয়ার

মদের মতো নয়। দুনিয়ার মদে মাতলামির ভাব সৃষ্টি হয়। বেহেশতের শরাবে তা হবে না। তাদের সামনে ঐ বালকেরা হরেক রকম মজাদার ফল ও বহু রকমের পাখির গোশত হাজির করবে। তারা তা থেকে পছন্দমতো যেটা যে পরিমাণ নিতে চায় নেবে। তা ছাড়া লুকিয়ে রাখা মূল্যবান মুক্তার মতো সুন্দরী হুর তাদের মনোরঞ্জনের জন্য দেওয়া হবে। বেহেশতে তারা সব সময় শান্তিদায়ক কথাবার্তাই শুনবে। সেখানে এমন কোনো বাজে কথা বা খারাপ কথা শুনবে না, যা মনে পীড়া দেয়। তাদের সাথে এমন লোকদের ওঠা-বসা হবে না, যারা অভদ্র ও অশ্লীল ভাষায় কথা বলে। দুনিয়ার জীবনে ভদ্রলোকেরাও কোনো কোনো সময় দুষ্ট লোকের অভদ্র কথা শুনতে বাধ্য হয়। বেহেশতে কখনো এমনটা হবে না। সেখানের সমাজটাই নেক ও ভদ্রলোকের সমাজ। দুনিয়ার জীবনে তারা যেসব নেক আমল করেছেন এর বদলা হিসেবেই বেহেশতে ঐ সব নিয়ামত তাদেরকে দেওয়া হবে বলে ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন।

২৭-৩৮ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে ঐসব নেক লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ডানদিকে থাকবে। প্রথমেই বলা হয়েছে, তারা কতই না ভাগ্যবান! তাদের সৌভাগ্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তারা যে বেহেশতে থাকবে, সেখানে রয়েছে উন্নত মানের কুল, থরে থরে সাজানো কলা, সারি সারি গাছের ছায়া, সদা বহমান ঝরনা এবং প্রচুর ফলমূল, যা খেয়ে শেষ করা যাবে না এবং যা ভোগ করতে কেউ বাধা দেবে না।

তারা উঁচু বিছানায় তাদের বিবিদের সঙ্গ লাভ করবে। দুনিয়ায় তাদের যে স্ত্রী ছিল তারা বেহেশতী হয়ে থাকলে ঐ বিবিই বেহেশতেও সাথী হবে। হাদীস থেকে এ বিষয়ে আরো জানা যায় যে, বেহেশতে পুরুষ ও নারীদের বয়স একই সমান হবে। সবাই ৩৩ বছরের যুবক-যুবতী হিসেবেই চিরকাল থাকবে। দুনিয়ায় কোনো স্ত্রীর যদি একাধিক স্বামী থেকে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যাকে সে বেশি পছন্দ করবে তাকেই বেহেশতে স্বামী হিসেবে পাবে। দুনিয়াতে স্ত্রীদের যে অবস্থাই থাকুক, বেহেশতে তাদেরকে কুমারী, সুন্দরী ও স্বামীর নিকট আকর্ষণীয় রূপে নতুন করে তৈরি করা হবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৯ ও ৪০ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, ডানদিকের লোকদের সংখ্যা আগের যুগেও যেমন বেশি ছিল, পরের যুগেও বেশি হবে। অর্থাৎ অগ্রবর্তী ও নিকটবর্তী লোকেরা পরের যুগে আগের যুগের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও ডানদিকের লোকদের সংখ্যা আগের যুগের মতোই পরের যুগেও বেশি হবে।

৪১-৪৪ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে বাঁ-দিকের লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা বড়ই হতভাগা! এরা এমন কষ্টদায়ক জায়গায় থাকবে, যেখানে গরম বাতাস, ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়া রয়েছে। সেখানে কখনো তারা ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক অবস্থা পাবে না।

৪৫-৪৮ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে এ লোকদের দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ হতভাগা লোকেরা দুনিয়ায় ভাগ্যবানই ছিল। আল্লাহর দেওয়া বহু নিয়ামত ভোগ করত। কিন্তু নিয়ামতের শুকরিয়ার পরিবর্তে এরা হামেশা নাফসের গোলামি করত। কুফরী, শিরক ও অন্যান্য বড় গুনাহে এরা লিপ্ত ছিল। এরা এ কথা বিশ্বাস করত না যে, মরার পর আবার তাদেরকে জীবিত করা হবে। বরং আখিরাতের ব্যাপারে বিদ্রূপ করে এরা প্রশ্ন করত, আমাদের শরীরের গোশত মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার হাড্ডিগুলোকে কীভাবে তোলা হবে? আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের হাড্ডিও পচে গেছে তাদেরকেও কীভাবে উঠানো হবে?

এখন তারা ঐ আবিশ্বাসের কুফল ভোগ করুক।

৪৯ ও ৫০ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্মোধন করে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনি আখিরাতে অবিশ্বাসীদেরকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিন যে, দুনিয়ায় আগে যত মানুষ ছিল এবং পরে যত মানুষ হবে কিয়ামতের পর তাদের সবাইকে অবশ্যই একদিন হাশরের ময়দানে জমায়েত করা হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে রাখা হয়েছে। এ নির্ধারিত সময়ের আগে কারো ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে এর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই। যার খুশি সে বিশ্বাস করুক। আর যে বিশ্বাস করবে না সে সময় এলেই দেখতে পাবে।

৫১-৫৬ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্টদেরকে সম্মোধন করে বলছেন, আজ তোমরা টের পাচ্ছ না যে, আখিরাতে তোমাদের কী দুর্দশা হবে। যখন খেতে চাইবে তখন যাক্কুম গাছের ফল দেওয়া হবে। ক্ষুধার জ্বালায় তা-ই তোমরা পেট ভরে খাবে। যখন পিপাসায় কাতর হবে তখন টগবগে ফুটন্ত পানি উটের মতো বেশি করে খাবে। তোমরা দুনিয়ায় যা করছ এর বদলায় সেদিন এভাবেই তোমাদের মেহমানদারি করা হবে।

আরবের তিহামা নামক এলাকায় যাক্কুম নামের এক রকম গাছ আছে, যা বড়ই বিস্বাদ ও যার গন্ধ খুবই খারাপ। এর ফল থেকে দুধের মতো এক রকম রস বের হয়, যা শরীরে লাগলে অবশ হয়ে যায়।

৫৭-৭৪ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে এমন কতক দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, যা দ্বারা তাওহীদ ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা শিরকে লিপ্ত এবং আখিরাতে অবিশ্বাসী ছিল। তাই এখানে এমনভাবে যুক্তি পেশ করা হয়েছে, একদিকে আখিরাতের পক্ষে প্রমাণ মেলে, অপরদিকে তাওহীদের সত্যতাও প্রমাণিত হয়। এর জন্য মানুষের বাস্তব জীবনের সহজ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

৫৭ থেকে ৫৯ নং আয়াতে মানুষের জন্মের কথা প্রথমে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, হে মানুষ! তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছ? তোমাদেরকে কি আমি সৃষ্টি করিনি? তাহলে কেমন করে সে কথা অস্বীকার করতে পার? তোমরা স্ত্রী সহবাসের সময় বীর্যপাত করার পর কে স্ত্রীর পেটে সন্তান সৃষ্টি করে?

মানুষ যদি নিজের সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখে তাহলে শুধু এ একটা বিষয়ই তাকে তাওহীদ ও আখিরাতকে স্বীকার করতে বাধ্য করার জন্য যথেষ্ট। এক ফোঁটা বীর্য থেকে কেমন করে একটা মানুষ জন্মলাভ করে– যা দেহ, মন, মগজ, অগণিত গুণ ও যোগ্যতা লাভ করে। এ বিরাট কাজটি একজন কৌশলী সত্তার পরিকল্পনা ছাড়া এমন সুন্দরভাবে সমাধা হতে পারে না। এটা বিভিন্ন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফসল নয়; এক আল্লাহ ছাড়া এর মধ্যে অন্য কারো বাহাদুরি নেই। এ থেকে আখিরাতও প্রমাণিত হয়। যিনি একবার সামান্য বীর্য থেকে পূর্ণ মানুষ বানাতে পারেন, তার পক্ষে মানুষের মরার পরে আবার তাকে সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন?

৬০ থেকে ৬২ নং আয়াতে মানুষের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হে মানুষ! তোমাদেরকে সৃষ্টি করা যেমন আমারই কাজ, তোমাদের মরণও আমারই হাতে। কে কোথায়, কখন, কীভাবে মরবে তা আমিই ফায়সালা করি। আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেউ মায়ের পেটেই মরে। কেউ শৈশবে, কেউ যৌবনে, কেউ বৃদ্ধ হয়ে মরে। কে কখন মরবে এর সময় আর কেউ জানে না।

হে মানুষ! দুনিয়ায় তোমাদেরকে আমি এককভাবে সৃষ্টি করেছি, মরার পর আরেক নিয়মে তোমাদেরকে জীবিত করব। সব নিয়ম আমারই বানানো। আমি কোনো এক নিয়মের অধীন নই। মরার সময় বুড়ো বয়সে মরলেও আখিরাতে জোয়ান বানিয়ে দেব। দুনিয়ায় তোমরা শুধু মুখ দিয়ে কথা বল; আখিরাতে তোমাদের হাত, পা, চামড়াও কথা বলবে। তাই প্রথম যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন তাঁর পক্ষে আবার সৃষ্টি করা অসম্ভব কেন হবে? এ সহজ কথাটি তোমরা কেন বুঝতে পার না?

৬৩ থেকে ৬৭ নং আয়াতে বীজ বুনা ও ফসল ফলার উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে, হে মানুষ! জমিতে বীজ পুঁতে দেওয়ার পর কে ফসল ফলায়? আমি ইচ্ছা করলে বীজ নষ্ট করে দিতে পারি, চারা ওঠার পর বন্যায় পচিয়ে দিতে পারি, পোকা দিয়ে খাইয়ে দিতে পারি, পাকা ফসল ঘরে তোলার আগেই ঝড়-তুফানে নষ্ট করে দিতে পারি। আমার এ ক্ষমতা কি তোমরা দেখতে পাও না? তোমরা কি এর মুকাবিলা করতে পার? তোমরা তখন শুধু হায় আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করতে পার না। এ অবস্থায় কেমন করে তোমরা আমাকে অস্বীকার কর?

৬৮ থেকে ৭০ নং আয়াতে বৃষ্টির পানির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করছেন, হে মানুষ! তোমরা কি একটু চিন্তা করে দেখতে পার না যে, মেঘ থেকে মিঠা পানি কে বর্ষণ করে? সমুদ্রের নোনা পানি থেকে যদি লবণসহ পানি উঠিয়ে এনে বৃষ্টি বর্ষণ করি তাহলে কি তোমরা তা ঠেকাতে পারবে? কিন্তু আমি তা না করে সমুদ্রের নোনা পানি থেকে বিশুদ্ধ পানিটুকু তুলে এনে তোমাদেরকে পান করতে দিই। অথচ তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর না। এ কাজটি যে একমাত্র আমিই করি, সে কথা যদি তোমরা বিশ্বাস করতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে।

৭১ থেকে ৭৩ নং আয়াতে আগুনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করছেন যে, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, এ আগুন জ্বালানোর জন্য যে লাকড়ি তোমরা ব্যবহার কর এর গাছ কি তোমরা সৃষ্টি কর? 'আগুন জ্বালানোর গাছ' বলতে আরবের 'মারখ' ও 'আফার' নামক গাছও বোঝানো হতে পারে। এসব গাছের কাঁচা ডাল একটার উপর আরেকটা দিয়ে আঘাত করে প্রাচীন আরববাসীরা আগুন জ্বালাত।

আগুন এমন জিনিস, যার উপকারিতার কথা চিন্তা করলে এ আগুন সৃষ্টিকারী আল্লাহর কথা মনে না হয়ে পারে না। আগুনই মানুষের জীবনকে পশুর জীবন থেকে উন্নত করেছে। আগুন না থাকলে মানুষ পশুর মতোই সব জিনিস কাঁচা খেতে বাধ্য হতো। শুধু তাই নয়, আগুন ব্যবহার করার ফলেই মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে। আগুন না থাকলে বিজ্ঞানচর্চা শুরু করাই সম্ভব হতো না। যাবতীয় বস্তুর আবিষ্কার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা আগুনের সাহায্যেই হয়ে থাকে। মানুষ শুধু আগুন সম্পর্কে চিন্তা করলেই আল্লাহকে চিনতে পারা উচিত।

আগুন মানুষকে আলো দান করে, যা না হলে মানুষের বেঁচে থাকাই সম্ভব হতো না। শিক্ষার আলোও আগুনের সাহায্য ছাড়া হাসিল করা যায় না।

৭৪ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে এবং তাঁর মারফতে সব মানুষকে আল্লাহর মহান নাম নিয়ে তাসবীহ করতে বলা হয়েছে। তাসবীহ্ করা মানে 'সুবহানাল্লাহ' বলা। সুবহানাল্লাহ অর্থ হলো এ কথা ঘোষণা করা যে, আল্লাহ তাআলা ঐসব রকম দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে পাক-পবিত্র, যা কাফির ও মুশরিক লোকেরা তাঁর উপর আরোপ করে থাকে। 'সুবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকূন'– এ আয়াতটি দ্বারা এ কথাই বোঝায়। যারা শিরক করে তারা আসলে আল্লাহর যাত, সিফাত, হক ও ইখতিয়ারে অন্যান্য শক্তিকে শরিক করে আল্লাহর দুর্বলতা আছে বলেই স্বীকার করে নেয়। 'সুবহানাল্লাহ' দ্বারা এরই প্রতিবাদ করা হয়।

তৃতীয় রুকূ'

৭৫-৭৯ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা তারকার কসম খেয়ে কুরআনের সত্যতা, মযবুতি ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলিষ্ঠ যুক্তি দেখিয়েছেন। কসম খাওয়ার আগে 'লা' শব্দ দ্বারা এ কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, কাফিররা কুরআন সম্পর্কে যেসব অমূলক কথার অপপ্রচার চালায় তা মোটেই সঠিক নয়, তাদের ধারণা একেবারেই ভুল।

তারকাসমূহের কসম করা দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহ যে আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী চলে সে আল্লাহই কুরআন নাযিল করেছেন। চন্দ্র-সূর্য-তারকা দ্বারা সাজানো আসমান যেমন সুশৃঙ্খল ও মযবুত, এ কুরআনের বিধানও তেমনি অটল ও স্থায়ী। তারকাসমূহ দেখতে আলাদা আলাদা দেখা গেলেও সবই এক কঠিন নিয়মে আবদ্ধ। তেমনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের জন্য যেসব নিয়ম-কানুন দিয়েছে তা একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধানের অধীন। এসব বিধানের মধ্যে সামান্য বেমিলও নেই।

৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারকার কসম খাওয়ার অর্থ যদি তোমরা বুঝতে পার তাহলে এ কথা স্বীকার না করে পারবে না যে, এ কসম এক বিরাট সত্য তুলে ধরে। এ কুরআন ঐ মহান সত্তাই নাযিল করেছেন, যিনি মহাশূন্যের বিস্ময়কর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহলোকে যেমন কোনো অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নেই তেমনি এ কুরআনের বিধান মেনে চললে মানবসমাজেও শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম হবে।

৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এ কারণেই কুরআনের মহান মর্তবা বুঝতে চেষ্টা কর, এটাকে মানবরচিত সাধারণ কিতাব মনে করো না।

৭৮ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কুরআন রাসূলের মুখ থেকে তোমরা শুনতে পাচ্ছ বলে এটা তার রচনা মনে করবে না। 'লাওহে মাহফূযে' আল্লাহর হেফাযতে এ কিতাবটি রাখা হয়েছে। এতে রদ-বদলের কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখান থেকেই ওহীর মারফতে এ কুরআন নাযিল করা হয়। এভাবেই এর হেফাযত করা হয়েছে।

৭৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফিররা এ কুরআন সম্পর্কে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তা একেবারেই মিথ্যা। তারা বলে, কোনো জিন ও শয়তান এসব কথা শেখায়। সূরা শু'আরার ২১০ থেকে ২১২ নং আয়াতে এ কথার জবাবে বলা হয়েছে, 'এ কুরআন নিয়ে শয়তান আসে না, তার পক্ষে এ কাজ সাজেও না, এ ক্ষমতাও তার নেই। শয়তানকে তো এ পবিত্র কালাম শুনতেও দেওয়া হয় না।'

অর্থাৎ কুরআন এমন পবিত্র কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে পবিত্র ফেরেশতা অতি হেফাযতের সাথে রাসূলের পবিত্র কলবে নাযিল করে থাকেন। কোনো পর্যায়েই কোনো অপবিত্র সত্তা কুরআনকে স্পর্শও করার ক্ষমতা রাখে না। লাওহে মাহফূয থেকে রাসূলের নিকট পৌছানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও শয়তান বা অন্য কোনো নাপাক শক্তির সামান্য হাতও নেই।

যে প্রসঙ্গ এবং পূর্বাপর যেসব কথা রয়েছে, তাতে এ আয়াতের উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাই যুক্তিপূর্ণ। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় বা কুরআনকে হাত দিয়ে ধরার সময় নাপাক অবস্থায় স্পর্শ করা যাবে কি না সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য নয় এবং তা এখানে প্রসঙ্গ নয়।

তবে এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থাপনায় যেমন কোনো অপবিত্র সত্তা কুরআনকে স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি যারা এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাদেরও নাপাক অবস্থায় কুরআন মাজীদে হাত লাগানো উচিত নয়।

৮০-৮২ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে কুরআনকে মহা নিয়ামত হিসেবে কবুল করার তাকীদ দিয়ে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, সারা জাহানের মনিবের পক্ষ থেকে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তাকে কি তোমরা অবহেলাই করতে থাকবে? এ মহা নিয়ামত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখাই কি তোমাদের সিদ্ধান্ত? এ নিয়ামতকে অস্বীকার করাই কি তোমাদের কিসমত? আল্লাহ তোমাদেরকে এ মহান নিয়ামত কবুল করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন। তোমরা ইচ্ছা করে তা থেকে মাহরুম থাকতে চাইলে আল্লাহ ও রাসূলের তাতে কিছুই আসে-যায় না।

৮৩-৮৭ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে মানুষের মৃত্যুর সময় আপনজনদের অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, হায়াত ও মওতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। যারা আল্লাহকে মনিব মেনে দুনিয়ায় তাঁর হুকুম পালন করে না, তাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা এ কয়টি আয়াতে বলেছেন যে, তোমরা যদি আমার অধীন বলে মনে না কর তাহলে যখন তোমাদের আপনজনের জান আমি বের করে আনি, তখন তোমরা বাধা দিতে পার না কেন? তখন তোমরা তার নিকটাত্মীয় হওয়ার কোনো প্রমাণ দিতে পার না। আমিই তখন তোমাদের চেয়ে তার বেশি কাছে থাকি। তোমরা কেবল অসহায় হয়ে চেয়ে থাক। এ স্পষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তোমরা আমাকে মনিব বলে মান না কেন?

৮৮-৯৪ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে যেমন মানুষের ভালো-মন্দ আল্লাহর হাতে, আখিরাতেও তেমনি আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ীই কেউ বেহেশতে আর কেউ দোযখে যাবে। তোমাদের চোখের সামনেই যে লোকটি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল তার জন্য যত চোখের পানিই তোমরা ফেল, যত দরদই তার জন্য দেখাও, এসব তার পরকালের জীবনে কোনো কাজে আসবে না। সেখানে তার কিসমতের ফায়সালা তার দুনিয়ার জীবনের আমলের উপরই নির্ভর করে।

দুনিয়াতে যদি সে আল্লাহর গোলাম হিসেবে চলে, তাঁর নৈকট্য লাভের যোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাহ হিসেবে তাঁর সামনেই থাকবে এবং উন্নত মানের বেহেশতে পরম আরাম-আয়েশে থাকবে। আর যদি সাধারণ নেক ও সালেহ লোক হিসেবে জীবন যাপন করে থাকে, তাহলে সেখানে আল্লাহর ডানদিকে থাকবে এবং সর্বপ্রকারে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু যদি সে বেঈমান ও বদ লোক হয়ে থাকে, তাহলে সে বাঁ-দিকে থাকবে এবং দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

এসব কথা চরম সত্য, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। যেমন কর্ম তেমন ফল হওয়াই স্থায়ী নিয়ম।

৯৫ নং আয়াত : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে তাঁর মহান রবের নামে তাসবীহ করার হুকুম দিয়েছেন। এ হুকুম অনুযায়ীই আল্লাহর রাসূল রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (আমার রব সব রকম দোষত্রুটি থেকে পবিত্র) বলে তাসবীহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনি সূরা আ'লার প্রথম আয়াতে দেওয়া হুকুম অনুযায়ী তিনি সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলে তাসবীহ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া ইঙ্গিত অনুযায়ীই নামাযের সব করণীয় বিষয় রাসূল (স) নিজেই ঠিক করে দিয়েছেন। তাই নামাযে এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা রাসূল (স) করতে বলেননি। তেমন কিছু করলে নামায কবুল না হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী চলার অভ্যাস করাই নামাযের একটা বড় উদ্দেশ্য। নামাযের মধ্যেই এ অভ্যাসের বিরোধী কিছু করা হলে নামাযের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সূরা ওয়াকি'আহ্

৯৬ আয়াত, ৩ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٩٦ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١

১. যখন (কিয়ামত হওয়ার) ঐ ঘটনাটি ঘটে যাবে।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢

২. তখন এর ঘটে যাওয়াকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার কেউ থাকবে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣

৩. (এ মহাবিপদ) কাউকে নীচু করবে, কাউকে উঁচুতে ওঠাবে।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝٤

৪. তখন গোটা পৃথিবীকে (একসাথে) ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে।[1]

وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝٦

৫-৬. আর পাহাড়কে এমন টুকরা টুকরা করে দেওয়া হবে যে, তা ছিটানো ধূলিকণায় পরিণত হবে।

وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧

৭. তোমরা তখন তিন দলে ভাগ হয়ে যাবে।

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨

৮. (একদল হবে) ডান দিকের লোক। ডান দিকের লোকেরা কত (ভাগ্যবান)!

وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝٩

৯. (আরেকদল হবে) বাঁ দিকের লোক। বাঁ দিকের লোকেরা কত (হতভাগা)!

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠

১০. আর যারা সামনে থাকবে তারা তো সামনেই (থাকার যোগ্য)।

أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١

১১. তারাই তো (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করবে।

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢

১২. তারা নিয়ামতভরা বেহেশতে থাকবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝١٣

১৩. আগের যুগের লোকদের মধ্যে (তাদের সংখ্যা) বেশি হবে।

১. অর্থাৎ, এটা কোনো স্থানীয় ভূমিকম্প হবে না; বরং গোটা পৃথিবী একই সময়ে কেঁপে উঠবে।

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

১৪. আর পরের যুগের লোকদের মধ্যে (তাদের সংখ্যা) কম হবে।

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾

১৫-১৬. মণিমুক্তা খচিত আসনে তারা মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

১৭-১৮. বহমান ঝরনার সুরায় ভরা পেয়ালা, জগ ও পানপাত্র নিয়ে চির কিশোর ছেলেরা তাদের সামনে ঘোরাফিরা করতে থাকবে।[২]

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾

১৯. (তা পান করায়) তাদের মাথাও ঘুরাবে না, আকল-বুদ্ধিও লোপ পাবে না (মাতলামি করবে না)।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

২০. আর তারা তাদের সামনে (রকমারি মজাদার) ফলমূল পেশ করবে, যাতে তারা পছন্দমতো তুলে নিতে পারে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

২১. আর (রকমারি) পাখির গোশতও সামনে রাখবে, যাতে ইচ্ছামতো নিতে পারে।

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾

২২. আর তাদের জন্য সুন্দর চোখওয়ালা হূর থাকবে।

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

২৩. তারা লুকিয়ে রাখা মোতির মতো (সুন্দর)।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. (এসব তাদের) ঐসব আমলের বদলেই তারা পাবে, যা তারা (দুনিয়ায়) করেছিল।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

২৫-২৬. সেখানে তারা সঠিক ও শান্তিময় কথা ছাড়া কোনো বাজে কথা বা গুনাহের কথা শুনতে পাবে না।

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যারা ডান দিকের লোক। ডান দিকের লোকেরা কতই না (ভাগ্যবান)!

২. এর অর্থ এমন বালক, যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তাদের বয়স চিরস্থায়ীভাবে একই অবস্থায় থাকবে।

২৮. (তারা যেখানে থাকবে সেখানে রয়েছে) কাঁটাবিহীন কুলগাছ[৩]	فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾
২৯. ও থরে থরে সাজানো কলা	وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়ানো ছায়া,	وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾
৩১. আর সদা বহমান পানি,	وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾
৩২-৩৩. আর প্রচুর ফলমূল, যা কখনো ফুরাবে না এবং যা (ভোগ করতে) কখনো নিষেধ করা হবে না,	وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. আরো (থাকবে) উঁচু বিছানা,	وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾
৩৫. তাদের স্ত্রীদেরকে আমি (খাসভাবে) নতুন করে সৃষ্টি করব।	اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেব।	فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
৩৭. (তারা হবে) স্বামীভক্ত ও সমবয়সী।	عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. (এ সবই) ডান দিকের লোকদের জন্য।	لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾
রুকূ' ২	
৩৯. আগের (যুগের) লোকদের মধ্যে (তাদের সংখ্যা) বেশি হবে।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. পরের (যুগের) লোকদের মধ্যেও (তাদের সংখ্যা) বেশি হবে।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর (যারা) বাম দিকের লোক, বাম দিকের লোকেরা কতই (হতভাগা)!	وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾
৪২. (তারা যেখানে থাকবে, সেখানে রয়েছে) গরম হাওয়া ও ফুটন্ত পানি;	فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. ও কালো ধোঁয়ার ছায়া,	وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. যা ঠাণ্ডাও নয়, আরামদায়কও নয়,	لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৩. অর্থাৎ এমন বরই গাছ, যাতে কাঁটা থাকবে না। বরই যতটা ভালো জাতের হয়, তার গাছে কাঁটাও তত কম হয়। এ কারণে জান্নাতের ঐ ফলের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তার গাছে কাঁটা আদৌ থাকবে না। ঐ ফল এমন উৎকৃষ্ট হবে, যা দুনিয়াতে পাওয়া যেতে পারে না।

৪৫. এরা ঐসব লোক, যারা (এ অবস্থায় পৌঁছার) আগে ভালো অবস্থায় ছিল।	إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এরা বারবার কবীরা গুনাহ করতে থাকত।	وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾
৪৭. তারা বলত, আমরা যখন মরে মাটিতে পরিণত হব এবং শুধু হাড্ডি বাকি থাকবে, তখন কি আবার আমাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করানো হবে?	وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আমাদের বাপ-দাদা যারা আগে চলে গেছেন, তাদেরকেও ওঠানো হবে?	أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯-৫০. (হে নবী!) এদেরকে বলে দিন যে, আগের ও পরের সবাইকে অবশ্যই একদিন একত্রিত করা হবে, যার সময় ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।	قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥٠﴾
৫১. তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীর দল!	ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾
৫২. তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছের খাবার খাবে।	لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. তা দিয়েই তোমরা পেট ভরবে।	فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪-৫৫. তারপর তোমরা পিপাসাকাতর উটের মতো উপর থেকে আসা টগবগে ফুটন্ত পানি পান করবে।	فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. বদলা দেওয়ার দিন এ সবই হবে (বাম দিকের লোকদের) মেহমানদারির জিনিস।	هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তবে কেন তোমরা সে কথা স্বীকার করছ না?[৪]	نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾
৫৮-৫৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীর্যপাত কর তা থেকে কি তোমরা বাচ্চা সৃষ্টি কর, না এর স্রষ্টা আমি?	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

৪. অর্থাৎ এ কথার সত্যতা স্বীকার করা যে, 'আমিই তোমাদের রব, প্রভু ও মা'বুদ এবং আমি তোমাদেরকে আবার সৃষ্টি করতে পারব।'

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬০-৬১. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর (সময়) ঠিক করে দিয়েছি। তোমাদের আকার-আকৃতি বদলে দিতে এবং তোমরা জান না এমন কোনো আকারে তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে আমি (মোটেই) অপারগ নই।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. তোমাদের প্রথম সৃষ্টি হওয়ার কথা তো তোমরা জানই। তবে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছ না?

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৩-৬৪. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীজ বুনে থাক, তা থেকে কি তোমরা ফসল ফলাও, না আমি ফসল ফলাই?

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে এ ফসলকে ভুসি বানিয়ে ফেলতে পারি। তখন তোমরা কেবল কথা বানাতে থাকবে।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

৬৬-৬৭. (বলতে থাকবে যে,) আমরা তো করযদাতা হয়ে পড়লাম; বরং আমরা সবকিছুই হারালাম।

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৮-৬৯. তোমরা কি চোখ খুলে দেখেছ, এই যে পানি তোমরা পান কর, তা কি মেঘ থেকে তোমরা নামিয়ে আন, না এর বর্ষণকারী আমি?

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. আমি ইচ্ছা করলে (ঐ পানিকে) নোনা বানিয়ে ফেলতে পারি। তবে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না?

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾

৭১-৭২. তোমরা কি খেয়াল করেছ, এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও তা জ্বালানোর গাছ কি তোমরা সৃষ্টি কর, না এর স্রষ্টা আমি?[৫]

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. (আমাকে) মনে রাখার জন্য (এ আগুনকে) আমিই মাধ্যম বানিয়েছি এবং যাদের দরকার তাদের জন্য (আগুনকে) জীবন ধারণের বস্তু বানিয়েছি।

৫. অর্থাৎ যেসব গাছের কাঠ থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও সেসব কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি?

৭৪. অতএব (হে রাসূল!) আপনার মহান রবের নাম নিয়ে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[৬]

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

রুকূ' ৩

৭৫. তাই (তোমাদের ধারণা ঠিক) নয়।[৭] আমি তারাগুলোর ডুবে যাওয়ার স্থানের কসম করছি।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

৭৬. তোমরা যদি বুঝতে পার তাহলে এটা অতি বড় কসম।

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭-৭৮. (আমি ঐ কসম করে বলছি যে,) নিশ্চয়ই এটা অতি উঁচু দরের কুরআন[৮], যা হেফাযতে রাখা একটি কিতাবে লেখা আছে।

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

৭৯. যারা পাক-সাফ, তারা ছাড়া অন্য কেউ এটাকে স্পর্শ করতে পারে না।[৯]

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. এটা রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

৮১. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে অবহেলা করবে?

أَفَبِهٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾

৮২. আর তোমরা কি এ নিয়ামতকে অস্বীকার করাকেই তোমাদের কিসমত হিসেবে ঠিক করে নিয়েছ?

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

---

৬. অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে তোমরা এ কথা ঘোষণা কর যে, কাফির ও মুশরিকরা তাঁর সাথে অন্য সত্তাকে শরিক করার মাধ্যমে তাঁর মধ্যে যেসব দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে বলে মনে করে, তিনি তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

৭. অর্থাৎ কথা তা নয়, যা তোমরা বুঝেছ। এখানে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সম্পর্কে শপথ করার পূর্বে 'না' শব্দের ব্যবহার দ্বারা এ কথাই বোঝা যাচ্ছে যে, লোকেরা কুরআন সম্বন্ধে এমন কিছু মনগড়া কথা রটাচ্ছিল, যা খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই শপথ করা হচ্ছে।

৮. তারকা ও গ্রহদের মাওয়াকে'-এর অর্থ তাদের অবস্থানস্থল, তাদের অবস্থান পর্যায় এবং তাদের কক্ষপথগুলো। কুরআনের উচ্চমর্যাদাবিশিষ্ট কিতাব হওয়া সম্পর্কে এ শপথ করার অর্থ : মহাশূন্যে গ্রহ-তারার বিধান যেমন মযবুত ও অটল, তেমনি এই বাণীও অটল ও দৃঢ়। যে আল্লাহ এ বিধান সৃষ্টি করেছেন তিনিই মযবুত বাণীও নাযিল করেছেন।

৯. অর্থাৎ, এ বাণী পবিত্র ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে শয়তানের কোনো হাত নেই।

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾

৮৩. যখন কারো জান গলায় পৌঁছে যায় (তখন তোমরা তা) কেন ঠেকাতে পার না?

وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. তখন তোমরা (কেবলই অসহায়ভাবে) দেখতে থাক (যে, সে মরে যাচ্ছে)।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার বেশি কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।

فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾

৮৬-৮৭. (এ অবস্থায়) তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাক এবং (এ ধারণায়) তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমরা (গলদেশ পর্যন্ত বের হয়ে আসা) জানকে ফিরিয়ে আনতে পার না কেন?

فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

৮৮-৮৯. তারপর (ঐ মৃত লোকটি) যদি (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করে থাকে, তাহলে তার জন্য রয়েছে আরাম-আয়েশ, উত্তম রিযিক ও নিয়ামতভরা জান্নাত।

وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

৯০-৯১. আর যদি সে ডান দিকের লোক হয়ে থাকে (তাহলে তাকে এভাবে বলা হয় যে,) তোমার প্রতি সালাম, তুমি ডান দিকের লোকদের মধ্যে গণ্য।

وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾

৯২-৯৩-৯৪. আর যদি সে অস্বীকারকারী ও গুমরাহ লোকদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার মেহমানদারির জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানি ও দোযখে পৌঁছা।

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

৯৫. এ সবই চরম সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. অতএব (হে রাসূল!) আপনার মহান রবের নাম নিয়ে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[১০]

১০. এ হুকুম অনুযায়ীই রাসূলে কারীম (স) রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলার আদেশ দিয়েছেন।

৫৭. সূরা হাদীদ

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

২৫ আয়াতের 'হাদীদ' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ লোহা।

নাযিলের সময়

উহুদের যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যকালের কোনো এক সময় সূরাটি নাযিল হয়েছে। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনামতে, এ সময়টা চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীর মধ্যে ছিল।

তখন অবস্থা এই ছিল যে, মদীনার ছোট্ট একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অল্পসংখ্যক মুজাহিদ গোটা আরবের কাফির ও মুশরিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করে টিকে ছিলেন। তখন শুধু জান দেওয়াই যথেষ্ট ছিল না, ঐ জিহাদে বিজয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট মালেরও দরকার ছিল।

আলোচ্য বিষয়

আল্লাহর পথে মাল খরচ করার জন্য প্রেরণা দান করাই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়।

আলোচনার ধারা

১-৬ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে আল্লাহ তাআলার বহু গুণের কথা উল্লেখ করে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ এ কথার গুরুত্ব বুঝতে পারে যে, কত বড় মহাশক্তিমান সত্তা তাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াত দান করছেন।

প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, আসমান ও জমিনের বিশাল সৃষ্টিজগৎ এ কথাই প্রমাণ করে যে, এক মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী সত্তার মর্জিমতোই সবকিছু সঠিক নিয়ম মেনে চলছে। প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহর হুকুম পালন করার মাধ্যমে এ কথাই ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ তাআলা সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত।

পরবর্তী ৫টি আয়াতে আল্লাহ তাআলার যে গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তা এমন এক সার্বভৌম সত্তার পরিচয় দেয়, যিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও চূড়ান্ত মালিক এবং সকল ব্যাপারে যিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এমনকি অন্তরের গোপন কথার খবরও তাঁর নিকট জানা। সব কিছুর চূড়ান্ত ফায়সালার মালিকও তিনি। তিনি সব সময় সব অবস্থায় সবখানে সবকিছুর খবর রাখেন। এ মহান সত্তাকে অগ্রাহ্য করে ও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে কিছুতেই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

এ কয়টি আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর এক-একটি গুণের ব্যাখ্যা এত ব্যাপক যে, তা লিখে শেষ করা অসম্ভব। এ ছয়টি আয়াতের এক-একটি শব্দ চিন্তার দুয়ার এমনভাবে খুলে দেয় যে, আল্লাহ তাআলার অসীম সত্তার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

৭-১০ নং আয়াত : এ কয়টি আয়াতে মুমিনদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সত্যিকার ঈমান এনে আল্লাহর দেওয়া মাল থেকে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য আবেগময় আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ঈমানের দাবিদার মুসলিম হওয়াই যথেষ্ট নয়। সত্যিকার ঈমানদার হও এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল খরচ করে ঈমানের বাস্তব প্রমাণ দাও।

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে ও রাসূলের নিকট বাইআত হয়ে যে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছ সে ঈমান ও বাইআতের দাবি পূরণ করছ না কেন? আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাঁর পথে খরচ না করলে ঈমানের দাবি পূরণ হতে পারে না।

যে মাল আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন তার আসল মালিক তোমরা নও। আল্লাহই আসল মালিক। তিনি তোমাদেরকে এ মালের উপর তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা) বানিয়েছেন, যাতে তাঁর মর্জিমতো তা খরচ কর। হাদীসে আছে, এ মালের মধ্যে তোমার হিস্যা ততটুকুই যতটুকু তুমি খাদ্য হিসেবে খেয়ে হজম করেছ, পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে ছিঁড়ে ফেলেছ এবং আল্লাহর পথে খরচ করেছ। এ ছাড়া যা তোমার দায়িত্বে রয়েছে তা তোমার নয়, তোমার মরার পর অন্য লোকের হাতে চলে যাবে।'

৯ ও ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান বলেই তিনি কুরআন নাযিল করে তোমাদেরকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ইসলামের আলোকময় পথে এনেছেন। তাই ইসলামের বিজয়ের জন্য তোমাদের মাল খরচ করা উচিত। আল্লাহর পথে মাল খরচ করা দ্বারা তোমাদেরই উপকার হবে। আল্লাহর এতে কোনো লাভ নেই। তিনি তো সব ধন-সম্পদেরই ওয়ারিশ আছেন।

বর্তমান সময়ে যখন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে খতম করার জন্য গোটা আরব শক্তি একজোট হয়ে বারবার আক্রমণ করছে, তখন যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। চূড়ান্ত বিজয়ের পর যারা জান-মাল দিয়ে জিহাদ করবে তারাও পুরস্কার অবশ্যই পাবে। কিন্তু বিজয় আসার আগে যারা জিহাদ করবে তাদের সমান মর্যাদা পরের লোকেরা কখনো পাবে না।

হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে যারা জান-মাল আল্লাহর পথে খরচ করে, তারাই সত্যিকারের ইখলাসের পরিচয় দেয়। বিজয় অনিশ্চিত জেনেও তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই কুরবানী দেয়। বিজয়ের পর যারা এ পথে খরচ করে, তারা কিছুতেই পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১ আয়াত : এ আয়াতে আল্লাহর পথে যে মাল খরচ করা হয় তাকে আল্লাহ করয হিসেবে গণ্য করেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা আল্লাহ তাআলার দানশীলতার চরম নমুনা বলা যেতে পারে। মাল আল্লাহরই দান। তাঁরই দেওয়া মাল থেকে তাঁর পথে খরচ করলে তিনি তা ধার হিসেবে গণ্য করেন। তবে শর্ত এই যে, এ করযদাতা যেন এমনভাবে দান করে, যাতে তা 'করযে হাসানা' বলে গণ্য হতে পারে। হাসানা মানে সুন্দর বা ভালো। ভালো করয বা সুন্দর করয গণ্য হওয়ার জন্য দাতার মধ্যে যেসব গুণ থাকা দরকার তা হলো-

১. খালেস নিয়তে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের উদ্দেশ্য ছাড়া দান করা।
২. রিয়া (লোকদেখানো মনোভাব) ও সুনাম হাসিল করার উদ্দেশ্য না থাকা।
৩. দান করে কারো উপর দয়া করা হয়েছে বলে প্রকাশ না করা।
৪. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান করা।
৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে এর কোনো বদলা কামনা না করা।

এ ধরনের দানকেই আল্লাহ তাআলা করযে হাসানা হিসেবে গণ্য করেন এবং এর জন্য আল্লাহ দুটো ওয়াদা করেছেন :

১. এ দানের বহুগুণ তিনি ফেরত দেবেন। কমপক্ষে দশ থেকে সাত শত গুণ বাড়িয়ে তিনি দান করবেন।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করার পুরস্কার হিসেবে তিনি এ দানের বদলাও দান করবেন।

১২ নং আয়াত : এ আয়াতে মুমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতে যাওয়ার পথে মুমিনগণের নূর তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াতে থাকবে, যাতে তারা আলোর মধ্যে পথ চলে বেহেশতে যেতে পারে।

কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিকরা দুনিয়ায় যেমন জাহিলিয়াতের অন্ধকারে পথহারা হয়ে চলেছিল, আখিরাতেও তারা সে অবস্থায়ই থাকবে। সেখানে সঠিক ঈমান-আকীদা ও নেক আমলই নূরে পরিণত হবে। যার আমল যে পরিমাণ ভালো হবে তার নূর সে পরিমাণই উজ্জ্বল হবে।

রাসূল (স) বলেছেন, কারো নূর এত বেশি উজ্জ্বল হবে যে, মদীনা থেকে আদন পর্যন্ত, আর কারো নূর সানয়া পর্যন্ত পৌঁছবে। কারো নূর এত কম হবে যে, তার পায়ের কাছেই শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, দুনিয়ায় যার নেক আমলের কারণে যে পরিমাণ কল্যাণ প্রকাশ পেয়েছে আখিরাতে সে পরিমাণেই নূর প্রকাশ পাবে।

১৩-১৫ নং আয়াত : এখানে হাশরের ময়দানে মুনাফিকদের অবস্থা কেমন হবে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যখন মুমিনদের সামনে তাদের নূর দৌড়াতে থাকবে এবং ঐ নূরকে অনুসরণ করে তারা বেহেশতের দিকে যেতে থাকবে তখন মুনাফিকরা তাদের পেছনে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে দোযখের দিকে চলতে থাকবে। তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের নূর থেকে আমাদেরকেও কিছু দাও, যাতে আমরা পথ দেখতে পাই। এর জবাবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পেছনে সরে যাও, আজ এখানে তোমরা কোনো নূর পাবে না। অন্য কোথাও নূর তালাশ কর। দুনিয়ায় যে পথে তোমরা চলেছ সেখানে নূর তালাশ করে দেখ। নূরের পথে দুনিয়ায় তোমরা চলতে রাজি হওনি। এখন কেমন করে নূর পাবে? একসময় মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে দেওয়া হবে। তখন মুনাফিকরা মুমিনদেরকে আর দেখতে পাবে না। ঐ দেয়ালের দরজা দিয়ে মুমিনরা বেহেশতে ঢুকে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। দরজার ভেতরের দিকে বেহেশতের নিয়ামত থাকবে, আর বাইরের দিকে থাকবে দোযখের আযাব।

তখন মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে কাতরভাবে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে এক জামায়াতে শামিল ছিলাম না? আমরা কি তোমাদের সাথে এক কালেমার ভাই ছিলাম না? আমরা কি তোমাদের সাথে নামায-রোযা করিনি? আজ আমরা তোমাদের থেকে কেমন করে আলাদা হয়ে গেলাম?'

এ কথার জবাবে মুমিনরা বলবে, 'তোমরা বাহ্যিক দিক দিয়ে আমাদের সাথে থাকা সত্ত্বেও এবং লোকদেখানো নামায-রোযা করলেও মনের দিক দিয়ে আমাদের সাথে ছিলে না। যখন বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করেছিলাম তখন জান ও মাল দিয়ে আমাদের সাথে তোমরা ঐ সংগ্রামে শরিক হওনি। তোমরা বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলে না। সমাজের সুবিধাভোগীর ভূমিকায়ই তোমরা পালন করেছ। মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও খাঁটি মুসলিম হওনি। ঈমান ও কুফরীর মাঝে তোমরা সন্দেহ-দোলায় দুলছিলে। বেদীন, বাতিল ও কুফরী শক্তির সাথে তোমরা কখনো সম্পর্ক ত্যাগ

করনি এবং একমুখী হয়ে তোমরা ইসলামী শক্তির সাথে নিজেদের ভাগ্যকে জড়াতে চাওনি। তোমরা ফিতনার মাঝেই পড়ে ছিলে। তোমরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে। তোমাদের মনোভাব এমন ছিল যে, ইসলামবিরোধীদের জয় হলে তোমরা তাদের আপন হয়ে যেতে তৈরি ছিলে। তোমরা সন্দেহের মধ্যে ছিলে যে, ইসলাম শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কি না বলা যায় না; তাই বিরোধীদের সাথেও যোগাযোগ রাখা দরকার, যাতে বিপদে পড়তে না হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ফায়সালা না আসা পর্যন্ত তোমরা আশা-নিরাশার মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছিলে। কোনো সময়ই তোমরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আমাদের আপদ-বিপদে সাথী ছিলে না এবং হক ও বাতিলের দীর্ঘ সংগ্রামে কখনো ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কর্মসূচিতে তোমরা অংশ নাওনি। মৃত্যু পর্যন্তও তোমরা শয়তানের ধোঁকা থেকে রেহাই পাওনি।

১৫ নং আয়াতে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফায়সালা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আখিরাতে মুনাফিক ও কাফিরদের পরিণাম একই হবে। তাদের কাছ থেকে কোনো রকম ফিদইয়া বা মুক্তিপণ নিয়ে তাদের শাস্তি মওকুফ করা হবে না। তাদের আসল ঠিকানা দোযখই হবে। তারা আল্লাহকে তাদের অভিভাবক যখন বানায়নি, তখন দোযখই তাদের উপযুক্ত অভিভাবক। এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণাম আর কিছুই হতে পারে না।

১৬ নং আয়াত : এ আয়াতে মুসলমানদের জামায়াতে শামিল হওয়া সত্ত্বেও যারা ঈমানের দাবি পূরণ করছিল না, তাদেরকে সম্বোধন করে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা ঈমানদার বলে দাবি করছ অথচ তোমাদের সামনেই অন্য ঈমানদাররা যেখানে জান ও মাল কুরবান করে গোটা আরবের বাতিল শক্তির মুকাবিলা করছে, তোমরা তা করছ না। রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে অল্পসংখ্যক মুজাহিদ কত কষ্ট করছে। সারা আরবে মুসলমানদের উপর যুলুম চলছে বলে তারা হিজরত করে মদীনায় আশ্রয় নিচ্ছে। আনসাররা তাদের সাহায্য করে কুলাতে পারছে না। তদুপরি আরব শক্তি বারবার মদীনায় হামলা চালাচ্ছে। এ অবস্থার মধ্যেও কি তোমাদের কোনো চেতনা হচ্ছে না? এটা কোন্ ধরনের ঈমান যে, এসব দেখে-শুনেও তোমরা এগিয়ে আসছ না? আল্লাহকে কেমন করে তোমরা এভাবে ভুলে আছ? তোমাদের মন আল্লাহর নামে কেন নরম হচ্ছে না? তোমরা রাসূলের ডাকে কেন সাড়া দিচ্ছ না? এখনো কি সাড়া দেওয়ার সময় হয়নি?

ইহুদী ও খ্রিস্টানরা তো তাদের নবী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার বহু বছর পর আল্লাহর পথ থেকে সরে গেছে। তোমাদের রাসূল তোমাদের সাথে থাকাকালেই তোমরা ওদের মতো হয়ে গেলে কেমন করে?

১৭ নং আয়াত : এ আয়াতে নবুওয়াত ও কিতাব নাযিল করাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বহু আয়াতে এ তুলনা দেওয়া হয়েছে। এখানে যে অর্থে এ প্রসঙ্গ আনা হয়েছে তা ভালো করে বোঝা দরকার। বৃষ্টি হলে দেখা যায় যে, উর্বর জমি জেগে ওঠে ও ফসলে ভরে যায়। কিন্তু পাথুরে জমি বৃষ্টি হলেও বন্ধ্যাই পড়ে থাকে। তেমনি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ যখন হেদায়াতের বৃষ্টি দান করেন তখন দেখা যায় যে, মানুষের মধ্যে যাদের মন সত্য তালাশ করে, যা ভালো তা কবুল করার আগ্রহ রাখে এবং সৎ জীবন যাপন করতে চায় তাদের জীবন ঈমান ও নেক আমলের ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ কথা দ্বারা পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়েছে যে, যারা রাসূল (স)-এর সাথে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না তাদের মন পাথুরে জমির মতোই। ওহীর বৃষ্টি তাদের জীবনে ফসল ফলায় না।

১৮ ও ১৯ নং আয়াত : এ দুটো আয়াতে সাচ্চা ঈমানদারদের কথা বলা হয়েছে। তারা পুরুষ হোক আর নারী হোক, আল্লাহ তাআলার কাছে তারা প্রিয়। তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর

পথে যা দান করে তা করযে হাসানা হিসেবে গণ্য হবে এবং আখিরাতে তার বহু গুণ বেশি ফেরত দেওয়া হবে। এর উপর দান করার কারণে অতিরিক্ত পুরস্কারও দেওয়া হবে। আরও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, খাঁটি ঈমানের পরিচয় যারা দিয়েছে, তারা বেহেশতে সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা পাবে।

সিদ্দীক মানে সত্যের সাধক। যে কথা ও কাজে সত্য। যা মুখে বলে তা অন্তরেও সত্য বলে জানে এবং বাস্তবেও তা করে। যে কখনো সত্যের বিপরীত কোনো কথা বলে না ও কোনো কাজ করে না। যার সম্পর্কে কেউ ধারণা করে না যে, সে বিবেকের বিরুদ্ধে বলবে বা চলবে।

শহীদ মানে সাক্ষী। যে আল্লাহর পথে জীবন দান করে তাকে এ জন্য শহীদ বলা হয় যে, সে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, সে আল্লাহর পথের পথিক। কথা, কাজ ও আচরণে যে আল্লাহর দীনের সাক্ষ্য বহন করে সে নিহত না হলেও আল্লাহর কাছে শহীদের মর্যাদা পাবে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর নাযিল করা আয়াতসমূহকে মানতে অস্বীকার করেছে তারা সঙ্গত কারণেই দোযখী হবে।

তৃতীয় রুকূ'

২০ ও ২১ আয়াত : এ দুটি আয়াতে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের অসারতার সাথে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের মর্যাদার তুলনা করে মানুষকে পরকালের সফলতার জন্য মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

কুরআনের বহু সূরায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৪ ও ১৫, ইউনুসের ২৪ ও ২৫, ইবরাহীমের ১৮, কাহ্ফের ৪৫ ও ৪৬ এবং নূরের ৩৯ নং আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুরআন এ বিষয়ে মানুষকে বোঝাতে চায় যে, আসলে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানে সুখের সময়ও অস্থায়ী, দুঃখের সময়ও অস্থায়ী। এখানে মন ভোলানোর উপকরণ অনেক আছে। কিন্তু এসবই অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ছোট মনের লোকেরা এসবকে খুবই বড় মনে করে। তারা এসবের ধোঁকায় পড়ে গিয়ে মনে করে যে, এসব হাসিল করাই জীবনের চরম সফলতা। অথচ দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগের যত বড় বড় উপকরণ আছে তা অতি নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী। এসবই ভাগ্যের খেলা। যেকোনো সময় ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেলে দুনিয়ায় থাকাকালেই সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারে। আর মৃত্যু এলে এসবই ফেলে চলে যেতে হবে।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত হলো আখিরাতের অবস্থা। ঐ জীবন মহান ও চিরস্থায়ী। ওখানকার লাভও মহান এবং স্থায়ী। ক্ষতিও বিরাট এবং স্থায়ী। যে ওখানে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি পেয়ে গেল সে চিরকালের জন্য এমন সব মহা নিয়ামতের ভাগী হয়ে গেল, যার তুলনায় দুনিয়ার সব ধন-দৌলত, রাজত্ব, সুখ-সুবিধা নিতান্তই তুচ্ছ। আর যে ওখানে আল্লাহর আযাবের ভাগী হয়ে গেল, সে দুনিয়ায় যত বড় সম্পদ ও ক্ষমতা ভোগ করে থাকুক এবং এসবকে সে যত বিরাট সাফল্য মনে করে থাকুক, সে তখন অনুভব করতে পারবে যে, দুনিয়ার জীবনে সে বড়ই ধোঁকা খেয়েছে এবং চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে এসেছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাথে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনা করার পর মানুষকে আল্লাহ তাআলা উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যে দুনিয়ার সুখ-সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছ তার বদলে আখিরাতের নিয়ামত পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করাই তোমাদের উচিত। দুনিয়ায় ধনে-জনে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া বা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা পেয়ে একে অপরের উপর বাহাদুরি প্রকাশ করা অর্থহীন। এসব দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে যাবে। যেমন জমির মনোরম সবুজ শস্যক্ষেত্রও কিছুদিনের মধ্যে হলদে হয়ে ভূষিতে পরিণত হয়, তেমনি দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যও

অতি ক্ষণস্থায়ী। তাই ক্ষণস্থায়ী জিনিসের বদলে চিরস্থায়ী জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা কর। ঐ বেহেশতের জন্য মেহনত কর, যা আসমান ও জমিনের মতো বিশাল।

এ বিশালতার অর্থ এই যে, বেহেশতবাসী সৃষ্টিজগতের সবখানেই অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। আরাম ও বিশ্রাম করার জন্য যে বাড়িতে বেহেশতবাসী থাকবে, সেটুকুর মধ্যেই তার জীবন সীমাবদ্ধ থাকবে না। সৃষ্টিজগতের যাকিছু সে দেখতে চাইবে, যত নিয়ামত পেতে চাইবে, যেখানে যেতে চাইবে কোথাও বাধা পাবে না।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখিরাতের কামিয়াবির জন্য চেষ্টা করেছে তারাই ঐ বিশাল বেহেশতের অধিকারী হবে। যারা দুনিয়ার ধোঁকায় না পড়ে আখিরাতের লক্ষ্যে কাজ করে তারাই আল্লাহর মেহেরবানী পাওয়ার হকদার।

২২ ও ২৩ নং আয়াত : এ দুটো আয়াতে ঐ সময়কার কঠিন অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তখন সব সময় দুশমনের হামলার আশঙ্কা বিরাজ করছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলছে। অবিরাম ঘেরাও অবস্থায় থাকতে হচ্ছে বলে মদীনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবের দরুন সবাই কষ্ট পাচ্ছে। আরবের সব জায়গায় মুমিনদের উপর যুলুম চলছে। এত রকম মুসিবতের মধ্যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মতো কাফিররা প্রচার চালাচ্ছে যে, দেব-দেবীর অভিশাপের কারণে তাদের এমন দুর্দশা হয়েছে। আর এ অবস্থার কারণে মুনাফিকদের মনে আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। মুসলিম ঈমানদাররা এ কঠিন অবস্থা সহ্য করেছিল বটে, কিন্তু কখনো কখনো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

এ পরিবেশেই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ কয়টি আয়াতে এমন কথা বলে দিয়েছেন, যা চরম বিপদেও মুমিনদেরকে সবর করার শক্তি জোগায়। বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ! তোমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহর অজান্তে তোমাদের উপর কোনো মুসিবত আসে না। আল্লাহর পূর্বপরিকল্পনায় যা তিনি ঠিক করে রেখেছেন সে অনুযায়ীই সবকিছু হচ্ছে। তোমাদেরকে যে বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি সৃষ্টির জন্যই তোমাদের ট্রেনিং হিসেবে এ কঠিন অবস্থায় ফেলা হয়েছে। এ ট্রেনিং ছাড়া মানবজাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হলে তোমরা কিছুতেই সফল হতে পারবে না। তোমাদের চরিত্রে যেসব গুণ থাকলে তোমরা সবার জন্য আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারবে, সেসব গুণ এ ধরনের ট্রেনিং ছাড়া সৃষ্টি হয় না। তাই হক ও বাতিলের এ লড়াই আল্লাহর শখের কোনো খেলা নয়। যারা হককে বিজয়ী করতে চায় তারা এ সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে।

এ ব্যবস্থা করা দ্বারা মুমিনদের দুটো গুণ হাসিল হয় বলে ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি গুণ হলো, দুনিয়ার দিক দিয়ে তোমাদের যত রকম ক্ষতি হয়েছে এর জন্য তোমাদের মনে কোনো দুঃখ থাকবে না। আল্লাহর পথে তোমাদের মহান কুরাবানি হয়েছে বলে তোমরা তৃপ্তিবোধ করবে। অপর গুণটি হলো, আল্লাহ তোমাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা, গনিমতের মাল ও অন্যান্য যত সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন সেসবের কারণে তোমরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে অহংকার করবে না এবং সীমা লংঘন করবে না। কারণ, তোমরা জানো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সবরের পরীক্ষার জন্য যেমন মুসীবত দেওয়া হয়, তেমনি ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ আল্লাহর দান বলে স্বীকার করে তার মর্জিমতো তা ব্যবহার করে কি না তারও পরীক্ষা নেওয়া হয়।

যারা আল্লাহর পথে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার পর সফলতা অর্জন করে, তাদের মধ্যে অহঙ্কার সৃষ্টি হয় না। তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে না। তারা সবকিছুকেই আল্লাহর দান মনে করে বিজয়ী হয়ে চলে।

২৪ নং আয়াত : এ আয়াতে ঐ সময়কার মুসলিম সমাজের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল তাদের দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার মুমিনগণ ঐ কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যে ট্রেনিং লাভ করেছিল, মুনাফিকরা কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি না থাকায় ঐ মূল্যবান তরবিয়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। মুনাফিকরা বাহ্যিক দিক দিয়ে মুমিনদের সাথে এক জামায়াতেই শামিল ছিল। তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাবিও করত। কিন্তু মুমিনদের মধ্যে যে ইসলাম ছিল তাদের মধ্যে এর অভাব থাকায় একদিকে তারা দুনিয়ার সামান্য ধন-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে অহঙ্কারী হয়ে গেল, অপরদিকে আল্লাহর পথে খরচ করা তো দূরের কথা, অন্যদেরকে দান না করার জন্য কুপরামর্শ দিতে লাগল।

ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে হক ও বাতিলের এ লড়াই ছাড়া মুমিনদের জামায়াতে লুকিয়ে থাকা মুনাফিকদেরকে আলাদা করে চিনে নেওয়া সম্ভব হতো না। কারা দীনের স্বার্থে মুসলিম জামায়াতে শরিক হচ্ছে, আর কারা দুনিয়ার স্বার্থে ঈমানদার হওয়ার দাবি করছে তা একমাত্র দীনের পথে বিপদ-মুসীবতের মাধ্যমেই সঠিকভাবে জানা যায়। এটাই আল্লাহর হিকমত। এ নিয়মেই দুনিয়ায় সৎ নেতৃত্ব কায়েমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা না হলে বিজয় যুগে ইসলামী সমাজ গঠনের যোগ্য লোক বাছাই করা সম্ভব হতো না।

মুনাফিকদের আচরণের কথা উল্লেখ করে আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে, তারা জেনে রাখুক যে, মুনাফিকী ভূমিকা পালন করে তারা আল্লাহর সামান্য কোনো ক্ষতিও করতে পারছে না; বরং তারা নিজেদেরই দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করছে। তাদের ইসলামের জন্য আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই। তারা আল্লাহর পথে খরচ না করলে আল্লাহর কিছুই আসে-যায় না। আল্লাহ তাদের প্রশংসারও কাঙ্গাল নন। কেউ তাঁর প্রশংসা না করলেও তিনি স্বয়ং প্রশংসিত। যারা তাঁর পথে দান করে এবং তাঁর প্রশংসা করে তারা নিজেদের লাভের জন্যই তা করে। এতে আল্লাহর নিজের কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই।

২৫ নং আয়াত : এ আয়াতটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য কী এবং ঐ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাসূলগণকে কী কী উপকরণ দান করা হয়েছে তা এখানে এমন সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, যা কুরআনের অন্য কোথাও এক আয়াতে এতটা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যত রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাদের সবাইকে তিনটি উপকরণ দান করেছেন। যথা–

১. 'বাইয়িনাত' বা সুস্পষ্ট প্রমাণ বা নিদর্শন। অর্থাৎ যাদেরকে রাসূল নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে এমন কতক গুণাবলি দেওয়া হয়েছে, যা এ কথার স্পষ্ট পরিচয় বহন করে যে, তাঁরা আল্লাহ রাসূল। নবুওয়াত প্রকাশ করার আগেই উন্নত মানবিক গুণাবলির কারণে সবাই তাঁদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। সমাজে সব মানুষের মধ্যে যেসব দোষ-ত্রুটি থাকে তা তাঁদের মধ্যে না থাকায় তাঁদের মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব জনগণের মনে তাঁদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে। তা ছাড়া রাসূলগণকে এমন সব মুজিযা দান করা হয়েছে, যা তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সহজে চিনে নিতে জনগণকে সাহায্য করেছে। যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, এসব ব্যক্তির পেছনে আল্লাহর শক্তিশালী হাত রয়েছে।

২. কিতাব। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথে চালানোর জন্য ওহীর মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন, যার সর্বশেষ সংস্করণ হলো কুরআন।

৩. মীযান। এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়িপাল্লা বা তুলাদণ্ড। দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও সুবিচারের প্রতীক। রাসূলগণকে মীযান দেওয়ার অর্থ হলো চিন্তা ও কর্মের এমন ভারসাম্য বজায় রাখার যোগ্যতা, যা তাঁদেরকে যেকোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যে সঠিক জ্ঞান মানুষকে কোনো চরমপন্থি হওয়া থেকে রক্ষা করে তাকেই মীযান বলা হয়েছে। দাঁড়িপাল্লা একদিকে ঝুঁকে থাকলে বোঝা যায় যে, হয় মাপে কম দেওয়া হচ্ছে অথবা বেশি নেওয়া হচ্ছে। এটা ইনসাফের বিরোধী।

জীবনের সব অবস্থায় মানুষ চিন্তা, কথা, আচরণ, লেনদেন, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান বা বিশুদ্ধ নিয়তের অভাবে ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারে না। ফলে তারা সঠিক পথে না চলে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে চরমপন্থি হয় এবং দুনিয়াতেও অশান্তি ভোগ করে, আখিরাতেও শাস্তির ভাগী হয়।

মানুষকে এ দুরবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্যই রাসূলকে মানদণ্ড বা মি'ইয়ারে হক বানানো হয়েছে– যাতে তাঁরা হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দ, সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে দাঁড়িপাল্লার মতো ওজন করে মানুষকে শান্তির পথ দেখাতে পারেন।

এভাবে প্রত্যেক রাসূলকে বাইয়িনাত, কিতাব ও মীযান দিয়ে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য কী তা 'লি-ইয়াকূমান্নাসু বিল কিসতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ 'যাতে ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে'। ইনসাফ এমন এক পরিভাষা, যা ইংরেজি 'জাস্টিস' ও বাংলা 'সুবিচার' শব্দ দ্বারা মোটামুটি বোঝানো যায়।

আসলে মানবসমাজের যাবতীয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণই হলো ইনসাফের অভাব। সবাই যার যার হক বা অধিকার যদি ঠিকমতো পায় তাহলেই বোঝা গেল, ইনসাফ কায়েম হয়েছে। এ ইনসাফের অভাবেই ব্যক্তিজীবন এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চরম অশান্তি বিরাজ করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও কোথাও ইনসাফ কায়েম নেই। এর কারণ এটাই যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের মীযান ছাড়া ইনসাফ কায়েম হতে পারে না। তাই রাসূলকে ইনসাফ কায়েমের দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে। রাসূলকে শুধু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিয়ে পাঠানো হয়নি। তাই মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করার বিরাট দায়িত্ব রাসূল (স) পালন করে গেছেন।

এরপর এ আয়াতে লোহা নাযিল করার কথা বলে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কিতাব ও মীযান নাযিল করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লোহা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ধাতু। আধুনিক জগৎ লোহা ছাড়া অচল। কিন্তু এ আয়াতে রাসূল পাঠানোর সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করার প্রসঙ্গে 'লোহা' নামক ধাতুর উল্লেখ করাটা প্রাসঙ্গিক হয় কেমন করে?

সকল বিখ্যাত তাফসীরে এর যত রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মর্ম একই দাঁড়ায়। কেউ লোহা দ্বারা সামরিক শক্তি বুঝেছেন। কারণ, সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র লোহা দিয়ে তৈরি হয়। কেউ রাষ্ট্রশক্তি বুঝেছেন। কারণ, সামরিক অস্ত্র রাষ্ট্রের মর্জিতেই ব্যবহার করা হয়। আবার কেউ লোহা দ্বারা সরকার বা শাসনক্ষমতা বুঝেছেন। কারণ, সরকার যে শক্তি প্রয়োগ করে তাতে লোহার সরঞ্জামই ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং এখানে লোহা শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে এ প্রসঙ্গ খুবই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বাইয়িনাত, কিতাব ও মীযান দিয়ে মানবসমাজে ইনসাফ কায়েমের যে বিরাট দায়িত্ব রাসূলের উপর অর্পণ করেছেন তা শুধু ওয়াজ, তাবলীগ ও তালকীনের দ্বারাই পালন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর আইন সমাজে চালু করার জন্য শাসনক্ষমতাও রাসূলের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন। তাই এ ক্ষমতাও রাসূল (স)-কে কাজে লাগাতে হয়েছে।

এ আয়াতে লোহা বা রাজশক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'এর মধ্যে বিরাট শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে।' শাসনক্ষমতা এমন এক হাতিয়ার, যা মানুষের উপর অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে আবার মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণও সাধন করতে পারে। 'বা'স'। শব্দ দ্বারা বিপদও বোঝায়। অর্থাৎ, সরকারি ক্ষমতা জনগণের জন্য বিপদের কারণও হতে পারে আবার জনগণের খিদমতের বাহনও হতে পারে।

মানবজাতির ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, রাষ্ট্রক্ষমতা যদি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের মীযান অনুযায়ী ব্যবহার করা না হয় তাহলে জনজীবন দুঃখময় হতে বাধ্য। দুনিয়ার সবার সামনে এ সত্য আজ সুস্পষ্ট। মানুষ যদি ইনসাফ পেতে চায় তাহলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া তা পাওয়া কখনো সম্ভব হবে না।

আয়াতের শেষাংশও বড়ই অর্থপূর্ণ। মানবসমাজে ইনসাফ কায়েমের জন্য আল্লাহ তাআলা যে নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেদিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের সকল বস্তুর জন্যই আইন ও বিধান তৈরি করেছেন এবং তা নিজেই জারি করেছেন। কিন্তু মানবজাতির উপযোগী যে বিধান তিনি কিতাব আকারে রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তা চালু করার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছেন।

সে ব্যবস্থা হলো এই যে, তিনি রাসূলের উপরই কিতাব ও মীযান নাযিল করেন এবং রাসূলের নেতৃত্বে একদল সৎ লোক তৈরি করার নির্দেশ দেন। রাসূল সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন এবং আল্লাহর আইন জারি করার যোগ্য একদল সৎ লোক জোগাড় হলে রাসূলকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেন, যাতে মানুষ ইনসাফ পায়, অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের মীযান অনুযায়ী জীবন যাপনের সুযোগ পায়।

আল্লাহ নিজে তাঁর আইন জারি করার ব্যবস্থা না করে তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে ইনসাফ কায়েমের ঐ কঠিন পদ্ধতি কেন দিলেন, সে কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষার সুযোগ দান করা। যারা পরীক্ষায় পাস করবে তাদেরকে তিনি পুরস্কার দেবেন আর যারা ফেল করবে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ দেখে নিতে চান যে, আল্লাহকে না দেখে এবং আল্লাহর কথামতো একজন মানুষকে রাসূল বলে স্বীকার করে কারা ইনসাফ কায়েমের সংগ্রামে শরিক হয়।

এ সংগ্রামকেই কুরআনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা ইকামাতে দীনের আন্দোলন বলা হয়েছে। যারা এ দায়িত্ব পালন করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর ও রাসূলের সাহায্যকারী বা আনসারুল্লাহ বলে গণ্য করেন। আনসারুল্লাহর এ বিরাট মর্যাদা কারা পেতে চায়, তাদেরকে চিহ্নিত করাই এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। তা না হলে শক্তিমান আল্লাহ কারো সাহায্যের কাঙ্গাল নন।

এ ব্যবস্থা না করে যদি আল্লাহ নিজেই তাঁর কিতাব আপন শক্তিতে কায়েম করে দিতেন, তাহলে আনসারুল্লাহর মর্যাদা যারা পেতে চায় তাদের সে সুযোগ হতো না। মানুষকে তিনি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতো তাঁর আইন মানতে বাধ্য করেননি। বাধ্য করলে মানুষ আল্লাহর খলীফা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারত না।

চতুর্থ রুকূ'

২৬ ও ২৭ নং আয়াত : এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স)-এর পূর্বে যত রাসূল বাইয়িনাত, কিতাব ও মীযান নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন তাঁদের উম্মতের উপর কীভাবে অধঃপতন এসেছে। ঐ রাসূলগণ নূহ (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁদের সন্তানদের মধ্যে কতক লোক হেদায়াতের পথে চলেছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই আল্লাহর নাফরমানি করেছে। এভাবে একের পর এক রাসূল দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, যাদের মধ্যে ঈসা (আ)-কে সবার শেষে পাঠানো হয়েছে। মুহাম্মদ (স)-এর পূর্ববর্তী রাসূলদের মধ্যে তিনিই শেষে এসেছেন। ঈসা (আ)-এর উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ ২৭ নং আয়াতে বলেন, যাঁরা এ রাসূলকে অনুসরণ করেছে তারা বড়ই মানবদরদি ও জনসেবক ছিল। ঈসা (আ) থেকেই তারা এ দুটো গুণের শিক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু যে কারণে তাদের অধঃপতন হলো তা হচ্ছে, বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসধর্ম। দুনিয়ার দায়িত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর ভালোবাসায় জীবন উৎসর্গ করার নামে তারা ঐ রাসূলের নিকট প্রেরিত কিতাব ইনজীলের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেল।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন যে, তারা নিজেরাই বৈরাগ্য সাধনের এ ভুল পথ বেছে নিয়েছে। আমি তাদেরকে এ রকম কোনো হুকুম দিইনি। আমি তাদেরকে আমার সন্তুষ্টি তালাশের হুকুমই দিয়েছি। কিন্তু তারা বৈরাগ্য সাধনকেই আমার সন্তুষ্টির পথ মনে করে নিয়েছে। এটা তাদের তৈরি বিদআত।

আল্লাহ বলেন যে, তারা বৈরাগ্য সাধনের পথকে সঠিক মনে করে গ্রহণ করা সত্ত্বেও সত্যিকার বৈরাগী হতে পারেনি। ফিতরাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাদেরকে ব্যর্থ হতে হয়েছে। বাস্তবে সন্ন্যাসধর্ম পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাদ্রিদের বৈরাগ্য জীবনের দীর্ঘ ব্যর্থ ইতিহাসই এর সাক্ষী। অবশ্য ঈসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে যারা সঠিকভাবে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি এর বদলা দিয়েছি; কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই ফাসিক ছিল।

২৮ ও ২৯ নং আয়াত : শেষ দুটো আয়াতে মুহাম্মদ (স)-এর উপর ঈমান আনয়নকারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং মুহাম্মদ (স)-এর আনুগত্য করতে থাকো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর দ্বিগুণ রহমত দান করবেন এবং তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তোমাদের কার্যকলাপ ও ভূমিকা এমন হওয়া উচিত, যাতে খ্রিস্টান ও ইহুদিরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারে যে, আল্লাহ তাদের উপর মোটেই সন্তুষ্ট নন; বরং তাঁর করুণা এখন মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারীদের উপরই বর্ষিত হচ্ছে এবং তারা যেন এটাও বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবিদার হলে তাদেরকে মুহাম্মদ (স)-এর বিরোধিতা পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করাই কর্তব্য। মুহাম্মদ (স)-এর উপর ঈমান আনা ছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি আল্লাহর নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সূরা হাদীদ

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعَاتُهَا ٤

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ করেছে। তিনিই মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

২. আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক তিনি। তিনিই হায়াত ও মওত দান করেন। আর তিনি সব জিনিসের উপর শক্তিশালী।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

৩. আদিও তিনি, অন্তও তিনি, যাহেরও তিনি, বাতেনও তিনি।[১] আর তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

৪. তিনিই (ঐ সত্তা) যিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি আরশের উপর বসলেন। যাকিছু জমিনে ঢুকে, আর যা তা থেকে বের হয় এবং যাকিছু আসমান থেকে নাযিল হয়, আর যা সেখানে উঠে যায়[২], সে সবই তাঁর জানা আছে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর যে কাজই তোমরা কর তা তিনি দেখছেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

১. অর্থাৎ, যখন কিছুই ছিল না তখনও তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। তিনি সকল প্রকাশ্য বস্তু থেকেও অধিক প্রকাশ্য। কেননা, দুনিয়াতে যাকিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁরই গুণ, তাঁরই কাজ এবং তাঁরই আলোর প্রকাশ। তিনি গুপ্ত জিনিস থেকেও অধিক গুপ্ত কেননা, অনুভূতি দ্বারা তাঁর সত্তা অনুভব করা তো দূরের কথা, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং চিন্তা-কল্পনাও তাঁর আকার ও আসল সত্তার নাগাল পায় না।

২. অন্য কথায়, তিনি শুধু সমষ্টিরই জ্ঞান রাখেন না, ছোট ছোট অংশের জ্ঞানও রাখেন। প্রতিটি বীজ যা মাটির নিচে ঢুকে, গাছের প্রতিটি পাতা ও অঙ্কুর যা মাটি থেকে বের হয়, বৃষ্টির একেকটি বিন্দু যা উপর থেকে পড়ে, বাষ্পের প্রতিটি কণা, যা সমুদ্র ও নদী-নালা থেকে উঠে উপর দিকে যায়, সবই তাঁর জানা। তিনি জানেন যে, কোন্ বীজ জমির কোন্ জায়গায় পড়ে আছে। জানেন বলেই তিনি তা থেকে অঙ্কুর বের করেন এবং তাকে লালন করে বড় করে তোলেন। তিনি আরো জানেন যে, বাষ্পের কতটুকু পরিমাণ কোথা থেকে উঠেছে এবং কোথায় তা পৌঁছেছে, তবেই তো তিনি ঐসবকে একত্র করে মেঘ সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রত্যেক জায়গায় নির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৫. আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক তিনি। সব বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৬. তিনি রাতকে দিনের ভেতর এবং দিনকে রাতের ভেতর ঢুকিয়ে দেন। আর অন্তরের গোপন কথাও তিনি জানেন।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৭. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন।[৩] আর ঐসব জিনিস থেকে খরচ কর, যার উপর তিনি তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন। তাই তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও মাল খরচ করবে তাদের জন্য বিরাট বদলা রয়েছে।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৮. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনছ না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের উপর ঈমান আনার জন্য ডাকছেন।[৪] আর তিনি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন[৫], যদি তোমরা সত্যিই তা মেনে নাও।

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৯. তিনিই তো আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাহর উপর সুস্পষ্ট আয়াতগুলো নাযিল করছেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর আসলেই আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ

১০. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছ না? অথচ আসমান ও জমিনের মীরাস তো আল্লাহরই জন্য[৬]।

৩. এখানে ঈমান আনার অর্থ ইসলামকে শুধু মুখে স্বীকার করা নয় বরং আন্তরিকতার সাথে মযবুতভাবে বিশ্বাস করা।

৪. এখানেও ঈমান আনার অর্থ খাঁটি দিলে বিশ্বাস করা।

৫. অর্থাৎ, আনুগত্যের অঙ্গীকার তথা মেনে চলার শপথ।

৬. এর দুটি অর্থ– প্রথমত, এ ধন তোমাদের কাছে চিরদিন থাকার জিনিস নয়, একদিন তোমাকে অবশ্যই সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে। তখন আল্লাহই ওয়ারিস হবেন। দ্বিতীয় অর্থ, আল্লাহর

مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑩

তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পর খরচ করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো তাদের সমান হতে পারে না, যারা বিজয়ের আগে খরচ করেছে ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা তাদের তুলনায় অনেক বেশি, যারা বিজয়ের আগে খরচ করেছে ও জিহাদ করেছে। অবশ্য আল্লাহ সবার জন্যই ভালো ওয়াদা করেছেন।[৭] আর তোমরা যাকিছু কর তা আল্লাহর জানা আছে।

রুকূ' ২

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ⑪

১১. এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দেবে— করযে হাসানা, যাতে তিনি তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দিতে পারেন? আর তার জন্য রয়েছে উত্তম বদলা।[৮]

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ

১২. ঐ দিন যখন তুমি মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে দৌড়াচ্ছে[৯], (তখন তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের

পথে খরচ করতে গিয়ে তোমার মনে গরিব হয়ে যাওয়ার ভয় হওয়া উচিত নয়। কেননা, যে আল্লাহর জন্য তুমি মাল খরচ করবে তিনি জমিন ও আসমানের সব ধনভাণ্ডারের মালিক, তিনি আজ তোমাকে যতটুকু দিয়ে রেখেছেন, তোমাকে দেওয়ার জন্য শুধু ততটুটুই তাঁর কাছে ছিল না; বরং তিনি তোমাকে এর থেকে অনেক বেশিও দিতে পারেন।

৭. কুফর ও ইসলামের লড়াইয়ের ফায়সালা ইসলামের পক্ষে হয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর) যারা কুরবানী দেয়, তারা মর্যাদায় ঐ লোকদের সমান হতে পারে না, যারা যে সময় ইসলামের উপর কাফিরদের শক্তি বেশি থাকে এবং যখন ইসলামের বিজয়ের কোনো দূরবর্তী সম্ভাবনাও দেখা যায় না তখন ইসলামের পক্ষে জান ও মাল কুরবানী করে।

৮. আল্লাহ তাআলার উদারতা ও মহিমার এটা একটা প্রমাণ যে, মানুষ তাঁরই দেওয়া ধন তাঁর পথে ব্যয় করলে তিনি নিজের দায়িত্বে তা করয বলে গণ্য করেন। তবে শর্ত এই যে, এ ঋণকে উত্তম ঋণ হতে হবে অর্থাৎ সহীহ নিয়তে, কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে দিতে হবে। এ ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা দুটো ওয়াদা করেছেন– ক. তিনি কয়েক গুণ বাড়িয়ে তা ফিরিয়ে দেবেন। খ. তিনি এর জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

৯. এখানে মানুষের মনে একটা প্রশ্ন খটকা সৃষ্টি করতে পারে যে, আগে আগে আলো চলতে থাকার কথা তো বোঝা যায়; কিন্তু ঐ আলো শুধু ডানদিকে দৌড়ানোর অর্থ কী? তার বাঁদিকে কি অন্ধকার থাকবে? এর উত্তর হচ্ছে, কোনো লোক নিজের ডান হাতে আলো নিয়ে চললে তার বাঁদিকও তো আলোকিত হয়; কিন্তু আসলে আলো তো তার ডান হাতেই থাকে।

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

জন্য ঐসব জান্নাতের সুখবর দেওয়া হচ্ছে, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে এবং যেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। এটাই বিরাট সফলতা।

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এমন অবস্থা হবে যে, তারা মুমিনদেরকে বলবে, 'আমাদের দিকে একটু খেয়াল কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর থেকে কিছু ফায়দা হাসিল করতে পারি।' কিন্তু তাদেরকে বলা হবে, 'পেছনে সরে যাও, অন্য কোথাও থেকে তোমাদের জন্য নূর তালাশ করে নাও।' তাদের মাঝে একটা দেয়াল খাড়া করে দেওয়া হবে, যাতে একটা দরজা থাকবে। ঐ দরজার ভেতরে রহমত ও বাইরে আযাব থাকবে।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾

১৪. তারা মুমিনদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' মুমিনরা জবাবে বলবে, 'হ্যাঁ, ছিলে তো, কিন্তু তোমরা যে নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনায় ঠেলে দিয়েছিলে, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে, সন্দেহে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-ভরসা তোমাদেরকে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। আর শেষ পর্যন্ত ঐ বড় ধোঁকাবাজ (শয়তান) আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছিল।'

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

১৫. তাই আজ তোমাদের কাছ থেকেও কোনো মুক্তিপণ কবুল করা হবে না, আর কাফিরদের কাছ থেকেও না। দোযখই তোমাদের ঠিকানা। সে-ই তোমাদের দেখা-শোনা করবে। আর এটা বড়ই নিকৃষ্ট পরিণাম।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

১৬. ঈমানদারদের জন্য[১০] এখনো কি ঐ সময় আসেনি যে, তাদের মন আল্লাহর যিকিরে বিগলিত হবে ও তাঁর নাযিল করা সত্যের সামনে নত হবে এবং তাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো হয়ে যাবে না? ঐ লোকদের উপর দিয়ে একটা লম্বা সময় পার হয়ে গেছে, তাই তাদের মন শক্ত হয়ে গেছে। আর আজ তাদের অনেকেই ফাসিক'হয়ে আছে।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

১৭. ভালো করে জেনে রাখো যে, আল্লাহ জমিনকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন।[১১] আমি তোমাদেরকে নিদর্শনগুলো পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮. পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যারা দান-খয়রাত করে[১২] এবং যারা আল্লাহকে করযে হাসানা দিয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বদলা।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ

১৯. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দীক[১৩] ও 'শহীদ' (হিসেবে

১০. এখানে ঈমানদার অর্থ সব মুসলমান নয়; বরং মুসলমানদের সেই বিশেষ গোষ্ঠী, যারা ঈমান এনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসারীদের দলে শামিল হওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট ছিল না।

১১. যে প্রসঙ্গে এখানে এ কথা বর্ণিত হয়েছে তা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় নবুওয়াত ও কিতাব নাযিলকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ, মানুষের উপর নবুওয়াতের তেমনি প্রভাব পড়ে, যেমন পৃথিবীর উপর বৃষ্টিধারার প্রভাব পড়ে। যে জমিনের মধ্যে কিছু মাত্রও উর্বরা শক্তি বর্তমান থাকে তা বৃষ্টি হলে সুজলা-সুফলা হয়ে ওঠে। অবশ্য বন্ধ্যা জমি আগে যেমন অনুর্বর ছিল বৃষ্টির পরও তেমনই পড়ে থাকে।

১২. 'সাদাকা' বা সদকা আমাদের সমাজে খুবই খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় ঐ দানকে সাদাকা বলা হয়, যা খাঁটি দিলে, সহীহ নিয়তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হয় এবং যার মধ্যে কোনো লোকদেখানো ভাব বা কারো প্রতি উপকারের খোঁটা দেওয়ার জযবা থাকে না।

১৩. 'সিদ্‌ক' এর Superlative degree হলো সিদ্দীক। সাদিক মানে সাচ্চা; আর সিদ্দীক অত্যন্ত সাচ্চা। অর্থাৎ এরূপ খাঁটি ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ যার চরিত্রে কোনোই খুঁৎ নেই, যে কখনো সত্য ও ন্যায়ের খেলাফ চলেনি, যার সম্পর্কে ধারণাই করা যায় না যে, সে বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো কথা

أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

গণ্য)।[14] তাদের জন্য রয়েছে তাদের বদলা ও তাদের নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের অধিবাসী।

রুকূ' ৩

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

২০. ভালো করে জেনে রাখো যে, দুনিয়ার এ জীবনটা খেল-তামাশা, মনভোলোনোর (উপকরণ), সাজ-সজ্জা, তোমাদের একে অপরের উপর গর্ব করা এবং ধনে-জনে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ এ রকম— যেমন এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, (এর ফলে) যে গাছ-গাছড়া জন্মাল তা চাষীকে খুশি করে দিল। তারপর ঐ ফসল পরিপক্ব হলো এবং তোমরা দেখলে যে তা হলদে হয়ে গেল। তারপর তা ভুসিতে পরিণত হয়ে যায়।

এর বিপরীত হলো আখিরাত— যেখানে রয়েছে (একদিকে) কঠিন আযাব, (অপরদিকে) আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা ছলনাময় জীবিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ

২১. তোমরা দৌড়াও এবং একে অপর থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং ঐ বেহেশতের দিকে, যার বিশালতা আসমান ও জমিনের মতো।[15] যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

বলবে। সে যখন কোনো কথা মেনে নেয় তখন সম্পূর্ণ ইখলাসের সাথেই মেনে নেয়। সে তা মেনে চলার হক আদায় করে, দায়িত্ব পালন করে এবং নিজের কাজের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করে যে, সে বাস্তবিকই এমন একজন মান্যকারী, প্রকৃত একজন মান্যকারীর পক্ষে যেরূপ হওয়া উচিত।

১৪. 'শহীদ'-এর অর্থ এখানে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দান করে।

১৫. সূরা আলে ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতের সঙ্গে এ আয়াত একত্র করে পাঠ করলে মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, জান্নাতে এক ব্যক্তি যে বাগান ও দালান কোঠা পাবে তা মাত্র তার থাকার জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোটা সৃষ্টিজগতেই সে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্যই তা তৈরি রাখা হয়েছে। এটা আল্লাহরই মেহেরবানী, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

২২. এমন কোনো বিপদ নেই, যা দুনিয়াতে বা তোমাদের নাফসের উপর নাযিল হয়, আর আমি একে সৃষ্টি করার আগেই তা এক কিতাবে (তাকদীরে) লিখে রাখিনি। এমনটা করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ কাজ।

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

২৩. (এসব কিছু এজন্য) যাতে তোমাদের যতটুকুই ক্ষতি হয়ে গেছে সেজন্য তোমরা হতাশ না হও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যাকিছু দিয়েছেন তাতে তোমরা খুশিতে আত্মহারা না হও। আল্লাহ এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না, যারা নিজেদেরকে বড় মনে করে এবং অহঙ্কার করে।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

২৪. যারা নিজেরা বখিলী করে ও মানুষকে বখিলী করতে বলে, যারা মুখ ফিরিয়ে রাখে (তারা জেনে রাখুক যে) নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সত্তা, যাঁর কারো কাছে কোনো ঠেকা নেই[১৬] এবং যিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না।[১৭]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ

২৫. আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে।[১৮]

১৬. আসলে 'গনী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো যিনি অভাবমুক্ত, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং যার কারো কাছে কোনো ঠেকা নেই বা যিনি কারো কাছে দায়ে পড়েন না।

১৭. আসলে 'হামীদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বপ্রশংসিত অর্থাৎ কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক তিনি প্রশংসার যোগ্য। মানুষ তার প্রশংসা না করলে তাঁর কিছুই আসে-যায় না।

১৮. এখানে নবীগণের মিশনের পূর্ণ সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত রাসূলই এসেছেন তাঁরা সকলে তিনটি জিনিস নিয়ে এসেছিলেন– ক. যুক্তি-প্রমাণ ও সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন বা উপদেশ-নির্দেশ; খ. কিতাব যার মধ্যে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা লিখিত থাকে। গ. মীযান (তুলাদণ্ড) অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার ঐ মানদণ্ড, যা ঠিক

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

আমি লোহা (বা রাষ্ট্রশক্তিও) নাযিল করেছি, যার মধ্যে বিরাট রণশক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে।[১৯] এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বড়ই শক্তিমান ও প্রতাপশালী।

রুকূ' ৪

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আমি নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছি এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে কিতাব ও নবুওয়াত দান করেছি। অতঃপর তাদের সন্তানদের মধ্যে কেউ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অনেক লোক ফাসিক হয়ে গেছে।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ

২৭. অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। শেষদিকে আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাঠালাম এবং তাকে ইনজীল দান করলাম। যারা তাকে মেনে চলেছে তাদের মনে আমি দরদ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছি। তারা নিজেরাই বৈরাগ্য জীবন[২০] কবুল করে নিয়েছে। আমি তা তাদের উপর ফরয করে দিইনি; বরং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করার উদ্দেশ্যে

ঠিক তুলাদণ্ডে ওজন করে নির্দেশ দেয়। চিন্তা, নৈতিকতা ও আচার-আচরণের বেলায় অতি বেশি বা অতি কম হওয়ার মধ্যে এবং সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিক ধারণার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের কথা কোন্‌টি তা ঐ মানদণ্ড দ্বারা সঠিকভাবে জানা যায়।

১৯. নবীগণের মিশন বর্ণনার সাথে সাথে এ কথাটি এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, এখানে লোহা অর্থ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং এ বাণীর মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা ইনসাফ কায়েমের উদ্দেশ্যে শুধু পরিকল্পনা পেশ করার জন্যই রাসূলদেরকে পাঠাননি বরং তা কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা-সাধনা ও সেই শক্তি সংগ্রহ করাও নবীদের মিশনের মধ্যে শামিল, যার সাহায্যে বাস্তবে ন্যায়বিচার কায়েম হতে পারে, ইনসাফের বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে এবং যুলুম ও ফাসাদের শক্তি চূর্ণ করা যেতে পারে।

২০. 'রাহবানিয়াত'-এর অর্থ সংসারত্যাগী, বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করে পাহাড়-পর্বত এবং বন-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করা বা নির্জন কোণে গিয়ে থাকা।

رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

এ বিদআত বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বৈরাগ্য জীবন যাপনের যে কর্তব্য ছিল তাও তারা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি বদলা দিয়েছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ দান করবেন, তোমাদেরকে এমন নূর দান করবেন, যার আলোয় তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

২৯. (এ হেদায়াত তোমাদের মেনে চলা উচিত) যাতে আহলে কিতাবগণ জানতে পারে যে, আল্লাহর মেহেরবানীর উপর তাদের কোনো একচেটিয়া অধিকার নেই এবং এ কথাও যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর মেহেরবানী তাঁর নিজের হাতেই রয়েছে; যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি দান করেন। আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।

৫৮. সূরা মুজাদালাহ

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'তুজাদিলু' শব্দ থেকে এ নামটি চয়ন করা হয়েছে। 'মুজাদালাহ' অর্থ বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ।

নাযিলের সময়

মদীনার খাজরায গোত্রের খাওলা বিনতে সা'লাবা নামক এক আনসার মহিলা সাহাবী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে 'যিহার' করার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তর্ক করছিলেন। ঐ 'যিহার' নামক কুপ্রথা সম্পর্কে এ সূরার শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। এ ঘটনাটি থেকে এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় ঠিকভাবে জানা যায়।

এ সূরাটি যে খন্দকের যুদ্ধের পর নাযিল হয় সে কথাও 'যিহার' সম্পর্কে দেওয়া বিধান থেকে বোঝা যায়। খন্দকের যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয়। তাতে এটুকু মন্তব্য করা হয়েছিল যে, 'যিহার দ্বারা স্ত্রী মা হয়ে যায় না।' যিহার সম্পর্কে আল্লাহর কী হুকুম তা ঐ সূরায় নেই। এ সূরায় সে হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই নিশ্চিতভাবে জানা গেল, খন্দকের যুদ্ধের পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। হিজরী পাঁচ সনের শাওয়ালে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় আলোচ্য বিষয় কয়েকটি :

১. এতে জাহিলী যুগের কুপ্রথা থেকে মুসলিম সমাজকে পাক-সাফ করার তাকীদ দেওয়া হয়েছে। 'যিহার' নামক কুপ্রথা সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান এতে আছে।

২. মুনাফিকরা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যে গোপন শলা-পরামর্শ করত তার কঠোর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এর বিষয়ে মুসলমানদেরকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে।

৩. মুসলমানদেরকে সভা-সমিতি ও মাহফিলের আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে।

৪. মুসলিম সমাজে খাঁটি মুসলমান যেমন থাকে, তেমনি মুনাফিকও থাকে। এমন লোকও থাকে, যারা খাঁটি মুসলমানও নয় আবার খাঁটি মুনাফিকও নয়। এর মাঝামাঝি ধরনের মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয়ে একসময় দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থনও করে থাকে।

ইসলামী আন্দোলনের সকল স্তরেই এ অবস্থা কম-বেশি থাকতে পারে। যারা ইসলামের পক্ষে মুখলিস তাদেরকে 'হিযবুল্লাহ' বা আল্লাহর দল বলা হয়েছে। আর বিরোধীদেরকে 'হিযবুশ শয়তান' বা শয়তানের দল বলা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে, আপনার সাথে ঐ মহিলাটির তর্ক ও অভিযোগ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এ বিষয়ে আমি জরুরি বিধান দিচ্ছি।

'যিহার'-এর ফলে যদি তালাকই হয়ে যায় তাহলে ছেলে-মেয়েদের কী উপায় হবে, ঐ মহিলাটি রাসূল (স)-এর সামনে এ পেরেশানিই প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ এ সমস্যার সমাধান মহিলাটিকে উপলক্ষ করে দিয়ে দিলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম এ মহিলাকে খুব সম্মান করতেন। হযরত ওমর (রা) খলীফা থাকাকালে একবার এ মহিলার কোনো দাবি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পূরণ করেছেন। এতে একজন একটু আপত্তি তুললে তিনি বলেছিলেন, 'যার দাবি সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ নিজেই পূরণ করেন তার দাবি কি আমি পূরণ না করে পারি?'

২ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, 'যিহার' করা দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যায় না। মুখে মা বললেই কেউ মা হয়ে যায় না; কিন্তু এভাবে বলা খুবই মন্দ কাজ। এ বদঅভ্যাস ত্যাগ করলে আল্লাহ আগের দোষ ধরবেন না।

৩ ও ৪ নং আয়াতে 'যিহার'-এর কাফফারা আদায়ের নিয়ম শেখানো হয়েছে। যিহার দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে না গেলেও যারা 'যিহার' করে তাদের এমন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে এ কুপ্রথা দূর হয়ে যায়।

কাফফারা কয়েক নিয়মে আদায় করা যাবে। যদি গোলাম আযাদ করার ক্ষমতা থাকে তাহলে তা-ই করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে একটানা ৬০টি রোযা রাখতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে দু বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

যে স্বামী 'যিহার' করে সে এ কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করতে পারবে না।

৫ ও ৬ নং আয়াতে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদেরকে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা যারা করেছে তাদেরকে যুগে যুগে দুনিয়াতেই যেমন শায়েস্তা করা হয়েছে, তেমনি এখনো করা হবে; আর মৃত্যুর পর আখিরাতে তো তারা চিরদিন আযাব ভোগ করতেই থাকবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

৭ ও ৮ নং আয়াতে মদীনার মুনাফিকদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। উহুদ যুদ্ধের পর মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে খতম করার জন্য কুরাইশদের নেতৃত্বে গোটা আরবের কাফির ও মুশরিকরা যখন একতাবদ্ধ হয়ে গেল তখন মদীনার ইহুদি গোত্রগুলো ও মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে গোপন শলা-পরামর্শ করত। আল্লাহ তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তাদের কোনো গোপন কারবারই আল্লাহর নিকট গোপন নয়। এ সবের শাস্তি তাদেরকে একদিন পেতেই হবে। দুনিয়ায় যদি কোনো রকমে তারা বেঁচেও যায় আখিরাতে তাদের বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না।

৯ ও ১০ নং আয়াতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো গোপন আলোচনায় শরীক না হয়। নেকী ও তাকওয়ার উদ্দেশ্যে গোপন আলোচনায় কোনো দোষ নেই। কানাঘুষা আসলেই শয়তানি কাজ। মুনাফিকরা মুমিনদের ক্ষতি করার জন্য এটা করে। তবে

মুমিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। কারণ, তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ তাদেরকে মুনাফিকদের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে চাইলে তাদের কোনো ক্ষতিই তারা করতে পারবে না।

১১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সভা ও মাহফিলের আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। সাধারণত দেখা যায়, মাহফিলে যারা প্রথমে আসে তারা এমন পাতলা হয়ে বসে যে সবটুকু জায়গাই যেন দখল করে আছে। পরে যারা আসে তাদের বসার সুবিধার জন্য আগের লোকেরা যদি একটু সরে ঘন হয়ে না বসে তাহলে মাহফিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। কারণ, বসার জায়গা তালাশ করার জন্য পরে আসা লোকেরা বসা লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে খালি জায়গায় পৌঁছতে চেষ্টা করে। এ অবস্থা আজো প্রায় মাহফিলেই দেখা যায়।

তাই আল্লাহ মুসলমানদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ আয়াতে বলেছেন, পরে আসা লোকেরা যাতে শান্তভাবে বসতে পারে সে উদ্দেশ্যে আগে বসে থাকা লোকেরা যেন জায়গা করে দেয়। মাহফিলের দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে বসার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তা সবারই মেনে চলা উচিত। কাউকে কোনো জায়গা থেকে উঠে যেতে বললে উঠে যাওয়াই উচিত। যাকে যেখানে বসতে দেওয়া হয় সেখানেই বসা উচিত।

১২ ও ১৩ নং আয়াতে রাসূল (স)-এর সাথে একান্তে কথা বলার ব্যাপারে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলের সাথে একা একা কথা বলার আগে কিছু দান-খয়রাত করো। ব্যক্তিগতভাবে একা একা রাসূল (স)-এর সাথে কথা বলার জন্য এত লোক চেষ্টা করতেন যে, রাসূল (স)-এর জন্য তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। তাই সাদাকার শর্ত আরোপ করে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের চাপ কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক লোকের পক্ষে সাদাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে কয়েকদিন পরই সাদাকার আদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় রুকূ'

১৪-১৮ নং আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। মদীনার ইহুদিরা ইসলামের দুশমনদের সাহায্য করছে- এ কথা জানা সত্ত্বেও মুসলমান হওয়ার দাবিদার যারা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখে, তারা যে মুনাফিক, তা এ কয়টি আয়াতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুসলমানরা যাতে সহজে মুনাফিদেরকে চিনে নিতে পারে এবং তাদের ব্যাপারে সাবধান হতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এখানে মুনাফিকদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কথায় কথায় কসম খেয়ে মিথ্যা কথা বলে। কসমকে এরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এদের মুনাফিকী কার্যকলাপকে কসমের ঢাল দিয়ে আড়াল করে রাখে।

মিথ্যা কসম খাওয়া এদের এমন বদঅভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, আখিরাতে আল্লাহর সামনেও এরা মিথ্যা কসম খেয়ে তাদের অপকর্মের কথা অস্বীকার করবে। দুনিয়াতে এর দ্বারা কিছু লোককে ফাঁকি দিলেও আখিরাতে কসম দ্বারা কোনো ফায়দা হবে না। সেখানে তাদের জন্য অপমানকর আযাব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

১৯-২১ নং আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, ইহুদি ও মুনাফিকরা শয়তানের দল। শয়তান তাদের উপর সওয়ার হয়ে তাদেরকে শয়তানের সেনাবাহিনী হিসেবেই ব্যবহার করছে; কিন্তু শয়তানের দল শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবে।

২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে তারা খুবই নীচু স্বভাবের লোক। মানুষের কল্যাণ তারা চায় না; এরা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত।

সূরার শেষ আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন ইসলামী আন্দোলনের সাথে বাতিলপন্থিদের লড়াই চলতে থাকে তখনই বাস্তবে প্রমাণ হয়ে যায় যে, শয়তানের দল কারা আর আল্লাহর দল কারা। যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং ইসলাম কায়েমের পথে বাধা সৃষ্টি করে তারা যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন, এমনকি পিতা-পুত্র-ভাই হলেও কোনো মুমিনের পক্ষে তাদেরকে মহব্বত করা সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলনের কোনো মুখলিস কর্মী এ ব্যাপারে দুর্বলতার পরিচয় দিতে পারে না।

একই অন্তরে ঈমান এবং ইসলামবিরোধীদের মহব্বত একত্রিত হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম বদর ও উহুদ যুদ্ধে এর এমন পরিচয় দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ হয়ে থাকবে।

ইসলামী আন্দোলনের যেসব কর্মীর পিতা-পুত্র-ভাই ও আত্মীয়রা ইসলামের বিরোধী, তাদের জন্য এ আয়াতে বিরাট এক সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, যারা আপনজনদের বিরোধিতার পরওয়া না করে ইসলামী আন্দোলনে মযবুত হয়ে টিকে থাকে, তারাই ঐসব লোক, যাদের অন্তরে তিনি ঈমান কায়েম করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের রূহকে এমন শক্তি দান করেছেন, যাতে তারা কোনো অবস্থায়ই মনোবল না হারায়।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও সুসংবাদ দিয়েছেন যে, এ জাতীয় লোকেরাই আল্লাহর দলের লোক। এরা যেমন আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েই আপনজনের মহব্বত ত্যাগ করেছে, তেমনি আল্লাহও তাদের উপর সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। এরা অবশ্যই কামিয়াব হবে।

সূরা মুজাদালাহ

২২ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٢ رُكُوْعَاتُهَا

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা ২৮

১. (হে রাসূল!) আল্লাহ ঐ মেয়েলোকটির কথা শুনেছেন[১], যে আপনার সাথে তার স্বামীর বিষয়ে তর্ক করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে চলেছে। আল্লাহ আপনাদের দুজনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

২. তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার[২]' (মুহাররামাতের তুলনা) করে তাদের স্ত্রীরা তাদের মা (বা বোন-কন্যা ইত্যাদি) হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই, যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। এ লোকেরা খুবই অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথা বলছে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।[৩]

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۖ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ②

১. এ আয়াত এক মহিলা সাহাবী খাওলা বিনতে সা'লাবা (রা)-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে যিহার (মায়ের সঙ্গে তুলনা) করেছিল। এ মহিলা নিজে জানতে এসেছিলেন যে, এ বিষয়ে ইসলামের কী হুকুম। তখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো হুকুম নাযিল হয়নি। তাই রাসূল (স) তাঁকে বললেন, আমার মনে হয় তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ। এ কথায় মহিলাটি অভিযোগ করতে থাকেন যে, তাহলে আমার ও আমার সন্তানদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি কেঁদে কেঁদে রাসূল (স)-এর নিকট নিবেদন করেছিলেন যে, 'এরূপ কোনো বিধান দেওয়া হোক, যাতে তাঁর ঘর ভাঙন থেকে রক্ষা পায়।' এ সূরায় এ সমস্যারই সমাধান দেওয়া হয়েছে।

২. আরবে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটত যে, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে স্বামী রাগ করে বলত 'তুই আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের মতো হারাম।' এ কথার অর্থ ছিল 'তোর সঙ্গে যদি আর সঙ্গম করি তবে আমার নিজের মায়ের সঙ্গে সঙ্গম করার মতো হবে।' অর্থাৎ তোকে তালাক দিলাম। এরই নাম 'যিহার'।

এ যুগেও অনেক নির্বোধ লোক স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে মা, বোন ও মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে থাকে। এর পরিষ্কার মর্ম হচ্ছে, এখন থেকে সে যেন স্ত্রীকে স্ত্রী নয় বরং ঐসব মহিলার মতো মনে করবে, যারা তাঁর জন্য হারাম।

৩. অর্থাৎ, এরূপ বলার জন্য খুবই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে যিহারের ব্যাপারে জাহেলি যুগের ভুল নিয়মকে রহিত করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন এবং এত বড় অন্যায়ের জন্য খুবই সামান্য শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

৩. যেসব লোক তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে তারপর তারা যা বলেছিল সে কথা থেকে ফিরে যায়[4], তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। এ কথা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যাকিছু তোমরা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।[5]

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

৪. আর যে তা (গোলাম আযাদ করতে) পারবে না, সে যেন একে অপরকে স্পর্শ করার আগে[6] একটানা দু মাস রোযা রাখে। আর যে এটাও করতে না পারে, সে যেন ৬০ জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়।[7] এ হুকুম এজন্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আন।[8] এটাই আল্লাহর দেওয়া সীমা। আর কাফিরদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৫. যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে তেমনিভাবে অপমান করা হবে, যেমন তাদের আগের লোকদেরকে করা হয়েছে। আমি সাফ সাফ আয়াত নাযিল করে দিয়েছি। আর কাফিরদের জন্য অপমানকর আযাব রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

৬. ঐ দিন (এ অপমানকর আযাব হবে,) যখন আল্লাহ তাদের সবাইকে আবার জীবিত

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ

৪. এর দুটি অর্থ হতে পারে– ক. তারা যা বলেছিল তার সংশোধন করতে চায়; খ.তারা এ কথা বলে যে জিনিসকে হারাম করতে চেয়েছিল তা নিজেদের জন্য আবার হালাল করতে চায়।

৫. অর্থাৎ, যদি কেউ চুপে চুপে নিজের ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে যিহার করে বসে এবং তারপর কাফফারা আদায় না করেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আগের মতোই যৌন সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে থাকে, তবে দুনিয়ার কোনো লোক তা না জানলেও আল্লাহ তো অবশ্যই সে কথা জানবেন। আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

৬. অর্থাৎ, একটানা দু মাস রোযা রেখে যাবে– এর মাঝে কোনো দিন রোযা ভাঙতে পারবে না। ভাঙলে আবার নতুন করে ৬০টি রোযা রাখতে হবে।

৭. অর্থাৎ, দু বেলা পেট ভরে খাওয়াবে। ৬০ জনের খাবারে যে পরিমাণ জিনিস দরকার তা রান্না না করে দিয়ে দিলেও চলবে। ৬০ জন লোককে একদিন খাওয়ালেও চলবে অথবা একজন লোককে ৬০ দিন খাওয়াতে হবে।

৮. এখানে ঈমান আনার অর্থ– খাঁটি ও মুখলিস মুমিনের মতো চলা।

أَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ⑥

করে ওঠাবেন এবং তারা যাকিছু করে এসেছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। তারা ভুলে গেছে বটে, কিন্তু আল্লাহ তাদের সব আমল গুনে গুনে রেখেছেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষী আছেন।

রুকূ' ২

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنٰى
مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑦

৭. তুমি কি জান না[৯] যে, আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে তা সবই আল্লাহর জানা আছে। কখনো এমন হয় না যে, তিন জনের মধ্যে কানকথা হয়, আর তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থজন হন না। অথবা পাঁচ জনের মধ্যে গোপন কথা হয় আর তাদের মধ্যে আল্লাহ ষষ্ঠজন হন না। যারা গোপনে কথা বলে তাদের সংখ্যা কম হোক আর বেশি হোক, যেখানেই তারা থাকুক আল্লাহ তাদের সাথেই থাকেন। তারপর তারা যাকিছু করেছে তা কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্বন্ধেই জ্ঞান রাখেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ
يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۖ وَإِذَا جَآءُوْكَ
حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ
أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۚ حَسْبُهُمْ

৮. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে গোপনে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল? তবুও তারা যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তা-ই করে চলেছে। এসব লোক গোপনে গোপনে একে অপরের সাথে গুনাহ, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের নাফরমানীর কথাবার্তা বলছে। (হে রাসূল!) এরা যখন আপনার কাছে আসে, তখন তারা এমন নিয়মে সালাম দেয়, যেভাবে আল্লাহ আপনাকে সালাম দেন না।[১০] আর তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের এসব কথাবার্তার দরুন আল্লাহ আমাদেরকে কেন আযাব দেন না?

৯. এখান থেকে দশম আয়াত পর্যন্ত মুসলিম সমাজের মধ্যে মুনাফিকরা যেসব অপকর্ম করেছিল তার সমালোচনা করা হয়েছে। তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে তারা মুমিনদের থেকে আলাদা নিজেদের এক উপদল বানিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরা তাদেরকে দেখত যে, তারা একে অপরের সাথে মিশে কানে কানে ফিসফিস করছে। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে, ঝগড়া-বিবাদ বাধাতে এবং হতাশা ছড়াতে নানা রকম ফন্দি করত ও নতুন নতুন গুজব রচনা করত।

১০. কয়েকটি হাদীস থেকে জানা যায়, ইহুদিরা নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম দেওয়ার ভান করে বলত, 'আসসামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম'। অর্থাৎ তারা 'আসসামু

جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝٨

তাদের জন্য দোযখই যথেষ্ট। তারা সেখানেই প্রবেশ করবে। তাদের পরিণাম খুবই মন্দ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝٩

৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা একে অপরের সাথে গোপনীয় আলাপ কর তখন গুনাহ, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের নাফরমানীর কথা বলো না; বরং নেকী ও তাকওয়ার কথা বলো। আর ঐ আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাঁর সামনে হাশরে হাজির হতে হবে।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝١٠

১০. কানাঘুষা তো একটি শয়তানী কাজ। মুমিদেরকে বিরক্ত করার জন্যই এ কাজ করা হয়। অবশ্য তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١

১১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, মাহফিলে জায়গা প্রশস্ত কর, তখন তোমরা জায়গা খোলাসা করে দিও। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন।[১১] আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাবে।[১২] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন।

আলাইকা' এমনভাবে উচ্চারণ করত, শ্রোতার মনে হতো যে তারা 'সালাম' বলেছে। কিন্তু আসলে তারা বলেছিল 'সাম' যার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। অর্থাৎ, তারা সালাম দেওয়ার বদলে বলত, 'হে আবুল কাসেম! তোমার মৃত্যু হোক।'

১১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুসলমানদেরকে যত আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, যখন কোনো মজলিসে আগে থেকে কিছু লোক বসা থাকে এবং পরে আসা কিছু লোক উপস্থিত হয় তখন আগের লোকদের মধ্যে এটুকু ভদ্রতা থাকা উচিত যে, তারা যেন নবাগতদেরকে বসার জায়গা করে দেয় এবং যতদূর সম্ভব কিছুটা সরে গিয়ে তাদেরকে বসার সুযোগ দেয়। আর পরে যারা এল তাদের মধ্যেও এতটুকু ভদ্রতা থাকা উচিত যে, তারা জবরদস্তি করে ওদের মধ্যে যেন ঢুকে না পড়ে এবং কোনো ব্যক্তিকে যেন উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা না করে।

১২. অর্থাৎ, যখন বৈঠক শেষ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় তখন উঠে চলে যাওয়া উচিত। তখনো মজলিসে বসে থাকা উচিত নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে একান্তে আলাপ কর তখন আলাপের আগে কিছু সাদাকা দান কর।[১৩] এটা তোমাদের জন্য ভালো ও বেশি পবিত্র। অবশ্য যদি সাদাকা দেওয়ার জন্য কিছুই না পাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

১৩. একান্তে কথা বলার আগে সাদাকা দেওয়ার কথায় কি তোমরা ভয় পেয়ে গেলে? তোমরা যদি তা না কর আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন— তাহলে নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাক। আর তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন।[১৪]

রুকূ' ৩

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

১৪. তুমি কি ঐসব লোককে দেখেছ, যারা এমন এক কাওমকে বন্ধু বানিয়েছে, যাদের উপর আল্লাহর গযব পড়েছে? এরা তোমাদেরও নয়, তাদেরও নয়। এরা জেনে-বুঝে মিথ্যা কথার উপর কসম খায়।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এরা যাকিছু করছে তা খুবই মন্দ।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾

১৬. এরা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে, যার আড়ালে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাদের জন্য অপমানকর আযাব রয়েছে।

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আদেশের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, লোকেরা খুব বেশি বেশি এবং বিনা প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আবেদন করতে শুরু করেছিল।

১৪. এ দ্বিতীয় আদেশ প্রথম আদেশের কিছু সময় পরে নাযিল হয়েছিল। এর দ্বারা সাদাকা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রহিত করা হয়েছে। সাদাকার এই হুকুম কতদিন জারি ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাতাদা (রা) বলেন, এক দিনের চেয়েও কম সময় এ হুকুম জারি ছিল, তারপর রহিত করে দেওয়া হয়েছে। মুকাতিল বিন হাইয়ান বলেন, দশ দিন জারি ছিল। এ হুকুমের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে যত বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে দশ দিন হচ্ছে সব থেকে বেশি সংখ্যা।

১৭. তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহ থেকে তাদেরকে বাঁচানোর ব্যাপারে কোনো কাজে আসবে না। তারা দোযখের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۚ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿١٧﴾

১৮. যেদিন আল্লাহ এদের সবাইকে ওঠাবেন, সেদিন তারা আল্লাহর সামনেও এভাবেই কসম খাবে, যেভাবে তোমাদের সামনে কসম খায়। তারা মনে করবে যে, এর দ্বারা তাদের কিছু ফায়দা হবে। জেনে রাখ যে, এরা পাকা মিথ্যুক।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٨﴾

১৯. শয়তান তাদের উপর সওয়ার হয়ে আছে। সে তাদের মন থেকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলের লোক। জেনে রাখ যে, শয়তানের দলই ক্ষতির মধ্যে থাকবে।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ أُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٩﴾

২০. নিশ্চয়ই ঐসব লোক বড়ই নীচ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُولٰٓئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

২১. আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রাসূলই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।

كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

২২. তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তারা ঐসব লোককে মহব্বত করে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে— তারা তাদের পিতা হোক পুত্র হোক কিংবা ভাই হোক বা আত্মীয় হোক। তারাই ঐসব লোক, যাদের মনে আল্লাহ ঈমান কায়েম করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি রূহ দান করে তাদেরকে শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ যে, আল্লাহর দলই কামিয়াব হবে।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا اٰبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمٰنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

৫৯. সূরা হাশর

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার দ্বিতীয় আয়াতের 'হাশর' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। হাশর অর্থ লোকদেরকে একত্র করা বা একত্র করে ঘেরাও করা।

নাযিলের সময়

হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আওয়াল মাসে 'বনূ নযীর' নামক ইহুদি গোত্রকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার পর এ সূরাটি নাযিল হয়।

মদীনার ইহুদীদের পরিচয় ও ভূমিকা

গোটা সূরাটিই বনূ নযীর গোত্রকে মদীনা থেকে বের করার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। কেন এ গোত্রটিকে বের করে দেওয়া হলো তা বুঝতে হলে এদের পরিচয় ও ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার।

শত শত বছর আগে জেরুসালেম ও অন্যান্য দেশ থেকে বিভিন্ন সময় বিতাড়িত হয়ে কয়েকটি ইহুদি গোত্র মদীনা শহর ও এর আশপাশে বসবাস করতে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পকলা ও কারিগরি বিদ্যা থাকায় এরা মদীনার আদি আবর গোত্রের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বিশেষভাবে সুদী কারবারে এরা খুব পাকা ছিল। তাই আরবদেরকে এরা টাকা ধার দেওয়ার মাধ্যমে সুদের জালে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছিল।

যে কয়টি ইহুদি গোত্র মদীনা শহর ও এর আশপাশে বাস করত তাদের মধ্যে বনূ কুরাইযা, বনূ নযীর, বনূ কাইনুকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনূ কাইনুকা শহরের অভ্যন্তরে এবং অন্য দুটো গোত্র শহরের বাইরে বাস করত।

মদীনায় আরবদের প্রধান দুটো গোত্র ছিল। তাদের নাম আউস ও খাযরাজ। এ দুটো গোত্রের মধ্যে সব সময় বিরোধ ও প্রতিযোগিতা ছিল। ইহুদিরা তাদের মধ্যে এ বিরোধ জিইয়ে রাখত, যাতে আরবরা একজোট হয়ে ইহুদিদেরকে তাড়িয়ে না দেয়।

বনূ কাইনুকা খাযরাজ গোত্রের বন্ধু এবং বাকি দুটো ইহুদি গোত্র আউস গোত্রের বন্ধু সেজে তাদের এ বিরোধকে টিকিয়ে রাখত। কিন্তু দুটো আরব গোত্রেই ইসলাম কবুল করার পর একে অপরের বন্ধু হয়ে যাওয়ায় এবং রাসূল (স) তাদেরই দাওয়াতে মদীনায় হিজরত করায় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে ইহুদিরাও সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার মনে করল।

তাই মদীনায় রাষ্ট্র-প্রধান হিসেবে রাসূল (স)-এর সাথে ইহুদিরা মিত্র হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হলো। চুক্তি অনুযায়ী মদীনার উপর কেউ হামলা করলে মুসলমানদের সাথে মিলে ইহুদিদেরও দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা। কিন্তু দেখা গেল, বদর যুদ্ধের পর বনূ কাইনুকাই প্রথম চুক্তি ভঙ্গ করল। তাই দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকে রাসূল (স) তাদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের পর ইহুদিরা চিন্তায় পড়ে গেল। চুক্তি করার সময় তারা রাসূল (স)-কে একজন শাসক এবং আউস ও খাজরায গোত্রদ্বয়ের নেতা হিসেবেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যেভাবে আরবের মানুষ ইসলাম কবুল করতে লাগল তাতে ইহুদিরা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ব্যাপারেও চিন্তিত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে কুরাইশদের পরাজয়ের পর বনূ কাইনুকার দুর্গতিতে রীতিমতো তারা ঘাবড়ে গেল। তাই কুরাইশরা যখন বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবার মদীনা আক্রমণ করতে এল তখন বনূ নযীর খুবই মারাত্মক ভূমিকা পালন করল। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ে তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল।

মদীনার মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই ইহুদিদের বন্ধু হয়ে গেল। রাসূল (স)-এর মদীনায় আসার আগে তাকেই মদীনার বাদশাহ বানানোর সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ায় সে সৌভাগ্য তার আর হলো না। কিন্তু তার গোত্র ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়ে সে মুসলমান হলেও ভেতরে সে রাসূল (স)-এর বিরোধী হয়েই রইল।

হিজরী চতুর্থ সনে ইহুদিদের দুশমনি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, তারা রাসূল (স)-কে হত্যা করার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেলল। আল্লাহ তাআলা ওহীর মারফতে তাদের এ গোপন ষড়যন্ত্র জানিয়ে দিলেন। বনূ নযীরের মহল্লায়ই রাসূল (স)-কে হত্যা করার সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে গেলেন। এ ঘটনার পর ঐ সনের রবিউল আওয়াল মাসেই বনূ নযীরের মহল্লা ঘেরাও করে বিনা যুদ্ধে তাদেরকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হলো।

আলোচ্য বিষয়

বনূ নযীরের অবরোধ ও পরাজয়ের পরই এ বিষয়ে এ সূরায় কয়েকটি কথা আলোচনা করা হয়েছে :

১. বনূ নযীরের জনসংখ্যা, অস্ত্রবল ও মযবুত দুর্গ থাকা সত্ত্বেও যে আসল কারণে তারা পরাজিত হয়েছিল তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতাই তাদের পরাজয়ের কারণ। তারা দুনিয়ার স্বার্থে লড়াই করতে চেয়েছিল। আর মুসলমানরা আল্লাহর পক্ষে তাদের মহল্লা ঘেরাও করেছিল। তাই আল্লাহ তাদের বস্তুগত শক্তিকে পরাজিত করে মুসলমানদের নৈতিক শক্তিকে বিজয় দান করলেন।

২. যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে শত্রুপক্ষের যেসব জমি-জায়গা ও ধন-সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের দখলে আসে তা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এর বিধি-বিধান এ সূরায় দেওয়া হয়েছে।

৩. বনূ নযীরের অবরোধকালে মুনাফিকদের ভূমিকা ও এর কারণ কী ছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসমান ও জমিনের সবকিছুই আল্লাহর দেওয়া নিয়ম মেনে চলছে। তিনি এমন শক্তিশালী ও সুকৌশলী যে, তিনি যা করতে চান কোনো শক্তিই তাঁর পথে বাধা দিয়ে টিকতে পারে না।

২-৪ নং আয়াতে বনূ নযীরের আত্মসমর্পণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা নিজেদের শক্তির বড়াই করে মদীনা ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিল; কিন্তু অবরোধের পর প্রথম হামলাতেই তারা কাবু হয়ে গেল এবং বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যেতে রাজি হলো।

মুসলমানদের ধারণাও ছিল না যে, এত সহজে তারা আত্মসমর্পণ করবে। আল্লাহ তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন এবং তাদের বাড়ি-ঘর যাতে মুসলমানরা ভোগ করতে না পারে সেজন্য পালানোর আগে নিজেরাই তা বরবাদ করল।

যদি তারা মদীনা ছেড়ে যেতে রাজি না হতো তাহলে তারা সবাই নিহত হতো। পালাতে রাজি হওয়ায় দুনিয়ার আযাব থেকে বেঁচে গেলেও আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ইহুদিদের বাগানের যেসব খেজুর গাছ মুসলমানরা যুদ্ধের প্রয়োজনে কেটেছে তা দূষণীয় নয়। শত্রুকে পরাজিত করার জন্য প্রয়োজনমতো যে ধ্বংসের কাজ করতে হয় তা যুদ্ধের আইনে বৈধ। তাদের সাজানো প্রিয় বাগান ধ্বংস করে তাদেরকেই অপমানিত করা হয়েছে।

৬-১০ নং আয়াতে শত্রুপক্ষের জমিজমা, বসতবাড়ি, বাগান এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের দখলে আনার পর তা কী নিয়মে ব্যবহার করা হবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বদর ও উহুদ যুদ্ধে কোনো এলাকা জয় হয়নি। শুধু দু পক্ষের সৈন্যদের মধ্যেই যুদ্ধ হয়েছে। তাতে যারা জয়ী হয়েছে, তারা পরাজিত সৈন্যদের ফেলে যাওয়া অস্থাবর সম্পদ এবং নিহতদের অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান দখল করেছে। ইসলামের পরিভাষায় এসবকে 'গনীমতের মাল' বলা হয়। এ জাতীয় মাল বিজয়ী সৈন্যদের হক বলে তাদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়ার বিধান রয়েছে।

কিন্তু কোনো এলাকা বা দেশ জয় করা হলে যে জমিজমা ও ধন-সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের দখলে আসে তা ইসলামী পরিভাষায় 'ফাই' নামে পরিচিত। ফাই অর্থ 'ফিরিয়ে আনা জিনিস'।

বনূ নযীরের এলাকা দখলের দ্বারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রথম 'ফাই' পেল। তাই 'ফাই'-এর বিধান এ কয়টি আয়াতে দেওয়া হয়েছে। ৬ নং আয়াতে মুসলমান সৈন্যদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা বদর যুদ্ধের মতো লড়াই করে এ মহল্লাটি দখল করনি। এ বিজয় আল্লাহ ও রাসূলের কারণে হয়েছে।

৭ থেকে ১০ নং আয়াতে 'ফাই' হিসেবে পাওয়া সম্পদ কোন্ কোন্ খাতে খরচ করতে হবে এর তালিকা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১ ও ১২ নং আয়াতে মুনাফিকদের ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে। মুনাফিকরা বনূ নযীরকে সাহায্যের যে ভরসা দিয়েছিল তা যে মোটেই আন্তরিক ছিল না, তা-ই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকরা হলো নিজের স্বার্থের দাস। তারা অন্যের স্বার্থে জান দিতে যাবে কেন? নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়া বড় কোনো উদ্দেশ্যে জান-মাল কুরবানী করার সাহস থাকলে তারা প্রকাশ্যেই ইসলামের বিরোধিতা করত। মুসলমান সেজে গোপনে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করাই যাদের খাসলত, তারা এমন ওয়াদা কী করে পালন করতে পারে, যা জান-মালের ক্ষতির কারণ হয়?

১৩ ও ১৪ নং আয়াতে বনূ নযীরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেও মুনাফিকরা কেন ওয়াদা পালন করতে পারল না এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে :

ক. এরা মুসলমানদের একতা, ইখলাস, নিষ্ঠা ও কুরবানীর জযবা দেখে এমন ভীত যে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত পায় না।

খ. এরা এমন কাপুরুষ যে, খোলা ময়দানে যুদ্ধ করার সাহস এদের নেই। দুর্গের নিরাপদ জায়গা বা দেয়ালের আড়ালে থেকে হয়তো যুদ্ধ করতেও পারে।

গ. মুনাফিকদের মধ্যে সত্যিকার একতা নেই। মুসলমানদের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের মধ্যে এমন কোনো ইতিবাচক উদ্দেশ্য নেই, যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থে এরা একে অপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের দুশমনিতে এদেরকে যতই একতাবদ্ধ মনে হয়, আসলে এরা ভেতরে ভেতরে সবাই সবার দুশমন।

১৫-১৭ নং আয়াতে মুনাফিকদেরকে শয়তানের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে তাদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সাথে এবং বনূ কাইনুকার সাথে ওয়াদা করে তা পালন করেনি। কুরাইশ ও বনূ কাইনুকা যেমন তাদের অপকর্মের ফল পেয়েছে মুনাফিকরাও তেমন ফল দুনিয়াতেই পাবে। আখিরাতের পাওনা তো আছেই।

শয়তানের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কুফরী করায়, এরাও তেমনি মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উসকানি দেয়। কিন্তু কুফরি করার কুফল যেমন শয়তান নিতে চায় না, তেমনি মুনাফিকরাও যুদ্ধের ক্ষতিতে শরিক হতে রাজি হয় না। তবে শয়তান ও তার কুমন্ত্রণায় যারা কুফরি করেছে তারা যেমন উভয়েই দোযখে যাবে, তেমনি মুনাফিক ও ইহুদি উভয়েই আখিরাতের দোযখে সমানভাবে শাস্তি ভোগ করবে।

তৃতীয় রুকূ'

১৮-২০ নং আয়াতে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে বলা হলেও সকল মানুষের জন্যই মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ দুনিয়ার জীবনে যদি সত্যিকার সফলতা চায় তাহলে তাকে কয়েকটি কথা মেনে চলা উচিত।

১. প্রতিটি ব্যাপারেই একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত।
২. দুনিয়ার পরপারে অনন্ত-অসীম জীবনের জন্য সুবন্দোবস্ত করার চেষ্টা থাকা উচিত। দুনিয়ার অল্প কয়েকদিনের সুখের জন্য সদা ব্যস্ত না থেকে চিরকালের সুখের ফিকর করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।
৩. আল্লাহকে ভুলে যারা জীবন কাটায়, আসলে তারা নিজেদের পরিণামের কথাই ভুলে গেছে। নিজের স্বার্থেই আল্লাহর কথা মেনে চলা সবারই উচিত।
৪. সফলতা ও ব্যর্থতা কখনো সমান হতে পারে না। দোযখের পথে জীবনভর চলেও যারা সফলতার কামনা করে তারা একেবারেই বোকা। সফলতার আকাঙ্ক্ষা থাকলে বেহেশত পাওয়ার পথেই চলতে হবে।

২১ নং আয়াতে মানুষকে দুনিয়ায় যে বিরাট দায়িত্ব দেওয়ার কথা কুরআনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েমের যে মহান দায়িত্ব মানুষের উপর দেওয়া হয়েছে, যদি এ দায়িত্ব পাহাড়ের মতো বিরাট ও মযবুত জিনিসের উপর চাপানো হতো তাহলে পাহাড়ও দায়িত্ববোধের কারণে থরথর করে কাঁপত অথচ মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আছে। তাদের উচিত, আল্লাহর পথে নিষ্ঠার সাথে চলা।

২২-২৪ নং আয়াতে একমাত্র হুকুমকর্তা ঐ আল্লাহ তাআলার কতক গুণাবলি প্রকাশ করা হয়েছে, যাঁর কথামতো দুনিয়ায় চলতে বলা হয়েছে। আল্লাহর এসব গুণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহকে ভুলে থাকা আত্মহত্যারই শামিল।

সূরা হাশর

২৪ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٤ رُكُوْعَاتُهَا ٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে, এর প্রতিটি জিনিস আল্লাহরই তাস্‌বীহ করেছে। আর তিনিই মহাশক্তিশালী ও মহাকৌশলী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

২. তিনিই তো ঐ সত্তা, যিনি আহলে কিতাব কাফিরদেরকে প্রথম হামলায়ই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।[১] তোমাদের কখনো এ ধারণা ছিল না যে, তারা বের হয়ে যাবে। আর তারাও মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাবে; কিন্তু আল্লাহ এমন দিক থেকে আসলেন, যে দিকের কোনো ধারণাই তারা করতে পারেনি।[২] তিনি তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন। ফলে তারা নিজ হাতেও তাদের ঘর-বাড়ি বরবাদ করে দিচ্ছিল, আর মুমিনদের হাতেও ধ্বংস হচ্ছিল। অতএব হে চোখওয়ালা মানুষ! তোমরা সবক শিক্ষা হাসিল কর।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۚ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ②

১. এখানে আহলে কিতাব কাফির বলতে বনূ নযীর ইহুদি গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। এরা মদীনার একাংশে বাস করত। এ গোত্রের সঙ্গে রাসূল (স)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল। কিন্তু এরা বারবার চুক্তি ভঙ্গ করেছে। শেষে চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (স) তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হয় তোমরা মদীনা ত্যাগ করে চলে যাও নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তারা চলে যেতে অস্বীকার করল। সুতরাং রাসূল (স) মুসলিম সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধার আগেই তারা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হলো, যদিও তাদের দুর্গগুলো খুব মযবুত ছিল এবং প্রচুর সামরিক সাজ-সরঞ্জামও ছিল।

২. তাদের উপর 'আল্লাহ তাআলা আসা'র অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ অন্য কোনো স্থানে ছিলেন, তারপর সেখান থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবেন। এর দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে তারা এ ধারণায় নিশ্চিত ছিল যে, বাহির থেকে যদি কোনো আক্রমণ হয় তবে আমরা নিজেদের দুর্গে থেকে তা প্রতিরোধ করব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এরূপ রাস্তা দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেন, যেদিক থেকে কোনো বিপদ আসার আশঙ্কাও তাদের মনে ছিল না। আর সে রাস্তা হলো, আল্লাহ তাআলা ভেতর থেকে তাদের সাহস ও প্রতিরোধশক্তি এমনভাবে খতম করে দিয়েছিলেন যে, তাদের হাতিয়ার ও দুর্গ কোনো কাজেই লাগেনি।

وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ۝

৩. যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে নির্বাসন লিখে না রাখতেন তাহলে দুনিয়াতেই তিনি তাদেরকে আযাব দিতেন।[৩] আর আখিরাতে তো তাদের জন্য দোযখের আযাব আছেই।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝

৪. এসব কিছু এজন্যই হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যে-ই আল্লাহর বিরোধিতা করে আল্লাহ তাকে সাজা দেওয়ার বেলায় বড়ই কঠোর।

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝

৫. তোমরা খেজুরের যেসব গাছ কেটেছ, আর যেগুলোকে ওদের মূলের উপর খাড়া থাকতে দিয়েছ, তাতে আল্লাহরই অনুমতি ছিল।[৪] আর (আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছেন) যেন ফাসিকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়।[৫]

৩. দুনিয়ার শাস্তির অর্থ তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেওয়া। যদি তারা সন্ধি করে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর পরিবর্তে যুদ্ধ করত তবে তারা একেবারেই ধ্বংস হয়ে যেত।

৪. এখানে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনূ নযীর গোত্রের বসতির চতুর্দিকে যে খেজুরের বাগান ছিল সেখানকার অনেক গাছকে মুসলমানরা অবরোধ করার সূচনায় কেটে ফেলেছিল অথবা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যাতে সহজে অবরোধ করা যায়; এবং যেসব গাছ সামরিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেনি সেগুলোকে যথাযথ অবস্থায় বহাল রেখেছিল। এ নিয়ে মুনাফিক ও ইহুদিরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল যে, "মুহাম্মদ (স) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন; কিন্তু তোমরা দেখে নাও শ্যামল ফলবতী গাছগুলো এরা কেমন করে কেটে চলছে! এরই নাম 'ফাসাদ ফিল আরদ' তথা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া আর কী?" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তোমরা যে গাছগুলো কেটেছ ও যেগুলো খাড়া থাকতে দিয়েছ এর মধ্যে কোনো কাজই অবৈধ নয়; বরং উভয় কাজই আল্লাহর অনুমোদিত।

৫. অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, এ গাছগুলো কাটার মধ্যদিয়ে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা প্রকাশ পাক এবং এগুলো না কাটার মধ্যদিয়েও তাদের অপমান হোক। কাটার মধ্যে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা মানে হলো এই যে, গাছগুলো তারা নিজেদের হাতে রোপণ করেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে যে বাগানগুলোর তারা মালিক ছিল তাদের চোখের সামনেই সে গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছিল অথচ কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অপরপক্ষে গাছগুলো না কাটার মধ্যে অপমানের মানে হলো, যখন তারা মদীনা থেকে বের হচ্ছিল তখন তারা স্বচক্ষে দেখছিল যে, কাল পর্যন্ত যে সরস শ্যামল বাগান তাদের সম্পত্তি ছিল, আজ তা মুসলমানদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাদের ক্ষমতা যদি থাকত তবে তারা এগুলোকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে মদীনা ত্যাগ করত এবং একটি অক্ষত গাছকেও তারা মুসলমানদের হাতে যেতে দিত না। কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় তারা সবকিছু যেমন ছিল তেমন অবস্থায়ই ফেলে রেখে হতাশা ও মনোবেদনার সঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

৬. আর যে ধন-সম্পদ[৬] আল্লাহ তাদের দখল থেকে বের করে তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে আনলেন[৭] তা এমন মাল নয়, যার উপর তোমরা তোমাদের ঘোড়া ও উট চড়াও করেছ। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে খুশি কর্তৃত্ব দান করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।[৮]

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ

৭. যত কিছুই আল্লাহ তাআলা ঐ মহল্লার লোকদের থেকে তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে আনলেন তা আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন[৯], ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য—

৬. এখানে সেই ধন-সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা প্রথমে বনূ নযীর গোত্রের অধিকারে ছিল এবং তাদেরকে বহিষ্কারের পর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ত্তে এসেছে। এ সম্পর্কে এখান থেকে দশম আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কীরূপে করা হবে তা নির্দেশ করেছেন।

৭. এ শব্দগুলো এই অর্থই প্রকাশ করে যে, এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যাকিছু পাওয়া যায় সেসবের উপর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বিদ্রোহীদের কোনো হকই নেই। এ কারণে বৈধ ও ন্যায় যুদ্ধের ফলে যেসব ধন-সম্পত্তি কাফিরদের অধিকার থেকে মুমিনদের অধিকারে এসেছে, সেসব সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা এই যে, সে ধনের মালিক আপন বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাৎকারী কর্মচারীদের আয়ত্ত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজ অনুগত কর্মচারীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী কানুনের পরিভাষায় এ ধন-সম্পত্তিকে 'ফাই' (ফেরত আনা সম্পদ) বলা হয়।

৮. অর্থাৎ, শুধু সংগ্রামী সৈন্যবাহিনীর সরাসরি বাহুবলের ফলে এই ধন মুসলমানদের কব্জায় আসেনি বরং আল্লাহ তাআলা নিজ রাসূল ও তাঁর উম্মত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, এ হচ্ছে তার সমষ্টিগত শক্তির ফল। তাই এ ধন (গনীমত) যুদ্ধলব্ধ লুণ্ঠিত ধন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সংগ্রামকারী সৈন্যদলের মধ্যে এ ধন যুদ্ধে পাওয়া মালের মতো ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে না; এ ধনের উপর সৈন্যদের এরূপ ভাগ পাওয়ার হক নেই। শরীআতে 'ফাই' ও গনীমতের হুকুমকে এভাবে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধে শত্রুসৈন্যদের কাছ থেকে যে অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাকে গনীমত বলা হয়। এ ছাড়া শত্রুদেশের ভূমি, গৃহাদি এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গনীমত নয়; 'ফাই'-এর মধ্যে গণ্য।

৯. আত্মীয়-স্বজন বলতে এখানে রাসূলুল্লাহর আত্মীয়-স্বজনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব। রাসূল (স) যাতে নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে ঐসব আত্মীয়-স্বজনেরও হক দিতে পারেন, যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী বা যাদেরকে সাহায্য করা তিনি প্রয়োজনবোধ করেন। সেজন্যই এ অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। নবী করীম (স)-এর মৃত্যুর পর এ অংশ একটি পৃথক ও স্থায়ী অংশরূপে বর্তমান থাকেনি; বরং মুসলমানদের মধ্যকার অন্যান্য দরিদ্র, পিতৃহীন ও মুসাফিরদের সাথে বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব গোত্রের অভাবগ্রস্ত লোকদের হকও বাইতুল মালের (সাধারণ কোষাগারের) উপর ন্যস্ত হয়; অবশ্য যাকাতে তাদের অংশ না থাকায় তাদের হক অন্যদের উপর অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়েছে।

وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

যাতে তা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আটক হয়ে না থাকে।[১০] রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা নিয়ে নাও এবং যা থেকে তিনি বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।[১১]

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

৮. (তা ছাড়া ঐ মাল) এ গরীব মুহাজিরদের জন্য, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তারা আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমর্থনে প্রস্তুত থাকে। এরাই সত্য পথের পথিক।

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৯. (ঐ মাল তাদের জন্যও,) যারা এ মুহাজিরদের আসার আগেই ঈমান এনে মদীনায় বসবাস করছিল।[১২] তারা ঐ লোকদেরকে মহব্বত করে, যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। এমনকি তাদেরকে যাকিছু দেওয়া হয় সে বিষয়ে তারা নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা পর্যন্ত অনুভব করে না। তাদের নিজেদের যত অভাবই থাকুক তারা নিজেদের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়। যাদেরকে অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে বাঁচানো হয়েছে, আসলে তারাই সফল।

১০. এটা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি নির্দেশ। এর মধ্যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির এই বুনিয়াদি নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধনের আবর্তন সমগ্র সমাজে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত। ধন মাত্র ধনবানদের মধ্যেই আবর্তন করতে থাকবে এবং ধনী দিন দিন অধিকতর ধনী ও দরিদ্র দিন দিন দরিদ্রতর হতে থাকবে– কিছুতেই যেন এরূপ না হয়।

১১. যদিও এ আদেশ বনূ নযীরের সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু এ আদেশের ভাষা সাধারণ; সেজন্য এর মর্ম হচ্ছে, সব ব্যাপারে যেন মুসলমানরা রাসূলের আদেশ-নির্দেশের আনুগত্য করে। এ কথার দ্বারা এ মর্ম আরো সুস্পষ্ট হয়েছে যে, 'যাকিছু রাসূল তোমাদেরকে দেন'- এর মোকাবিলায় 'যা কিছু তোমাদেরকে দেন না'– এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, 'যে জিনিস হতে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন তা থেকে তোমরা বিরত হও'।

১২. এখানে আনসারদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই'-এতে যে শুধু মুহাজিরদেরই হক আছে তা নয়; বরং প্রথম থেকে যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করছে তাঁরাও এ থেকে অংশ পাওয়ার হকদার।

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. (ঐ মাল তাদের জন্যও,) যারা তাদের পরে এসেছে[১৩] এবং যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের ঐসব ভাইকে মাফ করুন, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছেন। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের জন্য কোনো শত্রুতা থাকতে দিও না। হে আমাদের রব! তুমি বড়ই মেহেরবান ও দয়ালু।'[১৪]

রুকূ' ২

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۙ وَّإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তুমি[১৫] কি তাদেরকে দেখনি, যারা মুনাফিকী করছে? এরা তাদের আহলে কিতাব কাফির ভাইদেরকে বলে যে, 'যদি তোমাদেরকে বের করা হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো কথা কখনো মানবো না। যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব।' কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১৩. অর্থাৎ 'ফাই'-এর সম্পদে যে শুধু বর্তমান বংশধরদেরই হক আছে তা নয়; পরবর্তীদেরও হক রয়েছে।

১৪. এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি হিংসা পোষণ না করে এবং নিজেদের পূর্বে যেসব মুসলমান গত হয়েছেন তাঁদের জন্যও যেন মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে; তাঁদের প্রতি যেন নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষণ না করে।

১৫. সমগ্র রুকূ'টিতে মুনাফিকদের মতিগতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন বনূ নযীরকে মদীনা থেকে বের হওয়ার জন্য দশ দিনের নোটিশ দিয়েছিলেন এবং অবরোধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে, এমন সময় মদীনার মুনাফিকনেতারা তাদেরকে বলে পাঠাল যে, আমরা দু'হাজার লোক নিয়ে তোমাদের পক্ষে যাব এবং বনূ কুরাইশ ও বনূ গাতফানও তোমাদের সাহায্যে আসবে। সুতরাং মুসলমানদের মোকাবিলায় তোমরা মযবুত থাকো এবং কিছুতেই অস্ত্র সমর্পণ করো না; যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে আমরা যুদ্ধে তোমাদের সাথী হব এবং তোমাদেরকে যদি এখান থেকে বের করে দেয় তবে আমরাও এখান থেকে বের হয়ে যাব।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾

১২. যদি তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে এরা তাদের সাথে কখনো বের হবে না। আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তাহলে এরা কখনো তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি এরা তাদেরকে সাহায্য করেও তাহলে পিছু হটে আসবে এবং এর পর তারা আর কোনো সাহায্য পাবে না।

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

১৩. এদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। কারণ, এরা এমন লোক, যাদের বিবেক-বুদ্ধি নেই।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এরা কখনো একজোট হয়ে (খোলা ময়দানে) তোমাদের[১৬] সাথে লড়াই করবে না। যদি লড়াই করেও তাহলে দুর্গবেষ্টিত বস্তিতে থেকে অথবা দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে থেকে লড়াই করতে পারে। এরা একে অপরের চরম দুশমন। তোমরা এদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ। অথচ তাদের অন্তর একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের এ অবস্থা এ জন্য যে, এদের আকল নেই।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. এরা ঐসব লোকের মতোই, যারা তাদের কিছুকাল আগেই নিজেদের অপকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। আর (আখিরাতে তো) তাদের জন্য কঠিন আযাব আছেই।[১৭]

১৬. এই ক্ষুদ্র বাক্যে এক বিরাট সত্য তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি আছে সে তো জানে, আসলে ভয় করার যোগ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার শক্তি– মানুষের শক্তি নয়। সেজন্য কোনো মানবীয় শক্তি পাকড়াও করার জন্য থাকুক আর না-ই থাকুক, আল্লাহর কাছে ধরা পড়ার ভয় যে কাজে আছে এরূপ প্রতিটি কাজ থেকে সে বিরত থাকবে। আর দুনিয়ার সব শক্তি বিরোধিতা করলেও সে ঐ প্রতিটি ফরয আদায়ের জন্য সকল রকম চেষ্টা করবে, যা করার দায়িত্ব আল্লাহ তার উপর অর্পণ করেছেন। কিন্তু বিবেক-বোধহীন মানুষ আল্লাহর বদলে মানবীয় শক্তির দিকে চেয়ে সব ব্যাপারে নিজের কর্মপদ্ধতির সিদ্ধান্ত নেয়। সে যদি কোনো জিনিস থেকে বিরত হয় তবে আল্লাহর কাছে ধরা পড়ার ভয়ে বিরত হয় না; বরং কোনো মানবীয় শক্তি তাকে শাস্তি দেওয়ার ভয়েই সে তা করে এবং কোনো কাজ যদি সে করে তবে আল্লাহর হুকুমের কারণে করে না; বরং কোনো মানবীয় শক্তির পছন্দের কারণেই করে থাকে। এই বোধ ও বোধহীনতার পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর চরিত্র ও ব্যবহারকেই আলাদাভাবে তুলে ধরে।

১৭. এখানে কুরাইশ কাফির ও বনূ কাইনুকার ইহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা নিজেদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও এসব দুর্বলতার কারণেই মুষ্টিমেয় নিঃসম্বল মুসলিম দলের হাতে পরাজয় বরণ করেছিল।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের উদাহরণ শয়তানের মতো। প্রথমে সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন সে বলে, 'তোমার কুফরীর জন্য আমি দায়ী নই। আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. এরপর তাদের দুজনের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা উভয়ে চিরকাল দোযখে থাকবে। আর এটাই যালিমদের জন্য পরিণতি (প্রতিফল)।

রুকূ' ৩

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল। প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে।[১৮] আল্লাহকে আরো ভয় করে চল। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সব আমলের খবর রাখেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা ঐ লোকদের মতো হয়ে যেও না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহ তাদের নিজেদের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছেন।[১৯] এসব লোকই ফাসিক।

لَا يَسْتَوِيْٓ أَصْحٰبُ النَّارِ وَأَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. দোযখবাসী ও বেহেশতবাসী কখনো এক সমান হতে পারে না। আসলে বেহেশতবাসীরাই কামিয়াব।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

২১. যদি আমি এ কুরআনকে কোনো পাহাড়ের উপরও নাযিল করতাম তাহলে তোমরা দেখতে যে, পাহাড় আল্লাহর ভয়ে নত

১৮. 'আগামী দিন' অর্থ পরকাল। দুনিয়ার সমগ্র জীবনটি যেন 'আজ' এবং 'কাল' হচ্ছে কিয়ামতের দিন, যা এই 'আজ'-এর পরে আসবে।

১৯. অর্থাৎ, আল্লাহকে ভুলে থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে নিজেকে ভুলে যাওয়া। যখন মানুষ এ কথা ভুলে যায় যে, সে কারো দাস, তখন নিশ্চিতরূপে সে পৃথিবীতে নিজের জন্য এক ভুল স্থান ঠিক করে বসে; এবং তার সারাটা জীবন এই বুনিয়াদি ভুলের কারণে ভ্রান্ত হয়ে থেকে যায়। অনুরূপভাবে যখন সে এ কথা ভুলে যায় যে, সে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস নয়, তখন সেই অদ্বিতীয় সত্তা প্রকৃতপক্ষে সে যার বান্দাহ তাঁর দাসত্বই করে না; কিন্তু অন্য এমন অনেকের দাসত্ব সে করতে থাকে, আসলে সে যাদের মোটেই দাস নয়।

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

হয়ে ফেটে পড়ছে।[২০] আমি এসব উদাহরণ মানুষের সামনে এ জন্য পেশ করছি, যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করে।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

২২. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।[২১] গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রাহমান ও রাহীম।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র[২২], স্বয়ং শান্তি[২৩], নিরাপত্তাদাতা[২৪], রক্ষক[২৫], সবার উপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহঙ্কারের অধিকারী। মানুষ তাঁর সাথে যে শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী ও সে অনুযায়ী রূপদাতা। সব ভালো নাম তাঁরই। আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে সবই তাঁর তাসবীহ করছে।[২৬] তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।

---

২০. এই উপমার মর্ম হচ্ছে, কুরআন যেরূপভাবে আল্লাহর বড়ত্ব ও তাঁর কাছে বান্দাহর দায়িত্ব ও জবাবদিহির বর্ণনা দান করছে, যদি পাহাড়ের মতো বিরাট সৃষ্টিরও সে বোধ থাকত এবং সে জানতে পারত যে কীরূপ শক্তিমান প্রভুর সামনে তাকে কাজের জবাবদিহি করতে হবে, তবে সেও ভয়ে কেঁপে উঠত।

২১. অর্থাৎ, যিনি ছাড়া অন্য কারো এ মর্যাদা, স্থান ও মোকাম নেই যে, তার দাসত্ব ও পূজা করা যেতে পারে; যিনি ছাড়া এমন গুণ ও ক্ষমতা কারোরই নেই, যার উপাস্য হওয়ার হক থাকতে পারে।

২২. অর্থাৎ, তিনি এর থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁর সত্তার কোনো দোষ-ত্রুটি বা মন্দ গুণ থাকতে পারে না এবং তিনি এক পবিত্রতম সত্তা, যাঁর সম্পর্কে কোনো খারাপের ধারণা পর্যন্ত করা যায় না।

২৩. বিপদ অথবা দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি হতে পারে বা কখনো ঘাটতি আসতে পারে– এরূপ সকল সম্ভাবনা থেকে তাঁর সত্তা উচ্চতর ও পবিত্র।

২৪. অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট বস্তু তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ যে, তিনি কখনো তার প্রতি যুলুম করবেন না, অথবা তার হক নষ্ট করবেন না অথবা তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না অথবা তার প্রতি দেওয়া ওয়াদা পালন করবেন না।

২৫. মূলে 'আল মুহাইমিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে– প্রথমত, রক্ষণা-বেক্ষণকারী; দ্বিতীয়ত, পরিদর্শক, সাক্ষী যিনি দেখছেন যে, কে কী করছে; তৃতীয়ত, সেই সত্তা, যিনি মানুষের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।

২৬. অর্থাৎ, কথার ভাষায় বা অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা প্রতিটি দোষ ও ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৬০. সূরা মুমতাহিনা

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ১০ নং আয়াতের 'ফামতাহিনূ' শব্দ থেকে নামটি চয়ন করা হয়েছে। ঐ আয়াতে হুকুম করা হয়েছে যে, মক্কা থেকে যেসব মহিলা হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে, তারা সত্যিকার ঈমান আনার কারণেই হিজরত করেছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে। 'মুমতাহিনা' অর্থ যেসব মহিলাকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এর মূল শব্দ হলো ইমতিহান বা পরীক্ষা (যাচাই)।

নাযিলের সময়

এ সূরা এমন দুটো ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যা ইতিহাসে বিখ্যাত। তাই এর নাযিলের সময়কাল সঠিকভাবে জানা সহজ।

প্রথমত, হযরত হাতিব বিন আবি বালতায়া (রা) নামক এক সাহাবী রাসূল (স)-এর মক্কা অভিযানের খবর কুরাইশদেরকে জানানোর জন্য গোপনে এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনা মক্কা বিজয়ের কিছু আগেই ঘটে থাকবে।

দ্বিতীয়ত : এ সূরায় হিজরতকারী মহিলাদের কথা বলা হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয় পর্যন্তই হিজরত চালু ছিল। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের কিছু আগেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

১. হযরত হাতিব (রা) গোপনে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা কুরাইশদের হাতে পৌঁছলে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয়ের যে পরিকল্পনা রাসূল (স) করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু হযরত হাতিবের নিয়ত খারাপ ছিল না। তাঁর পরিবার মক্কায় রয়ে গিয়েছিল বলে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য এ চিঠি দিয়েছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানদের মহব্বতে যে কাজ তিনি করেছিলেন তা ইসলামের জন্য যে কত মারাত্মক ছিল তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাই ইসলামী আন্দোলনের সকলকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোনো অবস্থায়ই ইসলামের দুশমন শক্তির সামান্য সহায়তাও যেন করা না হয়।

২. হিজরতের ফলে যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান এ সূরায় দেওয়া হয়েছে। যেসব পুরুষ হিজরত করে এসেছেন তাদের স্ত্রীরা ঈমান না আনার কারণে মক্কায় রয়ে গেছে। আবার এমন মহিলারাও হিজরত করে এসেছেন, যাদের স্বামীরা কাফির অবস্থায় মক্কায় আছে। এ অবস্থায় হিজরতকারী ও মক্কায় থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে বিবাহবন্ধন জারি থাকবে কি না এবং যদি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয় তাহলে তাদের মোহরের লেনদেন কীভাবে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিধি-বিধান এ সূরায় দেওয়া হয়েছে।

৩. যেসব মহিলা ইসলাম কবুল করেছেন তাদের মধ্যে যাতে জাহেলী যুগের প্রচলিত বড় বড় দোষ না থাকে সেজন্য কীভাবে তাদের থেকে বাইআত নিতে হবে সে বিষয়ে এ সূরায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে ঐ সাহাবীগণকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, যারা হিজরত করে মদীনায় এলেও তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মক্কায় থেকে যাওয়ার কারণে তাদের হেফাযতের স্বার্থে মক্কায় ইসলামবিরোধীদের সাথে বন্ধুভাব পোষণ করেন।

যারা রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করল, এমনকি রাসূল (স) ও ঈমানদারদের উপর চরম যুলুম করে তাঁদেরকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করল, তাদের সাথে দুনিয়ার কোনো স্বার্থে গোপন সম্পর্ক রাখার বিরুদ্ধে এখানে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। যারা পরিবার-পরিজনের স্বার্থে এ ধরনের সম্পর্ক রাখে তাদের জানা উচিত যে, আখিরাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনো কাজে আসবে না।

এ কয়টি আয়াতে ইসলামী আন্দোলনের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, ইসলামবিরোধীরা সুযোগ পেলে তোমাদেরকে সামান্য খাতিরও করবে না। তোমরা পরিবার ও সন্তানাদির স্বার্থে যদি ইসলামী আন্দোলনের পরিকল্পনা গোপনে দুশমনদের জানাও তাহলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা যদি রাসূল (স)-কে ওহীর দ্বারা হযরত হাতিব বিন আবি বালতায়া (রা)-এর গোপন চিঠির খবর না দিতেন তাহলে রাসূল (স)-এর মক্কা বিজয়ের গোটা পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে পাঠিয়ে ঐ চিঠি উদ্ধার করেন। এক মহিলার হাতে সে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। মক্কার পথে এক জায়গায় গিয়ে হযরত আলী (রা) সে মহিলার কাছ থেকে তা কেড়ে নেন।

৪-৬ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সাহাবীদের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে বিরোধীদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত। এ বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তা অনুকরণ করার জন্য এখানে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর দীন এমন এক পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় যে, যারা দীন কবুল করে আর যারা কবুল করে না তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই আর বাকি থাকে না। যারা ইসলামবিরোধী, তারা তাদের ঈমানদার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কেও ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে সামান্য খাতির করে না। ঈমান ত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা আপস করতে রাজি হয় না।

এ অবস্থায় ঈমানদারদেরও উচিত, ঈমান না আনা পর্যন্ত নিজের বাপ-ভাইকেও আপন মনে না করা। এ আদর্শই হযরত ইবরাহীম (আ) রেখে গেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সাহাবীগণ একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করতেন। হযরত হাতিব (রা) যদি তা-ই করতেন তাহলে কাফিরদের উপর ভরসা করে পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন না।

হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর কাছে নিজেদের মযবুত মনোবলের জন্য যে দু'আ করেছিলেন, তা ৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ইজ্জতের স্বার্থে এ দু'আটির মর্ম গভীরভাবে বোঝা দরকার। এ দু'আয় এ কথাই বলা হয়েছে যে, 'হে আল্লাহ! আমরা যেন কোনো অবস্থায়ই এমন কোনো সামান্য দুর্বলত ও না দেখাই, যার ফলে বিরোধীরা ধারণা করার সুযোগ পায় যে, তারাই হক পথে আছে এবং আমরাই ভুল পথে আছি। আমাদের প্রতিটি আচরণ যেন এ কথাই প্রমাণ করে যে, বিরোধীরাই ভুল পথে আছে।'

দ্বিতীয় রুকূ'

৭-৯ নং আয়াতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে, যারা ঈমান না আনা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে না, তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখায় কোনো দোষ নেই। ইসলামের দুশমন আর অমুসলিম এক রকম নয়। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা ইসলামের দুশমনি করে না তাদের সাথে দুশমনদের মতো ব্যবহার করা উচিত নয়।

অবশ্য আজ যারা দুশমনি করছে তারাও একসময় ঈমান এনে তোমাদের বন্ধু হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন দুশমনি করছে ততদিন তাদের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকতে হবে, যাতে তারা তোমাদের সাথে সম্পর্কের সুযোগে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি করতে না পারে।

১০ ও ১১ নং আয়াতে মুহাজির মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে বেশ কয়টি আইন এ দুটো আয়াতে দেওয়া হয়েছে :

১. প্রথমে বলা হয়েছে, হিজরতকারী মহিলারা ঈমানের কারণেই মক্কা থেকে এসেছে কি না তা যাচাই করে দেখো। যদি তাদের ঈমান সম্পর্কে নিশ্চিত হও তাহলে তাদেরকে মদীনায় থাকতে দাও। হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুযায়ী শুধু পুরুষদেরকে মক্কায় ফেরত দিতে হবে; মহিলাদেরকে নয়।

২. এরপর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার ও কাফিরদের মধ্যে বিবাহসম্পর্ক থাকবে না। হিজরতকারী পুরুষদের যেসব স্ত্রী কাফির অবস্থায় মক্কায় রয়ে গেছে এবং হিজরতকারী মেয়েদের যেসব স্বামী কাফির অবস্থায় মক্কায় রয়েছে তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক খতম হয়ে গেছে।

৩. মুহাজির পুরুষদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, হিজরত করে আসা মহিলাদেরকে মোহর আদায় করে বিয়ে করতে পার।

৪. মুহাজির পুরুষদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তাদের যেসব স্ত্রী কাফির, তাদেরকে যেন আর স্ত্রী মনে না করে।

৫. মুহাজির পুরুষদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের কাফির স্ত্রীদেরকে যে মোহর দিয়েছিলে তা মক্কার কাফিরদের কাছ থেকে ফেরত চেয়ে নাও।

৬. মুহাজির মহিলাদেরকে বলা হয়েছে, তাদের কাফির স্বামীরা তাদেরকে যে মোহর দিয়েছিল তা তারা ফেরত পেতে পারে।

৭. কাফির স্ত্রীদেরকে মুমিন স্বামীরা যে মোহর দিয়েছিল তা যদি ফেরত না পাওয়া যায়, তাহলে কিছুই করার নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের কোনো চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এর কোনো মীমাংসা হবে না।

১২ নং আয়াতে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে যে, হিজরতকারী মহিলাদের বাইআত কবুল করার সময় তাদের কাছ থেকে আরব সমাজে প্রচলিত বড় বড় অন্যায় কাজ না করার মযবুত ওয়াদা নিতে হবে।

১৩ নং আয়াতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ ও রাসূলের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখে। ইহুদী-মুশরিকদের মধ্যে যারা বিরোধী ভূমিকা পালন করছে তাদের উপর আল্লাহর গযব রয়েছে। ফলে তারা আল্লাহর রহমত থেকে তেমনি নিরাশ, যেমন তাদের মধ্যে যারা কবরবাসী তারা। আল্লাহর নাফরমানরা কবরে যাওয়ার পর তাদের পরিণাম বুঝে নিরাশ হয়ে যায়। যাদের উপর আল্লাহর গযব পড়ে, তারা দুনিয়ায় থাকাকালেই নিরাশ হয়। কারণ, তারা আখিরাতে আল্লাহর দয়া পাওয়ার আশা করতে পারে না।

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٣ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

১. হে[১] ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই (দেশ ছেড়ে ঘর-বাড়ি থেকে) বের হয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মানতে তারা অস্বীকার করছে। আর তাদের আচরণ এমন যে, তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এ দোষের জন্য দেশ থেকে বের করে দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাক, কেমন করে তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বের বাণী পাঠাচ্ছ? অথচ তোমরা যাকিছু গোপনে ও প্রকাশ্যে করছ তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে-ই এরূপ করে সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ②

২. তাদের আচরণ তো এমন যে, যদি তোমাদেরকে কাবু করতে পারে তাহলে তারা তোমাদের সাথে দুশমনি করে এবং হাত ও মুখ দিয়ে তোমাদেরকে কষ্ট দেয়। তারা তো এটাই চায় যে, তোমরা যেন কোনো রকমে কাফির হয়ে যাও।

১. তাফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, যখন মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে লিখিত যে চিঠিতে হযরত হাতিব বিন আবি বালতায়া (রা) শত্রুদেরকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা আক্রমণ করতে চলেছেন, সে চিঠিটি যে সময় ধরা পড়েছিল সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৩. কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তানাদি[২] তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। সেদিন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।[৩] আর তোমরা যাকিছু কর তা আল্লাহ দেখেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে এক সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের দেশবাসীকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মা'বুদদের তোমরা পূজা কর তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি।[৪] এক আল্লাহর উপর তোমাদের ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য দুশমনি ও বিরোধ হয়ে গেল। তবে ইবরাহীম তার পিতাকে এ কথা বলা (এ থেকে একটা আলাদা ব্যাপার) যে, আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দু'আ অবশ্যই করব; কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে আপনার জন্য কিছু আদায় করার সাধ্য আমার নেই।[৫] (ইবরাহীম ও তার সাথীরা এ দু'আই করেছিল যে,) হে আমাদের রব! আপনার উপর আমরা ভরসা করেছি, আপনার দিকেই আমরা এসেছি এবং আপনার কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

২. হযরত হাতিব (রা) এ কাজ এ উদ্দেশ্যে করেছিলেন যে, মক্কায় তাঁর যে পরিবারবর্গ আছে যুদ্ধের সময় তারা যেন নিরাপদে থাকে। এ জন্য বলা হয়েছে, যে সন্তান-সন্ততি ও স্বজনবর্গের জন্য তুমি এ কাজ করছ পরকালে তারা তোমার কোনো কাজে আসবে না।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও সংযোগ সেখানে ছিন্ন করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে নিজ সত্তায় সেখানে উপস্থিত হবে। সুতরাং দুনিয়ার কোনো লোকেরই কোনো ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব বা দলবদ্ধতার খাতিরে কোনো অবৈধ কাজ করা উচিত নয়। কেননা, নিজের শাস্তি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে; তার নিজের দায়িত্বের মধ্যে অন্য কেউ অংশীদার হবে না।

৪. অর্থাৎ, আমরা তোমাদেরকে কাফির (অমান্যকারী) গণ্য করি। তোমরা সত্যপন্থি বলে আমরা মানি না এবং তোমাদের ধর্মকে মানি না।

৫. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই কথা অনুসরণযোগ্য যে, তিনি নিজের কাফির ও মুশরিক কাওমকে পরিষ্কারভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৫. হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফিরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দেবেন না।[৬] হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৬. এসব লোকের মধ্যেই তোমাদের জন্য ও যারা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের আশা করে তাদের জন্য সুন্দর আদর্শ রয়েছে। এ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে (সে জেনে রাখুক যে) নিশ্চয়ই কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি কারো প্রশংসারও ধার ধারেন না।

রুকূ' ২

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭. যাদের সাথে আজ তোমাদের দুশমনি রয়েছে[৭], হয়তো কোনো এক সময় আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

ত্যাগের কথা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তিনি যে নিজের মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ওয়াদা করেছিলেন এবং কার্যত তার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এ বিষয়টি তোমাদের জন্য অনুকরণীয় নয়।

৬. কাফিরদের জন্য মুমিনদের 'ফিতনা'স্বরূপ হওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে– কাফিররা মুমিনদের উপর বিজয়ী হয়ে নিজেদের এই জয়কে এ কথার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করে যে, আমরা সত্যের উপর আছি এবং মুমিনরা অসত্যের উপর আছে অথবা মুমিনদের উপর কাফিরদের যুলুম-অত্যাচারের বাড়াবাড়ি মুমিনদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে এবং অবশেষে মুমিনরা কাফিরদের কাছে অবনত হয়ে নিজেদের দীন ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। অথবা দীনে হকের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও মুমিনরা সেই মর্যাদার উপযোগী নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে এবং জগৎ তাদের চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্যে ঐ একই দোষ লক্ষ করে, যা জাহিলিয়াতের সমাজে সাধারণভাবে চালু আছে। এতে কাফিরদের এ কথা বলার সুযোগ হয় যে, এই দীনে এমন কী ভালো জিনিস আছে, যার জন্য আমাদের কুফরীর উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে মেনে নেওয়া যায়?

৭. উপরিউক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়ার পর এ আশাও দেওয়া হয়েছে যে, এমন সময়ও আসতে পারে, যখন তোমাদের এই আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের শত্রুতা কাল বন্ধুত্বে বদল হয়ে যাবে।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ⑧

৮. যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।[৮]

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓي اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑨

৯. আল্লাহ ঐসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে আর তোমাদেরকে বের করার জন্য একে অপরকে সাহায্য করেছে। এদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۗءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۭ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۭ

১০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন মুমিন মেয়েলোকেরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে তখন (তাদের মুমিন হওয়ার ব্যাপারে) তোমরা যাচাই করে নাও। তাদের ঈমানের আসল খবর তো আল্লাহই ভালো জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত দিও না।[৯] তারাও

৮. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না তোমরাও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে না– এটাই ইনসাফের দাবি। শত্রু এবং মিত্র সবাইকে একই পর্যায়ে গণ্য করা এবং উভয়ের সাথে একই রকম ব্যবহার করা বিচারসম্মত নয়। সেই সব লোকদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করার হক আছে, যারা ঈমান আনায় তোমাদের উপর অত্যাচার করেছে ও তোমাদেরকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে এবং তোমরা দেশ ত্যাগ করার পরও যারা তোমাদের পেছন ছাড়েনি। কিন্তু যেসব লোক এই অত্যাচারে কোনো অংশগ্রহণ করেনি, বিচারের দাবি হচ্ছে, তোমরা তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে এবং সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের উপর তাদের যেসব হক আছে তা পালন করতে কোনো ত্রুটি করবে না।

৯. হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম প্রথম তো মুসলমান পুরুষ মক্কা থেকে পালিয়ে পালিয়ে মদীনায় আসতে থাকে এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের ফেরত পাঠানো হতে থাকে, কিন্তু এরপর মুসলিম নারীদের আসা শুরু হয়ে যায় এবং কাফিররা চুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের ফিরে পাওয়ারও দাবি জানায়। এ সম্পর্কে এ প্রশ্ন ওঠে যে, হুদাইবিয়ার চুক্তি কি মহিলাদের উপরও প্রযোজ্য হবে? আল্লাহ তাআলা এ প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, যদি সে মুসলমান হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে,

وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

কাফিরদের জন্য হালাল নয়, কাফিরাও তাদের জন্য হালাল নয়। তাদের কাফির স্বামীরা তাদেরকে যে মোহর দিয়েছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা যদি তাদের মোহর আদায় করে[১০] তাদেরকে বিয়ে কর তাহলে কোনো দোষ নেই। তোমরাও কাফির স্ত্রীদেরকে বিয়ের বাঁধনে আটকিয়ে রেখ না। তোমরা তোমাদের কাফির স্ত্রীদেরকে যে মোহর দিয়েছিলে তা ফেরত চেয়ে নাও। আর কাফিররা তাদের মুমিন স্ত্রীদেরকে যে মোহর দিয়েছিল তা তারা ফেরত চেয়ে নিক। এটাই আল্লাহর হুকুম। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। আর তিনি মহাজ্ঞানী ও সুকৌশলী।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

১১. যদি তোমাদের কাফির স্ত্রীদের মোহরের কিছুই (কাফিরদের কাছ থেকে) ফেরত পাওয়া না যায় তবুও কাফিরদের যে স্ত্রীরা এদিকে চলে এসেছে তাদেরকে এমন পরিমাণ মোহর দান কর, যা কাফিরদের দেওয়া মোহরের সমান। আর যে আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান এনেছ তাঁকে ভয় করে চল।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا

১২. হে নবী! যখন আপনার কাছে মুমিন মেয়েরা বাইআত করতে আসে[১১] এবং এ ওয়াদা করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো

ঈমানের খাতিরেই সে হিজরত করে এসেছে অন্য কোনো কারণে আসেনি, তবে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। এ আদেশের ভিত্তি হচ্ছে, চুক্তিপত্রে লিখিত শর্তে 'রাজুলুন' (পুরুষ) শব্দ লিখিত ছিল– যেমন বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে।

১০. অর্থাৎ, তাদের কাফির স্বামীদের যে মোহর ফিরিয়ে দেওয়া হবে সেই মোহরই এই স্ত্রীলোকদের মোহর বলে গণ্য হবে না; বরং এখন যে মুসলমানই তাদের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে ইচ্ছা করবে, সে যেন তার মোহর আদায় করে তাকে বিবাহ করে।

১১. এ আয়াত মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর যখন মক্কা বিজয় হলো তখন কুরাইশরা দলে দলে রাসূল (স)-এর কাছে বাইআতের উদ্দেশ্যে হাজির হতে শুরু করল। তিনি

يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, জেনে-শুনে কোনো অপবাদ রচনা করবে না[১২], কোনো ভালো কাজে আপনার নাফরমানী করবে না[১৩], তাহলে তাদের বাইআত কবুল করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

১৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যাদের উপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা আখিরাতের ব্যাপারে তেমনই নিরাশ, যেমন কবরের কাফিররা নিরাশ।

সাফা পাহাড়ের উপর নিজে পুরুষদের বাইআত গ্রহণ করেন এবং মহিলাদের বাইআত গ্রহণের জন্য ও এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ওয়াদা নেওয়ার জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রা)-কে নিযুক্ত করেন। এরপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি স্থানে আনসার মহিলাদেরকে একত্র করতে নির্দেশ দেন এবং হযরত উমর (রা)-কে তাদের বাইআত গ্রহণের জন্য পাঠান।

১২. এর দ্বারা দুই প্রকার মিথ্যা দোষারোপ বোঝানো হয়েছে। প্রথমত, কোনো মহিলার পক্ষে অন্য মহিলার বিরুদ্ধে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করার অপবাদ দেওয়া এবং এ জাতীয় কাহিনী লোকদের মাঝে প্রচার করা। দ্বিতীয়ত, পরপুরুষের ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়ে স্বামীকে এই বিশ্বাস দান করা যে, এটা তোমারই সন্তান।

১৩. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে দুটি বড় গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত, নবী কারীম (স)-এর প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারেও 'ভালো কাজের আনুগত্য'-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অথচ রাসূল (স) সম্পর্কে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, তিনি কখনো খারাপের হুকুম দিতে পারেন। এর দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। কেননা, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য পর্যন্ত যখন 'ভালো কাজে আনুগত্য' করার শর্তযুক্ত, তখন অন্য কারো এ মর্যাদা কী করে হতে পারে যে, সে শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার হকদার হবে? এবং কী করে এমন কোনো হুকুমের বা আইনের বা নিয়মের বা প্রথার অনুসরণ করা যেতে পারে, যা আল্লাহর আইনের বিরোধী?

এ আয়াতে পাঁচটি নেতিবাচক হুকুম দেওয়ার পর মাত্র একটি ইতিবাচক হুকুম দেওয়া হয়েছে। আইনগত দিক দিয়ে এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব ভালো কাজে নবী করীম (স)-এর আদেশ পালন করতে হবে। মন্দ কাজ সম্পর্কে সেই বড় দোষগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, যা জাহিলিয়াতের যুগে স্ত্রীলোকেরা করত এবং সে দোষগুলো থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হলো। কিন্তু ভালো কাজ সম্পর্কে ভালো কাজের কোনো তালিকা পেশ করে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, তোমরা অমুক অমুক কাজ করবে; বরং এই প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, রাসূল (স) যে সৎ কাজের হুকুম দান করবেন তা তোমাদের পালন করতে হবে।

৬১. সূরা সফ্

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

চতুর্থ আয়াতের একটি শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ঐসব লোককে পছন্দ করেন, যারা কাতারবন্দি হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করে। 'সফ্' শব্দের অর্থ কাতার বা সারি।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি উহুদ যুদ্ধের পরপরই নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। সূরার আলোচনায় যে পরিবেশ ও অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ঐ সময়কার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ।

আলোচ্য বিষয়

ঈমান ও ইখলাসের সাথে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে জযবা সৃষ্টি করাই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। সূরাটিতে দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্যও কথা আছে। এমনকি ঈমানের মিথ্যা দাবিদার, যারা মুসলিম সমাজে ঢুকে মুনাফিকী করছিল তাদেরকেও এখানে সম্বোধন করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এমন এক মহান সত্তা, আসমান ও জমিনের সব কিছুই তাঁর তাসবীহ করছে। তাসবীহ করার অর্থ হলো আল্লাহর গুণগান করা বা তাঁর মধ্যে যে কোনো দিক দিয়ে সামান্য ত্রুটিও নেই সে কথা প্রকাশ করা। প্রতিটি সৃষ্টিই এ কথার প্রমাণ যে, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তাঁর কোনো ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে না। তিনি সকল রকম দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র– সুবহানাল্লাহু দ্বারা এ কথাই বোঝায়।

২ ও ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই, তাদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। যারা মুখে ঈমাদের দাবি করলেও আল্লাহর পথে লড়াই করে না তাদের কথা ও কাজে যে অমিল তা অতি স্পষ্ট। এটা মুনাফিকীরই পরিচয়। আল্লাহর কাছে তারাই প্রিয়, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং এমন পথে সংগ্রাম করে না, যা আল্লাহর পথ বলে গণ্য নয়; যারা শৃঙ্খলার সাথে ও সুসংগঠিতভাবে লড়াই করে এবং যারা দুশমনের বিরুদ্ধে সীসা গলানো মযবুত দেয়ালের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে।

৫-৭ নং আয়াতে রাসূল (স)-এর উম্মতকে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের রাসূল ও তোমাদের দীনের সাথে বনী ইসরাইলের মতো ব্যবহার করো না। বনী ইসরাইল হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে যে অন্যায় আচরণ করেছে, তার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াতের তাওফীক দেননি।

নবীগণ তাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখালেন। অথচ তারা জাদুকর বলে দোষ দেখিয়ে নবীদেরকে মানতে অস্বীকার করল এবং নানা বাঁকা পথে নবীদের বিরোধিতা করল। যারা নবীদের সাথে এমন

ব্যবহার করে তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ এমন ফাসিক ও যালিমদেরকে হেদায়াত দেন না।

৮ ও ৯ নং আয়াতে রাসূল (স)-এর বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআনের মাধ্যমে যে হেদায়াত ও হক দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তা বিজয়ী হবেই। মানুষের মনগড়া সব দীন বা জীবনবিধান ও নিয়ম-কানুনই বাতিল বা মিথ্যা। এসব বাতিল দীনের উপর আল্লাহর হক দীন কায়েম করার দায়িত্ব দিয়েই রাসূলকে পাঠানো হয়েছে। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা আল্লাহর এ মহান নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য যত চেষ্টাই করুক তা ফুঁ-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়। অপপ্রচার ও অন্যায়ভাবে বিরোধিতা করে দীনের বিজয়কে বাধা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। আল্লাহ তাঁর দীনের এ আলোকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পূর্ণতা দান করবেন। তারা ইসলামের বিজয় কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

১০-১৩ নং আয়াতে ঈমানের দাবিদার মুসলমানদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে–

১. তোমরা খাঁটি দিলে ঈমান আনো। শুধু মুখে ঈমানের দাবি করলে চলবে না। ঈমানের দাবি পূরণের জন্য জান ও মালের কুরবানীও দিতে হবে।

২. আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তোমরা জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো। আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি লাভজনক অন্য কোনো ব্যবসা নেই। দুনিয়ার ব্যবসায়ে লাভও হতে পারে, লোকসানও হতে পারে। কিন্তু এ ব্যবসায়ে শুধু লাভই আছে, ক্ষতির কোনো ভয় নেই। আল্লাহ ও রাসূলের উপর খাঁটি ঈমান এনে যারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাদের এ ব্যবসায়ে কী কী লাভ হয় তাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে :

ক. যারা এ পথে চলার মূল্য বোঝে তারা টের পায় যে, এটা কত ভালো পথ।

খ. আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

গ. আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশত দেবেন, যেখানে পরম সুখের বাড়ি-ঘরে তারা চিরকাল থাকতে পারবে।

এ সূরার শেষ আয়াতটি বড়ই অর্থপূর্ণ। যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য জনগণকে আল্লাহর পথে ডাকে, তাদেরকে এখানে আল্লাহর সাহায্যকারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ঈসা (আ)-এর উদাহরণ দিয়ে উৎসাহ দান করেছেন। ঈসা (আ) তাঁর সাহাবীগণকে আল্লাহর পথে তাঁর সাহায্যকারী হওয়ার জন্য যখন ডাকলেন, তখন তারা যেমন করে সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তেমনি রাসূল (স)-এর সাথীদেরও সাড়া দেওয়া উচিত। ঈসা (আ)-কে যারা মানতে রাজি হয়েছিলেন তাদেরকে আল্লাহ যেমন অমান্যকারীদের উপর জয়ী করেছিলেন, তেমনি রাসূল (স)-কে যারা মানবেন তাদেরকেও আল্লাহ অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী করবেন।

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٤ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١

১. আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে সবাই আল্লাহর তাসবীহ করে। তিনিই মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣

৩. আল্লাহর কাছে এটা খুবই অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বল, যা তোমরা কর না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝٤

৪. নিশ্চয় আল্লাহ ঐসব লোককে পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো মযবুত দেয়াল।[১]

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۗ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ

৫. মনে করে দেখ মূসার ঐ কথা, যা তিনি তার কাওমকে বলেছিলেন 'হে আমার কাওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা ভালো করেই জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর পাঠানো রাসূল।'[২] পরে তারা যখন বাঁকা পথ ধরল তখন আল্লাহও তাদের অন্তর

১. এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ঐ মুমিনরাই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে তৃপ্ত হয়, যারা তাঁর রাস্তায় জীবন দিতে ও বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, এ কথাও জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা সেই সেনাদলকে পছন্দ করেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যায়– (ক) তারা খুব বুঝে-শোনে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে; এমন কোনো পথে লড়াই করে না, যা আল্লাহর পথ নয়। (খ) তারা বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয় না; বরং দৃঢ় শৃঙ্খলার সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। (গ) শত্রুর মোকাবিলায় তারা সীসাঢালা দেয়ালের মতো মযবুত হয়ে লড়াই করে।

২. এ কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল তাদের নবীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছিল মুসলমানরা যেন তাদের নবীর সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার না করে। তা না হলে বনী ইসরাইলের ভাগ্যে যে পরিণাম ঘটেছে তারাও ঐ রকম পরিণাম থেকে রক্ষা পাবে না।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসিকদেরকে হেদায়াত দান করেন না।[৩]

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৬. মনে করে দেখ ঈসা ইবনে মারইয়ামের ঐ কথা, যা তিনি বলেছিলেন, 'হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর পাঠানো রাসূল।[৪] আমি ঐ তাওরাত যা আমার আগে এসেছে, তার সত্যতা প্রকাশ করছি এবং আহমাদ[৫] নামে আমার পরে যে রাসূল আসবেন তাঁর সুসংবাদ দিচ্ছি।' কিন্তু যখন তিনি তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হাজির হলেন তখন তারা বলল, 'এটা তো পরিষ্কার জাদু (ধোঁকা)'।[৬]

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৭. ঐ লোকের চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়।[৭] অথচ তাকে ইসলামের (আল্লাহর অনুগত হওয়ার) দিকেই ডাকা হচ্ছে।[৮] আল্লাহ এমন যালিম কাওমকে হেদায়াত দেন না।

৩. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার রীতি এই নয় যে, যারা নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায় তিনি অহেতুক তাদেরকে সোজা পথে চালাবেন এবং যারা তাঁকে অমান্য করতে উৎসাহী ও তৎপর, তিনি জোর করে তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে এনে ধন্য করবেন।

৪. এটা বনী ইসরাইলের অবাধ্যতার দ্বিতীয় উদাহরণ। প্রথম নাফরমানি তারা নিজেদের উন্নতির যুগের শুরুতে করেছিল। আর দ্বিতীয় নাফরমানি তারা এ যুগের শেষ পর্যায়ে করেছিল, যার পরে তাদের উপর চিরদিনের জন্য আল্লাহর লা'নত পড়েছে। এ দুটো ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর রাসূলের সাথে বনী ইসরাইলের মতো আচরণের পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা।

৫. রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে এ হচ্ছে হযরত ঈসা (আ)-এর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ। তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৬. মূলে 'সিহরুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে জাদু অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, ধোঁকা ও প্রতারণার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে 'জাদু'র ন্যায় এ শব্দের অন্যান্য অর্থও প্রচলিত। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, হযরত ঈসা (আ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন, সে নবী যখন নিজের নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে হাজির হলেন তখন বনী ইসরাইল ও ঈসা (আ)-এর উম্মত তাঁর নবী হওয়ার দাবিকে সম্পূর্ণরূপে ধোঁকা বলে গণ্য করল।

৭. অর্থাৎ, আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা দাবিদার বলে অভিহিত করে এবং নবীর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীকে নবীর মনগড়া কথা বলে গণ্য করে।

৮. অর্থাৎ, প্রথমত সত্য নবীকে মিথ্যা দাবিদার বলা কম যুলুম নয়; এরপর তাঁর উপর এ অতিরিক্ত যুলুম করা যে, আহ্বানকারী তো আল্লাহর বন্দেগীর ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে আর

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ﴿٨﴾

৮. এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহর এটাই ফায়সালা যে, কাফিররা যতই অপছন্দ করুক, তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেনই।

هُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهٗ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّينِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

৯. তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও হক দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে অন্য সব দীনের উপর বিজয়ী করেন। মুশরিকদের নিকট এটা যতই অপছন্দ হোক না কেন।

রুকূ' ২

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

১০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যবসার[৯] কথা বলব, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে?

تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَتُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

১১. তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো, যদি তোমরা তা জান।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

১২. আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বইছে, আর তোমাদেরকে চিরস্থায়ী বেহেশতের খুব ভালো বাসস্থান দেবেন। এটা অতি বড় কামিয়াবী।

শ্রবণকারী তার উত্তরে তাকে গালি দেয় ও তাকে নিরাশ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অপবাদ এবং কল্পিত দোষারোপ করার হীন পথ গ্রহণ করে।

৯. ব্যবসায়ে মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের অর্থ ও সময়, শ্রম, বুদ্ধি ও যোগ্যতা নিয়োগ করে থাকে। এ হিসেবে এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে, যদি এই পথে নিজেদের সবকিছু নিয়োগ কর, তবে তোমরা সেই লাভ পাবে, যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

১৩. আর অন্যান্য জিনিস যা তোমরা পছন্দ কর (তা-ও তোমাদেরকে তিনি দেবেন), আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দেবেন এবং খুব শিগ্‌গিরই একটি বিজয় দেবেন। (হে রাসূল! এ বিষয়ে) মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

১৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম তার সাথিদেরকে ডেকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর দিকে (ডাকবার) কাজে আমার সাহায্যকারী কে আছ? হাওয়ারীগণ জবাব দিয়েছিল, 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী।' তখন বনী ইসরাঈলের একটি দল ঈমান আনল, আরেকটি দল কুফরী করল। তারপর যারা ঈমান আনল, আমি তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে শক্তিশালী করলাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে রইল।[১০]

১০. 'মাসীহ'র অমান্যকারীরা হচ্ছে ইহুদি এবং তাঁর মান্যকারী হচ্ছে খ্রিস্টান ও মুসলমান। আল্লাহ তাআলা প্রথমে খ্রিস্টানদেরকে ইহুদিদের উপর বিজয়ী করেন। তারপর মুসলমানরাও তাদের উপর বিজয়ী হয়, এভাবে ঈসা (আ)-এর অমান্যকারীরা উভয়ের কাছে পরাজিত হয়েছে। এখানে এ ঘটনাটি মুসলমানদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেভাবে পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর মান্যকারীরা তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী হয়েছে, সেভাবেই এখন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মান্যকারীরাও তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী হবে।

৬২. সূরা জুমু'আ

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার দ্বিতীয় রুকূ'র প্রথম আয়াতের 'জুমু'আ' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

হিজরী সপ্তম বছর এ সূরার প্রথম রুকূ' নাযিল হয়েছে। সম্ভবত খায়বার বিজয়ের সময় অথবা এর পরপরই এ রুকূ'টি নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় রুকূ'টি হিজরতের সাথে সাথেই নাযিল হয়েছে। রাসূল (স) মদীনায় পৌঁছার পঞ্চম দিনেই তিনি জুমু'আর নামায শুরু করেন। সূরার শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, দীনি মাহফিলের আদব-কায়দা সবাই তখনো শেখেননি। ইসলামী সমাজ তখন শুরু হয়েছে মাত্র।

আলোচ্য বিষয়

প্রথম রুকূ' যখন নাযিল হয় তখন ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ছয় বছর পর্যন্ত তারা ইসলামী রাষ্ট্রের চরম বিরোধিতা করে মদীনা থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা শেষ বারের মতো তাদেরকে এ সূরায় সম্বোধন করেছেন, যাতে এখনও হেদায়াত কবুল করে ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

দ্বিতীয় রুকূ'টি অনেক আগে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এজন্য এ সূরায় শামিল করা হয়েছে যে, ইহুদিরা তাদের পবিত্র দিন শনিবারের সাথে যে আচরণ করেছে, মুসলমানরা যেন তাদের শুক্রবারের সাথে ঐ রকম ব্যবহার না করে। প্রথম রুকূ'তে ইহুদিদের সম্পর্কে আলোচনা করার পর দ্বিতীয় রুকূ'তে মুসলমানদেরকে সাবধান করা হয়েছে, যাতে তারা পথভ্রষ্ট ইহুদিদের মতো হয়ে না যায়।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, আসমান-জমিনে যাকিছু আছে সবই আল্লাহর তৈরি বিধান মেনে চলছে। তাদের এ আচরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টি জগতের একমাত্র মনিব। তাঁর ক্ষমতা ও হিকমত সবার উপর জারি আছে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে ইহুদিদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সাথে প্রথম আয়াতটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ইহুদিরা মনে করত, তাদের মধ্য থেকেই রাসূল হতে হবে, জাহিল আরবদের মধ্যে রাসূল হতে পারে না। এ কারণেই তারা মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়নি। সৃষ্টিজগৎ এ কথাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তাআলা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তিনি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। পূর্ণ ইনসাফের সাথে তিনি দুনিয়াকে চালাচ্ছেন। ইহুদিরা মনে করত, তারা যত মন্দই হোক আল্লাহ তাদের মর্জিমতোই রাসূল পাঠাবেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ বিষয়ে ফায়সালা করার মালিক একমাত্র তিনি।

২-৪ নং আয়াতে পরোক্ষভাবে ইহুদিদেরকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে, তোমরা এ রাসূলকে এ কারণেই মানতে রাজি নও যে, তিনি ঐ কাওমের লোক, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করে 'উম্মী' বলে থাক। আল্লাহ তাদের মধ্য থেকেই রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদেরই চোখের সামনে মানুষকে আল্লাহর কিতাব শোনাচ্ছেন, তাদের জীবনকে পবিত্র করে গড়ে তুলছেন, যারা গুমরাহ ছিল তাদেরকে হেদায়াত করছেন। এটা আল্লাহরই মেহেরবানী। তিনি যার উপর মেহেরবানী করতে চান সে ছাড়া অন্য কেউ তা পায় না। তোমরা এ মেহেরবানী পাওয়ার অযোগ্য বলেই তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিচ্ছ না।

৫-৮ নং আয়াতে ঐ ইহুদিদেরকেই বলা হয়, তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল; কিন্তু তোমরা এ পবিত্র দায়িত্ব বোঝনি, পালনও করনি। এ সত্ত্বেও তোমাদের ধারণা যে, তোমরা আল্লাহর বড়ই প্রিয়। যদি সত্যিই তোমাদের এ বিশ্বাস থাকত যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তাহলে মৃত্যুকে তোমরা এত ভয় কর কেন? তোমাদের অবস্থা তো এই যে, তোমরা অপমান সহ্য করতে রাজি; কিন্তু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নও। এ কথা তোমরা ভালো করেই জান যে, তোমাদের অপকর্মের ফলে মৃত্যুর পর তোমাদের দশা আরও অপমানজনক হবে। এ কারণেই মৃত্যু কামনা করার সাহস তোমাদের নেই। তোমরা জেনে রাখো, মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাদের সব অপকর্মের আমলনামা পেশ করে দেবেন।

দ্বিতীয় রুকূ'

৯-১১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেছেন যে, জুমু'আর আযান শোনার সাথে সাথে দুনিয়ার সব কাজকর্ম ক্ষান্ত করে তাড়াতাড়ি মসজিদে চলে এসো। জুমু'আর খুতবা খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনো। দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ যেন খুতবা ও নামায থেকে তোমাদের মনকে ফিরিয়ে না রাখে।

তোমরা আল্লাহরই দাস এবং সব সময় তোমাদের মনিবের কথামতোই চলা উচিত, সেকথা মনে রাখার জন্যই নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে। যখন নামায শেষ হয় তখনও নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকার সাথে সাথে আল্লাহর কথা মনে রাখবে, যাতে সব কাজ আল্লাহর মর্জিমতো করতে পার।

তোমাদের রুজি-রোজগারের আসল মালিক আল্লাহ। তিনিই রিযক দিয়ে থাকেন। তাই রিযকের ধান্দায় বা খেল-তামাশার আকর্ষণে আল্লাহর হুকুমকে অবহেলা করা ঈমানদারদের কাজ নয়।

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে সবই ঐ আল্লাহর তাসবীহ করছে যিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র, মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

২. তিনিই সে সত্তা, যিনি উম্মীদের[১] মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে ছিল।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ②

৩. (এ রাসূলের আগমন) অপর সব লোকদের জন্যও, যারা এখনো তাঁর সাথে এসে মিলিত হয়নি।[২] আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।[৩]

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

১. এখানে ইহুদি পরিভাষা হিসেবে 'উম্মী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে। এর মর্ম হচ্ছে, যে আরবদেরকে ইহুদিরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিরক্ষর বলে এবং নিজেদের তুলনায় হীন মনে করে, সর্বজয়ী আল্লাহ্ তাঁদেরই মধ্য থেকে এক রাসূল বের করেছেন। রাসূল নিজে উত্থিত হননি; বরং তাঁর উত্থানকারী হচ্ছেন এই বিশ্ব জাহানের সম্রাট, প্রবল ও বিজ্ঞ, যাঁর শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে এসব লোক নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তাঁর কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাত শুধু আরব জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা দুনিয়ার সেই সব জাতি ও বংশের জন্যও তিনি নবী, যারা এখনো মুমিনদের মধ্যে এসে শামিল হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ, এটা তাঁরই শক্তি ও মহিমা যে, তিনি এরূপ জাহিল উম্মী কাওমের মধ্যে এরূপ মহান নবী সৃষ্টি করেছেন, যাঁর শিক্ষা ও উপদেশ-নির্দেশ উন্নত, বিপ্লবী, বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নীতিসমূহের ধারক। এর উপর সমগ্র মানবজাতি মিলিত হয়ে একটি উম্মাতে (আদর্শগত দলে) পরিণত হতে পারে এবং চিরকাল সেই আদর্শ ও নীতিসমূহ থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে পারে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৪. এটা তাঁরই মেহেরবানী, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৫. যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল কিন্তু তারা তার ভার বহন করেনি, তাদের উদাহরণ ঐ গাধার মতো, যে কিতাবের বোঝা বহন করে। তাদের উদাহরণ এর চেয়েও মন্দ, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে।[৪] আল্লাহ এমন যালিম লোকদেরকে হেদায়াত দেন না।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৬. তাদেরকে বল, হে ঐসব লোক যারা ইহুদী হয়ে গেছ![৫] যদি তোমরা এ কথা মনে করে থাক যে, অন্য সব মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু তোমরাই আল্লাহর প্রিয়, তাহলে মৃত্যু কামনা কর; যদি তোমাদের এ ধারণায় তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।[৬]

৪. অর্থাৎ, তাদের অবস্থা গাধা থেকেও নিকৃষ্টতর। গাধার জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকায় সে নিরুপায়। কিন্তু এসব লোক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা তাওরাত পড়ে ও পড়ায় এবং এর অর্থও তাদের অজানা নয়। তবু এর পথনির্দেশ থেকে তারা জেনে-শুনে বিচ্যুত হচ্ছে এবং সেই নবীকেও তারা ইচ্ছা করে মানতে অস্বীকার করছে, যিনি তাওরাত অনুসারে সম্পূর্ণরূপে সত্য নবী। এরা না বুঝতে পারার দোষে দোষী নয়; বরং এরা জেনে-বুঝে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অপরাধে অপরাধী।

৫. এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে, 'হে ইহুদিগণ' বলা হয়নি, বরং 'হে লোকেরা, যারা ইহুদি হয়ে গেছে।' বা 'যারা ইহুদিত্ব গ্রহণ করেছ' বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, আসল দীন, যা মূসা (আ) এবং তাঁর পূর্বের এবং পরের নবীগণ এনেছিলেন তা তো ছিল ইসলামই; এসব নবী (আ)-এর মধ্যে কেউই ইহুদি ছিলেন না এবং তাঁদের সময়ে ইহুদিত্বের জন্মই হয়নি। এ নামসহ এই ধর্মমত অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে।

৬. আরবের ইহুদিরা সংখ্যা ও শক্তিতে মুসলমানদের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না এবং উপায়-উপকরণের দিক থেকেও অনেক অগ্রসর ছিল। কিন্তু এই অসম যুদ্ধে যে জিনিস মুসলমানদেরকে বিজয়ী এবং ইহুদিদেরকে পরাজিত করেছিল তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা, অন্তরের অন্তস্তল থেকে তারা এ মৃত্যুবরণের জন্য আগ্রহী ছিল এবং তারা প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতো। আর ইহুদিদের অবস্থা ছিল, তারা কোনো পথেই জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল না– না আল্লাহর পথে, না জাতির পথে, না নিজের ধন-সম্পদের পথে। তাদের শুধু প্রয়োজন ছিল জীবনের, সে জীবন যেরূপই হোক না কেন। এ জিনিসই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ করে রেখেছিল।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑦

৭. কিন্তু এরা যাকিছু করেছে সে কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এ যালিমদেরকে ভালো করেই জানেন।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

৮. তাদেরকে বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ, সে তো তোমাদের কাছে আসবেই। তখন তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর কাছে পেশ করা হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। আর তিনি তোমাদেরকে সবই জানিয়ে দেবেন, যা তোমরা করছিলে।

রুকূ' ২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨

৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন জুমু'আর দিন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের দিকে দৌড়ে যাও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও।[৭] এটাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো, যদি তোমরা জান।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

১০. তারপর যখন নামায আদায় হয়ে যায় তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর দান তালাশ কর[৮] এবং বেশি করে আল্লাহর যিক্‌র

৭. এখানে 'যিক্‌র'-এর অর্থ খুতবা। কেননা, আযানের পর প্রথম কাজ যা নবী করীম (স) সম্পাদন করতেন তা নামায নয়; বরং খুতবা আর তিনি সর্বদা নামায খুতবার পরে আদায় করতেন। 'আল্লাহর যিক্‌রের দিকে দৌড়াও'-এর মর্ম এই নয় যে, দৌড়া-দৌড়ি করে এসো; বরং এর মর্ম হচ্ছে দ্রুত ওখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করো। 'কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর'-এর মর্ম শুধু ক্রয় ও বিক্রয় ত্যাগ করা নয় বরং নামাযের জন্য যাওয়ার চিন্তা ও যত্ন ছাড়া অন্যসব ব্যস্ততা ও তৎপরতা ত্যাগ করা। ইসলামী ফিকহ্‌শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে একমত যে, জুমু'আর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় ও প্রত্যেক প্রকারের কারবার নিষিদ্ধ। অবশ্য হাদীস অনুযায়ী নাবালক, স্ত্রীলোক, দাসী, রোগী ও মুসাফিরদেরকে জুমু'আর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

৮. এর মর্ম এই নয় যে, জুমু'আর নামাযের পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ও জীবিকার সন্ধানে দৌড়-ঝাঁপে লিপ্ত হওয়া জরুরি। বরং এ ঘোষণা অনুমতির অর্থে করা হয়েছে। জুমু'আর আযান শুনে সকল কারবার ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এজন্য বলা হলো, 'নামায শেষ হওয়ার পর তোমাদের অনুমতি দেওয়া গেল, তোমরা ছড়িয়ে পড় এবং নিজেদের কোনো কাজ-কারবার করতে চাও তো কর। ইহরাম খোলার পর শিকারের অনুমতির সঙ্গে এ কথা তুলনীয়। যেমন– ইহরাম

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾	করতে থাকো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে।[৯]
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾	১১. যখন তারা ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখল তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখেই[১০] তারা সেদিকে দৌড়ে চলে গেল। তাদেরকে বলো যে, যাকিছু আল্লাহর কাছে আছে তা এসব খেল-তামাশা ও ব্যবসা থেকে বেশি ভালো।[১১] আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো রিয্কদাতা।[১২]

অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করে তারপর বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার করো (সূরা মায়িদা : ২)। এর মর্ম এই নয় যে, অবশ্যই শিকার করতে হবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা এরপর শিকার করতে পার। সুতরাং এ আয়াতের ভিত্তিতে যারা এ যুক্তি পেশ করে যে, কুরআন অনুসারে ইসলামে জুমু'আর ছুটি নেই তারা ভুল কথা বলে। সপ্তাহে যদি একদিন ছুটি করতে হয় তবে মুসলমানদের জুমু'আর দিনে করা উচিত, যেমন ইহুদিরা শনিবার ও খ্রিস্টানরা রবিবারে করে থাকে।

৯. এ রকম অবস্থায় 'আশা করা যায়' ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলার (মাআয আল্লাহ) কোনো সন্দেহ আছে; বরং আসলে এটা শাহী বর্ণনার ধরন। যেমন কোনো দয়ালু প্রভু নিজের কর্মচারীকে বলে, 'তুমি অমুক খেদমত আঞ্জাম দাও, সম্ভবত এর দ্বারা তোমার পদে উন্নতি পাবে।' এর মধ্যে এক গোপন ওয়াদা থাকে, যার আশায় কর্মচারী আন্তরিক আগ্রহে ও উৎসাহের সঙ্গে সেই খেদমত আঞ্জাম দেয়।

১০. এটা মদীনার প্রথম যুগের ঘটনা, সিরিয়া থেকে একটি ব্যবসায়ী দল ঠিক জুমু'আর নামাযের সময় এসেছিল; বস্তির লোকদেরকে তাদের আগমন সংবাদ জানানোর জন্য তারা ঢোল বাজাতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (স) সে সময় খুতবা দিচ্ছিলেন। ঢোল-শহরতের শব্দ শুনে অধীর হয়ে বারো জন ছাড়া বাকি সব লোক কাফেলার দিকে দৌড়ে যায়।

১১. সাহাবীগণের দ্বারা যে ত্রুটি ঘটেছিল, এখানে তার ধরন কী ছিল তা বোঝা যায়। যদি এতে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের দুর্বলতা ও আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশি পছন্দ করার দোষ দেওয়া হতো তাহলে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ, ধমকি ও তিরস্কারের ধরন অন্যরূপ হতো। কিন্তু যেহেতু সেখানে এরূপ কোনো খারাবি ছিল না; বরং যাকিছু ঘটেছিল তা তরবিয়াতের (শিক্ষার) অভাবের জন্যে ঘটেছিল, এজন্য প্রথমে শিক্ষাদানের নিয়মে জুমু'আর শিষ্টাচার নির্দেশ করা হয়েছে। তারপর ঐ ত্রুটি নির্দেশ করে অভিভাবকের মতো বোঝানো হয়েছে যে, জুমু'আর খুতবা (ভাষণ) শোনার ও জুমুআর নামায আদায় করার জন্য আল্লাহর কাছে যাকিছু তোমরা প্রতিদান পাবে, তা এই দুনিয়ার ব্যবসায় ও খেল-তামাশার চেয়ে অনেক বড় ও ভালো।

১২. অর্থাৎ, এ দুনিয়ায় বাহ্যিক দিক দিয়ে যে কেউই জীবিকা দানের মাধ্যম হোক না কেন, তাদের সকলের চেয়ে উত্তম জীবিকাদাতা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

৬৩. সূরা মুনাফিকূন

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'মুনাফিকূন' শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ভূমিকা এ সূরায় আলোচনা করার কারণে সূরার নামের সাথে আলোচ্য বিষয়েরও মিল রয়েছে।

নাযিলের সময়

একটি সামান্য ব্যক্তিগত ঝগড়াকে কেন্দ্র করে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে লড়াই লাগানোর উদ্দেশ্যে মুনাফিকসরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের যে ষড়যন্ত্রের ঘটনা এ সূরার ৭ ও ৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের পরপরই ঘটেছিল। ঐ যুদ্ধ হিজরী ৬ সালে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এ সূরাটি হয় যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে, আর না হয় মদীনায় ফিরে আসার সাথে সাথেই নাযিল হয়েছে; আর ঐ দুটো আয়াত প্রমাণ করে যে, মদীনায় পৌঁছার পরই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার প্রথম রুকূ'র সবটুকুতেই মদীনার মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুনাফিকদের ঐ আচরণের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ভূমিকা সহজে বোঝা যায়।

মদীনার গোত্রগুলোর মধ্যে আউস ও খাযরাজ নামক গোত্র দুটোই সবচেয়ে বড় ছিল। তাদের মধ্যে গোত্রীয় লড়াই লেগেই থাকত। উভয় পক্ষ দীর্ঘ লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে শান্তিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাইকে বাদশাহ মেনে নিয়ে মিলেমিশে থাকার ফায়সালা করেছিল। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই উভয় গোত্রের নেতারা মুসলমান হয়ে যাওয়ায় রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল। বাদশাহ হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ নিয়েই আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজের নেতৃত্ব রক্ষার আশায় ইসলাম গ্রহণ করল। যখন সে বুঝতে পারল যে, তার বাদশাহী পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন সে ইসলামের দুশমনদের পক্ষে মুনাফিকদের নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাদের এ ভূমিকাই এ সূরার প্রথম রুকূ'র আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় রুকূ'তে মুসলমানদেরকে খাঁটি ঈমানদার হিসেবে জীবন যাপন করার জন্য সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের চেয়ে আল্লাহর সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার এবং আল্লাহর মর্জিমতো মাল খরচ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মানুষ ছেলেমেয়ে ও টাকা-পয়সার লোভেই দীনের দায়িত্বে অবহেলা করে এবং দুনিয়ার স্বার্থে মুনাফিকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই মুনাফিকী আচরণ থেকে বাঁচার জন্যই এখানে মুসলমানদেরকে নসীহত করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে মুনাফিকদের প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, তারা মুখে ঈমান আনার দাবি করলেও আসলে এ দাবি মিথ্যা। মুসলমানরা যাতে তাদেরকে ঈমানদার বলে স্বীকার করে নেয় সে উদ্দেশ্যেই মুনাফিকরা কথায় কথায় কসম খায়। সে সময় মুসলমানদের সাথে কাফিরদের লড়াই চলছিল। তাই কাফির বলে পরিচয় পেলে মুসলমানদের হামলা থেকে বাঁচা যাবে না জেনেই মুনাফিকরা কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত।

মুনাফিকরা নিজেরা তো আল্লাহর পথ থেকে ফিরে থাকতই, অন্যদেরকেও ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। অন্তরের দিক থেকে কাফির হওয়া সত্ত্বেও ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুখে ঈমানদার বলে দাবি করে এরা যে চরম অন্যায় করেছে, এর ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ধোঁকাবাজরা আর ঈমান আনার যোগ্য হয় না। চরম কাফিরও একসময় ঈমান আনতে পারে; কিন্তু মুনাফিকদেরকে আল্লাহ সে তাওফীক দেন না।

৪-৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের ধোঁকাবাজির খোলস খুলে দেওয়া হয়েছে। এরা দেখতে বেশ সুপুরুষ ও সুন্দর বেশ-ভূষায় সেজে থাকে এবং এমন চমৎকার করে কথা বলে যে, শুনতে বেশ ভালো লাগে। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের আসল নমুনা ছিল এমনই। এরা যত ভালো কথাই বলুক, আসলে এরা ইসলামের পাকা দুশমন। এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার, যাতে ধোঁকা দিতে না পারে। বাইরে বন্ধু সেজে থাকলেও আসলে মনের দিক দিয়ে দুশমন হওয়ার কারণেই এরা সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে, না জানি কখন ধরা পড়ে যায়।

কোনো সময় তাদের মুনাফিকী ধরা পড়লে মুসলমানরা তাদেরকে রাসূল (স)-এর কাছে মাফ চাওয়ার পরামর্শ দিলে তারা দেমাগ দেখাত এবং মাফ চাওয়াকে অপমান মনে করত। তাই ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে মুনাফিকদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। সূরা তাওবার ৮০ নং আয়াতে আরও কড়া ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় মানুষ হেদায়াত পাওয়ারও যোগ্য নয়, ক্ষমারও হকদার নয়।

৭ ও ৮ নং আয়াতে এক মুহাজির ও এক আনসারের মধ্যে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীরা যেসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছিল তা উল্লেখ করে এর সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে।

বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধে বিজয়ের পর মদীনায় ফেরার পথে এক জায়গায় কূপের পানি নিয়ে এক মুহাজির ও এক আনসারের মধ্যে ঝগড়া হয়। মুহাজির আনসারকে লাথি মারার পর ঐ আনসার তাঁর গোত্রের লোকদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ঐ মুহাজিরও অন্যান্য মুহাজিরদেরকে ডাকতে থাকেন।

আবদুল্লাহ বিন উবাই সুযোগ বুঝে আনসারদেরকে উসকে দেয়। এ অবস্থা দেখে মুহাজিরদের মধ্য থেকে কিছু লোক এগিয়ে আসে। মারামারির উপক্রম হলে হৈচৈ শুনে স্বয়ং রাসূল (স) হাজির হন এবং মুসলমানের পরিচয় ভুলে গোত্রীয় ভাষায় মারামারির জন্য ডাক দেওয়াকে জাহিলিয়াতের পরিচায়ক বলে ঘোষণা করেন। তখন ঐ আনসার তাঁর মুহাজির ভাইকে মাফ করে দেন এবং বিষয়টা এভাবে মিটমাট হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় সে আরো অসন্তুষ্ট হয়ে তার অনুগত লোকদের মধ্যে এমন দুটো কথা বলাবলি করতে থাকল, যা এ দুটো আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সে এবং তার সমর্থকরা বলতে থাকল, 'হে মদীনাবাসী! তোমরা যদি মক্কার এ কাঙ্গালদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য না কর তাহলে এরা তাদের নেতাকে ছেড়ে চলে যাবে।' সে এ কথাও প্রচার করতে লাগল যে, 'এবার মদীনায় পৌঁছার পর আমরা এসব ছোট লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেব।' এসব ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা ঈমানদার আনসারগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। এমনকি আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ছেলে (তাঁর নামও) আবদুল্লাহ (রা) মদীনার নিকট পৌঁছার পর তলোয়ার দিয়ে পিতার পথ রোধ করে বললেন, 'আপনি রাসূল (স)-কে মদীনা থেকে বের করে দিতে চান? এখন আপনাকে মদীনায় ঢুকতেই দেব না। ঢুকতে হলে রাসূল (স)-এরই অনুমতি লাগবে।' তখন অপমানিত অবস্থায়ই রাসূল (স)-এর অনুমতিতে সে মদীনায় যেতে পারল।

এ দু আয়াতের শেষাংশে উবাইয়ের ঐ দুটো কথার প্রতিবাদ করে আল্লাহ তাআলা সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রুকূ'

৯-১১ নং আয়াতে ঈমানদারদেরকে মুনাফিকীর রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দুটো মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের মহব্বত যেন আল্লাহকে ভুলিয়ে না দেয়। এ দুটোর কারণেই মানুষ আল্লাহর নাফরমান হয়ে থাকে। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো পরিবার ও সম্পদের সাথে সম্পর্ক রাখা ইবাদতের মধ্যেই গণ্য। আল্লাহর দেওয়া সীমার বাইরে এসবের প্রতি আকর্ষণ ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

পানি ছাড়া মানুষের জীবন আচল বিধায় বলা হয়, 'পানির অপর নাম জীবন'; কিন্তু এ পানিতে ডুবেই আবার মানুষ মরে। যে পরিমাণ পানি জীবন বাঁচায়, এর বেশি হলেই মরণ। সূরা কাহ্‌ফের ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'মাল ও সন্তান দুনিয়ার জীবনের শোভা'; কিন্তু যদি মাল ও সন্তানকে আল্লাহর চেয়েও বেশি মহব্বত করা হয় তাহলেই ঈমানের মৃত্যু।

এ সীমা ঠিক রাখার জন্য ১০ নং আয়াতে আল্লাহর মর্জিমতো মাল খরচ করতে আদেশ করা হয়েছে। শেষ দুটো আয়াতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি সময় থাকতে আল্লাহর এ আদেশ পালন করা না হয় তাহলে মৃত্যুর সময় 'হায় আফসোসে' কোনো লাভ হবে না। মৃত্যু ঠিক সময়েই আসবে। তখন হায়াত বাড়ানোর দাবি জানানো অর্থহীন। আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, হায়াত বাড়িয়ে দিলেও আগের অভ্যাস বদলাবে না।

সূরা মুনাফিকূন

১১ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে নবী!) যখন এ মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।' আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল; কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এ মুনাফিকরা চরম মিথ্যুক।[১]

إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ①

২. এরা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে এবং এভাবে এরা আল্লাহর পথ থেকে নিজেরাও ফিরে আছে, অন্যদেরকেও ফিরিয়ে রাখছে। এরা যাকিছু করছে তা কতই না মন্দ!

اِتَّخَذُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ②

৩. এসব কিছু এজন্যই যে, এরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। তাই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। এখন এরা কিছুই বোঝে না।[২]

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ③

১. অর্থাৎ, যে কথা তারা নিজেদের মুখে বলছে তা তো নিজ স্থানে সত্য, কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে তাদের বিশ্বাস তা নয়। তাই তারা আপনার রাসূল হওয়া সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দান করছে তাদের সে কথায় তারা মিথ্যুক।

২. এ আয়াতে ঈমান আনার অর্থ মুখে ঈমানের দাবি করে মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়া। আর 'কুফর' করার অর্থ হচ্ছে, অন্তরে ঈমান না আনা এবং মুখে ঈমানি দাবি করার আগে যে কুফরীর উপর তারা ছিল, তার উপরই কায়েম থাকা। আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো অন্তরে মোহর মেরে দেওয়ার অর্থ যেসব আয়াতে সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে বলা হয়েছে, এ আয়াতটি তার মধ্যে একটি। এ মুনাফিকদের এরূপ অবস্থা এ কারণে হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছিলেন বলে ঈমান তাদের মধ্যে প্রবেশ করতেই পারেনি এবং তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক থেকে গিয়েছিল। বরং আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে সেই সময় মোহর মেরে দিয়েছিলেন, যখন তারা ঈমান আনার দাবি করা সত্ত্বেও কুফরীর উপর কায়েম থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের কাছ থেকে সঠিক ঈমানের সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে ঐ মুনাফিকীর (কপটতার) সুযোগ দান করা হলো, যা তারা নিজ ইচ্ছায় গ্রহণ করেছে।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

৪. তোমরা তাদেরকে দেখলে তাদের চেহারা তোমাদেরকে মুগ্ধ করবে। আর যখন তারা কথা বলে তখন তোমাদের শুনতেই ইচ্ছা করবে। কিন্তু আসলে এরা খোদাই করা কাঠ মাত্র (যা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে)।[৩] প্রতিটি জোরদার আওয়াজকে এরা তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা পাকা দুশমন। এদের থেকে হুঁশিয়ার থাকো। তাদের উপর আল্লাহর গযব পড়েছে। এদেরকে উল্টো কোন্ দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?[৪]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۝

৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘এসো, যাতে আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করেন’, তখন তারা মাথা ঝাঁকায়। তোমরা দেখতে পাও যে, তারা অহমিকা করে আসতে বিরত থাকে।[৫]

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

৬. (হে রাসূল!) আপনি তাদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করুন আর না-ই করুন, তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না। আল্লাহ ফাসিকদেরকে কখনো হেদায়াত দেন না।

৩. অর্থাৎ, যারা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে এরা মানুষ নয়; বরং কাঠের পুতুল। এদেরকে কাঠের সঙ্গে তুলনা করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, এরা চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়ে একেবারেই মরা; অথচ চরিত্র ও নৈতিকতাই মানুষের সারবস্তু। আবার দেয়ালে ঠেস দেওয়া খোদাই করা কাঠের সাথে তাদেরকে তুলনা করে এ কথাও বোঝানো হয়েছে যে, এরা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। কেননা, কাঠ তখনই কাজে লাগে, যখন তা কোনো ছাদ বা দরজা কিংবা কোনো ফার্নিচারে লাগানো হয়। দেয়ালে সাজানো খোদাই করা কাঠ কোনো কাজেরই নয়।

৪. তাদেরকে ঈমান থেকে কপটতার দিকে কে ফিরিয়ে নেয় সে কথা বলা হয়নি। পরিষ্কাররূপে এ কথা না বলায় এ কথাই বোঝা যায় যে, তাদের এই উল্টা চালের একটি মাত্র কারণ নয়, বরং এর মধ্যে বহু রকমের কারণ রয়েছে। শয়তান আছে, খারাপ বন্ধু আছে, তাদের নিজেদের নাফসের খাহেশ আছে। কারো স্ত্রী তাকে এ পথে টানে, কারো সন্তান তাকে বিপথে নেয়, কারো দুষ্ট আত্মীয়-কুটুম্বরা তাকে কুপথ দেখায় এবং কারো মনের হিংসা-বিদ্বেষ ও অহঙ্কারই তাকে সেই পথে পরিচালিত করেছে।

৫. অর্থাৎ, রাসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য না এসেই তারা ক্ষান্ত হতো না; বরং এ কথা শুনে অহঙ্কার ও গর্বে তারা মাথা ঝাঁকাত এবং রাসূলের কাছে আসা ও মাফ চাওয়াকে নিজেদের পক্ষে অপমানকর মনে করে আপন জায়গায় জমে বসে থাকত। এটাই তাদের মুমিন না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৭. এরাই ঐ লোক যারা বলে, 'রাসূলের সাথিদের জন্য খরচ করা বন্ধ করো, যাতে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।' অথচ আসমান-জমিনের ধনভাণ্ডারের মালিক আল্লাহ; কিন্তু এ মুনাফিকরা তা বোঝে না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۗ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧

৮. এরা বলে, 'আমরা মদীনায় পৌঁছার পর যে সম্মানিত, সে নীচ লোককে অবশ্যই বের করে দেবে।' অথচ সম্মান তো শুধু আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের জন্যই। কিন্তু এ মুনাফিকরা তা জানে না।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۗ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

রুকূ' ২

৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩

১০. আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে তোমরা খরচ করো। মৃত্যুর সময় সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না, তাহলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম।'

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠

১১. অথচ যখন কারো (কাজ করার) সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ কখনো কোনো লোককে আর সময় দেন না। আর তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

৬৪. সূরা তাগাবুন

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার নবম আয়াতের 'তাগাবুন' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, সূরাটি মাদানী যুগে নাযিল হয়েছে। ভাষা ও আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে মাক্কী যুগের সূরার সাথে কোনো কোনো অংশের মিল দেখে এর একাংশ মাক্কী বলে কেউ কেউ ধারণা করেছেন। হিজরতের পরপরই হয়তো সূরাটি নাযিল হয়েছে, যার ফলে মাক্কী সূরার কিছু বৈশিষ্ট্য এ সূরায় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়

ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষাই এ সূরার আলোচ্য বিষয়। প্রথম চার আয়াতে গোটা মানবজাতি, মাঝখানের ছয় আয়াতে কাফিরদেরকে এবং বাকি আটটি আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতের বক্তব্য বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের বহু সূরার শুরুতে পাওয়া যায়। কোথাও 'সাব্বাহা' দিয়ে শুরু হয়েছে এবং কোথাও 'ইউসাব্বিহু' আছে। প্রথমটি অতীত বোঝায় এবং দ্বিতীয়টি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বোঝায়।

এ জাতীয় সব আয়াতের মূল বক্তব্য একই। এতে বলা হয়েছে, গোটা সৃষ্টিজগৎ এ কথা ঘোষণা করছে যে, সবকিছু এক আল্লাহরই গুণ গাইছে। যে আল্লাহ আকাশ-পাতাল সৃষ্টি করেছেন তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। তাই সৃষ্টিলোকে কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি দেখা যায় না। সূরা মুল্‌কে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে, 'সৃষ্টির কোথাও কি সামান্য দোষও দেখতে পাও?'

সূরার শুরুতে এ ধরনের আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, কুরআন ঐ আল্লাহই নাযিল করেছেন, যিনি আসমান-জমিন ও এর মধ্যে যাকিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। তাই কুরআনে যা বলা হয়েছে তা সবই সঠিক ও নির্ভুল। এতে কোনো দোষ-ত্রুটি বের করতে পারবে না।

২-৪ নং আয়াতে গোটা মানবজাতিকে ডেকে স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ এ তিনটি আয়াতে বলেন :

১. তোমাদের সবাইকে আমি ভালো ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে ভালো বা মন্দকে গ্রহণ করতে আমি বাধ্য করিনি। এ বিষয়ে তোমাদেরকে স্বাধীনভাবে ফায়সালা করার ইখতিয়ার দিয়েছি। তাই তোমরা নিজের ইচ্ছাতেই কেউ ঈমান এনে থাক, আর কেউ কুফুরীতে লিপ্ত থাক। তোমরা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর এবং যে রকম আমলই কর, সবই আমি দেখছি।

২. আমি আসমান ও জমিন বিনা উদ্দেশ্যে এবং খেল-তামাশা করার জন্য বানাইনি। আমি সত্যসহ এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে এ বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকেও অনর্থক সৃষ্টি করিনি। যেমন খুশি তেমনি দুনিয়ার জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে এত সুন্দর করে তৈরি করা হয়নি। তোমাদেরকে আমার কাছে আবার ফিরে আসতে হবে।

৩. তোমরা দুনিয়াতে যাকিছু করছ তা প্রকাশ্যে কর আর গোপনে কর, সবই আমি জানি। এমনকি কোন্ কাজ কী নিয়তে করছ সে কথাও আমার অজানা থাকে না। তোমাদের মনের খবরও আমার জানা আছে।

এ তিনটি কথার মাধ্যমে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, দুনিয়ায় দায়িত্বজ্ঞানহীন পশুর মতো জীবন যাপন করা মানুষের সাজে না। মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছার স্বাধীনতা যিনি দিয়েছেন তিনি একদিন এসবের হিসাব অবশ্যই নেবেন।

৫-১০ নং আয়াতে কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে যা বলা হয়েছে তা দুই অংশে ভাগ করলে বুঝতে সহজ হবে :

১. ৫ থেকে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলের প্রতি ঈমান না আনার কারণে তোমাদের আগের জাতিসমূহের কী দশা হয়েছে সেসব কাহিনী তোমরা শোননি? দুনিয়ায় তো তারা তাদের অপকর্মের সাজা পেয়েছেই, মরার পর আরও কঠোর শাস্তি তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

ঐসব জাতির নিকট সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়েই রাসূলগণ এসেছিলেন। 'মানুষ আবার রাসূল হয় কেমন করে'– এ কথা বলেই তারা ঈমান আনল না। তাই আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমার প্রতি ঈমান না আনলে আমার কোনো ক্ষতি হয় না। আমি তাদের প্রশংসার কাঙ্গাল নই। ঈমান না আনার পরিণাম তারাই ভোগ করেছে।

তোমরাও আমার রাসূলের সাথে ঐ রকম আচরণই করছ। তোমরা যদি ঈমান না আন তাহলে ঐ পরিণামই ভোগ করবে।

আগের কাফিররাও তোমাদের মতোই আখিরাতকে অস্বীকার করেছিল। তোমরা জেনে রাখ, মৃত্যুর পর অবশ্যই তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে এবং দুনিয়ায় যা কিছু করছ তার বদলা দেওয়া হবে। এ কাজ আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

২. ৮ থেকে ১০ নং আয়াতে কাফিরদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত এবং ঈমান না আনার মারাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে বস্তুগত সুখ-সুবিধা ও লাভ-ক্ষতির যে হিসাব করে মানুষ চলে তা যে মোটেই স্থায়ী বিষয় নয়, সে বিষয়ে ৯ নং আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার অল্প কয়েকদিনের জীবনে কে কতটুকু পেল আর কী হারালো তা মোটেই শেষ কথা নয়। আখিরাতেই লাভ-ক্ষতির চূড়ান্ত হিসাব হবে কে হারল, আর কে জিতল।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১-১৮ নং আয়াতে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে এমন মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যা আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ উপদেশগুলোকে ভালোভাবে বোঝার জন্য এ আটটি আয়াতকে কয়েকটি পয়েন্টে ভাগ করে আলোচনা করা হচ্ছে :

১. ১১ নং আয়াতে ঈমান, ১২ নং আয়াতে আমল ও ১৩ নং আয়াতে তাওয়াক্কুলের হেদায়াত দেওয়া হয়েছে।

ঈমানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনে সব সময় এক অবস্থা থাকে না। বিপদ-মুসিবতে পড়লে মানুষ অস্থির হয়ে ঈমানের খেলাফ কাজ করে ফেলে। তাই এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আপদ-বিপদ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসতে পারে না। বিষয়টা এমন নয় যে, মুসিবত এসে গেল আর আল্লাহ ফিরিয়ে রাখতে পারল না। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর মর্জি অনুযায়ীই বিপদ আসে। বিপদ আসে পরীক্ষার জন্য। আর পরীক্ষা হয় প্রমোশনের জন্য। আপদ-বিপদ মুমিনের জীবনে উন্নতিরই সোপান।

হিজরতের পরপরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। যারা হিজরত করে বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, জমি-জমা ও বিষয়-সম্পত্তি ফেলে মদীনায় নিঃস্ব অবস্থায় পৌঁছলেন তাদের উপর যে এটা কত বড় মুসিবত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঈমানের কারণেই এ মুসিবতে তারা দিশেহারা হননি। ঈমান এমন এক সম্পদ, যা মুসিবতের সময়ও ঠাণ্ডা মাথায় ও সুস্থির মনে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। ঈমানের অভাব হলে বিচলিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত করারই প্রবল আশঙ্কা থাকে। মুসিবতের সময় ঈমানদারের মনে এ সান্ত্বনাবোধ থাকে যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কল্যাণ রেখেছেন।

১২ নং আয়াতে আমলের বিষয়ে বলা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবিদার তাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমমতো কাজ করা। যদি কেউ এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সে-ই দোষী সাব্যস্ত হবে। তাদের আমলের জন্য রাসূল (স) দায়ী হবেন না।

১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সকল দায়িত্ব পালন করাই ঈমানদারদের কর্তব্য। যেহেতু একমাত্র আল্লাহই মনিব ও মালিক এবং সব কিছু তাঁরই মর্জিতে হয়ে থাকে, সেহেতু মুমিন নিশ্চিন্তভাবেই আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিয়ে তৃপ্তিবোধ করে। এমনকি সে বিপদ-মুসিবতের মধ্যেও আল্লাহর উপর ভরসা করে পেরেশানি থেকে রক্ষা পায়।

আল্লাহর উপর সঠিক ঈমান ও ভরসা না থাকলে মুসিবতের সময় মানুষ অদ্ভুত আচরণ করে বসে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যেখানে-সেখানে ধরনা দেয়, যেকোনো অপমান বরদাশত করে নেয়, হীনতম কাজও করে বসে, আল্লাহকে পর্যন্ত গালি দিয়ে ফেলে, এমনকি আত্মহত্যা করতেও পরওয়া করে না।

এর বিপরীতে যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে এ কথা মানে যে, সবই আল্লাহর হাতে এবং তিনিই শুধু মুসিবত দূর করতে পারেন, আল্লাহ তাকে সবর ও হিম্মত দান করেন। কোনো বড় বিপদই তাকে বিপথে নিতে পারে না। শত যুলুম-নির্যাতনও বাতিলের নিকট মাথা নত করাতে পারে না। প্রতিটি মুসিবত একসময় রহমতে পরিণত হয়।

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটা বড়ই আজব। আল্লাহ তার ব্যাপারে যে ফায়সালাই করেন তা তার জন্য ভালোই হয়ে থাকে। সে মুসিবতের সময় সবর করার কারণে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। ভালো অবস্থা হলে সে শুকরিয়া আদায় করে– এটাও তার জন্য ভালোই হয়। মুমিন ছাড়া অন্য কারো অবস্থা এমন হয় না।' (বুখারী ও মুসলিম)

২. ১৪ থেকে ১৬ নং আয়াতে ঈমানদারদেরকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এসব দিক দিয়েই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এসবের মহব্বতেই মানুষ আল্লাহর হুকুম অমান্য করে। তাই ঈমানদারদেরকে এ বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রী ও সন্তানাদি যদি ঈমানের দিক দিয়ে সাথী না হয় তাহলে মুমিনের জন্য বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। তারা এমন সব দাবি জানাতে পারে, যা ঈমানের সাথে খাপ খায় না। তাদের চলাফেরা, আচার-আচরণ ঈমানের খেলাফ হলে মুমিনের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

তারা যদি নেক কাজে বাধা দিয়ে মন্দ কাজের জন্য চাপ দেয় এবং ঈমান থেকে ফিরিয়ে রেখে কুফরীর দিকে টানে; অথবা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে ইসলামের দুশমনদের সহযোগী হয়, তাহলেই এসব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কতক মুহাজির পরিবার এমনও ছিল, যাদের স্ত্রী ও পুত্রদের মধ্যে সবাই তখনও ঈমান আনেনি। তাই তাদের সম্পর্কে এখানে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

তবে এ সত্ত্বেও তাদেরকে দুশমন হিসেবে গণ্য না করে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার দ্বারা সংশোধন করতে হবে এবং সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৬ নং আয়াতে মুমিনদেরকে অভয় দান করা হয়েছে যে, তোমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। আল্লাহকে যেমন ভয় করে চলা উচিত, তেমনি ভয় করে চলার সাধ্যমতো চেষ্টা করতে থাকো। এ ব্যাপারে যদি তোমরা ইচ্ছাকৃত অবহেলা না কর, তাহলে যা করতে অক্ষম হও তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

৩. ১৭ নং আয়াতে আল্লাহর পথে খরচ করতে আদেশ করা হয়েছে। মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং কর্তব্য মনে করেই খরচ করে। সে আল্লাহকে ধার দিচ্ছে বলে কখনো মনে করে না। কিন্তু আল্লাহ মেহেরবানী করে এ দানকে 'করযে হাসানা' হিসেবে গণ্য করেন। কারণ, তিনি এ দানের বদলে একে বহু গুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবেন। আর এ দানের ফলে তার বহু ত্রুটি মাফ করে দেবেন। এভাবেই আল্লাহ মুমিনের নেক আমলের মূল্য দিয়ে থাকেন।

সবশেষে ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, যেহেতু তিনি সবকিছু জানেন, সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি হিকমতেরও অধিকারী, সেহেতু মুমিনদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে, তারা তাদের আমলের উপযুক্ত সুফল অবশ্যই পাবে।

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

সূরা তাগাবুন

১৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

১. আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে সবাই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তাঁরই বাদশাহী এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান।[১]

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

২. তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির হয়, আবার কেউ মুমিন হয়। তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ তা দেখছেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৩. তিনি আসমান ও জমিনকে হকের উপর সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। তারপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

৪. আসমান ও জমিনের প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি জানেন। তোমরা যা গোপন কর ও প্রকাশ কর[২] সবই তিনি জানেন। আল্লাহ অন্তরের অবস্থাও জানেন।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤

৫. তোমাদের কাছে কি ঐ লোকদের কোনো খবর পৌঁছেনি, যারা আগে কুফরী করেছে এবং তাদের কুকর্মের সাজা ভোগ করেছে? তাদের জন্য আরো কঠোর শাস্তি রয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا

৬. তাদের এমন পরিণাম হওয়ার কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তারা বলেছিল, 'মানুষ কি আমাদেরকে হেদায়াত

১. অর্থাৎ, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কোনো শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে রোধ করতে পারে না।

২. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'তোমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে যা কিছু কর।'

وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

দেবে?' এভাবে তারা মানতে অস্বীকার করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তখন আল্লাহও তাদের কোনো পরওয়া করলেন না। আল্লাহর তো কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি কারো প্রশংসারও ধার ধারেন না।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

৭. কাফিররা দাবি করে বলেছে যে, মরার পর কখনো আবার তাদেরকে ওঠানো হবে না। তাদেরকে বলো, 'আমার রবের কসম, তাদেরকে অবশ্যই উঠানো হবে।[৩] তারপর তোমাদেরকে নিশ্চয়ই জানিয়ে দেওয়া হবে যে, তোমরা (দুনিয়ায়) কী করে এসেছ। আর এমনটা করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।'

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

৮. তাই ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং ঐ নূরের উপর, যা আমি নাযিল করেছি।[৪] তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ

৯. (এ বিষয়ে তোমরা ঐদিন টের পাবে) যখন একত্র করার দিন তোমাদের সবাইকে তিনি একত্র করবেন।[৫] সে দিনটি হবে

৩. এখানে এ প্রশ্ন ওঠে যে, একজন আখিরাতে অবিশ্বাসীকে আপনি পরকালের আগমনের সংবাদ কসম খেয়ে দিন বা কসম না খেয়ে দিন, তাতে কী আসে-যায়? যখন সে ঐ জিনিস মানেই না, তখন আপনি শপথ করে বলছেন বলে সে কেমন করে তা মেনে নেবে? এর উত্তর হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (স) যাদেরকে সম্বোধন করেছিলেন তারা ছিল সেইসব লোক, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা ভালোভাবে জানত যে, তিনি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি। সুতরাং তারা মুখে তাঁর বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা অপবাদ রচনা করতে থাকুক না কেন, নিজেদের মনে তারা ধারণাই করতে পারত না যে, এরূপ খাঁটি মানুষ কখনো আল্লাহর শপথ করে এমন কথা বলতে পারে, যার সত্য হওয়া সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে।

৪. এখানে পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্টতই এ কথা বোঝা যায় যে, 'নূরের প্রতি যা আমরা নাযিল করেছি' কথাটির অর্থ কুরআন। আলোক (নূর) যেমন নিজেই প্রকাশ পায় ও চারপাশে সকল জিনিসকে প্রকাশ করে দেয়, যা অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তেমনি কুরআন এমন একটি বাতি, যার সত্যতা খুবই স্পষ্ট এবং যার আলোকে মানুষ ঐ সব সমস্যা বুঝতে ও তা সমাধান করতে পারে, যা বোঝার জন্য তার নিজের জ্ঞানের উপায়-উপকরণ ও বুদ্ধি মোটেই যথেষ্ট নয়।

৫. 'ইজতেমার (একত্রীকরণের) দিন'-এর অর্থ হাশরের দিন। সবাইকে একত্র করার অর্থ– সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তাদের সকলকে একই সময়ে আবার জীবিত করে একত্রিত করা।

سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

তোমাদের একে অপরের মধ্যে হার-জিতের দিন।[৬] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে ও নেক আমল করছে আল্লাহ তার গুনাহ ঝেড়ে ফেলবেন এবং তাকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনা বহমান রয়েছে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। এটাই বিরাট কামিয়াবী।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠

১০. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা দোযখের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

রুকূ' ২

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝١١

১১. কোনো মুসীবত কখনো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার মনকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٢

১২. আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো; কিন্তু যদি তোমরা আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রাসূলের উপর স্পষ্ট সত্য পৌছানো ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٣

১৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তাই আল্লাহর উপরই ঈমানদারদের ভরসা রাখা উচিত।[৭]

৬. অর্থাৎ, আসল হার-জিত হাশরের দিন হবে। সেখানে গিয়ে জানা যাবে, আসলে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর কে লাভবান হয়েছে; আসলে কে ঠকেছে ও কে বুদ্ধিমান ছিল; কে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজি এক মিথ্যা কারবারে লাগিয়ে নিজেকে ফতুর করে দিয়েছে আর কে নিজের শক্তি-সামর্থ্য, চেষ্টা, সময় ও সম্পদকে লাভজনক ব্যবসায়ে লাগিয়ে সকল মুনাফা লুটে নিয়েছে, যা প্রথম ব্যক্তিও অর্জন করতে পারত; যদি সে দুনিয়ার আসল পরিচয় জানতে গিয়ে ধোঁকা না খেত।

৭. অর্থাৎ, প্রভুত্বের সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হাতে। তোমার ভাগ্যকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বানানোর আদৌ কোনো ক্ষমতা অন্য কারো নেই। সুসময় আসতে পারে, তিনিই যদি তা নিয়ে আসেন; দুঃসময় কাটতে পারে, তিনিই যদি তা কাটিয়ে দেন। সুতরাং খাঁটি মনে যে ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু বলে মান্য করে তার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই যে, সে আল্লাহর উপর

১৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কতক তোমাদের দুশমন রয়েছে। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। যদি তোমরা ক্ষমাশীল ও সহনশীল হও এবং তাদেরকে মাফ করে দাও, তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান আছেনই।[৮]	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ⑭
১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তো এক পরীক্ষা। আর আল্লাহরই নিকট বিরাট প্রতিদান রয়েছে।	إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ⑮
১৬. তাই তোমাদের যতটা সাধ্য আছে আল্লাহকে ভয় করে চলো, শোন ও আনুগত্য করো এবং (মাল) খরচ করো। এটা তোমাদের জন্যই ভালো। যারা অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই কামিয়াব।	فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ⑯
১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহ গুণের কদর করেন এবং তিনি বড়ই সহনশীল।	إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ⑰
১৮. তিনি উপস্থিত ও অনুপস্থিত প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই জানেন, তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।	عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ⑱

ভরসা করে দুনিয়ায় একজন খাঁটি মুমিনের ন্যায় এ মযবুত বিশ্বাসের সাথে নিজের কর্তব্য পালন করে যাবে যে, সকল অবস্থায় কল্যাণ শুধু সেই পথেই আছে, যে পথ আল্লাহ তাআলা দেখিয়েছেন।

৮. অর্থাৎ, পার্থিব সম্বন্ধের দিক দিয়ে যদিও এরা তারাই, যারা মানুষের কাছে প্রিয়তম; কিন্তু দীনের দিক দিয়ে এরা তোমাদের শত্রু। এ শত্রুতা এই হিসেবে হতে পারে যে, তারা তোমাদেরকে সৎ ও নেক কাজে বাধা দেয় ও অসৎ কাজের দিকে টানে; অথবা এই হিসেবে হতে পারে যে, তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে ফেরাতে চায় ও কুফরীর দিকে ডাকে; অথবা এই হিসেবে হতে পারে যে, তাদের সহানুভূতি কাফিরদের প্রতি থাকে। যাই হোক, এসব এমন ব্যাপার, যার প্রতি তোমাদের সতর্ক থাকা জরুরি। এদের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে নিজেদের পরিণাম বিনষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তোমরা তাদেরকে শত্রুজ্ঞান করে তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে থাকবে; বরং এর মর্ম এই যে, তাদেরকে সংশোধন করতে না পারলেও অন্ততপক্ষে নিজেদেরকে বিপথে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

৬৫. সূরা তালাক

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

'তালাক' এ সূরার শুধু নামই নয়, এর আলোচ্য বিষয়ও তালাক। কেননা, এখানে তালাকের বিধানই বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূরা বাকারার পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরা বাকারাতেই তালাকের নিয়ম প্রথম জানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে বিস্তারিত বিধান না থাকায় এবং স্পষ্টভাবে না জানার কারণে তালাকের ব্যাপারে মানুষের ভুল হচ্ছিল। এ সূরায় তালাকের সংশোধিত ও পরিপূর্ণ বিধান নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে সূরা বাকারার ২২৮ থেকে ২৩০ ও ২৩৪ নং আয়াতে এবং সূরা আহযাবের ৪৯ নং আয়াতে যে বিধান নাযিল হয়েছিল, তা জানা থাকলে আলোচ্য সূরাটি বুঝতে সহজ হবে। সেখানে যে নিয়ম দেওয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপ–

১. পুরুষ তার স্ত্রীকে সর্বোচ্চ তিন বার তালাক দিতে পারে।

২. এক বা দু'বার তালাক দিলে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে; কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্বামী ও স্ত্রী ইচ্ছা করলে আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারে।

৩. স্বামী যদি তিন বার তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাদের মধ্যে আর বিয়ে হতে পারবে না। অবশ্য এ মহিলা যদি অন্য লোকের সাথে বিয়ের পর সে বিধবা হয় বা তার স্বামী তাকে নিজের ইচ্ছায় তালাক দেয় তাহলে ইদ্দতের পর পূর্বের স্বামীর সাথে আবার বিয়ে হতে পারে।

৪. যে মহিলার হায়েয হয় সে যদি স্বামীর সাথে রাত যাপন করে থাকে তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন হায়েয। অর্থাৎ তালাকের পর তিনটি হায়েয শেষ হতে হবে।

৫. এক তালাক বা দু'তালাকের বেলায় তিনটি হায়েয পার হওয়ার পূর্বে সে স্বামীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে বলেই স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে; কিন্তু তিন তালাকের পর যে ইদ্দত শুরু হয় তাতে এ স্বামীর কোনো অধিকার নেই। এ ইদ্দতের অর্থ হলো, এ ইদ্দত শেষ না হলে অন্য পুরুষ এ মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে না।

৬. যে মহিলা বিয়ের পর স্বামীর সাথে এক রাতও মিলিত হয়নি তাকে তালাক দিলে কোনো ইদ্দত করতে হবে না। ইদ্দত ছাড়া আবার তার বিয়ে হতে পারে।

৭. যে মহিলার স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত হলো চার মাস দশ দিন।

সূরা তালাকে এসব নিয়মের কোনোটাই বদলায়নি। এ সূরাটি দুটো উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে–

১. পুরুষকে তালাকের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যেন সহজে বিয়ে ভেঙে না যায়। আল্লাহ এটা মোটেই পছন্দ করেন না যে, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কিছুদিন জীবন যাপনের পর তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হোক। রাসূল (স) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন কোনো কাজকে হালাল করেননি, যা তালাক থেকেও খারাপ।' অর্থাৎ জায়েয কাজের মধ্যে তালাকই সবচেয়ে খারাপ কাজ। তাই এ সূরায় তালাক দেওয়ার এমন নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে কথায় কথায় তালাক না দেওয়া যায় বা একসাথেই তিন তালাক দেওয়া না হয় বা রাগের মাথায় হঠাৎ করে বিয়ে ভেঙে না দেওয়া হয়। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন নয় যে, যখন খুশি খতম করে দেওয়া যাবে, আবার খেয়াল-খুশিমতো বহাল রাখা চলে। বিবাহবন্ধন কায়েম রাখা ও না রাখার ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ও ধীরে-সুস্থে ফায়সালার দাবি রাখে। তাই তালাক দেওয়ার ভদ্র নিয়ম এ সূরায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যারা আবেগতাড়িত হয়ে তালাক দেওয়ার এ নিয়ম ভঙ্গ করে তারা চরম অসভ্যতা ও বর্বরতারই পরিচয় দেয়।

২. এ সূরার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো তালাকের পূর্ণাঙ্গ বিধান দান করা। সূরা বাকারায় দেওয়া বিধানের পর তালাকের বিষয়ে আরো যত প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে সেসবের সুস্পষ্ট জবাব এ সূরায় দেওয়া হয়েছে, যাতে তালাকের বিধান পূর্ণ হয়।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে কয়েকটি হেদায়াত দেওয়া হয়েছে :

১. তালাক দিলে ইদ্দতের হিসাব ঠিকমতো রাখবে, যাতে ইদ্দত পার হওয়ার আগে ফিরিয়ে নিতে চাইলে হিসাবের গোলমাল না লাগে। ইদ্দতের মধ্যে নিতে চাইলে আবার বিয়ে পড়াতে হবে না; কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন করে বিয়ে হতে হবে। তাই ইদ্দতের হিসাব রাখা খুবই জরুরি।

২. 'ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও' কথাটির অর্থ হলো, এমনভাবে তালাক দাও, যাতে ইদ্দতের হিসাব রাখতে অসুবিধা না হয়। এ দাবি পূরণ করতে হলে–

   ক. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে না। তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত হলো তিন হায়েয। হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে ঐ হায়েয গণনায় ধরা যাবে না। কারণ, তালাক দেওয়ার পর যে হায়েয শুরু হবে তা-ই হিসাবে ধরতে হবে।

   খ. যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করা হয় সে তুহুরেও তালাক দেওয়া যাবে না। হয়তো গর্ভ সঞ্চার হয়ে যেতে পারে, যার ফলে হায়েয বন্ধ থাকবে। এতে ইদ্দতের হিসাব রাখায় সমস্যা দেখা দেবে।

   গ. স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে গর্ভাবস্থায়ও তালাক দিতে পারে। এতেও ইদ্দত গণনা করা সহজ থাকে।

   ঘ. একসাথে তিন তালাক দেওয়া যাবে না। কারণ, তিন তালাকের পর তালাকদাতার জন্য ইদ্দত গণনার দরকারই থাকে না। তার পক্ষে ইদ্দতের মধ্যে বা পরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগই আর বাকি না থাকায় 'ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও' কথাটি তার জন্য খাটেই না।

৩. এক বা দুই তালাকের বেলায় যেহেতু আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে, সেহেতু তালাকের পরও স্বামী ও স্ত্রীর একই ঘরে থাকা উচিত। একে অপরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে হয়তো সহজেই মিলমিশ হয়ে যেতে পারে।

৪. অবশ্য যদি একই ঘরে থাকার ফলে ঝগড়া-ফাসাদ হয় এবং পারিবারিক অশান্তি বেড়ে যায় বা দুই পক্ষের কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে একত্রে না থাকাই উচিত। এ বিষয়ে যে সীমা লঙ্ঘন করবে সেই আল্লাহর নিকট দায়ী হবে।

৫. এক বা দুই তালাকের বেলায় ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হয় সুন্দর পরিবেশে আবার বিয়ে বহাল করে নাও; আর না হয় ভদ্রভাবেই বিয়ে ভেঙে দাও। কোনো ঝগড়া-বিবাদ যেন না হয়। এ উভয় ক্ষেত্রেই দু'জন নিরপেক্ষ সাক্ষী রাখ, যাতে স্বামী ও স্ত্রী যে সিদ্ধান্তই নেয় তা তারা পালন করে চলে এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করলে সাক্ষীদের সাহায্যে সঠিক বিচার করা যায়।

৬. উপরের সব কয়টি হেদায়াতই উপদেশ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, এর কোনোটাই আইন নয়। অর্থাৎ কেউ যদি এসব হেদায়াতকে উপেক্ষা করে তালাক দেয় তাহলে সে আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করল। এসব সীমা লঙ্ঘন করে যদি কেউ তালাক দেয় তবুও তালাক হয়ে যাবে। অবশ্য সীমা লঙ্ঘনের অপরাধের শাস্তি সে পাবে।

এসব উপদেশ অমান্য করে তালাক দেওয়ার বেলায় বিভিন্নভাবে সীমা লঙ্ঘন হতে পারে–

ক. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া।

খ. যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে সে তুহুরেই তালাক দিয়ে ফেলা।

গ. একসাথে তিন তালাক দেওয়া।

ঘ. তালাকের পর বিনা দোষে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া।

ঙ. ইদ্দতের হিসাব ঠিকমতো না রাখা।

চ. ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ভালো নিয়তে ফিরিয়ে না নিয়ে তাকে জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রাখা।

ছ. স্ত্রীকে বিদায় করার সময় লড়াই-ঝগড়া করে তাড়িয়ে দেওয়া।

জ. স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় বা বিদায় করার সময় সাক্ষী না রাখা।

এসব সীমা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও আইনগত তালাক হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। অবশ্য এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, এসব সীমা লঙ্ঘনকারী আল্লাহ ও আখিরাতের উপর সঠিক ঈমান রাখে না। যদি সত্যিকার ঈমান রাখত তাহলে ঐসব উপদেশ পালন করত।

৭. ঐসব উপদেশ পালন করার কারণে তালাকদাতার যে আর্থিক ক্ষতি হবে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে তা পূরণ করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে যে আল্লাহর উপদেশ মেনে চলে তার এটা জানা উচিত যে, আল্লাহ যা করতে চান তা অবশ্যই হয়ে থাকে।

৪ ও ৫ নং আয়াতে কয়েক রকমের মহিলাদের ইদ্দতের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন–

১. যাদের হায়েয শুরু হয়নি বা হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ইদ্দত তিন মাস।

২. যে গর্ভবতী, সন্তান প্রসব করার সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। এ নির্দেশ যারা মেনে চলবে আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন ও তাদেরকে পুরস্কার দেবেন।

৬ ও ৭ নং আয়াতে তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তালাকদাতার উপর তালাকী মহিলার যেসব অধিকার বাকি থাকে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে–

১. ইদ্দতকালে সে মহিলা তালাকদাতার বাড়িতে থাকতে পারবে এবং ভরণ-পোষণ পাবে। যেহেতু ইদ্দত শেষ না হলে সে মহিলার বিয়ে হতে পারে না সেহেতু তালাকদাতাই তাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবে। আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলাকে নিরাশ্রয় হতে দিতে চান না বা অন্য কারো দয়ার ভিখারী হতে বাধ্য করেন না।

২. গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাকদাতাকেই সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের খরচ বহন করতে হবে। কারণ সন্তান তারই। সন্তানের মাকেই যদি দুধ খাওয়াতে হয় তাহলে পিতাকে এর মজুরি দিতে হবে।

অবশ্য এসব খরচ বহন করার ব্যাপারে তালাকদাতা তার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ীই দেবে। তার সাধ্যের অধিক বোঝা আল্লাহ চাপাতে চান না। মহিলার অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। তালাকদাতা তার সঙ্গতি অনুযায়ী দিতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

৮ নং আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াতের সাথে তালাকের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা যা বলতে চেয়েছেন তার সারকথা হলো :

১. আল্লাহ যে বিধান রাসূলের মাধ্যমে পাঠান তা যারা মেনে চলে তারা নিজেদেরই কল্যাণ করে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, যারা রাসূলকে অমান্য করেছে তারা ধ্বংসই হয়েছে। আখিরাতেও তারা এর জন্য চির শাস্তি ভোগ করবে।

২. আল্লাহ তাআলা শেষ নবী হিসেবে যাকে পাঠিয়েছেন তিনি নির্ভুল জ্ঞানের আলো নিয়েই এসেছেন। এ আলো যারা গ্রহণ করতে চায় না তাদের পক্ষে মানবজাতির জন্য শান্তির পথ রচনা করা তো দূরের কথা– বিয়ে, তালাক ও ইদ্দতের মতো বিষয়েও তারা স্থায়ী ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান তৈরি করতে সক্ষম নয়।

৩. যারা সব ব্যাপারেই আল্লাহর বিধান মেনে চলে তারাই দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে চির সাফল্য লাভ করে।

৪. আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে যাকিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহই বানিয়েছেন। সব কিছুর উপর তাঁরই কর্তৃত্ব কায়েম আছে। তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার যোগ্যতা কারো নেই।

সূরা তালাক

১২ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ①

১. হে নবী! (সবাইকে জানিয়ে দিন) তোমরা যখন স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দেবে[১] এবং ইদ্দতের সময়কাল ঠিকভাবে গুনে রাখবে। আর যে আল্লাহ তোমাদের রব তাঁকে ভয় করে চল।[২] (ইদ্দত চলাকালে) তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না। তারা নিজেরাও যেন বের হয়ে না যায়[৩] তবে যদি তারা স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে বসে[৪] তাহলে আলাদা কথা। এটাই আল্লাহর ঠিক করে দেওয়া সীমা। আর যে আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করবে সে নিজের উপরই যুলুম করবে। তোমরা জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর (মিল-মিশের) কোনো অবস্থা তৈরি করে দেবেন।

১. ইদ্দতের জন্য তালাক দেওয়ার দুটো অর্থ হতে পারে– প্রথমত, হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিও না; বরং এমন সময় তালাক দাও, যে সময় থেকে তার 'ইদ্দত' শুরু হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইদ্দতের মধ্যে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ রেখে তালাক দাও। এমনভাবে তালাক দিও না, যার দ্বারা ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগই না থাকে। হাদীসে এ আদেশের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সে অনুসারে তালাকের পদ্ধতি হচ্ছে, হায়েযের সময় তালাক না দেওয়া; বরং সেই তুহুরে তালাক দেওয়া, যে তুহুরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করেনি অথবা সেই অবস্থায় তালাক দেওয়া, যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া জানা যায় এবং একই সময়ে তিন তালাক না দিয়ে ফেলা।

২. অর্থাৎ তালাককে 'খেল-তামাশা' মনে করো না যে, তালাকের মতো এত বড় ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর এটাও মনে রাখা না হয় যে, কখন তালাক দেওয়া হয়েছিল, কখন ইদ্দত শুরু হলো ও কখন তা শেষ হবে। যখন তালাক দেওয়া হয় তখন এর তারিখ ও সময় মনে রাখা জরুরি এবং এও মনে রাখা দরকার যে, কোন্ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ, পুরুষ রাগের বশে স্ত্রীকে যেন ঘর থেকে বের করে না দেয় এবং স্ত্রীও যেন রাগ করে ঘর থেকে চলে না যায়। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘর তার, সেই ঘরেই উভয়কে থাকতে হবে; যাতে একে অপরের কাছাকাছি আসার অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে তা থেকে যেন ফায়দা ওঠানো যায়। উভয়ে যদি একই ঘরে অবস্থান করে তবে তিন মাস তথা তিন হায়েয আসা পর্যন্ত বা গর্ভবতী অবস্থায় প্রসব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ বারবার আসার সম্ভাবনা আছে।

৪. অর্থাৎ, যদি বেহায়াপনা করে বেড়ায় বা ইদ্দতের মধ্যে ঝগড়া-লড়াই করে ও খারাপ কথা বলতে থাকে।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ﴿٣﴾

২-৩. তারপর যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) শেষ সময়ে পৌঁছে, তখন হয় তাদেরকে ভালোভাবে (বিবাহবন্ধনে) আবদ্ধ রাখ; আর না হয় ভালোভাবেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং এমন দুজন লোককে সাক্ষী রাখ[৫], যারা তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার যোগ্য। (হে সাক্ষীগণ!) আল্লাহর ওয়াস্তে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দেবে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে[৬] তাদের জন্যই এসব কথা উপদেশ হিসেবে বলা হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য (অসুবিধা থেকে) বের হয়ে আসার কোনো উপায় করে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে তার রিযকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই পূরা করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্যই তাকদীর ঠিক করে রেখেছেন।

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে তাদের (ইদ্দত) সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে গিয়ে থাক তাহলে (জেনে নাও) তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস।

৫. অর্থাৎ, তালাক দেওয়ার সময় সাক্ষী রাখা এবং ফিরিয়ে নেওয়ার সময়ও সাক্ষী রাখা।

৬. এই শব্দগুলো দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, উপরে যে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে তা উপদেশ হিসেবে বলা হয়েছে; আইন হিসেবে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যদি কেউ উপরে বর্ণিত নিয়ম ছাড়া তালাক দিয়ে বসে, ইদ্দত ঠিকভাবে গণনা না করে, স্ত্রীকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ঘর থেকে বের করে দেয়, ইদ্দতের পর যদি ফিরিয়ে নেয় তো স্ত্রীকে জ্বালাতন করার জন্য ফিরিয়ে নেয়, যদি বিদায় করে দেয় তো ঝগড়া-বিবাদের সঙ্গে বিদায় করে এবং তালাক ও ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে যা-ই করা হোক না কেন, কোনো অবস্থায় যদি সাক্ষী না রাখে তবে তার জন্য তালাক ও ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আইনগত পরিণতির মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। অবশ্য আল্লাহ তাআলার উপদেশের বিরোধী কাজ করায় এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, তার অন্তরে আল্লাহ ও 'শেষ দিন' সম্পর্কে সঠিক ঈমান বর্তমান নেই; এই কারণে সে এমন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে, যা একজন সাচ্চা মুমিনের পক্ষে করা উচিত নয়।

يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

আর এখনও যাদের হায়েয শুরু হয়নি[৭] তাদের জন্যও একই হুকুম। গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দতের সীমা প্রসব পর্যন্ত।[৮] যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, তার বিষয় তিনি সহজ করে দেন।

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

৫. এটাই আল্লাহর হুকুম, যা তিনি তোমাদের উপর নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ বিলোপ করে দেবেন। (তা ছাড়া) তাকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۝

৬. তোমাদের বাড়ির অবস্থা যেমনই হোক, (ইদ্দতকালে) তাদেরকে সেখানেই থাকতে দাও, যেখানে তোমরা থাক। তাদেরকে জ্বালাতন করার জন্য কষ্ট দিও না। আর যদি তারা গর্ভবতী হয় তাহলে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তাদের খরচ বহন করবে। তারপর যদি তারা তোমাদের খাতিরে (বাচ্চাকে) বুকের দুধ খাওয়ায় তাহলে এ মজুরিও তাদেরকে দাও। (মজুরির বিষয়ে) তোমরা একে অপরের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করে নাও; কিন্তু (মজুরি ঠিক করতে গিয়ে) যদি তোমরা একে অপরের উপর চাপ দিতে থাক তাহলে বাচ্চাকে অন্য কোনো মেয়েলোক দুধ খাওয়াবে।

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

৭. ভালো অবস্থার লোক তার অবস্থা অনুযায়ী খরচ দেবে। আর যাদেরকে কম রিযক দেওয়া হয়েছে তারা— আল্লাহ

৭. কম বয়সের কারণে হায়েয যদি না আসে বা অনেক স্ত্রীলোকের বহু বিলম্বে হায়েয আসার কারণে যদি হায়েয না এসে থাকে, আবার কোনো কোনো মহিলার জীবনে কখনো হায়েয আসে না– যদিও এরূপ ঘটনা খুবই কম– যাই হোক, তাহলে এ সকল অবস্থায় এরূপ মহিলাদের ইদ্দতকাল হায়েয হওয়া থেকে নিরাশ স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের ন্যায় অর্থাৎ তিন মাস।

৮. অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যুর পরপরই যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে অথবা গর্ভকাল যদি চার মাস দশ দিন থেকেও বেশি সময় চলতে থাকে, সব অবস্থায়ই সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইদ্দত শেষ হবে।

فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

তাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকেই খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যাকিছু দিয়েছেন, তিনি এর চেয়ে বেশি খরচের দায়িত্ব তার উপর চাপান না। আল্লাহ হয়তো শিগগিরই অভাবের পর তার অবস্থা সচ্ছল করে দেবেন।

রুকূ' ২

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾

৮. কত জনবসতি[৯] এমন ছিল, যারা তাদের রব এবং তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কড়া হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾

৯. তারা তাদের কর্মফল ভোগ করেছে এবং তাদের কাজের পরিণামে শুধু ক্ষতিই হয়েছে।

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহ তাদের জন্য (আখিরাতে) কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। হে ঈমানদার বুদ্ধিমান লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি এক উপদেশ নাযিল করেছেন।

رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ

১১. (আল্লাহ) এমন একজন রাসূল[১০] (পাঠিয়েছেন) যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর স্পষ্ট হেদায়াতে ভরপুর আয়াত শোনান, যাতে ঈমানদার ও নেক আমলকারীদেরকে

৯. আল্লাহর রাসূল (স) ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে যে আদেশ-নির্দেশ দান করা হয়েছে যদি মুসলমানরা সেগুলো অমান্য করে তবে ইহকালে ও পরকালে তাদের পরিণাম কী ঘটবে এবং যদি তারা আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে তবে কী পুরস্কারই বা তারা লাভ করবে, এ সম্পর্কে এখনই মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।

১০. তাফসীরকারকদের অনেকে 'উপদেশ' অর্থ কুরআন এবং 'রাসূল' অর্থ মুহাম্মদ (স) মনে করেছেন। আবার অনেক তাফসীরকারের অভিমত হলো, 'উপদেশ' অর্থ খোদ রাসূলুল্লাহ (স) অর্থাৎ রাসূলের সত্তাই জীবন্ত নসীহত। আমি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে বেশি সঠিক মনে করি।

إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনা বইতে থাকবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। এমন লোকের জন্য আল্লাহ চমৎকার রিযক রেখেছেন।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

১২. তিনিই আল্লাহ, যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন এবং জমিনের মতো[১১] আরো (জমিন) বানিয়েছেন। এদের মধ্যে হুকুম নাযিল হতে থাকে। (এসব কথা তোমাদেরকে এজন্য বলা হচ্ছে) যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপরই ক্ষমতা রাখেন; আর আল্লাহর জ্ঞান প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে রয়েছে।

১১. 'জমিনের মতো'-এর অর্থ এই নয় যে, যতগুলো আসমান সৃষ্টি করেছেন ততগুলো জমিনও সৃষ্টি করেছেন; আর 'জমিনের মতো' কথাটির অর্থ হলো, যেমন এই জমিন, যার উপর মানুষ বসবাস করছে তা এর অধিবাসীদের জন্য শয্যা ও দোলনাস্বরূপ, তেমনি আল্লাহ তাআলা এই সৃষ্টির মধ্যে অন্য এমন আরও জমিন তৈরি করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের উপর বসবাসকারীদের জন্য শয্যা ও দোলনাস্বরূপ। অন্য কথায়, আসমানে যেসব গ্রহ রয়েছে সেসব খালি পড়ে নেই; বরং পৃথিবীর মতো সেগুলোর অনেকটার মধ্যে বহু দুনিয়া আবাদ আছে।

৬৬. সূরা তাহরীম

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'লিমা তুহাররিমু' থেকেই এ নামকরণ করা হয়েছে। 'তাহরীম' মানে হারাম করা। এ নামের অর্থ হলো ঐ সূরা, যেখানে একটি হালাল জিনিসকে হারাম করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

হিজরী সপ্তম থেকে অষ্টম সনের মধ্যে কোনো এক সময়ে এ সূরাটি নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

একটি হালাল পানীয় রাসূল (স) তাঁর বিবিদের ইচ্ছা অনুযায়ী না খাওয়ার ফায়সালা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরায় নবীর মর্যাদা, নবীর বিবিদের দায়িত্ববোধ, তাওবাতুন নাসূহা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। শেষদিকে নবীর ঘরে কাফির বিবি এবং কাফিরের ঘরে মুমিন বিবির উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক তার হেদায়াত হওয়া তারই উপর নির্ভর করে। ঈমানের ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা করা প্রত্যেকেরই নিজস্ব দায়িত্ব।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে যে ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

রাসূল (স) রোজ আসরের নামাযের পর বিবিদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখা দিয়ে আসতেন। এক সময় দেখা গেল যে, তিনি হযরত যয়নব (রা)-এর ঘরে গিয়ে বেশিক্ষণ থাকেন। সেখানে বিশেষ এক ধরনের মধু ছিল, যার শরবত তিনি পছন্দ করতেন। অন্য বিবিগণ ঐ মধুর প্রতি রাসূল (স)-এর মনে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিলেন, যাতে ঐ মধুর কারণে সেখানে বেশি দেরি না করেন। রাসূল (স) ঐ মধু আর খাবেন না বলে কসম খেয়ে বসলেন।

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সূরার প্রথম আয়াতেই আপত্তি তুলে যা বললেন, তাতে বিরাট একটি বিষয়ে মুসলিম জাতিকে হেদায়াত দান করলেন। এ মূল্যবান হেদায়াতের ব্যাখ্যা হলো–

১. হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সীমা নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। কোনো মুবাহ জিনিসকে হারাম করার ক্ষমতা নবীরও নেই।

২. মানবসমাজে নবীর স্থান বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো সাধারণ লোকের জীবনে যে ঘটনা কোনো গুরুত্বই বহন করে না, নবীর জীবনে তা বিরাট ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে। রাসূল (স) ঐ মধু খাবেন না বলে ঘোষণা করার ফলে একটি হালাল জিনিসকে কেউ হারাম মনে করে ফেলতে পারে। তাই আল্লাহ আপত্তি তুলেছেন। নবীর সামান্য একটা কথাও আইনের মর্যাদা রাখে বলেই আল্লাহ এ ব্যাপারে সংশোধন করে দিলেন।

৩. এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা নবীর উপর যে বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন তা যাতে তিনি ঠিকমতো পালন করতে পারেন সেজন্য নবীর উপর আল্লাহ অতি কড়া নজর রাখেন। আল্লাহর মর্জির খেলাফ সামান্য কিছু দেখলেও সংশোধন করে ছাড়েন।

৪. এ জাতীয় কিছু ঘটনা থেকেই উম্মতের মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, নবীর জীবনে কোনো ভুল থাকতে পারে না। সামান্য ভুলও আল্লাহ সংশোধন না করে ছাড়েননি। এ কারণেই অন্ধভাবে নবীর আনুগত্য করতে হবে।

৫. মধু না খাওয়ার ওয়াদা করাটা নবীর মর্যাদার বিবেচনায় সঠিক না হলেও এটা কোনো এমন দোষ নয়, যা গুনাহ বলে গণ্য হতে পারে। তাই আল্লাহ এটা মাফ করে দিয়েছেন।

৬. নবীর বিবি হিসেবে তাঁদেরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। এভাবে রাসূলকে দিয়ে একটা হালাল জিনিসকে হারাম করানোর যে কাজ তাঁরা করলেন এটা তাঁদের জন্য মোটেই সাজে না। তাঁরা সাধারণ কোনো লোকের বিবি নন। তাঁদেরকে রাসূল (স) সন্তুষ্ট রাখতে চান বলেই এমন কিছু রাসূলের নিকট দাবি করা তাঁদের উচিত নয়, যার ফলে রাসূলকে এমন সমস্যায় পড়তে হলো।

৭. আল্লাহ তাআলা এ ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে বিশেষ করে রাসূল (স)-এর উম্মতকে এ শিক্ষাই দিলেন যে, কেউ যেন রাসূল (স)-কে অতিমানব মনে না করে। রাসূল (স) নিঃসন্দেহে মহামানব। কিন্তু তিনি মানুষ; মানুষের উর্ধ্বে কোনো সত্তা নন। মানুষ হিসেবে তিনিও ভুল করতে পারেন বটে; কিন্তু রাসূল হওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁকে ভুলের উপর কায়েম থাকতে দেন না। এখানেই আল্লাহ ও রাসূলের পার্থক্য যে, আল্লাহর ভুল হতেই পারে না, আর রাসূলের হতে পারে।

৮. রাসূল (স) মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারণে তিনি সব বিষয়েই সত্যের মাপকাঠি। অন্যান্য মানুষ কে কতটা মর্যাদার অধিকারী তা এ মাপকাঠি দিয়ে বিচার করেই বোঝা যাবে। সাহাবায়ে কেরামকে এ মাপকাঠিতে বিচার করেই রাসূল (স)-এর পর শ্রেষ্ঠতম মানুষ বলে মর্যাদা দেওয়া হয়। রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মর্যাদা সমান হতে পারে না বলেই তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলা ঠিক নয়। তবে রাসূল (স)-কে অনুসরণ করার ব্যাপারে তাঁরা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে যে, মধু না খাওয়ার কসম ভেঙে ফেলুন এবং সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতের বিধান অনুযায়ী কাফফারা আদায় করে এ কসম থেকে মুক্ত হয়ে যান।

তৃতীয় আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রাসূল (স) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট একটা কথা গোপনে বলেছিলেন এবং কাউকে তা বলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে সে কথাটা জানিয়ে দিলে আল্লাহ তাআলা ওহী দ্বারা রাসূল (স)-কে সে খবর দিয়ে দিলেন।

ঐ কথাটা কী ছিল তা এখানে আসল বিষয় নয়। সে কথাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলে আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করতেন। আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা নবীর বিবিদের দায়িত্ববোধের সাথে সম্পর্ক রাখে। যেকোনো বড় দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্ত্রী এমন অনেক বিষয় জানতে পারে, যা গোপন রাখা উচিত। স্ত্রীর অসাবধানতায় বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। রাসূল (স)-এর ব্যাপার তো আরো বিরাট।

৪ ও ৫ নং আয়াতে রাসূল (স)-এর বিবিগণকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি বিজয়ের ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। রাসূল (স)-এর বিবিগণ এতদিন পর্যন্ত খোরপোষের ব্যাপারে রাসূল (স)-এর উপর কোনো চাপ দেননি, এমনকি কোনো অভিযোগও পেশ করেননি। কিন্তু সবার উন্নতি হওয়ার পর বিবিদের পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা) এ বিষয়ে দাবি জানানো কর্তব্য মনে করলেন।

রাসূল (স) ঘরে মাল জমা রাখা মোটেই পছন্দ করতেন না। ফলে বিবিদেরকে কষ্ট করেই চলতে হতো। রাসূল (স) বিবিদের ঘরেই থাকতেন এবং তাঁদের সাথেই খেতেন। তিনি অত্যন্ত সরল জীবন যাপন

করতেন। গরিবের চেয়ে গরিব সাহাবীও রাসূলের অবস্থা দেখে সান্ত্বনা পেতেন। বাইতুল মালে যত ধন-সম্পদ আসত রাসূল (স) তা জনগণের মাঝে বিলি করে দিতেন। ফলে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হলো।

এ অবস্থায় সমাজের সবার উন্নতি দেখে রাসূল (স)-এর বিবিদের মনে কিছুটা সচ্ছল হওয়ার ইচ্ছা জাগা তেমন দূষণীয় ব্যাপার ছিল না। মানুষ হিসেবে ঐ সমাজের উন্নতির অংশীদার হওয়ার দাবি করা অন্যায় বলে তারা মনে করেননি।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল (স) মানবজাতির সামনে যে মহান আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা ঐ দাবির পক্ষে ছিল না। দেশের আর্থিক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের সরল জীবনের মান বাড়ানো পছন্দ করেননি। তাই বিবিদের এ দাবি মানতে তিনি রাজি হননি, এমনকি বিরক্ত হয়ে প্রায় এক মাস বিবিদের কাছে যাননি।

সরল জীবনের প্রতি রাসূল (স)-এর এ মনোভাব আল্লাহর এত বেশি পছন্দ হলো যে, সূরা আহযাবের ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে তিনি বললেন, 'হে নবী! আপনার বিবিদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও এর এত সাজসজ্জা চাও তাহলে আমি ধন-সম্পদ দিয়ে ভালোভাবে তোমাদেরকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের ঘর পছন্দ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের নেককারদের জন্য বড় পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

নবীর বিবিগণ সাধারণ মহিলা ছিলেন না। সাহাবী হিসেবে অন্য মহিলাদের যে মর্যাদা ছিল তার চেয়েও তাঁরা উন্নত মানের ছিলেন বলেই তাঁরা নবীর বিবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মুমিনদের মায়ের মর্যাদা আল্লাহই তাঁদের জন্য ঘোষণা করেছেন। তাঁরা কোনো অবস্থায়ই এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে রাজি ছিলেন না। তাই তাঁরা সরল জীবন যাপনে রাজি হয়ে রাসূলের বিবি থাকারই সিদ্ধান্ত নিলেন।

এ সূরার চতুর্থ আয়াতে যে দু'জন বিবিকে তাওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন– আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা), যাঁরা বিবিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এ ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করে যে মহান শিক্ষা উম্মতকে দেওয়া হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা হলো :

১. সাহাবীগণ (রা)ও মানুষ ছিলেন; তাঁরা ফেরেশতা ছিলেন না। তাঁদেরও খাওয়া-পরার দরকার ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টিই তাঁদের আসল লক্ষ্য ছিল। তাই দুনিয়ার কোনো স্বার্থে ঐ লক্ষ্য ত্যাগ করতে তাঁরা রাজি ছিলেন না।

২. নবীর বিবিগণ শুধু সাহাবীই ছিলেন না, তাঁরা সাহাবীদেরও মায়ের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ভালো খাওয়া-পরার দাবি জানানো কোনো বড় দোষ ছিল না; কিন্তু তা তাঁদের উন্নত মর্যাদার সাথে মানানসই ছিল না। তাই যে দু'জন এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে এ জন্য অনুতপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনা থেকে উম্মতকে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, যাদেরকে দীনের দিক দিয়ে নেতৃস্থানীয় বলে মান্য করা হয়, তাদের কোনো ভুল উল্লেখ করলেই তাদের সম্মান বিনষ্ট হয়ে যায় না। বুজুর্গদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবি এটা নয় যে, তাদেরকে নির্ভুল মনে করতে হবে এবং ভুল-ত্রুটি হলেও তা সম্মানের সাথেও আলোচনা করা যাবে না।

৬ ও ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতের শাস্তি এত কঠিন ও কষ্টদায়ক যে, তা থেকে পরিবার-পরিজনকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ঈমানের পথে পরিচালনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা মুমিনদের বিশেষ কর্তব্য। দুনিয়ার আপদ-বিপদে যাদের জন্য প্রাণ কাঁদে এবং যাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার

জন্য এত চেষ্টা-তদবির করা কর্তব্য মনে করা হয়, চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনে যাতে তাদেরকে শাস্তি পেতে না হয় সেদিকে যত্নবান না হওয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় বহন করে না।

ঈমান না আনার কারণে আখিরাতে যখন কাফিরদেরকে নিজেদের কর্মফল ভোগ করতে হবে তখন তাদের শত ওযর-আপত্তিও কোনো কাজে আসবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

৮ নং আয়াতে ঈমানদারদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ হিসেবে ত্রুটি ও গুনাহ হয়ে গেলে খাঁটি মনে তাওবা কর। আল্লাহ মানুষের নিকট এ দাবি কোথাও করেননি যে, তোমাদের কোনো ভুল-ত্রুটি হতে পারবে না। আল্লাহর দাবি হলো, মানবিক দুর্বলতার দরুন যখনই নাফরমানী হয়ে যায়, বিবেকের দংশনের সাথে সাথে পূর্ণ ইখলাসের সাথে তাওবা কর। হাদীসে আছে, খাঁটি তাওবাকারীর মর্যাদা এমন, যেন সে গুনাহই করেনি। খাঁটি তাওবা মানে সত্যিকার অনুতপ্ত হয়ে কাতরভাবে মাফ চাওয়া এবং এ গুনাহ আর কখনো যেন না হয় সে বিষয়ে মযবুত ফায়সালা করা।

তাওবা করার কথা বলার পরপরই এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হাশরের ময়দানে সকল মানুষকে যখন হিসাব-নিকাশের জন্য জমা করা হবে, তখন রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামকে অপমান করা হবে না। ঈমান আনার পর যারা এ দাবি পূরণ করতে থাকেন, তাদের সব দোষ-ত্রুটি আল্লাহ মাফ করে দেন। তাদের নেক আমল হাশরের কঠিন অন্ধকারে আলো হয়ে তাদেরকে বেহেশতের দিকে পথ দেখাতে থাকবে। কাফিরদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে দেখে তারা সেখানেও দোয়া করতে থাকবেন, যাতে তাদের আলো নিভে না যায়।

৯ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের যে আচরণ সে সময় প্রকাশ পেয়েছে, তারপর আর তাদের হেদায়াতের আশা করা যায় না। তাই এতদিন তাদের প্রতি যে নম্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার আর কোনো অবকাশ নেই। তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ তাকীদ এ কথাই প্রমাণ করে যে, রাসূল (স) এত রহমদিল মানুষ ছিলেন যে, কঠোরতা দেখানোর জন্য তাঁকে নির্দেশ দিতে হয়েছে।

১০-১২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তিন রকম মহিলার উদাহরণ পেশ করে যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তা হলো :

ক. নূহ (আ) ও লূত (আ)-এর বিবিরা নবীর বিবি হওয়া সত্ত্বেও দোযখের ভাগীই হলো। নবীর বিবি হওয়ার মর্যাদাও তাদেরকে রক্ষা করতে পারল না। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের ঈমান ও আমল দিয়েই বিচার করেন। ঐ দুই মহিলা নবীর বিবি হয়েও ঈমান আনল না; বরং কাফিরদের সহযোগী হয়েই থাকল। তাই এর যে পরিণাম হওয়া উচিত তা-ই হবে। নবীর বিবি হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ সুবিধা তারা পাবে না।

খ. এর ঠিক বিপরীত উদাহরণ হলো ফিরাউনের বিবি। ফিরাউন শুধু কাফিরই ছিল না; সে ছিল আল্লাহর বিদ্রোহী। আল্লাহর এত বড় দুশমনের বিবি হওয়ার কারণেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন না। এমন বিরোধী পরিবেশে থেকেও একমাত্র ঈমানের কারণে তিনি আল্লাহর প্রিয় হতে পেরেছিলেন। আল্লাহর বিদ্রোহীর বিবি হওয়ার কারণে তাঁর সামান্য ক্ষতিও হয়নি।

গ. মুমিনদের জন্য হযরত মারইয়ামের উদাহরণ এ শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যত বড় কঠিন পরীক্ষাই আসুক, আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই ঈমাদের দাবি। এ দাবি পূরণ করার কারণেই হযরত মারইয়াম ঈমানদারদের আদর্শ হিসেবে কুরআন মাজীদে এত বড় মর্যাদার আসন পেলেন।

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! যে জিনিসকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন[১] তাকে আপনি কেন হারাম করেন? (শুধু কি এজন্য যে) আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি চান?[২] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١﴾

২. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কসমের দায়-দায়িত্ব থেকে বাঁচার পথ ঠিক করে দিয়েছেন।[৩] আল্লাহই তোমাদের মনিব এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও সুকৌশলী।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

১. আসলে এটা কোনো প্রশ্ন নয়; এটা পছন্দ না করার কথা জানিয়ে দেওয়া। নবী (স)-এর কাছ থেকে এ কথা জানা উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি কেন এ কাজ করেছেন; বরং এর উদ্দেশ্য– তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, আল্লাহর নির্ধারিত হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার যে কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। যেহেতু তাঁর স্থান ও মর্যাদা কোনো সাধারণ মানুষের মতো নয় বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল এবং তিনি কোনো জিনিস নিজের উপর হারাম করে নিলে এ আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে যে, উম্মতও সে জিনিসকে হারাম বা কমপক্ষে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) মনে করতে থাকবে– এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কাজের দোষ ধরেছেন এবং তাঁকে এভাবে হারাম করা থেকে বিরত হতে আদেশ দিয়েছেন। এটা থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রাসূল (স)-এর নিজের পক্ষ থেকে কোনো জিনিসকে হালাল-হারাম করার অধিকার নেই।

২. এর দ্বারা জানা গেল, রাসূল (স) হারাম করার এই কাজ নিজের ইচ্ছায় করেননি এবং তাঁর বিবিরা চেয়েছিলেন, তিনি এরূপ করুন এবং তিনি শুধু তাঁর বিবিদের সন্তুষ্ট করার জন্যই একটি হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম গণ্য করেছিলেন। হাদীসের বিশ্বস্ত বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূল (স)-এর এক বিবির [হযরত যয়নব (রা)] গৃহে কোনো এক স্থান থেকে মধু এসেছিল, যা রাসূল (স) অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তাই তিনি তাঁর সাধারণ নিয়মের খেলাফ করে তাঁর ঘরে বেশি সময় অবস্থান করতে থাকেন। এতে অন্য কোনো কোনো বিবির ঈর্ষা সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের পরামর্শে এই মধুর প্রতি তাঁর এরূপ ঘৃণা জন্মাল যে, তিনি তা না খাওয়ার ওয়াদা করলেন।

৩. অর্থাৎ, কাফফারা দিয়ে শপথের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়ার যে নিয়ম আল্লাহ তাআলা সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা পালন করে তিনি যেন সে ওয়াদা ভেঙে ফেলেন, যার দ্বারা তিনি একটি হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝

৩. (এ ঘটনাটিও ভেবে দেখার মতো যে,) নবী তাঁর এক স্ত্রীর কাছে একটা কথা গোপনে বলেছিলেন। তারপর যখন ঐ স্ত্রী (আরেক স্ত্রীর কাছে) ঐ গোপন কথা ফাঁস করে দিল, তখন আল্লাহ নবীকে ঐ ফাঁস করার খবর জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (ঐ স্ত্রীকে) কিছুটা সাবধান করে দিলেন এবং কিছুটা মাফ করে দিলেন। তারপর যখন নবী তাঁকে (গোপন কথা ফাঁস করার বিষয়) জানালেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে এ খবর কে দিয়েছে? নবী বললেন, আমাকে তিনিই খবর দিয়েছেন, যিনি সব কিছু জানেন ও সব কিছুর খবর রাখেন।[৪]

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ۝

৪. যদি তোমরা দুজন তাওবা কর (তাহলে এটা তোমাদের জন্য ভালো)। কেননা তোমাদের মন সরল পথ থেকে দূরে সরে গেছে।[৫] আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে দল পাকাও তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তার মনিব এবং আল্লাহর পর জিবরাঈল, সব ঈমানদার নেক লোক ও সব ফেরেশতা তার সাথী ও সাহায্যকারী।[৬]

৪. সে গোপন কথাটি কী ছিল, কোনো রেওয়ায়াত থেকে নির্দিষ্টরূপে তা জানা যায় না এবং যে উদ্দেশ্য সাধনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সে দিক দিয়ে এ প্রশ্নের আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই যে, সে গোপন কথাটি কী? যে আসল উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র বিবিদের ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সকল দায়িত্বশীল লোকদের স্ত্রীদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা যে, তারা গোপন কথা হেফাযত করার ব্যাপারে যেন অসাবধান না হন। যিনি যত বড় মর্যাদার অধিকারী তাঁর ঘরের গোপন কথা প্রকাশ পাওয়া ততই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কথা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা না হোক, গোপন রহস্য হেফাযত করার ব্যাপারে অবহেলার অভ্যাস থাকলে লঘু কথার মতো কোনো এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

৫. এখানে 'দুই জন' বলতে হযরত ওমর (রা)-এর বর্ণনামতে, হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত হাফসা (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। আর সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ, হযরত ওমর (র)-এর মতে, এই দুই বিবি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কিছুটা বেশি সাহসের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেননি। তাই তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে দল বেঁধে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কেননা, যাঁর অভিভাবক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ এবং জিবরাঈল, ফেরেশতারা এবং সকল সৎ মুমিন যাঁর সঙ্গে আছেন, তাঁর মুকাবিলায় দল বেঁধে কেউই সফলকাম হতে পারে না।

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

৫. হতে পারে যে, যদি নবী তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তাঁকে তোমাদের বদলে এমন স্ত্রী দেবেন, যারা তোমাদের চেয়েও ভালো[৭], খাঁটি মুসলমান, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে ও আপন পরিবার-পরিজনকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর।[৮] এবং যার উপর এমন সব ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা খুবই কর্কশ ও কঠোর; যারা কখনো আল্লাহর নাফরমানী করে না এবং যে হুকুমই তাদেরকে দেওয়া হয় তা তারা পালন করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৭. (তখন বলা হবে যে) হে কাফিরগণ! আজ তোমরা কোনো ওযর-আপত্তি পেশ করো না। তোমরা যেমন আমল করেছ তেমন বদলাই তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

রুকূ' ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ

৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর কাছে তাওবা কর— খাঁটি তাওবা।

৭. এ থেকে জানা যায়, দোষ শুধু হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা)-এরই ছিল না বরং রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য পবিত্রা বিবিগণও কিছুটা দোষী ছিলেন। এ জন্য তাঁদের দু'জনের পর এ আয়াতে বাকি সব বিবিগণকেও সতর্ক করা হয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায়, সে সময়ে রাসূল (স) বিবিদের প্রতি এত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, এক মাস পর্যন্ত তিনি তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি এবং সাহাবীদের মধ্যে এ কথা রটে যায় যে, তিনি তাঁর বিবিদের তালাক দিয়েছেন।

৮. এ আয়াত থেকে জানা যায়, কোনো এক ব্যক্তির দায়িত্ব শুধু নিজেকেই আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করা পর্যন্ত সীমিত নয় বরং আল্লাহ যে পরিবারের কর্তৃত্বভার তার উপর অর্পণ করেছেন, নিজের সাধ্যমতো তাদেরকে এরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দান করাও তার দায়িত্ব, যাতে তারা আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং যদি তারা জাহান্নামের পথে চলে, তবে যথাসাধ্য তাদেরকে সে রাস্তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করাও তাঁর দায়িত্ব। জাহান্নামের ইন্ধন হবে পাথর– সম্ভবত পাথরের কয়লা। ইবনে মাসউদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), ইমাম মুহাম্মদ বাকের (র), সুদ্দী (র) বলেন, 'গন্ধকের পাথর'।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

হয়তো আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান রয়েছে। ঐ দিন আল্লাহ তাঁর নবী ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে অপমানিত করবেন না।[৯] তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে দৌড়াতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব! আমাদের নূর আমাদের জন্য পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑨

৯. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোর হোন। দোযখই তাদের ঠিকানা এবং তা বড়ই মন্দ ঠিকানা!

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ⑩

১০. আল্লাহ কাফিরদের ব্যাপারে নূহ ও লূতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করেছেন। তারা আমার দুজন নেক বান্দার অধীনে ছিল; কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।[১০] ফলে (তাদের স্বামীগণ নবী হওয়া সত্ত্বেও) আল্লাহর (হাত থেকে বাঁচানোর জন্য) তাদের কোনো উপকারে আসতে পারেনি। তাদের দুজনকে বলে দেওয়া হলো যে, দোযখের দিকে যারা যাচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও।

৯. অর্থাৎ, তাদের সৎ কাজের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না। কাফির ও মুনাফিকদেরকে কখনো এ কথা বলার অবকাশ দেবেন না যে, এরা আল্লাহর আনুগত্য করে কী প্রতিদান পেল? লাঞ্ছনা ও অপমান বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের ভাগ্যে ঘটবে; অনুগত ও আদেশ পালনকারীদের ভাগ্যে নয়।

১০. এখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা' এই অর্থে নয় যে, তারা ব্যভিচার করেছিল; বরং এই অর্থে যে, তারা ঈমানের পথে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-কে সহযোগিতা তো করেইনি বরং তাঁদের বিরুদ্ধে দীনের শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

১১. ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন—যখন সে দু'আ করেছিল, 'হে আমার রব! আমার জন্য আপনার কাছে বেহেশতে একটা বাড়ি বানিয়ে দিন, আমাকে ফিরাউন ও তার আমল থেকে উদ্ধার করুন এবং যালিম কাওম থেকে আমাকে নাজাত দিন।'

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ
رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿١٢﴾

১২. (ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ) ইমরানের মেয়ে[১১] মারইয়ামের উদাহরণও দিচ্ছেন যে, সে তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করেছিল।[১২] তারপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছি[১৩] এবং সে তার রবের কথাগুলো এবং কিতাবগুলোর সত্যতা প্রকাশ করেছে। সে অনুগত লোকদেরই একজন ছিল।[১৪]

১১. হতে পারে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর পিতার নাম ছিল ইমরান; অথবা তিনি ইমরানের বংশের হওয়ার কারণে তাঁকে ইমরানের কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১২. এটা ছিল ইহুদীদের ঐ অপবাদের খণ্ডন যে, মারইয়াম-এর গর্ভ থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মলাভ কোনো পাপের পরিণাম (নাঊযুবিল্লাহ)। সূরা নিসার ১৫৬ নং আয়াতে যালিমদের এই অভিযোগকে বিরাট মিথ্যা অপবাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে কোনো পুরুষের সংযোগ ছাড়াই তাঁর গর্ভাশয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রাণ নিক্ষেপ করি।

১৪. হযরত মারইয়ামকে এখানে যে উদ্দেশ্যে উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে, কুমারী অবস্থায় অলৌকিকভাবে তাঁকে গর্ভবতী করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছিলেন; কিন্তু তিনি ধৈর্যসহকারে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

৬৭. সূরা মুল্‌ক

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'মুল্‌ক' শব্দ দ্বারা এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় না যে, ঠিক কোন্ সময় সূরাটি নাযিল হয়েছে। কিন্তু সূরার আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম পর্যায়েই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। তাওহীদকে অস্বীকার করার পরিণাম হিসেবে আখিরাতের কথা এসেছে। রিসালাত সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে আলোচনা করে রিসালাতকে অস্বীকার করার পরিণতি আখিরাতে কী হবে তাও বলা হয়েছে। তাওহীদের 'আফাকী যুক্তি' বলিষ্ঠভাবে পেশ করা হয়েছে।

মাক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরার যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এ সূরায় খুবই স্পষ্ট। ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাকে মাক্কী সূরায় আকর্ষণীয় ভাষা ও ভঙ্গিতে এবং খুবই সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়েছে, যাতে তাদের বিবেক জাগ্রত হয় এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্পর্কে তাদের অবহেলা ও অমনোযোগিতা দূর হয়।

আলোচনার ধারা

১-৪ নং আয়াতে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে যে, মানুষ যে জগতে বাস করছে তা অতি সুসংগঠিত ও মযবুত রাজত্ব। বারবার তালাশ করেও এতে কোনো বেমিল ও খুঁত পাওয়া যাবে না। যিনি এ বিরাট রাজ্য সৃষ্টি করেছেন তিনিই এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। এর মধ্যে যত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা এককভাবে তাঁরই হাতে রয়েছে। এ ক্ষমতায় কেউ তাঁর সাথে শরিক নেই।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, মহাকুশলী আল্লাহর এ সৃষ্টিলোকে কোনো কিছুই যেমন বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি, তেমনি মানুষকেও অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি; বরং স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কে কেমন জীবন যাপন করে এবং কে কী কাজে জীবনটা কাটায় সে বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্যই মানুষকে দুনিয়ার হায়াত দিয়েছেন এবং এর পর মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন। দুনিয়ার জীবনটা হলো পরীক্ষার সময়। মৃত্যুর সাথে সাথেই পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যায়। দুনিয়ায় চিন্তা ও কর্মের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা-ই হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। কে কীভাবে কাজ করল এরই উপর পরীক্ষার ফল নির্ভর করে। আর একমাত্র পরীক্ষকের মর্জিমতোই ফল প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেমন মানুষের উপকারের জন্য সূর্য-চন্দ্র-তারকা দিয়ে আকাশকে সাজিয়েছেন, তেমনি দুনিয়ার পরীক্ষায় মানুষকে পাস করার সুযোগ দেওয়ার জন্য রাসূলের মারফতে হেদায়াত পাঠিয়েছেন। তোমরা রাসূলের কথা না মেনে গণকদের ধোঁকায় পড়বে না। গণকরা দাবি করে যে, শয়তান আসমান থেকে গায়েবি খবর এনে তাদেরকে দেয়। আসলে শয়তান কোনো সঠিক খবরই আনতে পারে না। কারণ, আসমানের তারকা থেকে বের হওয়া উল্কা বৃষ্টি শয়তানদেরকে তাড়িয়ে দেয়। যারা শয়তান ও গণকদের ধোঁকায় পড়ে, তাদের জন্য আখিরাতের জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির ব্যবস্থা করা আছে।

৬ ও ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে যারা অবিশ্বাস করে তারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় অবশ্যই ফেল করে। তারা আখিরাতে এর কী ভয়ানক পরিণাম ভোগ করবে তা-ই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন তাদেরকে দোযখে ফেলা হবে তখন দোযখের বিকট গর্জন শুনতে পাবে। মনে হবে যেন রাগে সে ফেটে পড়বে।

৮ ও ১১ নং আয়াতে রিসালাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। আজ দুনিয়ায় যারা রাসূলকে মানতে রাজি হচ্ছে না তারা দোযখের পাহারাদার ফিরিশতাদের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তাদের কাছে রাসূল এসেছিলেন। মক্কার কাফিরদেরকে এখানে সাবধান করে বলা হয়েছে, "তোমরা এখন রাসূলকে যতই অস্বীকার কর, আখিরাতে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমরা জেনে-শুনে রাসূলকে অমান্য করেছিলে। তখন তোমরা হায় আফসোস করে বলবে, 'যদি আমরা রাসূলের কথা শুনতাম বা বুঝতাম তাহলে আজ আমাদের এ দুর্দশা হতো না!"

১২-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর কোনো সৃষ্টির সামান্য খবরও অজানা থাকে না। এমনকি তিনি মানুষের অন্তরের গোপন চিন্তার খবরও জানেন। মানুষ যে কথাই বলুক, আস্তে বলুক আর জোরে বলুক সবই আল্লাহ জানতে পারেন। তাই আল্লাহকে দেখা না গেলেও তাঁর উপর বিশ্বাস করা এবং তাঁর কাছে প্রতিটি কথা ও নিয়তের হিসাব দিতে হবে মনে করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

চরিত্রের সঠিক বুনিয়াদ এটাই। আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে মনে করলেই সমস্ত খারাপ চিন্তা, কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। দুনিয়ার কোনো শক্তির হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকুক বা না থাকুক এবং দুনিয়াতে কোনো ক্ষতি হোক বা না হোক, আখিরাতে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস করে যারা দুনিয়ার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তারাই ক্ষমা ও অফুরন্ত পুরস্কারের যোগ্য।

১৫-২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন কতক বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা সব সময় মানুষের সামনেই ঘটে চলেছে। অথচ মানুষ এসব বিষয়ে খেয়াল করে দেখে না। ভাবুকের চোখ দিয়ে দেখলে মানুষ অবশ্যই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পশুর মতো তারা শুধু দেখে; বিবেক-বুদ্ধিকে তারা কাজে লাগায় না।

১৫ থেকে ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কে জমিনকে মানুষের ব্যবহারের যোগ্য বানিয়েছেন? এ থেকে কে তাদের রিযক যোগাড় করে দিচ্ছেন? আল্লাহ ইচ্ছা করলে সামান্য একটু ভূমিকম্প দিয়ে অথবা আসমান থেকে কোনো বালা-মুসিবত পাঠিয়ে অতি সহজেই সব মানুষকে শেষ করে দিতে পারেন। আল্লাহ বহু কাওমকে এভাবে শেষ করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ধ্বংস থেকে বাঁচতে চাও তাহলে রাসূলের কথামতো চল।

১৯ থেকে ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা একটু উড়ন্ত পাখির দিকে লক্ষ্য করো। কে এদেরকে শূন্যে ধরে রেখেছেন? আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদেরকে অগণিত আপদ-বিপদ থেকে হেফাযত করে রেখেছেন? আল্লাহ যদি তোমাদের জন্য রিযকের দরজা বন্ধ করে দেন তাহলে কার সাধ্য আছে তা খোলার? কিন্তু এসব কথা যত বাস্তব সত্যই হোক, যারা কাফির তারা বস্তুজগতের ধোঁকায় পড়ে বিদ্রোহের পথেই চলছে।

২২ ও ২৩ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যারা এসব সত্যের দিকে খেয়াল করে না তারা পশুর মতো মুখ নিচু করে গতানুগতিক নিয়মে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে বলে তারা হেদায়াত পেতে পারে না। হেদায়াত তারাই পায়, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে, চোখ-কানকে সজাগ রেখে চারপাশের দুনিয়াকে দেখে এবং যা দেখে তা থেকেই উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছেন। কিন্তু খুব কম লোকই এসবকে ঠিকমতো কাজে লাগাচ্ছে।

উপরিউক্ত ৯টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা যুক্তির চাবুক মেরে মানুষের বিবেককে জাগানোর উদ্দেশ্যে অনেক কথা বলেছেন।

২৪-২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সে সময়টা কখন আসবে, এর দিন-তারিখ বলে দেওয়া রাসূলের দায়িত্ব নয়; তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াই শুধু রাসূলের কাজ। আজ তোমরা সে কথা বিশ্বাস তো করছই না; বরং ঠাট্টা করে দাবি জানাচ্ছ যে, ঐ দিনটা এনে তোমাদের যেন দেখানো হয়। কিন্তু যখন সে দিনটি সত্যিই হাজির করা হবে তখন তোমাদের চেহারা বিগড়ে যাবে। তখন বলা হবে, 'যে দিনটা আসবে বলে ওয়াদা করা হয়েছিল তা এখন ভালো করে দেখে নাও।'

২৮ ও ২৯ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে মক্কার কাফিরদের বদ দোয়ার জবাব শেখানো হয়েছে। ওরা রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ধ্বংস কামনা করত। আল্লাহ বলেছেন, 'হে রাসূল! ওদেরকে বলুন, 'আমার আল্লাহ আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে ধ্বংস করুক আর আমাদের উপর মেহেরবানী করুক, তাতে তোমাদের কী উপকার হবে? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহর গজব থেকে কে তোমাদেরকে বাঁচাবে? যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে চলেছে তাদেরকে তোমরা গুমরাহ মনে করছ? একদিন আসবে, যখন এ সত্য প্রকাশ পাবে যে, কে সত্যিকার গুমরাহ ছিল।"

৩০ নং আয়াতে একটি প্রশ্ন তুলে ধরে মানুষকে চিন্তা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আরবের মরুভূমিতে যে পানির সাহায্যে তোমাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন, যদি তা মাটিতে তলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কে তোমাদেরকে তা ফিরিয়ে দেবে? আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তি কি আছে যে, এই আবে হায়াতের ধারা জারি করতে পারে?

সূরা মুল্‌ক

৩০ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পারা ২৯

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ؗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿١﴾

১. তিনি বড়ই মহান ও শ্রেষ্ঠ, যাঁর হাতে রয়েছে (সৃষ্টিলোকের) রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান।[১]

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿٢﴾

২. যিনি হায়াত ও মওত সৃষ্টি করেছেন—যাতে তিনি তোমাদেরকে যাচাই করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে বেশি ভালো।[২] তিনি মহা শক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾

৩. যিনি থরে থরে সাতটি আসমান বানিয়েছেন। তুমি রাহমানের সৃষ্টির মধ্যে কোনো গরমিল দেখতে পাবে না।[৩] আবার তাকিয়ে দেখ, কোথাও কোনো ফাটল[৪] দেখতে পেলে কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾

৪. বারবার তাকিয়ে দেখ, তোমার চোখ ক্লান্ত অবস্থায় বিফল হয়ে ফিরে.আসবে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا

৫. আমি (তোমাদের) কাছের আসমানকে[৫] বড় বড় বাতি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি এবং

১. অর্থাৎ, তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন; কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। এমনটা হতে পারে না যে, তিনি কোনো কাজ করতে চান, আর তা করতে পারেন না।

২. অর্থাৎ, দুনিয়ায় মানুষের হায়াত-মওতের ধারা তিনি এজন্য শুরু করেছেন, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন এবং কার আমল বেশি ভালো তা দেখে নিতে পারেন।

৩. আয়াতে 'তাফাউত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ বেমিল হওয়া, এক জিনিসের সাথে অপরটির মিল না খাওয়া; জোড় না মিলা।

৪. আয়াতে 'ফুতুর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ খুঁত, ফাটল, ফাঁক, ছিদ্র, ফেটে যাওয়া, ভাঙা-চোরা হওয়া। অর্থাৎ, গোটা সৃষ্টির বন্ধন এমন মযবুত এবং জমিনের একটি অণু থেকে বিশাল ছায়াপথ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিস এমনভাবে সাজানো যে, কোথাও সৃষ্টিলোকের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে কোনো ফাটল দেখা যায় না। তোমরা যতই তালাশ কর না কেন, কোথাও সামান্য খুঁত, ছিদ্র বা দোষ-ত্রুটি পাবে না।

৫. অর্থাৎ, ঐ আসমান, যার তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহ আমরা দুরবীন ছাড়া খালি চোখে দেখে থাকি।

رُجُومًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾

এসব দিয়ে শয়তানকে মেরে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছি। আর এ (শয়তানদের) জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾

৬. যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। আর তা বড়ই খারাপ ঠিকানা!

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾

৭. যখন তাদেরকে সেখানে ফেলা হবে তখন তারা এর গর্জনের ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে[৬] এবং সে তখন ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾

৮. রাগের চোটে সে যেন ফেটে পড়তে চাইবে। যখনই এতে কোনো দলকে ফেলা হবে, এর পাহারাদার (ফেরেশতারা) জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সাবধানকারী আসেনি?

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾

৯. তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিল; কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা বড়ই গোমরাহিতে পড়ে আছ।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾

১০. তারা আরও বলবে, হ্যাঁ, আমরা যদি শুনতাম ও বুঝতাম তাহলে আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের ভাগীদের মধ্যে শামিল হতাম না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾

১১. এভাবে তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেবে। ঐ দোযখবাসীদের উপর লা'নত (অভিশাপ)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾

১২. যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।

৬. এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ আওয়াজ দোযখের নিজেরই আওয়াজ। আবার এমনও হতে পারে যে, আগে যাদেরকে দোযখে ফেলা হয়েছে এ আওয়াজ তাদের চিৎকার ও বিলাপেরই আওয়াজ।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾

১৩. তোমরা চুপে চুপে কথা বল বা জোরে কথা বল (তা আল্লাহর কাছে সমান)। তিনি তো মনের অবস্থাও জানেন।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۴﴾

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না?[৭] অথচ তিনি সূক্ষ্ম জিনিসও দেখেন এবং সবকিছু জানেন।

রুকূ' ২

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾

১৫. তিনিই সে (সত্তা), যিনি জমিনকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন। তোমরা এর বুকের উপর চলাফেরা কর, আর আল্লাহর রিয্ক থেকে খাও। তোমাদেরকে আবার জীবিত হয়ে তাঁরই কাছে যেতে হবে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿۱۶﴾

১৬. তোমাদের কি ভয় নেই যে, যিনি আসমানে আছেন[৮] তিনি তোমাদেরকে মাটি চাপা দেবেন এবং তখন জমিন হঠাৎ দোল খেতে থাকবে?

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿۱۷﴾

১৭. তোমাদের কি ভয় নেই যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠিয়ে দেবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে যে, আমার সতর্ক করার কাজটি কেমন (ভয়াবহ) হয়ে থাকে।

৭. এর অনুবাদ এভাবেও হতে পারে, 'তিনি কি নিজের সৃষ্টিকেই জানবেন না?'

৮. এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা আসমানে থাকেন। এভাবে বলার কারণ এই যে, স্বাভাবিকভাবে মানুষ যখন আল্লাহর দিকে মনোযোগ দিতে চায় তখন সে আসমানের দিকেই তাকায়। যখন দো'আ করে তখন আসমানের দিকেই হাত তোলে। কোনো বিপদের সময় যখন সব সহায় থেকে নিরাশ হয় তখন আসমানের দিকে মুখ তুলে ফরিয়াদ করে। হঠাৎ কোনো বালা-মুসিবতে পড়লে বলে যে, এটা আসমানী বালা, উপর থেকেই এসেছে। অস্বাভাবিকভাবে কোনো জিনিস পাওয়া গেলে বলে যে, এটা উপর থেকেই এসেছে। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবকে আসমানী কিতাবই বলা হয়। এসব কথা থেকে এটাই বোঝা যায়, মানুষের মজ্জাগত স্বভাবই এমন যে, যখনই আল্লাহর কথা চিন্তা করে তখন তার খেয়াল নিচে জমিনের দিকে যায় না; বরং উপরে আসমানের দিকেই যায়।

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

১৮. এদের আগে যারা ছিল তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। এখন দেখ, আমার পাকড়াও কেমন (শক্ত) ছিল।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ إِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾

১৯. এরা কি এদের উপর উড়ন্ত পাখিকে পাখা ছড়িয়ে দিতে এবং গুটিয়ে নিতে দেখে না? রাহমান ছাড়া আর কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۚ إِنِ الْكٰفِرُوْنَ إِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾

২০. (বল) কোন্ সেনাবাহিনী তোমাদের কাছে আছে যে, রাহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে?[৯] আসলে কাফিররা ধোঁকায় পড়ে আছে।

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾

২১. (বল) রাহমান যদি তাঁর রিযক আটকিয়ে রাখেন তাহলে আর কে আছে যে, তোমাদেরকে রিয্‌ক দিতে পারে? আসলে এরা বিদ্রোহ ও সত্যবিমুখতায় জিদ ধরে আছে।

أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ أَهْدٰىٓ أَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

২২. (ভেবে দেখো,) যে মুখ নিচু করে চলে[১০] সে কি বেশি সঠিক পথে আছে, না যে মাথা তুলে সোজাসুজি এক সরল পথে চলছে?

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. (হে রাসূল!) এদেরকে বলে দিন, তিনিই (আল্লাহ), যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন এবং (চিন্তা করা ও বোঝার যোগ্য) মন দিয়েছেন; কিন্তু তোমরা কমই শুকরিয়া আদায় করে থাক।[১১]

৯. এর অনুবাদ এভাবেও হতে পারে, 'রাহমান ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদের সেনাবাহিনী হিসেবে তোমাদেরকে সাহায্য করে?'

১০. অর্থাৎ, পশুর মতো মুখ নিচু করে ঐ পথরেখা ধরে যাচ্ছে, যে পথে কেউ তাকে চালিয়ে দিয়েছে।

১১. অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম ও আকল এবং শোনার ও দেখার এসব নিয়ামত সত্যকে চেনার জন্যই দিয়েছেন। এসব দিয়ে তোমরা অন্য সব রকম কাজই করে থাক শুধু ঐ কাজটিই কর না, যার জন্য এসব দেওয়া হয়েছিল। এটা বড়ই নিমকহারামি করছ।

قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٢٤

২৪. এদেরকে বলে দিন, তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্রে জড়ো করা হবে।

وَ یَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝٢٥

২৫. ওরা বলে, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল যে, এ ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে?

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝٢٦

২৬. আপনি বলে দিন, এ বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই আছে। আমি তো স্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র।

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِیْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ قِیْلَ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝٢٧

২৭. তারপর যখন তারা ঐ জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে তখন কাফিরদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, এটাই ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা দাবি জানাচ্ছিলে।

قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِیَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَّعِیَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ یُّجِیْرُ الْكٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝٢٨

২৮. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমাকে ও আমার সাথিদেরকে ধ্বংস করে দিন বা আমাদের উপর দয়া করুন, কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক আযাব থেকে কে বাঁচাবে?[১২]

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝٢٩

২৯. (এদেরকে) বলুন, তিনি বড় দয়াবান। তাঁরই উপর আমরা ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর আমরা ভরসা করে আছি। শিগ্‌গির তোমরা জানতে পারবে যে, কারা স্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে আছে।

قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَّاْتِیْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِیْنٍ ۝٣٠

৩০. (আরো) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি তোমাদের (কূপের) পানি মাটিতে তলিয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানির ধারা বের করে দেবে?

১২. মক্কা শরীফে যখন রাসূল (স)-এর দাওয়াতী কাজ শুরু হলো এবং কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করতে লাগল তখন ঘরে ঘরে রাসূল (স) ও সাহাবীদের উপর বদ দোয়া হতে লাগল। রাসূল (স)-কে মেরে ফেলার জন্য জাদু করা হলো, এমনকি হত্যা করার চিন্তাও করা হলো। এসবের কারণে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে তাদের উদ্দেশে এ কথা বলার আদেশ দিলেন যে, 'আমরা ধ্বংস হই বা আল্লাহর ফজলে বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কী লাভ হবে? তোমরা নিজের চিন্তা কর যে, আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা কীভাবে বাঁচবে?'

৬৮. সূরা কালাম

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরার দুটো নাম। সূরা নূন ও সূরা কালাম। সূরার প্রথম আয়াত থেকেই এ দুটো নাম নেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরার আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরের ঐ সময়ে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, যখন রাসূল (স)-এর বিরোধিতা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় রিসালাত। এ মূল বিষয়ের ভিত্তিতে আরও তিন ধরনের আলোচনা এসেছে–

১. রিসালাতের বিরোধীদের আপত্তি ও সমালোচনার জবাব।
২. তাদেরকে সতর্ক করা ও উপদেশ দান করা।
৩. রাসূল (স)-এর প্রতি সবর করা ও মযবুত থাকার নির্দেশ।

আলোচনার ধারা

১-৪ নং আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে রাসূল (স)-কে পাগল বলার মযবুত জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে কলম ও কলম দিয়ে যা লেখা হচ্ছে তা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা আসলে কুরআনের কসম খেয়ে দ্বিতীয় আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহর মেহেরবানিতে রাসূল (স) নিশ্চয়ই পাগল নন।

বিরোধীদের পক্ষ থেকে পাগল বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও রাসূল (স) তাদেরকে দরদ দিয়ে যে কুরআনের মতো উপদেশপূর্ণ বাণী শোনাচ্ছেন, সেজন্য তৃতীয় আয়াতে রাসূল (স)-এর জন্য অফুরন্ত পুরস্কারের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে রাসূল (স)-এর অতুলনীয় মহান ও উন্নত চরিত্রের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা পরোক্ষভাবে কাফিরদের বিবেককে চাবুক মেরে বলেছেন, এমন চরিত্রের লোককে কোন্ মুখে তোরা পাগল বলিস? পাগল কি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারে? রাসূল (স)-এর আদর্শ, চরিত্র ও তাঁর মুখ থেকে প্রচারিত কুরআনের বাণীই এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, যারা রাসূল (স)-কে পাগল বলছে তারা বিরোধিতার কোনো যুক্তি না পেয়ে অসহায়ভাবে পাগল বলে গালি দিচ্ছে।

৫-৯ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বিরোধীদের এসব প্রলাপে আপনি মন খারাপ করবেন না। কারা পাগল তা সবাই দেখতে পাবে। আপনার রব ভালো করেই জানেন যে, কারা পথহারা হয়েছে আর কারা হেদায়াত পেয়েছে। আপনি ওদের কথায় কান দেবেন

না। আসলে ওদের এ জাতীয় বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য হলো আপনার তৎপরতাকে দমন করা। তারা চায় যে, তাদের গালাগালিতে আপনি ঘাবড়ে গিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে একটু ঢিলা দেন। আপনি যদি একটু নমনীয় হয়ে কাজে পিছিয়ে থাকেন তাহলে তারাও বিরোধিতায় একটু ঢিলা দিতে পারে। কিন্তু আপনি তাদের এ চালবাজিতে পড়বেন না। ইকামাতে দীনের আন্দোলনে আপনি এগিয়ে চলুন, তাদের কোনো পরওয়া করবেন না।

১০-১৬ নং আয়াতে মক্কার সরদারদের মধ্যে যে সবচেয়ে বিরোধী ছিল, তার নাম না নিয়েই তার ঘৃণ্য চরিত্রের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ জঘন্য চরিত্রের কথা সবাই জানত। তাই আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীকে এ কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন যে, তোমরা এমন নিকৃষ্ট লোকের নেতৃত্বে কী করে রাসূল (স)-এর মতো শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের লোকের বিরোধিতা করছ?

১০ থেকে ১৩ নং আয়াতে ঐ লোকের বড় বড় দোষের কথা উল্লেখ করার পর ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এমন ঘৃণ্য লোকটির টাকা-পয়সা ও সন্তান-সন্ততি বেশি আছে বলেই কি তোমরা তার নেতৃত্বে রাসূল (স)-এর বিরোধিতা করছ। এ লোকটির পক্ষে কি কোনো যুক্তি আছে? আমার উপদেশপূর্ণ মূল্যবান আয়াত তাকে যতই শোনানো হোক, সে তা কবুল করে না; বরং সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলে যে, এসব তো পুরান কালের উপকথা মাত্র।

১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হুমকি দিয়ে বলেছেন, এ লোকটিকে আমি দেখিয়ে দেব। সে এত বেশি বেড়ে গেছে যে, ওকে আমি দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান করব।

অহঙ্কারে সে তার নাককে হাতির শুঁড়ের মতো যতই উঁচু করে চলুক, আমি তার অহঙ্কারের নাকে দাগ দিয়ে ছাড়ব।

১৭-৩৩ নং আয়াতে মক্কাবাসীকে এক বাগানের মালিকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ ১৭টি আয়াতে যা বলা হয়েছে এর সারকথা হলো, ঐ বাগানের মালিকরা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার বদলে বাগানের ফল দেখে অহঙ্কারী হয়ে গেল। যে আল্লাহ ঐ বাগানে এমন চমৎকার ফল দিলেন তিনি ইচ্ছে করলেই যেসব ধ্বংস করে দিতে পারেন, সে কথা তারা ভুলে গেল। একদিন সকালে তারা বাগানের ফল পাড়ার জন্য গিয়ে দেখল, বাগানের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তাদের মধ্যে যে লোকটি ভালো ছিল সে তাদেরকে আল্লাহর পথে চলার জন্য উপদেশ দিয়েছিল। কিন্তু তার কথায় তারা কান দেয়নি। বাগানে গিয়ে যখন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দেখল তখন তারা বুঝতে পারল, আল্লাহকে অমান্য করে তারা নিজেদের উপরেই যুলুম করেছে। তখন তারা এ দুরবস্থার জন্য একে অপরকে দোষ দিতে থাকল। আল্লাহর বিদ্রোহী ছিল বলে তারা অনুতাপও করতে লাগল। তখন আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় তারা আল্লাহর দিকে ফিরে এল।

এ উদাহরণের মাধ্যমে মক্কাবাসীকে বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত ভালো ও চরিত্রবান বলে পরিচিত লোকটি তোমাদেরকে আল্লাহর পথে চলার যে উপদেশ দিচ্ছে, সে লোকের কথা অমান্য করে তোমরাও ঐ বাগানের মালিকদের মতোই ভুল করছ। বাগানটি ধ্বংস হওয়ার পর তাদের ভুল বুঝতে পারল; কিন্তু তখন বুঝলেও তাতে তাদের কোনো লাভ হয়নি। তেমনি আজ মক্কাবাসীরা যদি রাসূলের কথা অমান্য করে তাহলে একদিন তাদেরকেও আল্লাহর গযবে পড়তে হবে। তখন আফসোস করলেও কোনো লাভ হবে না। তাই এখনো সময় আছে। হে মক্কাবাসী! তোমরা এখনো ফিরে এসো। নইলে তোমরা দুনিয়ায় তো অপমানিত হবেই, আখিরাতেও কঠিন আযাবে ভুগবে।

১৭ ও ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আমি মক্কাবাসীকে তেমনি পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন একটি বাগানের মালিকদেরকে ফেলেছিলাম। আল্লাহর নাম না নিয়েই বা ইনশাআল্লাহ না বলেই তারা গর্বের সাথে বলেছিল, তারা ঐ বাগানের ফল সকালে অবশ্যই পেড়ে নেবে। দুনিয়ার সবকিছু যে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং সবকিছুর উপরই যে তাঁর ক্ষমতা, সে কথার দিকে মানুষ খেয়াল করে না। মানুষ যখন দেখতে পায় যে, তার চেষ্টার ফলে বাগানে খুব ফল হয়েছে, দোকানে খুব লাভ হয়েছে, কারখানায় খুব উৎপাদন হয়েছে তখন সে নিজেকেই এসবের আসল মালিক মনে করে বসে। এটাই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের পরীক্ষা। আসমানী যেকোনো বালা-মুসিবত দিয়ে এসবই যে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে পারেন সে কথা মানুষ একেবারেই ভুলে যায় এবং এর ফলে সে নিশ্চিন্তে আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকে।

১৯ ও ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ঐ বাগানের মালিকরা যে সকালে ফল পাড়তে যাওয়ার কথা, তার আগের রাতে আল্লাহ ঐ বাগানটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন। মালিকরা তা জানতেও পারল না।

২১ থেকে ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সকালে সবাই একে অপরকে ডাকাডাকি করে খুব খুশিমনে বাগানের দিকে রওয়ানা হলো। তারা ফল পাওয়ার ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত ছিল যে, পথে তারা এ কথা বলাবলি করতে লাগল যে, আজ সব ফলই আমরা বাড়িতে নিয়ে আসব। ফকির-মিসকীনদেরকে কিছুই দেব না।

২৬ ও ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বাগানের জায়গায় পৌঁছে যখন দেখতে পেল, গাছ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে তখন প্রথমে তারা মনে করল যে, বোধ হয় পথ ভুলে অন্য জায়গায় এসে গেছে। কিন্তু চারদিকে খেয়াল করে যখন নিজেদের বাগান চিনতে পারল তখন আফসোস করে বলতে লাগল, 'হায়! আমরা সব ফল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।"

২৮ ও ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন ঈমানদার লোক ছিল। সে লোক অন্য সবাইকে বলল, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিইনি? আল্লাহকে মেনে চললে আজ এ দশা হতো না। তোমরা আমার কথায় কান দাওনি। তখন সবাই বলে উঠল, আমরা মহা অন্যায় করে ফেলেছি এবং নিজেদের উপর নিজেরাই যুলুম করেছি।

৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের এ দুরবস্থার জন্য তারা একে অপরকে দোষ দিতে লাগল। একজন অপরজনকে বলতে লাগল, তুমিই তো আমাদেরকে ফুসলিয়ে আল্লাহর নাফরমান বানিয়েছ।

৩১ ও ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তারা সবাই আফসোস করে বলল, আমরা আল্লাহর বিদ্রোহী হয়ে এ মুসীবতে পড়েছি। এখন আমরা তাওবা করছি এবং আমাদের রবের গোলামি করতে রাজি আছি। হয়তো তিনি আমাদেরকে আগের চেয়ে ভালো বাগান দেবেন।

৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এভাবেই দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানীর সামান্য শাস্তি দেওয়া হয়; কিন্তু আখিরাতের আযাব এর চেয়েও অনেক বেশি কষ্টদায়ক। এসব কথার ভেতর দিয়ে মক্কাবাসীকে সাবধান করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (স) যে সবচেয়ে ভালো মানুষ সে কথা তোমরা জান। তাঁর কথামতো তোমরা যদি আল্লাহর দাসত্ব কবুল না কর তাহলে তোমাদেরকেও ঐ বাগানের মালিকদের মতোই আফসোস করতে হবে। তোমরা যদি এ কথা বুঝতে, তাহলে রাসূল (স)-কে কখনো অস্বীকার করতে সাহস পেতে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৪-৪৭ নং আয়াতে বিভিন্নভাবে যত কথা বলা হয়েছে তাতে কাফিরদেরকে কোথাও উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও সতর্ক করা হয়েছে আবার কোথাও ধমক লাগানো হয়েছে। এ ১৪টি আয়াতের সারকথা নিম্নরূপ :

দুনিয়ায় যারা মুত্তাকী হিসেবে জীবন যাপন করছে তাদের জন্যই আখিরাতের সব নিয়ামত রয়েছে। যারা আল্লাহর কথামতো চলে, তাদের অবস্থা আল্লাহর নাফরমানদের মতো হতেই পারে না। কাফিরদের এ ধারণা একেবারেই ভুল যে, আল্লাহ তাদের সাথে এমন ব্যবহারই করবেন, যা তাদের পছন্দ। এ বিষয়ে তাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে?

দুনিয়ায় যারা আল্লাহকে সিজদা করেনি আখিরাতে তারা করতে চাইলেও পারবে না। সেখানে তাদেরকে অপমানিত হতেই হবে। কুরআনকে অগ্রাহ্য করে আখিরাতে আযাব থেকে বাঁচার উপায়ই থাকবে না। দুনিয়ায় তাদেরকে পাপের সাথে সাথে পাকড়াও না করায় তারা ধোঁকায় পড়ে আছে। রাসূল ও কুরআনকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও যে তাদের উপর আযাব নাযিল হচ্ছে না তাতে ওরা মনে করছে যে, তারা ঠিক পথেই আছে। তারা যে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতেই পারছে না। তারা যে রাসূলের বিরোধিতা করছে এর কোনো যুক্তিই নেই। রাসূল (স) বিনা স্বার্থে তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকছেন। তিনি নিজের জন্য তাদের কাছে কিছুই চান না। তাদের এ কথা দাবি করারও ক্ষমতা নেই যে, তিনি রাসূল নন বা তাঁর কথা সঠিক নয়।

৩৪ থেকে ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বেহেশতের সব নিয়ামত মুত্তাকীদের জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তাঁর দাস ও বিদ্রোহীদের সাথে কি একই ব্যবহার করবেন? তোমরা কীভাবে এমন অযৌক্তিক ধারণা কর?

৩৭ থেকে ৪১ নং আয়াতে কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে, আখিরাতে তোমাদেরই পছন্দমতো সুখ-সুবিধা পাবে বলে যে তোমরা ধারণা করে আছ, এর কী প্রমাণ তোমাদের কাছে আছে? তোমাদের নিকট কি এমন কোনো কিতাব আছে, যেখানে এ জাতীয় লেখা দেখাতে পারবে? আল্লাহ কি তোমাদের সাথে এমন কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, যা কিয়ামতের দিন তিনি পালন করতে বাধ্য হবেন? যদি তোমাদের মধ্যে কারো সাহস থাকে তাহলে সে দাবি করুক যে, কার সাথে আল্লাহর এ জাতীয় চুক্তি হয়েছে। তোমরা যাদেরকে মা'বুদ হিসেবে আল্লাহর সাথে শরিক কর তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করো, যদি তোমাদের দাবি সত্য বলে মনে কর।

৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতে এসব কাফিরকে যখন পাকড়াও করা হবে তখন তাদেরকে সিজদা করতে বলা হবে; কিন্তু তারা সিজদা করতে পারবে না। দুনিয়ায় তারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল বলেই সেখানে তাদেরকে সিজদা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে না। এভাবেই তাদেরকে অপমান করা হবে। ভয়, অপমান ও লজ্জায় এরা নিচের দিকে চেয়ে থাকবে।

৪৪ থেকে ৪৭ নং আয়াতে যদিও রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তবুও আসলে কাফিরদের জন্যই কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, হে রাসূল! যারা কুরআন অস্বীকার করছে তাদের ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। তাদেরকে আমি ঢিলা দিয়ে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব, তারা টেরও পাবে না যে, তাদের বিরুদ্ধে কেমন মযবুত চাল চেলেছি। হে রাসূল! আপনি কি তাদের কাছে কোনো পুরস্কার দাবি করেছেন, যার কারণে আপনার

কথা মানতে ওদের এত আপত্তি হচ্ছে? এরা ঈমান আনার ফলে আপনার কি কোনো ব্যক্তিগত লাভ হবে? আপনি তো তাদের ভালোর জন্যই দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন। তাদের কাছে কি এমন কোনো গায়েবি কথা জানা আছে, যার ভিত্তিতে তারা দাবি করতে পারে যে, এ কুরআন আল্লাহর বাণী নয় বা আপনি আল্লাহর রাসূল নন?

৪৮-৫০ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কাফিরদের এসব বিরোধিতায় পেরেশান না হয়ে সবরের সাথে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। ইউনুস (আ)-এর মতো ধারণা করে নেবেন না যে, আপনার কাওম কোনো সময়ই হেদায়াত হবে না। এমন ধারণা করে ফেললে আপনি তাঁর মতোই ভুল করে বসবেন।

এ প্রসঙ্গে ইউনুস (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর ভুলের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নবী বলে তাঁকে মাছের পেটে আশ্রয় দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আল্লাহ তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন তিনি 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন' বলে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে লাগলেন। (সূরা আম্বিয়া ৮৭ ও ৮৮ নং আয়াত দ্র.)

সূরা সাফ্ফাতের ১৪২ থেকে ১৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর তাওবা কবুল করে তাঁর উপর মেহেরবানী করলেন, মাছের পেট থেকে উদ্ধার করে সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছিয়ে দিলেন এবং ছায়া ও ফলদার গাছ উৎপন্ন করে সেখানে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন।

৫১-৫২ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে আরও বলা হয়েছে, কাফিররা যখন কুরআন শুনতে পায় তখন তারা রাগে ফেটে পড়তে চায়। তারা কীভাবে এর মোকাবিলা করবে তা ভেবে পায় না। তাই ওরা এমনভাবে আপনার দিকে তাকায়, যেন আপনাকে গিলে খেতে চায়। তারা আপনাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতে চায়। অথচ আপনি যে কুরআন তাদের কাছে পেশ করছেন, তা সকল মানুষের জন্য এমন মূল্যবান উপদেশ, যার মূল্য বোঝার যোগ্যতাই এদের নেই।

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ①

১. নূন, কলমের শপথ এবং (ঐ জিনিসের) শপথ, যা লেখকরা লিখছে।[১]

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ②

২. আপনার রবের দয়ায় আপনি পাগল নন।[২]

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ③

৩. নিশ্চয়ই আপনার জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কখনো শেষ হবে না।[৩]

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ④

৪. আর নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রের অতি উচ্চ স্তরে রয়েছেন।[৪]

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ⑤ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ⑥

৫-৬. শিগ্‌গিরই তোমরাও দেখতে পাবে এবং তারাও দেখতে পাবে যে, তোমাদের মধ্যে কে পাগলামিতে পড়ে আছে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ⑦

৭. নিশ্চয়ই আপনার রব তাদেরকেও ভালোভাবেই জানেন, যারা তাঁর পথ থেকে সরে গেছে। আর তিনি তাদেরকেও ঠিকভাবেই জানেন, যারা সঠিক পথে আছে।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑧

৮. তাই আপনি মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের কথা মেনে নেবেন না।

১. মুফাসসিরদের ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন, কলম অর্থ ঐ কলম, যা দিয়ে যিকর বা কুরআন লেখা হচ্ছে। এর দ্বারা আপনা-আপনিই প্রমাণিত হয় যে, 'যা লেখা হচ্ছিল' কথাটির অর্থ হলো কুরআন মাজীদ।

২. এখানে মনে হয়, রাসূল (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু কাফিররা যে রাসূল (স)-কে পাগল বলত সে অপবাদেরই জবাব দেওয়াই হলো এর আসল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এ কুরআন তথা ওহী লেখকদের হাতে যা লেখা হচ্ছে তা নিজেই তাদের ঐ অপবাদের প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট।

৩. অর্থাৎ আপনার জন্য এ কারণে অগণিত ও অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে যে, আপনি মানুষের হেদায়াতের জন্য যে চেষ্টা করছেন, তার বদলায় বড়ই বেদনাদায়ক কথা শোনা সত্ত্বেও আপনি এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৪. অর্থাৎ, কুরআন ছাড়া আপনার উন্নত চরিত্রও এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, কাফিররা আপনাকে পাগল বলে যে অপবাদ দিচ্ছে তা একেবারেই মিথ্যা। কেননা, উন্নত চরিত্র ও পাগলামি একত্র হতে পারে না।

৯. তারা চায় যে, যদি আপনি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।[৫]	وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝
১০. আপনি এমন লোকের কথা মেনে নেবেন না, যে কসম খেয়ে বেড়ায় (এবং যে) অধম;	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝
১১. যে নিন্দুক ও চোগলখোরি করে বেড়ায়;	هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ۝
১২. যে ভালো কাজে বাধা দানকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী ও পাপী;	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝
১৩. যে ভয়ানক চরিত্রহীন এবং এসব দোষের সাথে সাথে যার মূলই বদ (নিকৃষ্ট)।	عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝
১৪. এ কারণে যে, তার অনেক ধন ও সন্তান আছে।[৬]	اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝
১৫. যখন আমার আয়াত তাকে পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এটা তো পুরান কালের উপকথা মাত্র।	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
১৬. শিগ্‌গিরই আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দেব।[৭]	سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝
১৭-১৮. আমি তাদেরকে (মক্কাবাসীকে) ঐ রকম পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন এক বাগানের মালিকদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম, যখন তারা কসম করেছিল যে, খুব সকালে তারা	اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝

৫. অর্থাৎ, আপনি যদি ইসলাম প্রচারে একটু ঢিল দেন তাহলে তারা আপনার বিরোধিতা কিছু কমিয়ে দেবে। অথবা তাদের গোমরাহির খাতিরে যদি আপনার দীনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে তৈরি থাকেন তাহলে তারাও আপনার সাথে আপস করতে রাজি হবে।

৬. এ কথাটির সম্পর্ক আগের কথার সাথেও হতে পারে, পরের কথার সাথেও হতে পারে। আগের কথার সাথে হলে অর্থ হবে, 'এরূপ লোকের ধনবল ও জনবল আছে বলেই তার চাপে কোনো কথা মেনে নেবেন না।' পরের কথার সাথে সম্পর্ক হলে অর্থ হবে, 'অনেক মাল ও সন্তানের অধিকারী হয়ে সে বড় দেমাগি হয়ে গেছে। তাই যখন তাকে আমার আয়াত শোনানো হয় তখন সে বলে, এটা তো পুরানকালের কল্পকাহিনী মাত্র।

৭. সে নিজেকে বড় নাকওয়ালা (উঁচু মর্যাদাবান) মনে করত বলেই তার নাককে শুঁড় বলা হয়েছে। আর নাকে দাগ লাগানোর অর্থ অপমান করা। অর্থাৎ আমি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এমনভাবে হেয় করব, সে কোনো সময় এ হীনতা থেকে মুক্তি পাবে না।

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

অবশ্যই (তাদের বাগানের) ফল পাড়বে। অন্য কিছু হতে পারে বলে তারা ভাবল না।[৮]

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

১৯-২০. তারা (রাতে) যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন আপনার রবের কাছ থেকে এক বিপদ ঐ বাগানের উপর এসে পড়ল এবং এর অবস্থা কাটা ফসলের মতো হয়ে গেল।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

২১-২২. খুব সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, যদি ফল পাড়তে চাও তাহলে সকাল সকাল বাগানে চলো।

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৩-২৪. তারপর তারা রওয়ানা হলো এবং চুপে চুপে একে অপরকে বলতে লাগল, আজ বাগানে যেন কোনো মিসকীন না আসতে পারে।

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. কাউকে কিছু না দেওয়ার ফায়সালা করেই তারা সকালবেলা সেখানে তাড়াতাড়ি এমনভাবে হাজির হলো, যেন তারা (ফল পাড়ার) ক্ষমতা রাখে।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

২৬-২৭. কিন্তু যখন তারা বাগান দেখল তখন বলল, আমরা নিশ্চয়ই রাস্তা ভুলে গেছি; না, বরং আমরা মাহরূম (বঞ্চিত) হয়ে গেছি।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোকটি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, তোমরা কেন তাসবীহ করছ না?[৯]

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. তখন তারা বলে উঠল, আমাদের রব পাক-পবিত্র; আমরা অবশ্যই গুনাহগার ছিলাম।

৮. অর্থাৎ, তাদের আপন ক্ষমতা ও অধিকারের উপর এতটা ভরসা ছিল যে, কসম খেয়ে বিনা দ্বিধায় বলে ফেলল, 'আমরা আগামীকাল অবশ্যই নিজেদের বাগানের ফল পাড়ব।' তারা এ কথা বলার কোনো প্রয়োজনই মনে করেনি যে, 'ইনশাআল্লাহ আমরা এ কাজ করব।'

৯. অর্থাৎ, আল্লাহকে কেন স্মরণ করছ না? কেন এ কথা ভুলে গেলে যে, উপরে বড় কোনো শক্তি আছে?

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ﴿٣٠﴾

৩০. অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।

قالوا يويلنا إنا كنا طغين ﴿٣١﴾

৩১. (শেষ পর্যন্ত) তারা বলল, আমাদের অবস্থার জন্য আফসোস! নিশ্চয়ই আমরা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম।

عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا رغبون ﴿٣٢﴾

৩২. হয়তো আমাদের রব এর বদলে আমাদেরকে এর চেয়ে ভালো বাগান দেবেন, আমরা আমাদের রবের দিকেই ফিরে এলাম।

كذلك العذاب ۖ ولعذاب الأخرة أكبر ۘ لو كانوا يعلمون ﴿٣٣﴾

৩৩. আযাব এ রকমই হয়। আখিরাতের আযাব এর চেয়েও বড়। কতই ভালো হতো, যদি এরা জানত!

রুকূ' ২

إن للمتقين عند ربهم جنت النعيم ﴿٣٤﴾

৩৪. নিশ্চয়ই[১০] মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে নিয়ামতভরা বেহেশত রয়েছে।

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴿٣٥﴾

৩৫. আমি কি অনুগত লোকদের অবস্থা অপরাধীদের মতো করে দেব?

ما لكم ۜ كيف تحكمون ﴿٣٦﴾

৩৬. তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফায়সালা করছ?

أم لكم كتب فيه تدرسون ﴿٣٧﴾ إن لكم فيه لما تخيرون ﴿٣٨﴾

৩৭-৩৮. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে,[১১] যেখানে তোমরা এ কথা পড়েছ যে, তোমাদের জন্য সেখানে ঐ সবকিছুই আছে, যা তোমরা পছন্দ কর?

أم لكم أيمن علينا بلغة إلى يوم القيمة ۙ

৩৯. অথবা তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত পালনীয় আমাদের এমন কোনো ওয়াদার

---

১০. মক্কার বড় বড় সরদার মুসলমানদেরকে বলত, দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত আমরা পাচ্ছি তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আমাদেরকে পছন্দ করেন। আর তোমরা যে দুরবস্থায় আছ তা এ কথারই প্রমাণ যে, তোমরা আল্লাহর বিরাগভাজন। তাই তোমাদের কথামতো যদি কোনো আখিরাত থাকেই তাহলে সেখানেও আমরা সুখেই থাকব। আর আযাব হলে তোমাদের উপরই হবে, আমাদের উপর নয়।

১১. অর্থাৎ, আল্লাহর প্রেরিত কিতাব।

إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

প্রমাণ আছে কি, তোমরা যা ঠিক করে রেখেছ তা অবশ্যই তোমাদেরকে দেওয়া হবে?

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. (হে রাসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তাদের মধ্যে কে এ বিষয়ে জিম্মাদার (দায়িত্বশীল)?

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

৪১. অথবা তাদের পক্ষে কি কোনো শরীক আছে (যারা এ বিষয়ে দায়িত্ব নিয়েছে), তারা এ কথায় সত্যবাদী হলে তাদের শরীকদেরকে নিয়ে আসুক।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. যেদিন কঠিন সময় আসবে এবং সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, সেদিন (এসব লোক সিজদা) করতে পারবে না।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাদের দৃষ্টি নত থাকবে, অপমান তাদের উপর ছেয়ে থাকবে। (অথচ দুনিয়ায়) সুস্থ থাকা অবস্থায় এদেরকে সিজদা করতে বলা হয়েছিল; (কিন্তু এরা অস্বীকার করেছিল)।

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অতএব (হে রাসূল!) এ কালামকে যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা টেরও পাবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

৪৫. আমি তাদের জন্য রশি ঢিলা করছি। নিশ্চয়ই আমার চাল অত্যন্ত মযবুত।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. অথবা আপনি কি তাদের কাছে কোনো বদলা চাচ্ছেন যে, তারা সে বোঝার চাপে দমে যাচ্ছে?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. অথবা তাদের কাছে কি কোনো গায়েবী ইলম আছে, যা তারা লিখে রাখছে?

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. অতএব আপনার রবের হুকুম আসা পর্যন্ত সবর করুন এবং মাছওয়ালার (ইউনুস [আ])[১২] মতো হবেন না, যখন তিনি চিন্তিত অবস্থায় কারতভাবে ডেকেছিলেন।

لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. যদি তার রবের মেহেরবানী তার কাছে না পৌঁছত, তাহলে হেয় অবস্থায় খোলা ময়দানে তাকে ফেলে দেওয়া হতো।

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. অবশেষে তার রব তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাকে নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করে নিলেন।

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

৫১. যখন কাফিররা এই উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে, তখন আপনার দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকে, যেন আপনাকে তারা উৎখাত করে ছাড়বে। আর বলে, 'এ তো নিশ্চয়ই এক পাগল।'

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. অথচ এ (কুরআন) তো সারা জাহানের জন্য এক উপদেশ।

১২. অর্থাৎ ইউনুস (আ)-এর মতো অধৈর্য হবেন না। ধৈর্যের অভাবের কারণেই (তিনি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে হিজরত করলেন, যার ফলে) তাঁকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিল।

৬৯. সূরা হা-ক্বাহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

মাক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমদিকে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। তখন ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু হলেও এতটা জোরদার হয়নি।

এ সূরার সাথে হযরত ওমর (রা)-এর একটা ঘটনার সম্পর্ক থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। হযরত ওমর (রা)-নিজেই বর্ণনা করেছেন, "একদিন আমি রাসূল (স)-কে বিরক্ত করার জন্য গিয়ে দেখলাম, তিনি আমার আগেই মসজিদে হারামে পৌঁছে নামায শুরু করেছেন। নামাযে তিনি সূরা হা-ক্বাহ পড়ছিলেন আর আমি পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। কুরআনের ভাষা এতটা আকর্ষণীয় মনে হলো যে, আমি মনে মনে বলছিলাম, এ লোকটি সত্যি একজন কবি। তখনই তিনি এ আয়াত পড়লেন, 'এ কালাম কোনো কবির রচনা নয়।' মনে মনে বললাম, 'তাহলে লোকটি জাদুকর হবে', তখনই ঐ আয়াত পড়লেন, 'এটা কোনো জাদুকরের কথা নয়। তোমরা কমই খেয়াল কর, এটা তো রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।' তখন ইসলামের প্রভাব আমার মনে দাগ কাটল।"

আলোচনার বিষয়

এর প্রথম রুকূ'তে আখিরাতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় রুকূ'তে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদ আল্লাহরই বাণী এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহরই রাসূল।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কিয়ামত ও আখিরাত এমন নিশ্চিত বিষয় যে, তা হবেই হবে।

৪-১২ নং আয়াতে 'আদ ও সামূদ জাতি এবং ফিরাউন ও নূহ (আ)-এর কাওম রাসূলকে অমান্য এবং কিয়ামত ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করার ফলে তাদের উপর কী ধরনের আযাব নাযিল হয়েছিল এর বিবরণ রয়েছে।

১৩-১৭ নং আয়াতে সংক্ষেপে কিয়ামতের একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

১৮-৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঐ আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, যে জন্য তিনি মৃত্যুর পর আবার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। বলা হয়েছে, যেদিন সব মানুষকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হবে, সেদিন সবার গোপন বিষয়ই প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের অমলনামা হাতে হাতে দেওয়া হবে এবং যার যার আমল অনুযায়ী সবাই পুরস্কার ও শাস্তি পাবে।

১৯-২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারা খুশি হয়ে তা সবাইকে দেখাবে। তারা এ কথা মনে করে তৃপ্তিবোধ করবে যে, আমরা দুনিয়ার জীবনের সব কাজ-কর্মের হিসাব এখানে দিতে হবে মনে করে জীবন যাপন করেছিলাম বলেই এ সৌভাগ্য হয়েছে। এর ফলে তারা বেহেশতে তাদের মনমতো সুখে থাকার অনুমতি পাবে।

২৫-২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যাদের আমলনামা বাঁ হাতে দেওয়া হবে, তারা শুধু 'হায় আফসোস' করতে থাকবে।

৩০-৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তখন হুকুম দেবেন যে, এদেরকে পাকড়াও করে শিকল দিয়ে বেঁধে দোযখে ফেলে দাও। কারণ, এরা বেঈমান। এদের অন্তরে গরিবের জন্য দরদ ছিল না। এখানে এদের জন্যও কোনো দরদি বন্ধু নেই। দোযখে অপরাধী হিসেবে এদেরকে খাবার জন্য পুঁজ দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৮-৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন কোনো কবি বা জাদুকরের রচনা নয়। রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে এ কুরআন নাযিল হয়েছে। অবশ্য রাসূল (স)-এর মুখ থেকেই তোমরা কুরআন শুনতে পাচ্ছ; কিন্তু এর ভাব ও ভাষার দিকে তোমরা খেয়াল করছ না। খেয়াল করলে তোমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কোনো মানুষ এমন বাণী রচনা করতে পারে না।

৪৪-৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, কুরআনের বাণীর মধ্যে কোনো রকম রদ-বদল করার কোনো ইখতিয়ার কোনো রাসূলকে দেওয়া হয়নি। কাফিরদের সন্দেহ ও অপপ্রচারের জবাবে এখানে আল্লাহ তাআলা জোর দিয়ে বলেছেন, আমি ওহীর মাধ্যমে যে কথা নাযিল করি, রাসূল তা-ই তোমাদের কাছে পেশ করেন। যদি রাসূল নিজের কোনো কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন তাহলে আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতাম। তিনি এমন কিছু করতেই পারেন না। তাই আমার কালাম হিসেবেই কুরআনকে তোমরা কবুল করে নাও।

৪৮-৫২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআন সম্পর্কে আরো ঘোষণা দিয়েছেন, একমাত্র মুত্তাকীরাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যারা উপদেশ নেয় না, তাদেরকে আমি চিনি। তারা কুরআনকে সত্য বলে গ্রহণ না করলে আল্লাহ ও রাসূলের কিছুই আসে-যায় না; তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা গ্রহণ করুক আর না-ই করুক, কুরআন অবশ্যই মহাসত্য। সুতরাং হে রাসূল! আপনার মহান রবের নাম নিয়ে তাসবীহ করুন এবং কাফিরদের কোনো পরওয়া না করে আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

সূরা হা-ক্কাহ্

৫২ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْحَاۤقَّةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَاۤقَّةُ ﴿١﴾

১. ঐ ঘটনা ঘটবেই।[১]

مَا الْحَاۤقَّةُ ﴿٢﴾

২. কী সে ঘটনা, যা ঘটবেই ঘটবে?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ﴿٣﴾

৩. সে ঘটনাটি সম্পর্কে তুমি কী জানো, যা ঘটবেই ঘটবে?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

৪. সামূদ ও 'আদ জাতি ঐ মহাবিপদকে[২] মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যা হঠাৎ ঘটবে।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾

৫. সামূদ (জাতি)-কে তো এক কঠিন দুর্ঘটনা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾

৬. আর 'আদ (জাতি)-কে এক ভয়ানক তুফানি বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

৭. (আল্লাহ) তাদের উপর একটানা সাত রাত ও আট দিন (এ মহাবিপদ) চাপিয়ে রেখেছিলেন। তুমি (ওখানে থাকলে) দেখতে যে, তারা খেজুর গাছের পচা কাণ্ডের মতো লুটিয়ে পড়ে আছে।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

৮. এখন তাদের কাউকে কি তুমি বেঁচে আছে দেখতে পাও?

وَجَاۤءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

৯. ফিরাউন, তার আগের লোকেরা ও ওলট-পালট হওয়া বস্তিগুলো[৩] এ মহা অন্যায়ই করেছিল।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

১০. তারা সবাই তাদের রবের রাসূলদের কথা অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে খুব শক্তভাবে পাকড়াও করলেন।

---

১. আয়াতে 'আল হা-ক্কাহ্' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো ঐ ঘটনা, যা অবশ্যই ঘটবে। অর্থাৎ তোমরা যত খুশি অস্বীকার কর, ঐ ঘটনা অবশ্যই ঘটবে। তোমাদের অস্বীকার করার কারণে এ ঘটনা ঘটা বন্ধ থাকবে না।

২. কিয়ামত 'হবেই হবে' বলার পর এখানে এর ভয়াবহতার ধারণা দেওয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ, লূত (আ)-এর বস্তিগুলো, যা ওলট-পালট করে দেওয়া হয়েছে।

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

১১-১২. যখন পানির বন্যা সীমা পার হয়ে গিয়েছিল,[৪] তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছিলাম।[৫] যাতে এ ঘটনাকে তোমাদের জন্য আমি উপদেশপূর্ণ বানাতে পারি এবং মনে রাখার যোগ্য কান এটাকে হেফাযত করতে পারে।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

১৩. তারপর যখন এক দফা শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾

১৪. এবং জমিন ও পাহাড়কে তুলে একই আঘাতে চুরমার করে দেওয়া হবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

১৫. সেদিনই ঐ ঘটনাটি ঘটে যাবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

১৬. ঐদিন আসমান ফেটে যাবে, ফলে এ বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বে।

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৭. ফেরেশতারা এর আশপাশেই থাকবে এবং সেদিন আট জন ফেরেশতা তোমার রবের আরশ তাদের উপর বহন করে রাখবে।[৬]

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৮. সেদিন তোমাদেরকে হাজির করা হবে, তোমাদের কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকবে না।

৪. এখানে নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

৫. যদিও ঐসব লোককেই নৌকায় চড়ানো হয়েছিল, যারা হাজার হাজার বছর আগে ছিল, তবুও যেহেতু মানববংশ ঐ লোকদেরই সন্তান, সেহেতু বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে নৌকায় চড়ানো হয়েছিল।

৬. এ কথাটি মুতাশাবিহাতের মধ্যে গণ্য, যার অর্থ বোঝা কঠিন। এ কথাও আমাদের জানার ক্ষমতা নেই যে, আরশ কী জিনিস। আর এ কথাও আমাদের বোঝার সাধ্য নেই যে, কিয়ামতের দিন আরশকে আট জন ফেরেশতা বহন করার ধরন কী হবে। আয়াতেও এ কথা বলা হয়নি যে, ঐ সময় আল্লাহ তাআলা আরশে বসা থাকবেন। আর কুরআন আমাদেরকে ঐ মহান সত্তার যে ধারণা দিয়েছে, তাও এ ধারণা পোষণ করতে দেয় না যে, তিনি দেহ, দিক ও স্থানের ঊর্ধ্বে সত্তা হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় আসন গ্রহণ করেন এবং কোনো সৃষ্টি তাঁর আসন বহন করে থাকে। তাই এর অর্থ ঘাঁটাঘাঁটি করার চেষ্টা করা নিজেকে গোমরাহির বিপদে লিপ্ত করারই শামিল।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

১৯-২০. তখন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, দেখ দেখ, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি মনে করতাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই আমাকে পেতে হবে।[৭]

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২১. ফলে সে তার পছন্দনীয় আরামে থাকবে।

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২২. উঁচু মানের বেহেশতে।

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যার ফলগুলোর গুচ্ছ ঝুঁকে থাকবে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৪. (তাদেরকে বলা হবে,) যা তোমরা অতীত দিনগুলোতে করেছ, এর বদলায় তোমরা মজা করে খাও ও পান কর।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, হায়! আমার আমলনামা যদি দেওয়াই না হতো!'

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

২৬. আমার হিসাব কী তা যদি আমি না-ই জানতাম![৮]

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

২৭. 'হায়! আমার ঐ মৃত্যু (যা দুনিয়ায় এসেছিল) তা-ই যদি আমার শেষ হতো!'

مَآ أَغْنٰى عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

২৮. (আজ) আমার মাল আমার কোনো কাজে আসল না।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

২৯. আমার সব ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।[৯]

৭. অর্থাৎ সে তার সৌভাগ্যের কারণ এটাই বলবে যে, সে দুনিয়ায় আখিরাত সম্পর্কে গাফিল ছিল না; বরং এ হিসাব করেই জীবন যাপন করেছে যে, একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের হিসাব দিতে হবে।

৮. এ আয়াতের আরেকটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে, আমি কখনো জানতামই না যে, হিসাব বলে কোনো আপদ আছে। কখনো আমার এ খেয়ালও আসেনি যে, একদিন আমাকে নিজের হিসাবও দিতে হবে এবং আমার সব কার্যকলাপ আমার সামনে রেখে দেওয়া হবে।

৯. অর্থাৎ, দুনিয়ায় যে ক্ষমতার বলে আমি দেমাগ নিয়ে চলতাম তা এখানে খতম হয়ে গেছে। এখানে আমার কোনো বাহিনী নেই, আমার হুকুম মেনে চলার মতো কেউ নেই। আমি এক অসহায় ও নিরুপায় বান্দাহ হিসেবে খাড়া আছি, যে নিজের আত্মরক্ষার জন্য কিছুই করতে পারে না।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝

৩০. (তখন হুকুম হবে) ওকে ধর এবং ওর গলায় বেড়ি লাগাও।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝

৩১. এরপর ওকে দোযখে ফেলে দাও।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

৩২. তারপর ওকে সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বাঁধ।

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

৩৩. নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত না।

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

৩৪. সে মিসকীনকে খাবার দেওয়ার জন্য উৎসাহ দিত না।[১০]

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۝

৩৫. তাই তার জন্য আজ এখানে কোনো দরদি বন্ধু নেই।

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝

৩৬. জখমের পুঁজ ছাড়া অন্য কোনো খাবার নেই।

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

৩৭. অপরাধী ছাড়া অন্য কেউ এ (খাবার) খাবে না।

রুকূ' ২

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

৩৮-৩৯. অতএব তা নয়।[১১] আমি (ঐসব জিনিসের) কসম করছি, যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۝

৪০-৪১. নিশ্চয়ই এ (কুরআন) রাসূলে কারীমের (কাছে পাঠানো) বাণী, কোনো কবির রচনা নয়; কিন্তু তোমরা কমই ঈমান এনে থাক।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝

৪২. এটা কোনো জাদুকরের কথাও নয়; তোমরা কমই খেয়াল কর।

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৪৩. এটা সারা জাহানের রবের তরফ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

---

১০. অর্থাৎ নিজে কোনো গরিবকে খাওয়ানো তো দূরের কথা; কাউকে এটুকু কথা বলাও পছন্দ করত না যে, আল্লাহর ভুখা বান্দাহকে খাবার দিয়ে দাও।

১১. অর্থাৎ, তোমরা যাকিছু ধারণা করে আছ, আসল কথা তা নয়।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

৪৪. এ (রাসূল) যদি নিজের কথা আমার নামে চালিয়ে দিত,

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

৪৫. তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তারপর নিশ্চয়ই তার শাহরগ কেটে দিতাম।

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তখন তোমাদের কেউই (আমাকে) তা থেকে ফেরাতে পারত না।[১২]

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আসলে এ (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে কতক লোক মিথ্যা সাব্যস্তকারী রয়েছে।

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. নিশ্চয়ই এটা কাফিরদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

৫১. এ (কুরআন) অবশ্যই খাঁটি সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং (হে রাসূল!) আপনার মহান রবের নামে তাসবীহ করুন।

---

১২. এ কথা বলাই আসল উদ্দেশ্য যে, ওহীর মধ্যে কিছু কম বা বেশি করার কোনো ইখতিয়ার নবীর নেই। আর যদি কোনো নবী এমন করে, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেব। কিন্তু এ কথাকে এমনভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে চোখের সামনে এ ছবি ফুটে ওঠে যে, এক বাদশাহর কোনো কর্মচারী বাদশাহর নামে কোনো জাল ফরমান জারি করল আর অমনি তাকে পাকড়াও করে মেরে ফেলা হলো। এ আয়াত থেকে কিছু লোক এ ভুল দলিল পেশ করেছে যে, কোনো লোক নবুওয়াতের দাবি করার সাথে সাথে আল্লাহ যদি তার গর্দান উড়িয়ে না দেন তাহলে প্রমাণ হবে যে, সে নবী। অথচ এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা সত্যিকার নবী সম্পর্কে; নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের সম্পর্কে নয়। মিথ্যা দাবিদাররা তো শুধু নবুওয়াতই দাবি করে না; খোদায়ী দাবিও করে। এরপরও তারা যে দুনিয়ায় নেচে বেড়ায় এটা তাদের দাবির সত্যতার প্রমাণ নয়।

৭০. সূরা মা'আরিজ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

তৃতীয় আয়াতের 'মা'আরিজ' শব্দ দিয়ে এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরার অর্থের দিকে খেয়াল করলে বোঝা যায়, এ সূরাটিও ঐ পরিবেশেই নাযিল হয়েছে, যে পরিবেশে সূরা হা-ক্কাহ নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরাতে ঐসব কাফিরদেরকে সতর্ক করার সাথে সাথে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যারা কিয়ামাত, আখিরাত, দোযখ ও বেহেশতের কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা রাসূল (স)-কে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলত, আমরা তোমার সব কথাকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে যদি শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গিয়ে থাকি তাহলে ঐ কিয়ামত নিয়ে এস, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ। গোটা সূরাটিতেই ঐ চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১ ও ২ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কাফিররা আখিরাতের আযাবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ও সে বিষয়ে ঠাট্টা করে আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে যে, ঐ আযাব এনে দেখাও, যা আল্লাহর কাছ থেকে আসবে বলে তুমি ভয় দেখাচ্ছ। সে আযাব আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে। যখন আসবে তখন কেউ তা ফেরাতে পারবে না। আযাব চাওয়ার সাথে সাথে না আসার কারণে যারা মনে করে, আযাব আসবেই না, তাদের কোনো ধারণাই নেই যে, সৃষ্টিজগতের পরিকল্পনায় বিভিন্ন কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা মহাকালের সময়টাকে কীভাবে নির্দিষ্ট করেন।

৩ ও ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা একটু আভাস দিয়েছেন যে, আল্লাহর নিকট কোটি বছরের দীর্ঘ সময়ও মহাকালের ক্ষুদ্র অংশ বলেই গণ্য। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে এক-একটা দিন দুনিয়ার মানুষের সময়ের হিসাবে এক হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়ায় মানুষকে বাস করার সুযোগ দিচ্ছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। দীর্ঘ সময় পর আবার সব মানুষকে জীবিত করবেন।

আল্লাহর এ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ীই একসময় তিনি কাফিরদের উপর দুনিয়াতেই আযাব নাযিল করবেন। এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সত্ত্বেও তারা যখন চায় তখনই আযাব নাযিল করা হয় না।

এ দুটো আয়াত 'মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহের মধ্যে গণ্য। হযরত জিবরাঈল ও অন্যান্য ফেরেশতা দুনিয়ার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পর আল্লাহর কাছে এর হিসাব পেশ করতে চান। আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য কোন্ ধরনের সিঁড়ি তাঁরা ব্যবহার করেন, আল্লাহর কাছে যাওয়ার অর্থই বা কী এবং

পঞ্চাশ হাজার বছরে কতটা দূরে যান ইত্যাদি বোঝার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। এসব কথা দ্বারা এটুকু ধারণাই দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর বিরাট পরিকল্পনায় সময়ের হিসাবটা বোঝার সাধ্যও মানুষের নেই।

৫-৭ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল! আমার আযাব নিয়ে কাফিররা যে ঠাট্টা করছে তাতে বিরক্ত হবেন না। আমি আমার হিসাবমতোই যথাসময়ে আযাব দেব। ওদের কথায় অধৈর্য হয়ে আমি এখনই আযাব নাযিল করব না। আপনি সবর করুন। আমার আযাব এখনই আসেনি বলে ওরা মনে করছে যে, আসবেই না। আমার হিসাবে ওদের জন্য আযাব কাছেই আছে, কেবল সঠিক সময়ের অপেক্ষা।

৮-১৪ নং আয়াতে ঐ কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা নিয়ে কাফিররা ঠাট্টা করছিল এবং রাসূল (স)-এর নিকট দাবি করছিল যে, আযাব এনে দেখাও। যখন সত্যি সে আযাব আসবে তখন কাফিরদের কেমন দশা হবে তা এখানে বলা হয়েছে। তখন ওরা তাদের বিবি-বাচ্চা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনকে কুরবানী দিয়ে হলেও ঐ আযাব থেকে বাঁচতে চাইবে; কিন্তু কোনো রকমেই বাঁচতে পারবে না।

১৫-১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে এমন কঠিন আগুনে ফেলা হবে, যার ফলে তাদের চামড়া ঝলসে যাবে। দোযখ তাদেরকেই ডাকতে থাকবে, যারা রাসূলের সত্যতার উপর বিশ্বাস করেনি এবং আখিরাতের কথা ভুলে দুনিয়ায় কেবল ধন-দৌলতের নেশায়ই মত্ত হয়েছিল।

১৯-২১ নং আয়াতে মানুষের স্বভাব-চরিত্রের একটা বড় দুর্বলতা সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অস্থিরমনা। আপদ-বিপদ দেখলেই মানুষ অস্থির হয়ে ঘাবড়ে যায়। আর যখন তাকে ধন-সম্পদ দেওয়া হয় তখন সে মালের মহব্বতে এতটা পাগল হয়ে যায় যে, সে তা কল্যাণের পথে খরচই করতে চায় না। সাধারণ অবস্থায় মানুষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে এ দুর্বলতা রয়েছে।

২২-৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাহস দিয়ে বলেছেন, মানুষের স্বভাবের যেসব দুর্বলতা রয়েছে তা এমন নয় যে, এ থেকে বাঁচার ক্ষমতাই তাদের নেই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছেন। যারা পশুর মতো শুধু দেহের দাবি মেনে দুনিয়ার মজা লোটার তালেই থাকে তারা ঐ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়ে নাফসের গোলামই থেকে যায়।

কিন্তু যারা মানবজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করে তারা ঐ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নাফসের দাবিকে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে এ যোগ্যতা দান করেছেন যে, মানুষ যখন 'খাও-দাও ও ফূর্তি কর' জাতীয় পশুসুলভ জীবন পছন্দ না করে বিবেকের দাবি অনুযায়ী বড় কিছু করতে চায় তখন সে নাফসের দাবিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা লাভ করে। সে তখন দুনিয়ার সব সুখ-সুবিধা কুরবানী দিয়ে জীবনের মহৎ ও বড় কোনো উদ্দেশ্যে মানবীয় সব দুর্বলতা জয় করে নেয়।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কল্যাণ পাওয়াকেই যারা জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, তারা মানবীয় দুর্বলতার নিকট পরাজিত হয় না। ঈমানের বলে নাফসের উপর বিজয়ী হওয়ার যোগ্যতার দরুন তাদের মধ্যে উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টি হয়। এ ১৪টি আয়াতে এরই বিবরণ দিয়ে শেষদিকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এসব গুণের লোকেরাই বেহেশতে সম্মানের সাথে চিরদিন থাকবে। সে

গুণগুলোর তালিকা নিম্নরূপ :

১. তারা নিয়মিত নামায আদায় করে (২৩ নং আয়াত)।

২. তারা অভাবীদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে এবং তাদের মালে গরিবদের হক আছে বলে স্বীকার করে (২৪ ও ২৫ নং আয়াত)।

৩. তারা আখিরাতের বিচারদিবসকে সত্য মনে করে এবং সেখানে দুনিয়ার কাজের হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস করে (২৬ নং আয়াত)।

৪. তারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করে এবং সে আযাব থেকে কখনো নির্ভয় হয় না (২৭ ও ২৮ নং আয়াত)।

৫. তারা বিবাহিত স্ত্রী ও দাসী ছাড়া কোনো মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখে না (২৯ ও ৩০ নং আয়াত)।

৬. তারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে (৩২ নং আয়াত)।

৭. তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সত্য গোপন রাখে না (৩৩ নং আয়াত)।

৮. তারা সর্ব প্রকারে নামাযের হেফাযত করে (৩৪ নং আয়াত)।

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৬-৩৯ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে এমনভাবে বলা হয়েছে যে, একদিকে এতে কাফিরদের প্রতি ধমক বোঝা যায় এবং অপরদিকে রাসূল (স)-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে রাসূল! আপনি এদেরকে কুরআন শোনাচ্ছেন এবং দীনের দাওয়াত তাদের কাছে পেশ করছেন; অথচ এরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য আপনাকে চারদিক থেকে এসে ঘিরে ফেলে। এদের কী হয়েছে? এরা কী চায়? এরা কি সত্যি বেহেশতে যেতে চায়? যারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য তাদের গুণাবলি এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাফিরদের কি এতটুকু আকলও নেই যে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই তারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। এর জন্য অবশ্যই ঈমান ও আমল প্রয়োজন। যার বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে।

৪০ ও ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন, এরা যদি ঈমান না আনে তাহলে তিনি তাদের চেয়ে ভালো কোনো কাওমকে রাসূলের সমর্থক বানিয়ে দেবেন। রাসূলকে যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে সে কাজ অবশ্যই হবে। মক্কাবাসীরা যদি সে কাজে রাসূলের সহযোগী না হয়, তাহলে অন্য লোক দিয়ে রাসূলকে সাহায্য করার ক্ষমতা আল্লাহর আছে। এ বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে বিফল করার সাধ্য কারো নেই। পরবর্তীকালে মদীনাবাসীদেরকে রাসূল (স)-এর সমর্থক হওয়ার তাওফীক দিয়ে আল্লাহ ঐ কথাই সত্য প্রমাণিত করলেন।

৪২-৪৪ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে, আপনি কাফিরদের বাড়াবাড়িতে পেরেশান হবেন না; দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যান। যারা হেদায়াত কবুল করছে না তাদেরকে এ জীবনের কটা দিন খেল-তামাশা ও বাজে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকতে দিন, যখন সময় আসবে তখন তাদেরকে ধাওয়া করে বিচারের জন্য আনা হবে। সেদিনের ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হবে। সেদিন চরম অপমানের দরুন তারা চোখ তুলে চাইতেও পারবে না।

সূরা মা'আরিজ

৪৪ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤٤ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿۱﴾

১. দাবিদার ঐ আযাব দাবি করল, যা হবেই হবে।

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿۲﴾

২. (ঐ আযাব) কাফিরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ؕ﴿۳﴾

৩. (ঐ আযাব) তাঁর পক্ষ থেকে (আসবে), যিনি উপরে ওঠার সিঁড়িগুলোর মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ﴿۴﴾

৪. ফেরেশতারা ও রূহ[১] এমন এক দিনে তাঁর দিকে উঠে যায়[২], যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।[৩]

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿۵﴾

৫. তাই (হে রাসূল), আপনি ভদ্রভাবে[৪] সবর করুন।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ﴿۶﴾

৬. এরা (আযাবকে) দূরে মনে করে।

وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ؕ﴿۷﴾

৭. আর আমি তা কাছেই দেখছি।

---

১. রূহ অর্থ জিবরাঈল (আ)। ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁর নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এ বিষয়টা মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ নির্দিষ্ট করা যাবে না। আমরা ফেরেশতাদের হাকীকতও জানি না, তাদের উপরে ওঠার ধরনও বুঝতে পারি না। আমাদের মগজে এ ধারণা করাও অসম্ভব যে, ঐ সিঁড়িই বা কেমন, যা দিয়ে ফেরেশতারা উপরে ওঠেন। আর আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেও এ ধারণা চলে না যে, তিনি কোনো বিশেষ জায়গায় থাকেন। কারণ, তাঁর সত্তা স্থান ও কালের উর্ধ্বে।

৩. সূরা হাজ্জের ৪৭ নং আয়াত ও সূরা সাজদার ৫ নং আয়াতে হাজার বছরে একদিন বলা হয়েছে। এখানে আযাব দেওয়ার দাবির জবাবে আল্লাহ তাআলার একদিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছর বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ নিজেদের সংকীর্ণ খেয়াল, চিন্তা ও দৃষ্টির ফলে আল্লাহর ব্যাপারও নিজেদের সময়ের মানদণ্ডেই মাপে এবং ৫০ বা ১০০ বছর কালও বিরাট লম্বা মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে এক-একটি প্রকল্প ১ হাজার ও ৫০ হাজার বছরের হয়ে থাকে। আর এ মেয়াদও শুধু নমুনা হিসেবেই বলা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ এমন সবর, যা একজন উদার ও উন্নত মানের মানুষের জন্য শোভনীয় হয়।

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ﴿٨﴾

৮. (ঐ আযাব ঐদিন হবে,) যেদিন আসমান গলিত রুপার মতো হয়ে যাবে।[৫]

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ﴿٩﴾

৯. আর পাহাড়ও রঙিন ধোনা পশমের মতো হয়ে যাবে।

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۚ﴿١٠﴾

১০. কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুও তার প্রিয় বন্ধুর খোঁজ নেবে না।

يُّبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ ۙ﴿١١﴾

১১. (অথচ) তারা একে অপরকে দেখতে পায়– এমনভাবে তাদেরকে রাখা হবে। অপরাধী ইচ্ছা করবে যে, আযাব থেকে বাঁচার জন্য তার সন্তানকে,

وَصَاحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ۙ﴿١٢﴾

১২. তার স্ত্রী ও ভাইকে,

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِى تُـْٔوِيهِ ۙ﴿١٣﴾

১৩. তার ঐ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে, যে তাকে আশ্রয় দিত

وَمَن فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۙ﴿١٤﴾

১৪. এবং দুনিয়ার সবাইকে সে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে, যেন এ তদবির তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়।

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۙ﴿١٥﴾

১৫. কক্ষনো নয়! নিশ্চয়ই তা (আগুনের) লেলিহান শিখা।

نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ۚ﴿١٦﴾

১৬. যা চামড়াকে ঝলসিয়ে তুলে নেয়।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۙ﴿١٧﴾

১৭. (দোযখ) ঐ লোককে তার দিকে ডাকতে থাকবে, যে (সত্য থেকে) পালিয়েছে ও মুখ ফিরিয়েছে,

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾

১৮. আর মাল জমা করেছে, তারপর আঁকড়িয়ে রেখেছে।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۙ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয়ই মানুষকে অস্থিরমনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬]

৫. অর্থাৎ, বারবার রঙ বদলাবে।

৬. আমরা যে কথাকে এভাবে বলি, 'এটা মানুষের মজ্জাগত বা স্বভাবগত' অথবা 'এটা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা'– এ কথাটাকেই আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেছেন যে, 'মানুষকে এ স্বভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

২০. যখন তার উপর খারাপ অবস্থা আসে তখন সে হতাশ হয়।	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾
২১. আর যখন তার অবস্থা ভালো হয় তখন সে কৃপণ হয়।	وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾
২২. কিন্তু ঐসব লোক (এসব দোষ থেকে বেঁচে আছে) যারা নামাযী,	إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾
২৩. যারা সবসময় তাদের নামায আদায়কারী।	الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾
২৪-২৫. যাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য নির্দিষ্ট হক রয়েছে।	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾
২৬. যারা বিচারদিবসকে সত্য বলে মানে।	وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং যারা তাদের রবের আযাবকে ভয় করে।	وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. নিশ্চয় তাদের রবের আযাবকে নিরাপদ মনে করা যায় না।	إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾
২৯-৩০. আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে তাদের বিবি বা দাসীর ব্যাপারে ছাড়া। নিশ্চয়ই তারা এ বিষয়ে নিন্দার পাত্র নয়।	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾
৩১. অবশ্য যারা এর চেয়ে বেশি চায় তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী।	فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾
৩২. যারা তাদের আমানত ও ওয়াদার রক্ষক,	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর যারা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে (সততার উপর) কায়েম থাকে	وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং যারা তাদের নামাযকে হেফাযত করে,	وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এমন সব লোকই সম্মানের সাথে বেহেশতে যাবে।	أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

রুকূ' ২

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

৩৬-৩৭. অতএব (হে রাসূল), কাফিরদের কী হয়েছে যে, ওরা ডান ও বাঁ দিক থেকে দলে দলে আপনার দিকে দৌড়ে আসছে?[৭]

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

৩৮. এদের প্রত্যেকেই কি লোভ করে যে, তাদেরকে নিয়ামতভরা বেহেশতে দাখিল করা হবে?

كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৯. কক্ষনো নয়! এদেরকে আমি যে জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছি তা এরা জানে।

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۝ عَلٰى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

৪০-৪১. সুতরাং তা নয়। আমি পূর্ব ও পশ্চিম দিকগুলোর[৮] রবের কসম খাচ্ছি। তাদের বদলে আমি তাদের চেয়ে ভালো মানুষ নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখি। (এ বিষয়ে) আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে এমন কেউ নেই।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝

৪২. অতএব (হে রাসূল!), সে দিনটি সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে। ঐ দিনটিতে হাজির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় পড়ে থাকতে দিন।

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ۝

৪৩. সেদিন এরা তাড়াতাড়ি কবর থেকে এমনভাবে বের হবে, যেন দেবতার আস্তানায় দৌড়ে যাচ্ছে।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝

৪৪. তাদের চোখ নিচু থাকবে, অপমান তাদের উপর ছেয়ে থাকবে। এটাই ঐদিন, যার ওয়াদা এদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

৭. এখানে ঐসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূল (স)-এর দাওয়াত, তাবলীগ ও কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং হাসি-ঠাট্টা করার জন্য চারদিক থেকে দৌড়ে আসত।

৮. 'পূর্ব ও পশ্চিমসমূহ' কথাটি এ অর্থেই বলা হয়েছে যে, বছরের মধ্যে সূর্য প্রতিদিন এক নতুন কোণে উদিত হয় এবং নতুন কোণে অস্ত যায়। তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদয় ও অস্ত যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে পূর্ব ও পশ্চিম এক নয়, বহু।

৭১. সূরা নূহ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরাটির নাম নূহ। এর আলোচ্য বিষয়ও নূহ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাটিতে নূহ (আ)-এর কাহিনীই বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটিও মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরে নাযিল হয়েছে। সূরার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তখন রাসূল (স)-এর বিরোধিতা যথেষ্ট তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

আলোচ্য বিষয়

নূহ (আ)-এর কাহিনীর মাধ্যমে এখানে মক্কাবাসীদেরকে সাবধান করে বলা হয়েছে, তোমরা মুহাম্মদ (স)-এর সাথে ঐ রকম ব্যবহারই করছ, যে রকম নূহ (আ)-এর সাথে তাঁর পথভ্রষ্ট কাওম করেছিল। যদি তোমাদের আচরণ না বদলায় তাহলে তোমাদের ঐ পরিণামই হবে, যা তাদের হয়েছিল। এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় 'রিসালাত'।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি নূহ (আ)-কে তার কাওমের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠালাম, যাতে তিনি জনগণকে হেদায়াতের উদ্দেশ্যে সাবধান করে দেন এবং আযাব আসার আগেই তারা সতর্ক হয়ে আল্লাহর পথে আসে।

২-৪ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, নূহ (আ) কীভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেছেন। বলা হয়েছে, তিনি তাঁর দেশবাসীকে বললেন, 'আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। তোমরা একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব কর, শুধু তাঁকেই ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। তাহলে তোমাদের আগের সব গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের দুনিয়ায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন। কিন্তু যদি তোমরা এ কথা না শোন তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহ আযাব নাযিল করবেন এবং আযাবের ফায়সালা হয়ে গেলে আর উপায় থাকবে না।'

৫-২০ নং আয়াতে নূহ (আ)-এর ইসলামী আন্দোলনের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। বহু বছর তিনি দেশবাসীকে হেদায়াত করার জন্য কীভাবে চেষ্টা করে এসেছেন, এখানে তারই রিপোর্ট তিনি আল্লাহর নিকট পেশ করেছেন :

১. ৫-৭ নং আয়াতে তিনি বলেছেন, রাত-দিন যতই তাদের হেদায়াতের চেষ্টা করেছি ততই তারা আরো বেশি দূরে সরে গিয়েছে। আমার কথা যাতে শুনতে না পায় সে জন্য তারা কানে আঙুল ঠেসে দিয়ে রেখেছে। জিদ ও অহঙ্কার তাদেরকে পেয়ে বসেছে।

২. ৮-১০ নং আয়াতে তিনি বলেছেন, আমি কোনো সময় অত্যন্ত জোর দিয়ে তাদেরকে উপদেশ শোনানোর চেষ্টা করেছি। কোনো সময় অনেক লোকের সামনে বক্তৃতা করেছি, আবার কখনো

ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তাদেরকে এ ভরসাও দিয়েছি যে, তোমরা ঈমান এনে তোমাদের রবের নিকট মাফ চাইলে তিনি অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।

৩. ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তাদের এ সুসংবাদও দিয়েছি যে, ঈমান আনলে দুনিয়াতেও আল্লাহ সুখ-সুবিধা বাড়িয়ে দেবেন, আল্লাহর অনুগত দাস হিসেবে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলে তোমাদের ধনে-জনে উন্নতি দেবেন।

৪. ১৩-২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, নূহ (আ) 'আফাক' ও 'আনফুস'-এর উদাহরণ দিয়ে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কী হলো? এত যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছি, তবুও তোমরা আমার কথা মানতে রাজি হচ্ছ না কেন? তোমরা কি একটু চিন্তা করেও দেখ না যে, শুককীট থেকে কীভাবে এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় পরিবর্তন করতে করতে হাত-পা, চোখ-কান ও মন-মগজওয়ালা পূর্ণ মানুষ বানিয়েছি। মাটি থেকেই তোমাদের দেহকে লালন-পালন করার কেমন অদ্ভুত ব্যবস্থা করেছি। (১৭ নং আয়াত)

তোমরা কি একটু খেয়াল করেও দেখ না যে, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ও পাহাড়-পর্বতের মাঝে পথের দিশা তোমাদের খিদমতের জন্যই তৈরি করা হয়েছে?

যে আল্লাহ তোমাদের জন্য গোটা সৃষ্টিজগৎ তৈরি করলেন এবং তাঁর সৃষ্টিকে ব্যবহার করার যোগ্য দেহ তোমাদের দান করলেন, সে আল্লাহ সম্পর্কে কি তোমাদের একটু ভয় হয় না যে, তিনি অসন্তুষ্ট হলে তোমাদের পাকড়াও করতে পারবেন? (১৩ নং আয়াত)

দ্বিতীয় রুকূ'

২১-২৪ নং আয়াতে নূহ (আ) তাঁর কাওম সম্পর্কে চরমভাবে নিরাশ হয়ে আল্লাহর নিকট তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নালিশ পেশ করেছেন। তিনি বললেন, এ জাতির হেদায়াতের আর কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। এরা সমাজের নেতাদের কথামতোই অন্ধভাবে চলে। পথভ্রষ্ট ধর্মনেতারা দেব-দেবীকে ত্যাগ না করার জন্য বলায় জনগণ তাদের মতেই চলছে। সমাজের কায়েমি স্বার্থের সব লোকেরা একজোট হয়ে এমন বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে যে, এ জাতি আর গোমরাহি থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায় না।

২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন, আমার রাসূলের রিপোর্ট সঠিক ছিল বলেই তার কাওমের উপর আযাব নাযিল করলাম। দুনিয়ায় তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেই আমি ক্ষান্ত হইনি; মৃত্যুর পরও তাদেরকে পাকড়াও করে দোযখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

আল্লাহর এ ঘোষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আ) তাঁর কাওম সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে ভুল করেননি। তিনি অধৈর্য হয়ে ঐ মন্তব্য করেননি। ইউনুস (আ)-এর নিরাশ হওয়ার সাথে আল্লাহ একমত হননি; কিন্তু নূহ (আ)-এর সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলেন।

২৬-২৮ নং আয়াতে নূহ (আ)-এর এ দো'আ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি আল্লাহর আযাব নাযিলের সময় তাঁর রবের নিকট করেছিলেন। এ দো'আয় তিনি নিজের এবং সকল ঈমানদারদের মাগফিরাত কামনা করেছেন। আর কাওমের কাফিরদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, ওদের একজনকেও যেন জীবিত না রাখেন। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এরা কেউ বেঁচে থাকলে এদের সন্তানদের ঈমান আনতে দেবে না। এদের কাছে কোনো কল্যাণই আর আশা করা যায় না।

সূরা নূহ

২৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি নূহকে (এই হেদায়াতসহ) তার কাওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তার কাওমের লোকদেরকে তাদের নিকট এক কঠিন আযাব আসার আগেই সাবধান করে দেন।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

২. তিনি বলেছিলেন, হে আমার দেশবাসী! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী (রাসূল)।

قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②

৩. (তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলছি,) তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমাকে মেনে চলো।

أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ③

৪. আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে (দুনিয়ায়) বাঁচিয়ে রাখবেন।[১] আসল কথা এই যে, আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যায় তখন আর দেরি করা হয় না।[২] তোমরা যদি এ কথা জানতে (তবে কতই না ভালো হতো)!

يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ④

৫. তিনি (নূহ) বললেন[৩], হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার দেশবাসীকে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি;

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ⑤

১. যদি তোমরা এ তিনটি কথা মেনে নাও, তাহলে তোমাদেরকে দুনিয়ায় ঐ সময় পর্যন্ত বাঁচার সুযোগ দেওয়া হবে, যা আল্লাহ তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য নির্ধারণ করেছেন।

২. এখানে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা ঐ সময়, যা আল্লাহ তাআলা কোনো কাওমের উপর আযাব নাযিলের জন্য নির্দিষ্ট করেন। এ বিষয়ে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোনো কাওমের উপর আযাব নাযিলের ফায়সালা হয়ে যায় তখন ঈমান আনলেও তাদেরকে মাফ করা হয় না।

৩. মাঝখানে এক দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস বাদ দিয়ে এখানে নূহ (আ)-এর ঐ আবেদন বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি তাঁর নবুওয়াতের শেষ পর্যায়ে আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিলেন।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

৬. কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের মধ্যে শুধু পালানোর মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে।

وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾

৭. আর যখনই আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি— যাতে আপনি তাদেরকে মাফ করে দেন, তারা তাদের কানে আঙ্গুল ঠেসে দিয়েছে, তাদের কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে,[৪] তাদের আচরণে তারা জিদ ধরে রয়েছে এবং খুব বেশি অহঙ্কার করেছে।

ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾

৮. এরপর আমি তাদেরকে উঁচু আওয়াজে দাওয়াত দিয়েছি।

ثُمَّ اِنِّيْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ﴿٩﴾

৯. তারপর আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যেও তাবলীগ করেছি এবং চুপে চুপেও বুঝিয়েছি।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

১০. আমি বলেছি, তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও; নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

১১. তিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি দেবেন।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿١٢﴾

১২. তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি দান করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করে দিবেন।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾

১৩. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর জন্য কোনো মান-মর্যাদার আশা করো না?[৫]

৪. মুখ ঢাকার উদ্দেশ্য– হয় তারা নূহ (আ)-এর কথা শোনা তো দূরের কথা, তাঁর চেহারা পর্যন্ত দেখা পছন্দ করত না, আর না হয় তাঁর সামনে থেকে মুখ ঢেকে চলে যেতে চাইত, যাতে তিনি তাদেরকে চিনতে পেরে তাদের সাথে কথা বলার সুযোগই না পান।

৫. অর্থাৎ, দুনিয়ার ছোট ছোট বাদশাহ ও সরদারদের সম্পর্কে তো তোমরা মনে কর যে, তাদের সম্মান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে কিছু করলে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা খেয়ালই কর না যে, তিনিও কোনো মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করছ। তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে শরীক বানাচ্ছ। তাঁর হুকুম অমান্য করছ, আর এতে তোমাদের ভয় হয় না যে, তিনি এসবের জন্য শাস্তি দিতে পারেন।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

১৪. অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।[৬]

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমরা কি দেখতে পাও না, আল্লাহ কীভাবে থরে থরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন?

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

১৬. এবং তাতে চাঁদকে আলো ও সূর্যকে বাতি বানিয়েছেন।

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে অদ্ভুতভাবে বানিয়েছেন।[৭]

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

১৮. এরপর তোমাদেরকে এ মাটিতেই ফিরিয়ে নেবেন এবং (তা থেকেই) তোমাদেরকে হঠাৎ বের করে আনবেন।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন।

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

২০. যাতে তোমরা এর মধ্যে খোলা রাস্তায় চলাফেরা করতে পার।

রুকূ' ২

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

২১. নূহ বললেন, হে আমার রব! এরা আমার কথা অমান্য করেছে এবং (ঐ নেতাদের) কথামতো চলেছে, যারা মাল ও সন্তান পেয়ে আরো বেশি ব্যর্থ হয়েছে।

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

২২. এরা বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে রেখেছে।

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا

২৩. এরা বলেছে, তোমাদের মা'বুদদেরকে কখনো ত্যাগ করো না। আর ওয়াদ্দ,

৬. অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় পার করে তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় আনা হয়েছে।

৭. এখানে জমিনের উপাদান থেকে মানুষকে সৃষ্টি করাকে তৃণলতা উৎপাদনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন এক সময় পৃথিবীতে গাছপালা ছিল না, অতঃপর আল্লাহ তাআলা এখানে তা উৎপন্ন করেছেন। তেমনি এক সময় ছিল, যখন দুনিয়ায় মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, অতঃপর আল্লাহ এখানে মানুষের চারা লাগালেন।

وَلَا سُوَاعًا ۥ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে[৮] তোমরা ত্যাগ করো না।

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلًا ﴿٢٤﴾

২৪. এরা বহু লোককে গুমরাহ করেছে এবং (হে আল্লাহ!) আপনিও গোমরাহি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে এ যালিমদের উন্নতি দেবেন না।[৯]

مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾

২৫. তাদের নিজেদের দোষের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতঃপর তারা নিজেদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো সাহায্যকারী পায়নি।

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

২৬. নূহ বললেন, হে আমার রব! এই কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন না।

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৭. যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করবে। আর এদের বংশে যারাই জন্ম নেবে তারা পাপী ও কট্টর কাফিরই হবে।

رَّبِّ اغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًۢا ﴿٢٨﴾

২৮. হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মুমিন হিসেবে আমার ঘরে দাখিল হয়েছে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীকে মাফ করুন। আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই তাদেরকে বাড়তে দেবেন না।

৮. নূহ (আ)-এর কাওমের উপাস্য দেবদেবীদের মধ্য থেকে এখানে ঐসব দেবতার নাম নেওয়া হয়েছে, যেসবকে পরবর্তীকালে আরবরাও পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় আরবের জায়গায় জায়গায় ওসবের মন্দির ছিল।

৯. অধৈর্য হয়ে নূহ (আ) এ বদদো'আ করেননি; বরং এ বদদোয়া তাঁর মুখ থেকে তখনই বের হয়েছিল, যখন শত শত বছর তাবলীগের হক আদায় করার পর তিনি নিজের কাওমের ব্যাপারে পুরাপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন।

৭২. সূরা জিন

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরার নাম জিন এবং এর আলোচ্য বিষয়ও জিন। জিনদের কুরআন শোনা এবং তাদের কাওমের নিকট ইসলামের প্রচার সম্বন্ধে এ সূরায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটি নাযিলের সময় নিয়ে মতভেদ আছে। কুরআন তিলাওয়াত শুনে জিনদের ঈমান আনার দুটো ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২ নং আয়াতে ও এ সূরার ২ থেকে ৭ নং আয়াতের মধ্যে বর্ণিত ঘটনা দুটো এক সময়ের নয়। নবুওয়াতের দশম বছরে তায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' নামক জায়গায় রাসূল (স) বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তখন জিনদের একটা দল কুরআন শুনে ঈমান এনেছিল। এ বিষয়ে রেওয়ায়াত বেশি বিখ্যাত হওয়ার ফলে ঐ ঘটনার সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেছেন।

কিন্তু ঘটনা দুটোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সূরা আহকাফে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যে মূসা (আ) ও পরবর্তী কিতাবে বিশ্বাসী ছিল তা ঐসব আয়াত থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। রেওয়ায়াত থেকে এটা প্রমাণিত যে, 'উকায' নামক জায়গায় কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে যখন রাসূল (স) গিয়েছিলেন, তখনো জিনেরা কুরআন শুনেছিল। কিন্তু কোন্ সময় এ ঘটনা ঘটেছিল তা ইতিহাস থেকে নির্ণয় করা যায়নি। অবশ্য এ সূরার ৮ থেকে ১০ নং আয়াতে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, নবুওয়াতের প্রথমদিকেই সম্ভবত এ ঘটনাটি ঘটেছিল। রাসূল (স)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সময় থেকেই মনে হয় আসমানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর আগে জিনেরা এমন কড়া ব্যবস্থা দেখেনি বলে এসব আয়াতের কথায় বোঝা যায়।

জিনের পরিচয়

জিন সম্পর্কে কুরআনে এত স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, কোনো ঈমানদারের পক্ষে জিনকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। মানুষ মাটির তৈরি এবং জিন আগুনের তৈরি বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ও জিনকেই ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আর যাবতীয় সৃষ্টিই সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত। তাই শুধু মানুষ ও জিনের জন্যই শাস্তি ও পুরস্কার এবং দোযখ ও বেহেশত রয়েছে। অন্য কোনো সৃষ্টির এ ইখতিয়ার নেই বলে তাদের কোনো কাজের জন্যই তারা দায়ী নয় এবং তারা পুরস্কার বা শাস্তি পাবে না।

জিন সম্পর্কে কুরআনে এত স্পষ্ট বক্তব্যের পর জিনকে অবাস্তব সৃষ্টি বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। জিন আল্লাহর সৃষ্ট এক বাস্তব অস্তিত্ব। ব্যক্তিগত সত্তা ও সামাজিক কাঠামো নিয়ে জিন সম্প্রদায় মানুষের মতোই জাতি হিসেবে অস্তিত্বশীল। মানুষের দৃষ্টির অগোচরে আছে বলেই একে অবিশ্বাস করার কোনো যুক্তি নেই। সূরা আ'রাফের ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, জিন মানুষকে দেখতে পায়; যদিও মানুষ জিনকে দেখতে পায় না।

জিন ও মানুষকে আল্লাহর দীনের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হলেও দুনিয়ায় উভয়ের দায়িত্বে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফতের মর্যাদা ও দায়িত্ব দিয়েছেন। এ দায়িত্ব তিনি জিনকে দেননি। আদমকে সৃষ্টি করার আগেই জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম ও ইবলিসের কাহিনী কুরআনে ৭ জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবলিস আদমের পূর্বেই ছিল এবং সে জাতিতে জিন ছিল।

আল্লাহ তাআলা জিন জাতির মধ্য থেকে রাসূল পাঠাননি। মানুষের উপর খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়ার কারণে শুধু মানুষের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছেন। সূরা আর রাহমানে আল্লাহ তাআলা নিজেই জিন ও ইনসানকে একসাথে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং জিন জাতির উপরও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব রয়েছে। তাই জিনদের মধ্যে মুমিন, কাফির এবং মুশরিক আছে, যেমন মানুষের মধ্যে আছে।

সূরা বাকারা (৩০-৩৪ আয়াত) থেকে ও সূরা কাহ্ফ (৫০ নং আয়াত) থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব মানুষকে দেওয়া হয়েছে এবং এ কারণে মানুষ জিন থেকে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য জিনকে কতক বিষয়ে বিরাট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সূরা নাম্ল (৭ নং আয়াত) থেকে জানা যায় যে, সুলাইমান (আ)-এর খাদেম হিসেবে এক জিন সাবার রানীর সিংহাসন বহু দূর থেকে নিমিষের মধ্যে হাজির করে দেয়। কিন্তু এ জাতীয় ক্ষমতার কারণে জিনকে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বহু জীব-জন্তুকে বিভিন্ন দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী করেছেন বলে কি তাদেরকে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?

কুরআন মাজীদ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করা, কুমন্ত্রণা দেওয়া, খারাপ কাজ করার জন্য ফুসলানোর ক্ষমতা জিনকে দেওয়া হয়েছে। ইবলিসের মতো খোদাদ্রোহী জিন মানুষের শত্রু হিসেবে এ কাজে লেগেই আছে; কিন্তু জোর করে খারাপ কাজে লিপ্ত করার ক্ষমতা জিনকে দেওয়া হয়নি।

আলোচনার ধারা

১-১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, একদল জিন কুরআন শুনে এর প্রতি কীরূপ আকৃষ্ট হলো এবং তারা তাদের কাওমের কাছে ফিরে গিয়ে অন্য জিনদের নিকট কুরআন ও এর শিক্ষা সম্পর্কে কী কী কথা বলল।

প্রথম আয়াতের 'হে রাসূল! আপনি বলুন, আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে'– এ কথা দ্বারা বোঝা গেল, জিনদের একদল যখন রাসূল (স)-কে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেছিল তখন তিনি তাদেরকে দেখেননি; এমনকি তিনি জানতেও পারেননি যে, একদল জিন তাঁর তিলাওয়াত শুনছিল। আল্লাহ তাআলা পরে ওহীর মাধ্যমে এ বিষয়ে তাঁকে জানিয়েছেন।

এ ১৫টি আয়াতের বিবরণ অনুযায়ী জিনদের ঐ দলটির পক্ষ থেকে তাদের কাওমের নিকট যেসব কথা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের গোটা বক্তৃতা এখানে তুলে ধরেননি। ঐ কথাগুলো একটা বক্তৃতার মতো মনে হয় না। তাদের বক্তব্যের শুধু উল্লেখযোগ্য বড় কথাগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে :

১. ২ ও ৩ নং আয়াতে জিনদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এরা কুরআন শোনার আগে মুশরিক ছিল। এখন তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার ফলে শিরক ত্যাগ করল।

২. ৪ ও ৫ নং আয়াতে এরা স্বীকার করেছে যে, তাদের কতক পথভ্রষ্ট লোকের কারণেই তারা পূর্বে শিরকে লিপ্ত ছিল। তাদের ধারণা ছিল না যে, মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা শিরক প্রচার করত তারা এভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা আকীদা চালু করতে পারে।

এখানে পরোক্ষভাবে মক্কার সরদারদেরকে বলা হয়েছে, তোমরাও পথভ্রষ্ট জিনদের ম[illegible]া তোমাদের জাতিকে শিরকে লিপ্ত করে রেখেছ। যারা এ কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারাও ঐ জিনদের মতোই হেদায়াত পেয়েছে। তোমরাও হেদায়াত পাবে, যদি কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে বুঝতে চেষ্টা কর।

৩. ৬ ও ৭ নং আয়াতে তারা বলেছে, মানুষ জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করায় জিনদের অহঙ্কার আরও বেড়ে গিয়েছে, যার ফলে তারা মনে করত, রাসূলের কোনো দরকার নেই এবং আল্লাহ কোনো রাসূল পাঠাবেনও না। জিনরা আসমানে বিচরণ করে গোপনে অনেক কিছু জেনে নিতে চেষ্টা করত।

৪. ৮-১০ নং আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, জিনদের ঐ দলটি আসমানে গিয়ে আগের মতো কিছু জানার চেষ্টা করে উল্কা বৃষ্টি দ্বারা বাধা পেয়ে জমিনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। আসমানের এ রকম কঠোর পাহারা দেখে তারা চিন্তায় পড়ে গেল যে, এ রকম হওয়ার কী কারণ হতে পারে? তারা দুনিয়ায় ফিরে এসে কুরআন শুনে বুঝতে পারল যে, কুরআনের বাণী ঠিকমতো যাতে রাসূলের কাছে পৌঁছে, সে জন্যই আসমানে এত কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫. ১১ থেকে ১৫ নং আয়াতে জিনদের ঐ দলটি এ কথা প্রকাশ করেছে যে, তাদের জাতির সবাই ঈমান আনতে রাজি হয়নি, তবুও যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, ঈমান আনলে কী লাভ হবে এবং না আনলে কী ক্ষতি হবে। এ কথাগুলো মক্কাবাসীদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে।

১৬ ও ১৭ নং আয়াতের কথাগুলো আল্লাহ নিজেই বলেছেন। বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, এ কথাগুলো আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহর পথে যারা মযবুতভাবে চলে তাদেরকে দুনিয়াতেও তিনি নিয়ামত দান করেন। সূরা নূহের ১১ ও ১২ নং আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে। যথাসময়ে পরিমাণমতো বৃষ্টি দিয়ে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় যে, তারা আল্লাহর এ দান পেয়ে আল্লাহরই মর্জিমতো তা ব্যবহার করে কি না এবং আল্লাহর আরো বেশি আনুগত্য করে কি না। এ পরীক্ষায় তারাই ফেল করে, যারা আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে তা ভোগ করার মধ্যে এমন মত্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহর কথা ভুলে গিয়ে নাফসের গোলামিই করতে থাকে। যারা এরূপ করবে তাদেরকে আযাব ভোগ করতেই হবে।

১৮ ও ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, মসজিদগুলো একমাত্র আল্লাহরই ইবাদতের জন্য ব্যবহার করতে হবে। সেখানে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। মক্কায় মুশকিরদের নিকট

রাসূল (স) এই বিশুদ্ধ তাওহীদের দাওয়াতই দিচ্ছিলেন। তিনি মূর্তিপূজা না করে যখন এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নামাযে দাঁড়ালেন, তখন মক্কার কাফির ও মুশরিকরা তাঁর উপর আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

দ্বিতীয় রুকূ'

২০-২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি কাফির ও মুশকিদেরকে আপনার পজিশন ভালোভাবে জানিয়ে দিন। ঐ নির্দেশের সারমর্ম হচ্ছে– 'আমি তো এক আল্লাহকে রব হিসেবে ডাকি। আমি অন্য কোনো সত্তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করি না। আমি শুধু আল্লাহর কথাই তোমাদের কাছে পৌছাচ্ছি। আমি এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করছি না, যার বলে তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারি। আমার কথা মানলে তোমাদেরই উপকার হবে, না মানলে তোমাদের ক্ষতি হবে। তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছানোর যে দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, যদি আমি তা পালন না করি তাহলে আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন। আমি আল্লাহর কথা অমান্য করে তোমাদের কথামতো চললেও তোমরা আমাকে পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে না। এক আল্লাহ ছাড়া আমার অন্য কোনো আশ্রয় নেই।

আল্লাহর বাণী তোমাদেরকে পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। যারা তা মানবে না তাদেরকে চিরদিন দোযখে থাকতে হবে। এখন মানা আর না মানা তোমাদেরই মর্জি।

২৪ ও ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে আসলে কাফিরদেরকেই পরোক্ষভাবে সাবধান করেছেন। বলা হয়েছে, ওরা আপনার সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা কম দেখে আপনাকে দুর্বল মনে করে। তাই তারা আপনাকে দমন করতে চায়। কিন্তু এক সময় আসবে, তখন তারা টের পাবে যে, কারা দুর্বল ও সঙ্গীহীন। সে সময়টা দূরে না কাছে তা অবশ্য রাসূলের জানা নেই; কিন্তু সে সময়টা যে আসবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সূরার শেষ তিনটি আয়াতে (২৬-২৮) সবাইকে জানানো হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই 'আলিমুল গাইব। তিনি তা থেকে যেটুকু ইলম যাকে দেন, সে এর চেয়ে বেশি কিছু জানবে না। রাসূল (স)-কে আল্লাহ তাআলা যতটুকু ইলম দান করেন ততটুকুই তিনি পান। তার চেয়ে বেশি ইলম রাসূলেরও নেই। সুতরাং গায়েবী ইলম অন্য কারো পাওয়ার উপায় নেই। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা যখনই রাসূল (স)-এর নিকট ইলম পাঠান তখন সে ইলমকে হেফাযত করার এমন মযবুত ব্যবস্থা করেন যে, কোনো জিনের পক্ষেও এর কোনো সামান্য অংশ গোপনে জেনে ফেলা সম্ভব নয়। এমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী ঠিকমতো রাসূলের কাছে পৌছানোর পথে কেউ কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

সূরা জিন

২৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝١

১. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমার উপর ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মন দিয়ে শুনেছে।[1] তারপর (তাদের কাওমের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা বড়ই অদ্ভুত কুরআন শুনেছি।

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢

২. যা সত্য-সঠিক পথ দেখায়। তাই আমরা এর উপর ঈমান এনেছি এবং এখন আর আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।

وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝٣

৩. (এ কথার উপরও ঈমান এনেছি যে,) আমাদের রবের মর্যাদা অনেক উঁচু। তিনি কাউকে বিবি ও সন্তান বানাননি।

وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝٤

৪. আর আমাদের নির্বোধ লোকেরা[2] আল্লাহ সম্বন্ধে বহু ভিত্তিহীন কথা বলে বেড়ায়।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝٥

৫. আর আমরা ধারণা করেছিলাম যে, মানুষ ও জিন কখনো আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারে না।

وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝٦

৬. আর মানুষের মধ্যে কতক লোক জিন জাতির কতক লোকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছিল। এভাবে তারা জিনদের অহঙ্কার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

---

১. এ থেকে বোঝা গেল যে, ঐ সময় রাসূল (স) জিনকে দেখেননি। তাঁর জানা ছিল না যে, তারা কুরআন শুনছে; বরং পরে ওহীর দ্বারা আল্লাহ তাঁকে এ ঘটনার খবর দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'রাসূল (স) জিনদের সামনে কুরআন পড়েননি এবং তিনি তাদেরকে দেখেনওনি।'

২. আয়াতে 'সাফীহুনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা একজন বা একটি দলের জন্য ব্যবহার করা চলে। যদি এর দ্বারা একজন নাদান বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে সে ইবলিস হবে। আর যদি একটি দল বোঝানো হয় তাহলে অর্থ হবে, 'জিনের মধ্যে অনেক বেওকুফ ও নির্বোধ আছে, যারা এ জাতীয় কথা বলে।'

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝٧

৭. আর মানুষও ধারণা করত, যেমন তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ কাউকে রাসূল হিসেবে পাঠাবেন না।

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨

৮. আর আমরা আসমানে তল্লাশি চালিয়েছি। তখন আমরা দেখলাম যে, তা পাহারাদারদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে এবং উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে।

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩

৯. আর আমরা আগে কিছু খবর শোনার জন্য আসমানে বসার জায়গা পেতাম। এখন যে-ই গোপনে কিছু শোনার চেষ্টা করে সে-ই দেখতে পায় যে, তার জন্য জ্বলন্ত উল্কা ওঁতপাতা অবস্থায় রাখা আছে।

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠

১০. আর আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে, দুনিয়াবাসীর সাথে কোনো ক্ষতিকর বিষয়ের ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের রব তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর ইচ্ছা করছেন।[৩]

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ۝١١

১১. আর আমাদের মধ্যে কিছু লোক সালেহ (নেক) এবং কিছু এর চেয়ে নিকৃষ্ট। আমরা বিভিন্ন পথে বিভক্ত হয়ে রয়েছি।

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝١٢

১২. আর আমরা বুঝতে পারছিলাম, আমরা আল্লাহকে দুনিয়াতেও অক্ষম করতে পারব না, পালিয়েও তাকে পরাজিত করতে পারব না।[৪]

৩. এ থেকে মনে হয় যে, ঐ জিনের দল আসমানের এ অবস্থা দেখে এর কারণ তালাশ করার জন্য জমিনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে এমন কী ব্যাপার ঘটল বা ঘটতে যাচ্ছে, যার খবরের হেফাযতের জন্য এত কড়া ব্যবস্থা করা হয়েছে? এখন আমরা আগের মতো ঊর্ধ্বজগতের খবরাখবর পাওয়ার সুযোগই পাচ্ছি না। যেদিকেই যাচ্ছি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৪. অর্থাৎ, আমাদের ঐ ধারণাই আমাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। যেহেতু আমরা আল্লাহ থেকে নির্ভয় ছিলাম না এবং আমাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা নাফরমানী করি তাহলে কোনো প্রকারেই তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারব না, সেহেতু যখন আমরা ঐ কালাম শুনলাম, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সরল-সঠিক পথ দেখানোর জন্য এসেছে তখন আমাদের এ দুঃসাহস হয়নি যে, সত্য জানার পরও আমাদের নির্বোধ লোকদের প্রচারিত ভুল আকীদাই আঁকড়ে ধরে থাকব।

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

১৩. আর আমরা যখন হেদায়াতের কথা শুনলাম তখনই তাঁর উপর ঈমান আনলাম। এখন যে-ই তার রবের উপর ঈমান আনবে, তার হক নষ্ট হওয়ার বা যুলুমের কোনো ভয় থাকবে না।

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

১৪. আর আমাদের মধ্যে কতক মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) এবং কতক সত্যবিমুখ। সুতরাং যারা (আনুগত্যের পথ হিসেবে) ইসলাম কবুল করল তারাই নাজাতের পথ তালাশ করে নিয়েছে।

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

১৫. আর যারা সত্য থেকে বিমুখ হয়েছে তারা দোযখের লাকড়িতে পরিণত হবে।[৫]

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

১৬. (হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার উপর এ ওহীও পাঠানো হয়েছে যে) মানুষ যদি সঠিক পথে মযবুতভাবে চলত, তাহলে আমি তাদেরকে বেশি করে পানি পান করাতাম।

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

১৭. যাতে এ নিয়ামত দ্বারা তাদেরকে আমি পরীক্ষা করতে পারি। আর যে তার রবের যিক্‌র থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তার রব তাকে কঠিন আযাবের মধ্যে নিয়ে ফেলবেন।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

১৮. আর মসজিদগুলো আল্লাহর জন্য। সুতরাং সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে না।[৬]

---

৫. প্রশ্ন হতে পারে যে, কুরআন অনুযায়ী জিন তো নিজেই আগুনের সৃষ্টি। তাহলে দোযখের আগুনে তাদের কী কষ্ট হবে? এর জবাব এই যে, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ মাটির তৈরি। তবু মানুষকে মাটির ঢিল মারলে আঘাত পায় কেন?

৬. অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না, অন্য কারো কাছে দোয়া চেয়ো না এবং অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকো না।

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

১৯. আর যখন আল্লাহর বান্দাহ তাঁকে ডাকার জন্য খাড়া হলেন, তখন মানুষ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

রুকূ' ২

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২০. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি তো আমার রবকে ডাকছি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে আমি শরীক করি না।

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২১. (আরো) বলুন, আমি তোমাদের জন্য ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না।

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. (আরো) বলুন, আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না। আমিও তিনি ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় পেতে পারি না।

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহর কথা ও তাঁর পাঠানো বাণী পৌঁছানো ছাড়া (আমার আর কিছু করারই দায়িত্ব নেই)। এখন যে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানবে না তার জন্য দোযখের আগুন রয়েছে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২৪. (এরা তাদের চাল-চলন বদলাবে না) যে পর্যন্ত না তারা ঐ জিনিস দেখবে, যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হচ্ছে। তখন তারা টের পাবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল আর কাদের দল সংখ্যায় কম।[৭]

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৫. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি জানি না, তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা কাছেই এসে গেছে, নাকি আমার রব এর জন্য লম্বা মেয়াদ ঠিক করবেন।

---

৭. ঐ সময় কুরাইশরা রাসূল (স)-এর দাওয়াত ইলাল্লাহ শুনলেই হামলা করতে আসত। তাদের এ ধারণা ছিল যে, তাদের দল খুব বড়, আর রাসূলের সাথে মুষ্টিমেয় লোক থাকায় তাদেরকে দমন করতে পারবে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬. তিনি গায়েবের ইলম রাখেন। আর গায়েবী কথা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৭. (অবশ্য) ঐ রাসূল ছাড়া, যাকে (গায়েবী ইলম দেওয়ার জন্য) তিনি পছন্দ করে নিয়েছেন।[৮] তখন নিশ্চয়ই তিনি (ঐ রাসূলের) সামনে ও পেছনে পাহারাদার নিয়োগ করেন।[৯]

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২৮. যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[১০] আর তিনি তাদের গোটা পরিবেশকে ঘিরে রেখেছেন এবং এক-একটি জিনিসকে তিনি গুনে গুনে রেখেছেন।[১১]

৮. অর্থাৎ, রাসূল নিজে গায়েবী ইলমের অধিকারী নন; বরং যখন আল্লাহ রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে বাছাই করে নেন তখন গায়েবী ইলমের যতটুকু তিনি চান ততটুকু তাকে দান করেন।

৯. পাহারাদার অর্থ ফিরিশতা, অর্থাৎ যখন আল্লাহ কোনো গায়েবী ইলম রাসূলের কাছে পাঠান তখন এর হেফাযতের জন্য চারদিকে ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যাতে ঐ ইলম অত্যন্ত নিরাপদ অবস্থায় রাসূলের কাছে পৌঁছে যায় এবং এর মধ্যে কোনো ভেজাল মিশতে না পারে।

১০. এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য যে পরিমাণ গায়েবী ইলম প্রয়োজন তা রাসূলকে দেওয়া হয়। আর ফেরেশতারা এ বিষয়ে যত্ন নেন, যাতে ঐ ইলম সঠিক অবস্থায় রাসূলের কাছে পৌঁছে যায় এবং তারা এ বিষয়েও লক্ষ রাখতেন, যেন রাসূল তাদের রবের বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছে দেন।

১১. অর্থাৎ, রাসূল (স) ও ফেরেশতাদের উপর আল্লাহর ক্ষমতা এমন ব্যাপক যে, তাঁরা যদি চুল পরিমাণও আল্লাহর মর্জির খেলাফ চলেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও হবেন। যেসব বাণী আল্লাহ পাঠান তার প্রতিটি অক্ষর গুনে রাখা আছে। এর একটি অক্ষরও কম-বেশি করার কোনো ক্ষমতা রাসূলদের বা ফেরেশতাদের নেই।

৭৩. সূরা মুয্‌যাম্‌মিল

মাক্কী ও মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের আল মুয্‌যাম্‌মিল শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে। এটা শুধু নাম; সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিলের সময়

এ সূরার দুটো রুকূ' আলাদা আলাদা সময়ে নাযিল হয়েছে। সকলের মতেই প্রথম রুকূ'টি মাক্কী যুগের বলে হাদীস থেকেও প্রমাণিত। কিন্তু মাক্কী যুগের কোন্ স্তরে নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া না গেলেও সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরেই নাযিল হয়েছে।

প্রথমত, এ সূরায় রাসূল (স)-কে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, নবুওয়াতের প্রথমদিকে তাঁকে এ বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী রূহানী শক্তি হাসিলের জন্যই এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তাহাজ্জুদের নামাযে রাতের অর্ধেক সময় কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, তখন পর্যন্ত বেশ কিছুসংখ্যক সূরা নাযিল হয়েছে। তা না হলে এত বেশি সময় তিলাওয়াত করার সুযোগ হতে পারে না।

তৃতীয়ত, রাসূল (স)-কে বিরোধীদের বাড়াবাড়িতে সবর করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্যে তাবলীগ করার কাজ তখন এগিয়ে চলেছিল বলেই বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরের অবস্থার সাথেই এ কথা মিল খায়।

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ'টিও মাক্কী বলে অনেক মুফাস্‌সির মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ রুকূ'তে যুদ্ধের কথা এবং যাকাত আদায়ের কথা উল্লেখ থাকায় রুকূ'টিকে মাদানী যুগের বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, মাক্কী যুগে যুদ্ধের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আর নির্দিষ্ট পরিমাণে যাকাত দেওয়ার বিধানও মাক্কী যুগে নাযিল হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

রিসালাতই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। এতে নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনের হেদায়াত দেওয়া হয়েছে; মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈমান না আনার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং আখিরাতে নেক আমলের পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৪ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, নবুওয়াতের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁর উপর দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব পালনের জন্য যেন তিনি নিজেকে তৈরি করেন। এর জন্য যে বাস্তব কর্মসূচি তাঁকে দেওয়া হয়েছে তা হলো রাত জেগে নামায আদায় করা।

সূরার শুরুতেই 'হে চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি' বলে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। মনে হয়, তিনি আগের অভ্যাসমতোই শুয়েছিলেন বা ঘুমাচ্ছিলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বলা হলো, নবুওয়াতের যে মহান দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে এর জন্য আপনার রূহানী শক্তি বাড়ানো দরকার এবং আপনার রবের সাথে সম্পর্ক গভীর করা প্রয়োজন। আপনার পক্ষে আগের মতো আরামে শুয়ে রাত কাটানোর সুযোগ আর নেই। রাতের কিছু সময় ঘুমিয়ে বাকি সময় তাহাজ্জুদ নামাযে ধীরে-সুস্থে কুরআন বেশি করে পড়ুন।

৫ ও ৬ নং আয়াতে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, কুরআন নাযিল করে যে কঠিন দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়া হয়েছে তা পালন করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে হলে রাতের অর্ধেক বা কিছু বেশি বা কিছু কম সময় তাহাজ্জুদে মগ্ন থাকা দরকার। এ শক্তি ও যোগ্যতা আপনার মধ্যে এভাবেই সৃষ্টি হবে। কুরআনের সব হুকুম পালন করে মানবজাতির সামনে আদর্শ মানুষের উদাহরণ পেশ করা এবং সকল বাতিল শক্তিকে পরাজিত করে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা এমন কঠিন কাজ যে, একমাত্র তাঁরাই এ বিরাট কাজে মযবুত হয়ে টিকে থাকতে পারে, যারা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক কায়েম করতে চেষ্টা করে।

৭-৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দিনের বেলায় দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন এবং তানযীম ও তারবিয়াতের কাজে আপনাকে যখন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, তখনো আল্লাহর যিকর করতে থাকবেন। আর কারো পরওয়া না করে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। তিনি সবার রব। তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই। অতএব সব ব্যাপারে তাঁরই উপর নির্ভর করুন। আপনি পুরোপুরি তাঁরই হয়ে যান। তাহলে অন্য কারো ধার ধারতে হবে না।

১০ ও ১১ নং আয়াতে বিরোধীদের ভূমিকায় ও কষ্টদায়ক আচার-আচরণে রাসূল (স)-কে সবরের উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে, এরা আপনার সম্পর্কে যাকিছু বলছে তাতে বিচলিত হবেন না। অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। তাদের কথা গায়ে মেখে মনে কষ্ট পাবেন না। বিশেষ করে ঐ ধনী লোকেরা, যারা তাদের কায়েমী স্বার্থের কারণে আপনাকে রাসূল হিসেবে মানতে রাজি হচ্ছে না, তাদের বিরোধিতার জবাবে আপনাকে কিছুই করতে হবে না। তাদেরকে আমিই দেখে নেব। তাদেরকে আমার হাতেই ছেড়ে দিন। তাদেরকে এ অবস্থায় অল্প কিছুদিন পড়ে থাকতে দিন। আমি তাদের সাথে কী করি তা দেখতে পাবেন।

১২-১৪ নং আয়াতে অবিশ্বাসীদের পরিণাম কী হবে তা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, তাদের শাস্তির জন্য পুরোপুরি ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। তাদেরকে ভারী বেড়ি দিয়ে আটকিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ফেলা হবে। তাদেরকে এমন খারাপ খাবার দেওয়া হবে যে, তাদের গলায় আটকে থাকবে। আরো বহু রকমের আযাব তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। অবশ্য এ পরিণাম দুনিয়ায় হবে না। এর জন্য কিয়ামতের অপেক্ষা করতে হবে। পাহাড়-পর্বতে সাজানো এ পৃথিবী ধ্বংস করে কিয়ামত ঘটানোর পরই তারা ঐ পরিণাম দেখতে পাবে।

১৫ ও ১৬ নং আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মুহাম্মদ (স)-কে কোনো নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। যুগে যুগে যে দায়িত্ব দিয়ে আমি রাসূল পাঠিয়েছি সে দায়িত্বই তাঁকে দিয়েছি। তোমরা নিশ্চয়ই ফিরাউনের কাহিনী শুনেছ। ফিরাউনের কাছে যেমন আমি মূসা (আ)-কে পাঠিয়েছিলাম, তেমনি তোমাদের কাছে মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি।

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, রাসূলের কথা না মানার দরুন ফিরাউনের কী দশা হয়েছিল। তাকে আমি কেমন শক্ত হাতে পাকড়াও করেছিলাম। তোমরাও যদি তোমাদের রাসূলকে না মান তাহলে তোমাদের পরিণামও তা-ই হবে।

১৭-১৯ নং আয়াতে কাফিরদেরকে দরদ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াদা কখনো পূরণ না হয়ে পারে না। তোমরা রাসূলকে যে মানতে চাচ্ছ না এর পরিণামে দুনিয়ায় যদি ফিরাউনের দশা তোমাদের না-ও হয় তবে আখিরাতের দুর্দশা থেকে তোমরা কীভাবে বাঁচবে সে কথা কি ভেবেছ? আখিরাতের কঠিন দিনে এমন অবস্থা হবে যে, শিশু পর্যন্ত বুড়ো হয়ে যাবে। সেদিন আসমান ভেঙে পড়তে চাইবে।

১৯ নং আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কেউ ঐ দুর্দশা থেকে বাঁচতে চায় তাহলে যেন রাসূলের মাধ্যমে পাঠানো উপদেশ মেনে চলে। এভাবে যারা তাদের রবের পথ ধরবে তারাই আখিরাতে মুসিবত থেকে বাঁচবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

২০ নং আয়াত সম্পূর্ণ দ্বিতীয় রুকূ'ই দখল করে আছে। প্রথম রুকূ'তে ১০ বছর পর (হিজরতের পর) মদীনায় এ রুকূ'টি নাযিল হয়। প্রথম রুকূ'তে শুধু রাসূল (স)-কে তাহাজ্জুদের হুকুম দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-ও রাসূল (স)-এর অনুকরণে তাহাজ্জুদ নামাযের উপর জোর দেন। তাই এ রুকূ'তে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সবাইকে সম্বোধন করেই কথা বলেছেন।

এখানে বলা হয়েছে, হে রাসূল! আমি জানি যে, আপনি এবং আপনার সাহাবীগণ কোনো সময় রাতের তিন ভাগের দু'ভাগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দিচ্ছেন। দিনে আপনাদের যে বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হয় তাতে তাহাজ্জুদে আরো কম সময় লাগালেই চলবে। রাত ও দিনের সঠিক হিসাব আমার ভালোভাবে জানা আছে। কুরআনের যেটুকু অংশ সহজে নামাযে পড়া সম্ভব হয় ততটুকু সময়ই তাহাজ্জুদ পড়ুন। এত বেশি সময় পড়ার দরকার নেই।

তাহাজ্জুদের বোঝা হালকা করার কারণ হিসেবে আল্লাহ বলেছেন, আপনাদের মধ্যে কতক লোক অসুখের কারণে রাত জাগতে পারে না, অনেকে রুজি-রোজগারে ব্যস্ত থাকার দরুন সময় পায় না। আর কতক লোক জিহাদের ময়দানে থাকায় বেশি সময় তাহাজ্জুদে লাগাতে পারে না। তাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, নামাযে কুরআনের যতটুকু পড়া সম্ভব হয় ততটুকু তাহাজ্জুদে পড়লেই চলবে।

শেষের দিকে নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, আল্লাহর পথে খুশিমনে খরচ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে খরচ করা হলে আল্লাহ এটাকে ধার বলে গণ্য করেন এবং এর বদলায় বহু গুণ বেশি ফেরত দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এভাবে দুনিয়ায় আল্লাহর মর্জিমতো চললে আখিরাতে এর সুফল পাওয়া যাবে। আল্লাহর দেওয়া প্রতিদানের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে?

সর্বশেষ আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফ চাওয়ার হুকুম দিয়ে নিশ্চয়তা দান করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। বান্দাহ যদি মনিবের হুকুম সাধ্যমতো পালনের চেষ্টা করতে থাকে তাহলে তার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি মাফ করে দেন। কারণ, তিনি অত্যন্ত মেহেরবান।

সূরা মুয্যাম্মিল

২০ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী ও মাদানী

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ وَّمَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿١﴾

১. হে চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি!

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿٢﴾

২. কিছু সময় বাদ দিয়ে রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকুন।

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿٣﴾

৩. আধা রাত বা তার চেয়ে কিছু কম করুন।

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾

৪. অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি বাড়িয়ে নিন, আর কুরআন খুব থেমে থেমে পড়ুন।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾

৫. নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী নাযিল করব।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾

৬. আসলে রাতজাগা নাফসকে দমন করার জন্য খুব বেশি (ফলদায়ক) এবং (কুরআন) ঠিকমতো পড়ার জন্য বেশি উপযোগী।

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۙ﴿٧﴾

৭. দিনের বেলা তো আপনার জন্য অনেক ব্যস্ততা আছে।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۙ﴿٨﴾

৮. আপনার রবের নামের যিকির করুন এবং সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে তাঁরই হয়ে থাকুন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। অতএব তাঁকেই নিজের উকিল[১] বানিয়ে নিন।

১. ঐ লোককেই উকিল বলে, যার উপর ভরসা করে কোনো লোক তার কোনো বিষয়ের ভার ঐ লোকের উপর দেয়। অনেকটা এ অর্থেই আমাদের দেশে উকিল শব্দকে ঐ লোকের জন্য ব্যবহার করা হয়, যার নিকট মামলা-মোকদ্দমার দায়িত্ব দিয়ে এক ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয় যে, তার পক্ষ থেকে তার উকিলই ভালোভাবে মোকদ্দমা লড়বে এবং নিজের মোকদ্দমায় নিজেকেই আর লড়ার দরকার হবে না।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

১০. আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে সবর করুন এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান।[২]

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾

১১. এসব মিথ্যা সাব্যস্তকারী বিলাসি লোকদেরকে (সামলানোর কাজটি) আমার উপরই ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে অল্প কিছু সময় এ অবস্থায়ই থাকতে দিন।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾

১২-১৩. নিশ্চয়ই (তাদের জন্য) আমার কাছে শক্ত বেড়ি, জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাবার ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾

১৪. (এ অবস্থা) সেই দিন হবে, যখন জমিন ও পাহাড় কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়গুলোর অবস্থা এমন হবে, যেন বালুর স্তূপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমাদের[৩] কাছে আমি তেমনিভাবে এক রাসূলকে তোমাদের উপর সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি, যেমন আমি ফিরাউনের কাছে এক রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾

১৬. তারপর ফিরাউন ঐ রাসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে খুব শক্ত হাতে পাকড়াও করলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

১৭-১৮. যদি তোমরা মানতে অস্বীকার কর তাহলে ঐ দিন কীভাবে তোমরা বেঁচে যাবে, যে দিন শিশুদেরকে বুড়ো বানিয়ে ছাড়বে এবং যার ফলে আসমান ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর ওয়াদা তো পূরণ হবেই হবে।

২. 'আলাদা হয়ে যান' অর্থ এটা নয় যে, তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে তাবলীগের কাজও বন্ধ করুন। বরং এর অর্থ হলো তার সাথে তর্কে লিপ্ত হবেন না, তার আজে-বাজে কথা ও আচরণকে একেবারেই উপেক্ষা করুন এবং তার অভদ্রতার জবাব দেবেন না। আর তাকে এড়িয়ে চলার এ আচরণ যেন দুঃখ, ক্ষোভ ও বিরক্তির সাথে করা না হয়। এমনভাবে যেন হয়, যেমন কোনো ভদ্রলোক কোনো অসভ্য লোকের গালি শুনে তাকে উপেক্ষা করে এবং অন্তরে কোনো মলিনতাও আসতে দেয় না।

৩. এখন মক্কার ঐ কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে, যারা রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছিল এবং বিরোধিতায় তৎপর ছিল।

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ। যার ইচ্ছা হয়, তার রবের দিকে যাওয়ার পথ ধরুক।

রুকূ' ২

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

২০. (হে রাসূল[৪]!) আপনার রব জানেন যে, আপনি কখনো রাতের প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ, কখনো আধা রাত এবং কখনো তিন ভাগের এক ভাগ রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকেন। আপনার সাথিদের মধ্য থেকেও একদল (এ কাজ করে)। আল্লাহই রাত ও দিনের সময়ের হিসাব রাখেন। তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের ঠিক হিসাব রাখতে পার না। এজন্য তিনি তোমাদের উপর দয়া করেছেন। এখন থেকে (নামাযে কুরআন) ততটুকুই পড়, যতটুকু তোমরা সহজে পড়তে পার।[৫] আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের কতক লোক অসুস্থ থাকে, অন্য কতক লোক আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য সফর করে থাকে, আরো কতক লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে। তাই কুরআনের যতটুকু সহজে পড়া যায় ততটুকুই পড়ে নাও। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও[৬] ও আল্লাহকে করযে হাসানা দান করো। তোমরা নিজেদের জন্য ভালো যাকিছু আগে পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। এটাই বেশি ভালো এবং এর পুরস্কার অনেক বড়। আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

৪. এ রুকূ' প্রথম রুকূ'র দশ বছর পর মদীনায় নাযিল হয়েছে।

৫. যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লম্বা কিরাআতের কারণেই নামায লম্বা হয়ে থাকে সেহেতু বলা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদের নামাযে যতটুকু কুরআন সহজে পড়তে পারেন ততটুকুই পড়ুন। এর ফলে নামাযের দৈর্ঘ্য এমনিই কমে যাবে।

৬. তাফসীরকারগণ সকলেই একমত যে, এর দ্বারা ফরয নামায ও ফরয যাকাত আদায় করা বোঝায়।

৭৪. সূরা মুদ্দাস্‌সির

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'মুদ্দাস্‌সির' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এ নামও বিষয়ভিত্তিক নয়, পরিচয়মূলক মাত্র।

নাযিলের সময়

এর প্রথম সাতটি আয়াত নবুওয়াতের একেবারে প্রথমদিকে নাযিল হয়েছে। সর্বপ্রথম সূরা 'আলাকের যে পাঁচটি আয়াত হেরাগুহায় নাযিল হয়েছিল এরপর কিছুদিন ওহী বন্ধ ছিল। ঐ অবস্থায় একদিনের ঘটনা রাসূল (স) নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'একদিন আমি মক্কার রাস্তা দিয়ে চলার সময় হঠাৎ এক আওয়াজ শুনে আসমানের দিকে চেয়ে দেখি, জিবরাঈল (আ) এক চেয়ারে বসে আছেন। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। বাড়িতে এসে বলতে লাগলাম, আমাকে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। তখন ওহী নাযিল হয়েছে।'

ঐ সময় প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয়েছে। পরে নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে প্রকাশ্যে তাবলীগের কাজ শুরু হওয়ার পর প্রথম হজ্জের মওসুমে সূরার বাকি সবটুকু নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

হেরাগুহায় প্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছে, তাতে রাসূল (স)-এর উপর কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তখন শুধু ধারণা দেওয়া হলো যে, তিনি একজন রাসূল এবং তাঁর উপর ওহী আসতে থাকবে। এর আগে ওহী সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তাই প্রথম ওহী নাযিলের পর তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন। পরবর্তী ওহীর জন্য তাঁর মন-মগজ তৈরি হওয়ার প্রয়োজনে কিছুদিন ওহী বন্ধ থাকার পর এ সূরাতেই তাঁকে নবুওয়াতের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্মনীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ সাতটি দায়িত্ব ও কর্মনীতি অনুযায়ী যখন তিনি তাবলীগের কাজ শুরু করলেন তখন মক্কায় হৈচৈ পড়ে গেল। হজ্জের মওসুমে আরব থেকে যারা আসবে তাদের কাছেও তাবলীগ শুরু হয়ে যাওয়ার ভয়ে মক্কার সরদাররা ওয়ালিদ বিন মুগীরার (খালিদ বিন ওয়ালিদের পিতা) সভাপতিত্বে এক জরুরি সম্মেলনে একত্র হলো। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, তারা পাল্টা প্রচারণা চালাবে এবং সবাইকে জানিয়ে দেবে যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এক জাদুকর। তার জাদুময় কথায় যেন কেউ তার ধোঁকায় না পড়ে। প্রথম সাত আয়াতের পর বাকি অংশে ঐ ঘটনার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং নবীর দাওয়াত কবুল না করার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে রাসূল (স)-কে স্নেহমাখা ভাষায় মুদ্দাস্‌সির বা কম্বলওয়ালা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আদর করে বলা হয়েছে, আপনার কি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকা সাজে? আপনার উপর যে নবুওয়াতের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।

২-৭ নং আয়াতে নবুওয়াতের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্মনীতি বোঝানো হয়েছে। এতে নিম্নরূপ সাতটি কথা রয়েছে :

১. উঠুন, জাগুন, কর্মচঞ্চল হোন, দায়িত্ব পালনে তৎপর হোন।

২. মানুষ যে পশুর মতো ভালো-মন্দ হিসাব না করে গতানুগতিক জীবন কাটাচ্ছে, তাদেরকে এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন। তাদের কল্যাণ কিসে, সে কথা বোঝাতে থাকুন।

৩. আপনার রবই যে সবচেয়ে বড়, তা প্রচার করুন। আর যে যত বড়ত্বের দাবিই করুক আপনি যে আপনার রব ছাড়া কারোই পরওয়া করেন না, সেকথা সবাইকে জানিয়ে দিন। আল্লাহু আকবার'ই আপনার প্রথম ও প্রধান স্লোগান হবে। সবাই যেন আল্লাহকেই সবচেয়ে বড় বলে মেনে নেয়, সে দাওয়াতই দিন।

৪. আপনি এমন পোশাক পরুন, যা ভদ্র, শালীন, পাক-পবিত্র; যা দেখে মানুষ আপনাকে আপন মনে করে কাছে আসবে। বৈরাগীর মতো অসামাজিক পোশাক বা বড়লোকদের মতো অহঙ্কারী ও জাঁকজমকের পোশাক পরবেন না।

৫. পোশাকের দ্বারা যেমন আপনার বাইরের দিকটা পাক-সাফ ও সুন্দর থাকা উচিত, তেমনি আপনার ভেতরটাও সব রকম অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। আপনার স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন যেন এমন হয়, যাতে সবাই আপনাকে ভালোবাসে।

৬. আপনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার বদলায় তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান আশা করবেন না। দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ নিঃস্বার্থভাবেই করতে হবে। মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার দায়িত্ব পালন করে তাদের প্রতি আপনি দয়া করছেন বলে মনে করবেন না। যদি তা মনে করেন, তাহলে তারা আপনার দাওয়াত কবুল না করলে নিরাশ হবেন বা তাদের উপর রাগ করবেন; আপনি সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজ করে যান।

৭. দাওয়াত ইলাল্লাহর যে মহান দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হলো তা কিন্তু সহজ কাজ মনে করবেন না। এতে মানুষের যত কল্যাণই থাকুক, তারা কিন্তু সহজে এ দাওয়াত কবুল করবে না। এ নতুন কথা কবুল করার আগে জনগণ শত বার ভাববে। যাদেরকে জনগণ আগে থেকে ধর্মনেতা, সমাজপতি ও বড়লোক বলে মেনে এসেছে, তাদের কাছে তারা মতামত চাইবে। ঐসব কায়েমী স্বার্থ তখন আপনার বিরুদ্ধে জনগণকে খেপাবে এবং হাজারো ষড়যন্ত্র করে আপনার কাজে বাধা দিতে থাকবে।

তাই শুরুতেই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এ অবস্থার জন্য আপনি তৈরি থাকবেন। আপনাকে চরম ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। সবরের এ কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হলে আপনাকে একমাত্র আপনার রবের সন্তুষ্টিই তালাশ করতে হবে। কারণ, এ পথে একমাত্র আমার খাতিরেই সবর করা সম্ভব।

আল্লাহর রাসূলকে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব দেওয়ার সময় যে সাতটি কথা দায়িত্ব ও কর্মনীতি হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীর জন্যই বিশেষভাবে জরুরি। এ কর্মনীতি পালন না করে যারা এ কাজ করতে চেষ্টা করবে, তাদের দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতিই বেশি হবে। এ কর্মনীতি যারা মানতে পারবে না, তারা একসময় এ পথ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।

৮-১০ নং আয়াতে কিয়ামতের দিন নবীর দাওয়াত যারা কবুল করবে না, তাদের কী দশা হবে সে কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐ দিনটি তো আসলেই কঠিন হবে। বিশেষ করে কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। মুমিনদের জন্য অবশ্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী কারো জন্য কম ও কারো জন্য বেশি সহজ হতে পারে।

১১-২৬ নং আয়াত পর্যন্ত ওয়ালিদ বিন মুগীরার নাম উল্লেখ না করে উপরিউক্ত সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তার নিন্দনীয় ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে।

১১-১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ওয়ালিদকে তো আমিই সৃষ্টি করেছি। সে আজ যে দেব-দেবীর পক্ষে রাসূলের বিরোধিতা করছে, তারা তাকে বানায়নি। আর যখন সে জন্ম নেয় তখন সে একাই ছিল। ধনবল ও জনবল পেয়ে ঐ কথা সে এখন ভুলে গেছে। সে যে নেতৃত্বের আসন পেয়েছে তা আমিই দিয়েছি। এ নেতৃত্ব হারানোর ভয়েই সে এ ভূমিকা পালন করছে। এর ফল সে কী আশা করে? সে কি আশা করে যে, এরপরও তাকে আরো উন্নতি দেব?

১৬-১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাকে সবকিছুই দিয়েছি। আমার আয়াতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার পরও সে আশা করে যে, তাকে আরো দেব? তাকে দোযখের শাস্তি ছাড়া কিছুই দেওয়ার নেই।

১৮-২৫ নং আয়াত পর্যন্ত উক্ত সম্মেলনে ওয়ালিদ বিন মুগীরার ভূমিকার ছবিটিই তুলে ধরা হয়েছে। মক্কার সরদারদের নেতা হিসেবে ওয়ালিদ রাসূল (স)-এর কাছে যতবার আপস প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছে, ততবারই সে কুরআনের বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছে। একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও কবি হিসেবে সে বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর কালাম বলে যা পেশ করছে তা মানুষের রচনা হতে পারে না। তাই একবার সে কুরাইশ সরদারদেরকে রাসূল (স)-এর বিরোধিতা না করার পরামর্শ দিয়েছিল। ওয়ালিদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তার মন সাক্ষ্য দিচ্ছিল, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল; কিন্তু কুরাইশ সরদাররা সে কথা না মানা পর্যন্ত সে যদি আগেই মেনে নেয় তাহলে তার নেতৃত্ব থাকে না। এ অবস্থায় যখন তারই সভাপতিত্বে সম্মেলন হচ্ছে, তখন তার নিজের বিবেকের বিরুদ্ধেই তাকে লড়াই করতে হলো।

হজ্জের মৌসুমে গোটা আরব থেকে আগত জনগণের নিকট মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে কী কথা প্রচার করতে হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই এ সম্মেলন হচ্ছিল। নেতারা অনেক রকম প্রস্তাব পেশ করল। সভাপতি হিসেবে ওয়ালিদ প্রতিটি প্রস্তাব যুক্তিসহকারে বাতিল ঘোষণা করল। তখন সবাই ওয়ালিদের উপরই চাপ সৃষ্টি করল যে, তাহলে তুমিই সিদ্ধান্ত দাও।

ওয়ালিদ মহা সমস্যায় পড়ল। যদি সে বিবেকের দাবি মেনে নেয় তাহলে সবাই যে তার বিরোধী হয়ে তাকে নেতৃত্ব থেকে সরাবে, সে কথা বুঝতে আর বাকি রইল না। নেতা হিসেবে নিজের মর্যাদা বহাল রাখার প্রয়োজনে খুব ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত বিবেকের বিরুদ্ধে চলার সিদ্ধান্তই সে নিল।

তার এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ১৯ ও ২০ নং আয়াতে আল্লাহ মন্তব্য করেছেন, 'হায় হায়! সে তো নিজেকে কতল করে ফেলল– এটা কী সিদ্ধান্ত নিল? এমন সিদ্ধান্তই সে নিল, যা তাকে ধ্বংস করে দিল। তার উপর লা'নত।'

২১ থেকে ২৩ নং আয়াতে তার চেহারার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাকে বিবেকের বিরুদ্ধে রীতিমতো অভিনয় করতে হয়েছে। সে সবার দিকে তাকাল; ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

চেহারায় গভীর চিন্তার ভাব ফোটানোর চেষ্টা করল, তারপর বিবেকের দাবি থেকে পিছিয়ে এল এবং নেতৃত্বের অহঙ্কার দেখিয়ে হুংকার ছাড়ল।

সে যা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল তা ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ঘোষণা করল, 'এ তো পুরনো কালের জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর কথা বলে দাবি করলেও আসলে এসব কথা মুহাম্মদেরই রচনা।'

ওয়ালিদ বিন মুগীরা এক প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র

যখনই ইমাকাতে দীনের আন্দোলন কোথাও শুরু হয় তখন ফিরাউন, নমরূদ ও আবু জাহলদের ভূমিকা পালনের লোক যেমন সকল দেশে এবং সকল যুগেই পাওয়া যায়, তেমনি ওয়ালিদ বিন মুগীরার ভূমিকা পালন করার লোকও দেখা যায়।

ইসলামী আন্দোলনকে মনে-প্রাণে পছন্দ করা সত্ত্বেও শুধু দুনিয়ার স্বার্থে যারা নানা অজুহাতে বিরোধিতা করে থাকে এবং ফিরাউন-নমরূদদের সাথে সহযোগিতা করে থাকে, তাদের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রই ওয়ালিদ বিন মুগীরা।

দেশের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও মহল্লা পর্যন্ত উপরিউক্ত উভয় ভূমিকা পালনের লোক পাওয়া যায়। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তাদের আচরণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সহজেই তাদের চিনে নিতে পারেন।

২৬ নং আয়াতে ওয়ালিদের ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাআলাও তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, 'আমি শীঘ্রই তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব।'

২৭-৩০ নং আয়াতে ঐ দোযখের ভয়ানক ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐ দোযখ সম্পর্কে কি তোমাদের কোনো ধারণা আছে? যাদেরকে সেখানে ফেলা হবে তাদের আযাবের কোনো শেষ থাকবে না এবং কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। তাদেরকে দোযখের আগুনে জ্বালিয়ে শেষ করে দেওয়া হবে না; বরং চামড়া ঝলসিয়ে দিতে থাকবে, যাতে চিরদিন সাজা ভুগতে বাধ্য হয়। ঐ দোযখের কর্মচারী ১৯ জন ফেরেশতা হবে।

৩১ নং আয়াতটি কুরআনের বড় আয়াতগুলোর একটি। দোযখের কর্মচারী মাত্র ১৯ জন শুনে কাফিররা তো হেসেই অস্থির। কোটি কোটি মানুষকে দোযখে মাত্র এ কয়জন ফেরেশতা কী করে সামলাবে– এ জাতীয় নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে, ব্যাপারটা মোটেই হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ঐ ১৯ জন কর্মচারী মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা, যাদের শক্তি সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণা নেই। এ সংখ্যাটা উল্লেখ না করলেও চলত। কিন্তু এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর দ্বারা কাফির, মুমিন, আহলে কিতাব, মুনাফিকসহ সবাইকে যাচাই করা হচ্ছে।

যারা কাফির, তারা তো হেসেই উড়িয়ে দিল। যারা আহলে কিতাব, তাদের তো একীন করা উচিত। যারা মুমিন, তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেল, যেহেতু আল্লাহ বলেছেন। তাই আহলে কিতাব ও মুমিনদের এ নিয়ে সন্দেহের কিছুই নেই। কিন্তু যাদের অন্তরে মুনাফিকীর রোগ আছে, আর যারা কাফির, তারা এ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এ সংখ্যা উল্লেখ করার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এভাবেই আল্লাহর বাণী দ্বারা কিছু লোক পথভ্রষ্ট হয় ও কতক লোক হেদায়াত পায়। যাদের অন্তর বাঁকা, তারা

হেদায়াতের বদলে গুমরাহ হয়। আর যারা সরলমনা, তাদের ঈমান আরও মযবুত হয়। আল্লাহর সেনাবাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সঠিক ধারণা করতে পারে না। দোযখ ও এর কর্মচারীর সংখ্যা তাদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যারা হেদায়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

দ্বিতীয় রুকূ'

৩২-৩৭ নং আয়াতে দোযখ সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের মনোভাবের প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, ব্যাপারটা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়ার জিনিস নয়। চাঁদের অস্তিত্ব, রাতের আসা-যাওয়া, সকালের আলো কি এ কথা প্রমাণ করে না যে, এ সবই বিরাট বিরাট ব্যাপার। সব সময় এগুলো দেখতে পাচ্ছ বলে এর গুরুত্ব তোমরা অনুভব কর না। যিনি এ সবের স্রষ্টা তিনিই দোযখ বানিয়েছেন। এটাও তাঁরই এক বিরাট সৃষ্টি, যাঁকে ভয় পাওয়া মানুষের কর্তব্য। এখন যার খুশি ঈমান এনে উন্নতির পথে চলুক, আর যার খুশি কুফরী করে অধঃপাতে যাক।

৩৮ নং আয়াতে একটা বিরাট বিষয়কে মাত্র কয়েকটি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক মানুষ যা কামাই করে তারই বদলে সে বন্ধক থাকে।'

ব্যাংক থেকে ধার নিতে হলে ব্যাংক তার পুঁজির নিরাপত্তার জন্য ঋণপ্রার্থীর নিকট বন্ধক দাবি করে। জমি, বাড়ি, অলঙ্কার ইত্যাদি বন্ধকস্বরূপ দেওয়া হয়। ধার শোধ করা হলে ঐ বন্ধকি জিনিস ফেরত পাওয়া যায়। ধার আদায় করতে না পারলে তা ফেরত পাওয়া যায় না।

তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় বস্তুজগৎ ও এ জগৎকে ব্যবহার করার উপযোগী হাতিয়ার হিসেবে মানবদেহ দান করেছেন। চিন্তাশক্তি, মননশক্তি, দৈহিক যাবতীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি সবই তাঁর দান। এসব শক্তি দ্বারা সৃষ্টিজগতের সবকিছুই মানুষ তার কাজে লাগায়। এর কোনোটাই মানুষের সৃষ্টি নয়।

এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এসবই মানুষকে ধার দেওয়া হয়েছে। যে রূহবিশিষ্ট মানুষটিকে বস্তুজগৎ ও জড়দেহ ধারস্বরূপ দেওয়া হয়েছে, এর বদলে স্বয়ং মানুষটিই আল্লাহর নিকট বন্ধকে আবদ্ধ আছে। এখন সে কেমন আমল করল তারই উপর নির্ভর করে যে, সে আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে কি না। তাই বলা হয়েছে, মানুষ তার আমলের বদলেই বন্ধক রয়েছে। যদি আল্লাহর দেওয়া দেহ ও জগৎকে আল্লাহর পছন্দমতো ব্যবহার করে তবেই সে নিজেকে ছাড়াতে পারবে। তা না হলে সে আল্লাহর হাতে আটকই থাকবে এবং এর জন্য অবশ্যই শাস্তি পাবে।

৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বন্ধকি দশা থেকে তারাই মুক্তি পাবে, যারা ডানদিকে থাকবে। আরবী ভাষায় ডান হাতকে সম্মান ও সৌভাগ্যের প্রতীক এবং বাঁ হাতকে অপমান ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করা হয়। তাই আদালতে আখিরাতে বিচারকালে আল্লাহ তাআলা বেহেশতীদেরকে ডানদিকে এবং দোযখীদেরকে বাঁদিকে রাখবেন। কুরআনে 'আসহাবুল ইয়ামীন' নেক লোকদেরকেই বলা হয়েছে, যারা ডানদিকে থাকবে।

যারা বন্ধকি দশা থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে যাওয়ার অধিকার পাবে, তারা বন্ধকী দশায় আবদ্ধ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, কী কারণে তোমাদেরকে দোযখে যেতে হলো।

৪১-৪৮ নং আয়াতে দোযখীরা এ প্রশ্নের উত্তরে যা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে ওয়ালিদ বিন মুগীরার দল যত হঠকারিতাই করুক, সেদিন আসহাবুল ইয়ামীনের প্রশ্নের জবাবে তারা অকপটে অপরাধ স্বীকার করবে।

তারা বলবে, আমরা নামায আদায় করিনি, গরিবদেরকে খাওয়াইনি, সত্যের বিরোধিতা করেছি, এমনকি এখন যে আখিরাতকে দেখতে পাচ্ছি, তাকে মিথ্যা মনে করেছি।

৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এ অপরাধীদের জন্য কোনো সুপারিশ কাজে লাগবে না।

৪৯-৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের গোমরাহীর কারণ সম্পর্কে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে প্রশ্ন তুলে নিজেই এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন তারা কুরআন থেকে হেদায়াত না নিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইল। কুরআন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর যে হাস্যকর আচরণ তারা করেছে, তাতে তাদেরকে বন্য গাধার সাথেই তুলনা করতে হয়। বাঘের ভয়ে যেমন বন্য গাধা পালায়, তারা কুরআনকেও তেমনি ভয় পেল কেন?

৫১ নং আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, কাফিররা মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার না করে বিদ্রূপের ভাষায় বলত, 'তোমাকে রাসূল নিযুক্ত করা হয়ে থাকলে তোমার আল্লাহকে বলো যে, আমাদের প্রত্যেকের নামে লিখিত চিঠি দিয়ে সে কথা জানিয়ে দিক।

তাদের উপরিউক্ত আচরণের মূল কারণ ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আসলে যারা আখিরাতে জবাবদিহির ভয় করে না, তাদের আচরণ এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

৫৪-৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য উপদেশ। কিন্তু এ উপদেশ কবুল করার জন্য আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না; যার খুশি উপদেশ গ্রহণ করবে। তবে এটা জেনে রাখা উচিত যে, যাকে আল্লাহ উপদেশ কবুলের তাওফীক দেন না, সে হেদায়াত পায় না। আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, হেদায়াত কবুলের জন্য কার কতটুকু আগ্রহ। এ আগ্রহের অভাবেই কুরআনকে চেনা সত্ত্বেও ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে আল্লাহ হেদায়াতের তাওফীক দেননি। যদি কেউ হেদায়াত পাওয়ার আগ্রহ না রাখে, তাহলে আল্লাহ এমন কোনো ঠেকায় পড়েননি যে, অলৌকিক উপায়ে হেদায়াত করার যে দাবি তারা ৫১ নং আয়াতে করেছে তা তিনি পূরণ করতে বাধ্য হবেন। শেষ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত মহব্বত ও দরদের সাথে বলেছেন, মানুষের উপরে আল্লাহর এ হক রয়েছে যে, তারা আল্লাহকে ভয় করার যোগ্য মনে করবে এবং আল্লাহর মর্জিমতো চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু এভাবে চলার চেষ্টা করতে গিয়ে যদি মানবিক দুর্বলতার কারণে দোষ-ত্রুটি হয়েই যায়, তাহলে তারা যেন এ কথা মনে রাখে যে, আল্লাহ তাআলা মাফ করারও অধিকারী। তিনি বান্দাহকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জিদ ধরে বসে নেই।

সূরা মুদ্দাস্‌সির

৫৬ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে[১] কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি!

২. ওঠুন এবং সাবধান করুন।

৩. এবং আপনার রবের বড়ত্ব প্রচার করুন।

৪. আপনার পোশাক পাক-সাফ রাখুন।

৫. মলিনতা থেকে দূরে থাকুন।

৬. বেশি পাওয়ার জন্য ইহসান করবেন না।

৭. আর আপনার রবের খাতিরে সবর করুন।

৮. অতঃপর যখন[২] শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।

৯. ঐ দিনটি বড়ই কঠিন দিন হবে।

১০. কাফিরদের জন্য (মোটেই) সহজ হবে না।

১১. আমাকে এবং ঐ লোককে ছেড়ে দিন, যাকে আমি একা[৩] সৃষ্টি করেছি।

১২. আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি।

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ﴿٨﴾

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ﴿٩﴾

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿١١﴾

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿١٢﴾

---

১. এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াতে সর্বপ্রথম রাসূল (স)-কে তাবলীগ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের পর এটাই রাসূল (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত দ্বিতীয় ওহী।

২. এ অংশ ঐ সময় নাযিল হয়েছে, যখন প্রথম সাতটি আয়াত নাযিলের অনেক দিন পর এবং রাসূল (স)-এর প্রকাশ্যে তাবলীগ শুরু হয়ে যাওয়ার পর হজ্জের প্রথম মওসুম এল। তখন মক্কার সরদাররা একটি সম্মেলন করে এ সিদ্ধান্ত নিল যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে যারা বাইরে থেকে আসবে তাদের মাঝে কুরআন ও রাসূল (স) সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য এক বিরাট প্রচারাভিযান চালানো হবে।

৩. এর দ্বারা ওয়ালিদ বিন মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে, যার অন্তর কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মক্কায় তার সরদারি কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সে এ সম্মেলনে কাফিরদেরকে এ পরামর্শ দিয়েছিল যে, রাসূল (স)-কে জাদুকর এবং কুরআনকে জাদু বলে প্রচার করা হোক।

وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾

১৩. তার সাথে হাজির থাকার জন্য সন্তানাদি দিয়েছি।

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾

১৪. তার জন্য ক্ষমতা পাওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছি।

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾

১৫. এর পরও সে লোভ করে যে, আমি তাকে আরো বেশি দেব।

كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾

১৬. কক্ষনো নয়! সে আমার আয়াতের বিরুদ্ধে দুশমনি রাখে।

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾

১৭. শিগ্‌গিরই আমি তাকে এক কঠিন জায়গায় চড়াব।

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয়ই সে চিন্তা করেছে এবং কিছু কথা বানানোর চেষ্টা করেছে।

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

১৯. কাজেই তার উপর অভিশাপ। সে কেমন ধরনের কথা বানানোর চেষ্টা করেছে?

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২০. আবার বলছি, তার উপর অভিশাপ। সে কেমন ধরনের কথা বানানোর চেষ্টা করেছে?

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

২১. এরপর সে (জনগণের দিকে) চেয়ে দেখল।

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর সে কপাল কুঁচকালো এবং মুখ বাঁকা করল।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারপর পিছিয়ে গেল ও অহঙ্কারে পতিত হলো।

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

২৪. শেষে বলল, এ (কুরআন) তো আগে থেকে চালু হওয়া জাদু ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

২৫. এ তো মানুষের বানানো কথা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৬. শিগ্‌গিরই আমি তাকে দোযখে ফেলে দেব।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কী জানো যে, ঐ দোযখটি কী?

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৮. (যা) বাকিও রাখে না, ছেড়েও দেয় না।[৪]

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

২৯. (যা) চামড়া ঝলসিয়ে দেয়।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩০. উনিশ জন (পাহারাদার) এর উপরে নিযুক্ত আছে।

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

৩১. আমি[৫] ফেরেশতাদেরকেই দোযখের কর্মচারী বানিয়েছি এবং তাদের সংখ্যাকে আমি কাফিরদের জন্য ফিতনা বানিয়েছি, যাতে আহলে কিতাবদের মধ্যে ইয়াকীন এসে যায়, ঈমানদারদের ঈমান বেড়ে যায় এবং আহলে কিতাবরা ও মুমিনরা কোনো সন্দেহে পড়ে না থাকে।[৬] অন্তরের রোগী ও কাফিররা বলে যে, 'এ আজব কথা দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চান?' এভাবেই আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আপনার রবের সেনাবাহিনীকে তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর এ (দোযখের আলোচনা) মানুষের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুকূ' ২

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

৩২. কক্ষনো নয়![৭] কসম চাঁদের!

---

৪. অর্থাৎ, আযাবের উপযোগী যে-ই তার আওতায় আসবে, তাকে অক্ষত রাখবে না এবং তার কবজায় যে-ই আসবে, তাকে আযাব না দিয়ে ছাড়বে না।

৫. এখান থেকে ৩১ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত বাক্য কয়টি সূরার আলোচ্য বিষয়ের অতিরিক্ত কথা। রাসূল (স) থেকে দোযখের মাত্র ১৯ জন কর্মচারীর কথা শুনেই কাফিররা এ কথাকে ঠাট্টায় উড়িয়ে দিতে চাইল। তাদের কাছে এটা খুবই অদ্ভুত মনে হলো যে, একদিকে আমাদেরকে বলা হচ্ছে, আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক কাফির ও কবীরা গুনাহর দোষে দোষী, তাদের সবাইকে দোযখে ফেলা হবে। অপরদিকে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, এত বিরাট দোযখে অগণিত মানুষকে আযাব দেওয়ার জন্য মাত্র ১৯ জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে।

৬. যেহেতু আহলে কিতাব ও ঈমানদারগণ ফেরেশতাদের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন, সেহেতু তাদের মনে এ সন্দেহ হতে পারে না যে, মাত্র ১৯ জন ফেরেশতা দোযখের ব্যবস্থাপনার জন্য কেমন করে যথেষ্ট হতে পারে।

৭. অর্থাৎ এটা কোনো আজগুবি কথা নয়, যা নিয়ে এভাবে ঠাট্টা করা চলে।

বাংলা	আরবি
৩৩. কসম রাতের, যখন তা ফিরে যায়।	وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾
৩৪. কসম সকালের, যখন তা ফর্সা হয়।	وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾
৩৫. নিশ্চয়ই এ (দোযখ) বড় বড় জিনিসের একটি।[৮]	اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾
৩৬. মানুষের জন্য তা সাবধানকারী।	نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾
৩৭. তোমাদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে চায় এবং যে পিছিয়ে থাকতে চায়, তাদের প্রত্যেকের জন্যই (এটা সতর্ককারী)।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾
৩৮. প্রত্যেক মানুষ যা কামাই করে, তার বদলেই সে বন্ধক থাকে।	كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. অবশ্য ডান দিকের লোকেরা ছাড়া।	اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾
৪০-৪১. তারা বেহেশতে থাকবে এবং অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে।[৯]	فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. কিসে তোমাদেরকে দোযখে নিয়ে গেল?	مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের মধ্যে শামিল ছিলাম না।	قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর আমরা মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়াতাম না।	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর (সত্যের বিরুদ্ধে) যারা অযথা কথা বানায়, আমরাও তাদের সাথে মিলে কথা বানাতাম।	وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর বিচারদিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম।	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾
৪৭. শেষ পর্যন্ত ঐ নিশ্চিত জিনিসটিই আমাদের সামনে এসে পড়ল।	حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾

৮. অর্থাৎ যেভাবে চাঁদ, রাত ও দিন আল্লাহর কুদরতের বিরাট প্রমাণ, তেমনি দোযখও বড় বড় কুদরতের একটি জিনিস।

৯. অর্থাৎ, বেহেশতে বসে বসে তারা দোযখবাসীদের সাথে কথা বলবেন এবং এ প্রশ্ন করবেন।

৪৮. তখন সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না।	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০-৫১. এরা যেন ভীত বন্য গাধা। বাঘের ভয়ে পালাচ্ছে।[১০]	كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾
৫২. বরং এদের প্রত্যেকেই চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি পাঠানো হোক।[১১]	بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾
৫৩. কক্ষনো নয়![১২] আসল কথা হলো, এরা আখিরাতকে ভয় করে না।	كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾
৫৪. কক্ষনো নয়! এ (কুরআন) তো একটি উপদেশ।	كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾
৫৫. এখন যার ইচ্ছা সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾
৫৬. আল্লাহর ইচ্ছা না হলে এরা কোনো উপদেশই গ্রহণ করবে না। তিনিই তাকওয়া পাওয়ার অধিকারী এবং (যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে) তিনিই মাফ করার অধিকারী।	وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

১০. এটা একটা আরবী বাচনভঙ্গি। বন্য গাধার বৈশিষ্ট্য এই যে, বিপদের একটু আঁচ পেলেই এমন দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে যে, অন্য কোনো পশু এমনভাবে পালায় না।

১১. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ যদি সত্যিই মুহাম্মদ (স)-কে নবী নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে মক্কার এক-একজন সরদারের নামে এ মর্মে চিঠি দিয়ে জানানো হোক যে, মুহাম্মাদ (স) আমার নবী, আর তোমরা তাঁর আনুগত্য কবুল কর।

১২. অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোনো দাবি কিছুতেই পূরণ করা হবে না।

৭৫. সূরা কিয়ামাহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'কিয়ামাহ' শব্দের ভিত্তিতে এর নামকরণ করা হয়েছে। এটা শুধু নামই নয়; এ সূরার আলোচ্য বিষয়ও কিয়ামাত।

নাযিলের সময়

এ সূরার ১৫ নং আয়াতের পর সূরার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে হঠাৎ রাসূল (স)-কে ওহী গ্রহণ করার ব্যাপারে যে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে তাতে বোঝা যায়, মাক্কী যুগের একেবারে প্রথমদিকেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। ১৬ থেকে ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ওহী গ্রহণ করার সময় আয়াত মুখস্থ রাখার জন্য পেরেশান হয়ে সাথে সাথে আওড়ানোর চেষ্টা করার দরকার নেই। মনোযোগ দিয়ে শুনলেই চলবে, মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহরই। এ থেকে বোঝা যায় যে, তখনো ওহী গ্রহণ করার অভ্যাস রপ্ত হয়ে সারেনি।

আলোচ্য বিষয়

কিয়ামাত ও আখিরাত যে সম্ভব এবং এটা যে অবশ্যই হবে বরং হওয়াটাই যে উচিত, তা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে এ সূরায় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আখিরাতের ইমকান, ওকূ ও ওজূবের দলিল পেশ করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম দুটো আয়াতই 'না' দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, কোনো কথা চর্চা করা হচ্ছিল, যার প্রতিবাদ করা হচ্ছে। মক্কাবাসী কিয়ামাত ও আখিরাতকে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তারা এটাকে অসম্ভব, অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে তর্ক করছিল। তাই প্রথমেই প্রতিবাদ করে বলা হলো, তোমরা যা ভাবছ, ব্যাপার মোটেই তা নয়।

প্রথম দুটো আয়াতেই আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে কথা বলেছেন। আমরা যে উদ্দেশ্যে কসম খাই, আল্লাহ সে উদ্দেশ্যে কসম খান না। কোনো কথা সত্য বলে বিশ্বাস করানোর জন্যই আল্লাহর নামে আমরা কসম খেয়ে থাকি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে বিষয়ের নাম নিয়ে কসম খান, সে বিষয়টাকেই তাঁর বক্তব্যের যুক্তি হিসেবে পেশ করেন।

প্রথম আয়াতে কিয়ামাতের কসম খেয়ে আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন যে, এ দুনিয়া একদিন খতম হয়ে যাবে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালায় সাজানো এ পৃথিবী যেভাবে চলছে তা চিরদিন যে এভাবে চলবে না, তা সৃষ্টিধারা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ঐ দিনটি যে একদিন আসবেই সে কথা জোর দিয়ে বলার জন্য কিয়ামাতের কসম খাওয়াই যথেষ্ট।

কিন্তু বস্তুজগতের বর্তমান ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে যে একটি নৈতিক জগৎ সৃষ্টি করা হবে সে কথার যুক্তি হিসেবেই দ্বিতীয় আয়াতে 'নাফসে লাওয়ামার' কসম খাওয়া হয়েছে। শুধু কিয়ামাতের কসম খাওয়া এর জন্য যথেষ্ট নয়।

নাফস হলো মানুষের দেহের দাবির নাম। মানবদেহ হলো তার বস্তুগত অস্তিত্ব। এ বস্তুজগতের প্রতিই এ দেহের স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। এর কোনো নৈতিক বোধ নেই। রূহ বা বিবেকই হলো মানুষের নৈতিক অস্তিত্ব। এটাই আসল মানুষ। দেহ যখন পশুর মতো হিতাহিত জ্ঞানহীন অবস্থায় বস্তুজগৎকে ভোগ করতে চায়, তখন বিবেকই সেখানে নৈতিকতার দাবি তোলে এবং যা মনুষ্যত্বের বিরোধী তার প্রতিবাদ জানায়। এটাকেই বিবেকের দংশন বলা হয়। এভাবেই দেহ ও বিবেকের মধ্যে হামেশা লড়াই চলছে।

কুরআনে এ লড়াইয়ের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যখন বিবেক এত দুর্বল থাকে যে, নাফস যা চায় বিনা বাধায় তা করাতে সক্ষম হয় এবং বিবেক বাধা দিতে অক্ষম হয়, তখনকার অবস্থাকে সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াতে 'নাফসে আম্মারা' বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো 'হুকুমকর্তা নাফস'। অর্থাৎ সে দাপটের সাথে হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে বিনা বাধায়। ঈমান না থাকার ফলেই এমন অবস্থা হতে পারে।

কিন্তু যখন নাফসকে বিবেক বাধা দেয়, তখনকার অবস্থাকেই 'নাফসে লাওয়ামা' বলা হয়েছে। অর্থাৎ নাফসে লাওয়ামা হলো ঐ নাফস, যে বিবেকের নিকট গালি ও ধমক খায়। এটা হলো ঈমানের সাধারণ অবস্থা।

সূরা 'ফাজর'-এর ২৭ নং আয়াতে 'নাফসে মুত্মাইন্নাহ' বা প্রশান্ত নাফস নামে নাফসের যে অবস্থা বোঝানো হয়েছে, তা হলো ঈমানের উন্নততম অবস্থা। রূহ বা বিবেক যখন শক্তিশালী হয় তখন নাফস আর লড়াই করে না; বিবেকের নির্দেশ সে শান্তভাবে মেনে নেয়। এরই নাম নাফসে মুত্মাইন্নাহ।

নাফস ও রূহের এ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই আছে। তাই এ সূরার দ্বিতীয় আয়াতে নাফসে লাওয়ামার কসম খেয়ে কিয়ামতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের যুক্তি পেশ করা হয়েছে। কিয়ামতের প্রথম অধ্যায়ে সব মানুষ মরে যাবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবার যে মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তির জন্য নতুন করে তৈরি করা হবে, নাফসে লাওয়ামার অস্তিত্বকেই এর প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

নাফসে লাওয়ামার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ভালো ও মন্দের ধারণা মানুষের আছে। আর বিবেকের এটাই দাবি যে, ভালো কাজের পুরস্কার পাওয়া এবং মন্দ কাজের শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুগত এ দুনিয়ায় নৈতিক ফল প্রকাশ পায় না। তাই একটি নৈতিক জগৎ দরকার, যেখানে ভালো ও মন্দের ফল প্রকাশ পাবে। অতএব আখিরাত যে অবশ্যই হওয়া উচিত, এটা বিবেকেরই দাবি। এভাবে নাফসে লাওয়ামাকে আখিরাতের যুক্তি হিসেবে এখানে পেশ করা হয়েছে। এটা হলো 'আনফুসের যুক্তি'।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে যারা মৃত্যুর পর আবার মানুষের দেহকে অস্তিত্বে আনা অসম্ভব মনে করে, তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ কি এ কথা মনে করে যে, পচা হাড়গুলোকে আর জমা করা যাবে না? তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ আঙুলের মাথার রেখাগুলোসহ আবার মানুষকে তৈরি করতে সক্ষম।

৫ নং আয়াতে আখিরাতকে অস্বীকার করার আসল কারণ প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা যে এর যুক্তি বুঝতে পারে না তা নয়। আসলে তারা দুনিয়ার মজা লুটার তালে আছে। তারা এ বস্তুজগতের রূপ-রস-গন্ধকে অবাধে ভোগ করার জন্য

পাগল। তাই তারা নৈতিকতার পরওয়া না করে বিবেকের বিরুদ্ধে সব রকম অপকর্মই চালিয়ে যেতে চায়। পশুর মতো ভোগবাদী জীবন যাপনই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের এ উদ্দেশ্যের সাথে আখিরাতে বিশ্বাস মোটেই খাপ খায় না। তাহলে যে ভোগের চিন্তা ছাড়তে হয়।

৬ নং আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের একটি বিদ্রূপপূর্ণ প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা জিজ্ঞেস করে যে, কিয়ামতের দিনটা কবে আসবে? কিয়ামতের তারিখ জানার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন তোলা হয়নি; বরং অস্বীকার করার মতলবেই তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

৭-১২ নং আয়াতে ঐ প্রশ্নের জবাবে কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের তারিখ জানার কোনো দরকার নেই। সেদিনের অবস্থাটা শুনে রাখো। সেদিন চন্দ্র-সূর্যের এ দুনিয়া ভেঙে একাকার করে দেওয়া হবে। মানুষ তখন হয়রান হয়ে বলবে, হায়! কোথায় পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেব? এর জবাবে বলা হবে, না না, আর কোথাও আশ্রয় পাবে না। তোমাদের রবের দরবারেই হাজির হতে হবে।

১৩-১৫ নং আয়াতে হাশরের ময়দানের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সেদিন সব মানুষের আমলনামা পেশ করা হবে। দুনিয়ায় থাকাকালে মানুষ যাকিছু করেছে এবং মৃত্যুর পর ঐসব কাজের জের হিসেবে যাকিছু তার হিসাবে জমা হয়েছে, সবই সেদিন তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

এভাবে জানিয়ে দেওয়া ছাড়াও প্রত্যেক মানুষ নিজেই ভালো করে জানে যে, সে কতটুকু ভালো বা মন্দ। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যে যত কৈফিয়তই পেশ করুক নিজের কাছে তার চরিত্র অজানা নয়। সে নিজেই সেদিন বুঝতে পারবে যে, সে কতটুকু অপরাধী।

১৬-১৯ নং আয়াত পর্যন্ত ওহী গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (স)-কে ঐ হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, যা সূরাটি নাযিলের সময় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

২০ ও ২১ নং আয়াতে আখিরাত অস্বীকার করার অরো একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। ৫ নং আয়াতে একটা কারণ আগেই বলা হয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে, হে মানুষ, তোমাদের দুর্বলতা এখানেই যে, তোমরা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে এতই মহব্বত কর যে, আখিরাতের কথা তোমাদের খেয়াল থাকে না। এটাই তোমাদের আসল রোগ। হাদীসে আছে, 'দুনিয়ার মহব্বতই সব পাপের মূল।'

২২-২৫ নং আয়াত পর্যন্ত হাশরের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, সেদিন দু'রকমের লোক দেখা যাবে। কতক লোকের চেহারা তরতাজা, সজীব ও উজ্জ্বল দেখা যাবে। তারা তাদের রবের দিকে পুরস্কারের আশায় দেখতে থাকবে। আর কতক লোকের চেহারা বড়ই উদাসীন, মলিন ও হতাশ থাকবে। তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের সাথে অতি কঠোর ব্যবহার করা হবে। তারা শাস্তির আশঙ্কায় পেরেশান অবস্থায় থাকবে।

২৬-৩০ নং আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মরণকালীন করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তাদের জান বের হওয়ার সময় হয় তখন একদিকে তার আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসায় নিরাশ হয়ে ঝাড়-ফুঁক জাতীয় তদবিরের তালাশ করতে থাকে, অপরদিকে আযাবের ফেরেশতা তার রূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। মৃত্যুপথযাত্রী নিজেও টের পায় যে, তার বিদায়ের সময় হয়ে গেছে। তখন তার দুই পা একসাথে জড়িয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, সে আর পা নাড়াতে পারবে না। আর অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হওয়ার মতো অসহায় অবস্থায় দুই পা লম্বা হয়ে পড়ে থাকবে।

এটাই তার জন্য কিয়ামত ও আখিরাতের শুরু। তার রবের নিকট রওনা হওয়ার দিন এটাই। অথচ এ দিনটিকে সে ভুলে ছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'

৩১-৩৫ নং আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অনেক তাফসীরকারের মতে, আবূ জাহলকে উদ্দেশ করে এ কথাগুলো বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আবূ জাহল নিশ্চয়ই প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। অর্থাৎ আখিরাতে অবিশ্বাসীরা আবু জাহলের মতোই হয়ে থাকে।

এ জাতীয় চরিত্রের পরিচয় হলো, এরা আখিরাতকে সত্য বলে মেনে নেয় না। আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ নামাযও আদায় করে না; বরং তারা আখিরাতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় এবং ঈমানের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর দাপট দেখিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলে যায়। যতই তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হোক, তারা এ সবের ধার ধারে না।

৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে আবু জাহল! এমন আচরণ তোর মতো লোকের জন্যই সাজে। কোনো নেক লোকের জন্য এমনটা মোটেই শোভা পায় না।

৩৬-৪০ নং আয়াতে এ সূরার মূল বক্তব্যকে আবার সুস্পষ্টভাবে পেশ করে বলা হয়েছে, আখিরাতের যুক্তি এখনো মানুষের বুঝে আসছে না? মানুষকে ভালো ও মন্দের ধারণা দিয়ে এবং উভয়দিকে চলার ইখতিয়ার দেওয়ার পর মানুষকে কি এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে? তাদেরকে কি পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, মন্দ বুঝেও তা করেছে কেন এবং ভালো জেনেও তা করেনি কেন?

মানুষ কী করে আল্লাহর এ ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারে যে, তিনি মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন? যিনি সামান্য বীর্যকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করতে পারেন, তারপর দেহকে ঠিকঠাক করে তৈরি করেন এবং নারী-পুরুষ নির্দিষ্ট সংখ্যায় সৃষ্টি করেন, তিনি কেন মৃত্যুর পর আবার জীবিত করতে পারবেন না?

বিনা পরিকল্পনায়ই মানব সৃষ্টির এ ধারা চলছে বলে ধারণা করার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে? যদি কোনো মহা পরিকল্পনাকারী এর পেছনে না থাকত, তাহলে কোনো দেশে শুধু পুরুষ আর কোথাও শুধু নারী সৃষ্টি হলে কী উপায় হতো?

সুতরাং আখিরাতকে অসম্ভব ও অযৌক্তিক মনে করার পক্ষে কোনো যুক্তিই নেই।

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٤٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ①

১. না, তা নয়;[১] আমি কসম খাচ্ছি কিয়ামতের দিনের।[২]

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②

২. (আবার বলছি,) না, তা নয়; আমি কসম খাচ্ছি নাফসে লাওয়ামার।[৩]

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ③

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে পারব না।

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ④

৪. বরং আমি তো তার আঙ্গুলের মাথাও ঠিকভাবে বানাতে পারি।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ⑤

৫. কিন্তু মানুষ চায় যে, ভবিষ্যতেও সে পাপ কাজ করতে থাকবে।[৪]

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ⑥

৬. সে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা কিয়ামতের দিনটি কবে আসবে?

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑦

৭. তারপর যখন দেখার শক্তি হারিয়ে যাবে,

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑧

৮. চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑨

৯. এবং চাঁদ ও সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেওয়া হবে।

১.'না' দিয়ে কথা শুরু করা দ্বারা এ কথারই প্রমাণ মিলে যে, আগে থেকে কোনো কথা চলছিল, যার প্রতিবাদে এ সূরা নাযিল হয়েছে। এখানে 'না' বলার মানে হলো, তোমরা যাকিছু ধারণা করে আছ তা মোটেই সঠিক নয়। আমি কসম খেয়ে বলছি যে, আসল কথা ওটা নয়, এটা।

২. কিয়ামত আসার ব্যাপারে কিয়ামতের নামে কসম এজন্য খাওয়া হয়েছে যে, এর আসাটা নিশ্চিত। গোটা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ দুনিয়া অনাদি নয়, অনন্তও নয়; এক সময় অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে আবার এক সময় অবশ্যই খতম হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ কসম ঐ বিবেকের, যা মন্দের নিন্দা করে এবং মানুষের মধ্যে যার উপস্থিত থাকা এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, মানুষ তার আমলের জন্য দায়ী এবং এ জন্য তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

৪. অর্থাৎ ,তাদের কিয়ামতকে অস্বীকার করার আসল কারণ এটা। কোনো যুক্তি ও জ্ঞানের দলিলের ভিত্তিতে কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, কিয়ামত হবে না বা হতে পারে না।

يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾

১০. সেদিন এ মানুষই বলে উঠবে, 'পালানোর জায়গা কোথায়?'

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾

১১. কক্ষনো নয়! সেখানে কোনো আশ্রয়ের জায়গা থাকবে না।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾

১২. সেদিন তোমার রবেরই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ﴿١٣﴾

১৩. সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, সে আগে কী করেছে এবং পরে কী করেছে।

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾

১৪. বরং মানুষ নিজেই তার নিজেকে ভালোভাবে জানে।

وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾

১৫. সে যতই ওযর পেশ করুক না কেন।[৫]

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾

১৬. (হে রাসূল[৬]!) এই ওহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বাকে নাড়াবেন না।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾

১৭. এটা মুখস্থ করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব।

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾

১৮. কাজেই যখন আমি তা পড়তে থাকি, তখন আপনি সে পড়া মন দিয়ে শুনতে থাকুন।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾

১৯. তারপর এর মর্ম বুঝিয়ে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব।

৫. অর্থাৎ, আসলে আমলনামা মানুষের সামনে রাখার এ উদ্দেশ্য নয় যে, অপরাধীকে তার অপরাধ জানানো হচ্ছে; বরং আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ না করলে সুবিচারের দাবি পূরণ হয় না। সাধারণত প্রত্যেক মানুষ ভালো করেই জানে যে, সে আসলে দোষী কি না।

৬. ১৬-১৭ নং আয়াতের সবকয়টি বাক্য সূরার আলোচনা-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। জিবরাঈল (আ) যখন রাসূল (স)-কে এ সূরা শোনাচ্ছিলেন, তখন ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় রাসূল (স) সাথে সাথে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করছিলেন।

২০. কক্ষনো নয়![৭] আসল কথা হলো, তোমরা যে জিনিস জলদি পাওয়া যায় (অর্থাৎ দুনিয়া) তাকেই ভালোবাস।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

২১. আর আখিরাতকে ছেড়ে দিয়ে থাক।

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾

২২. সেদিন কতক চেহারা তরতাজা থাকবে।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২৩. তাদের রবের দিকে দেখতে থাকবে।

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

২৪. সেদিন আরো কতক চেহারা উদাস থাকবে।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা ধারণা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা হবে।

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৬. কক্ষনো নয়![৮] যখন প্রাণ গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং বলা হবে, 'ঝাড়-ফুঁক করার কেউ আছে কি?'

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৮. তখন সে বুঝতে পারবে, এটা (দুনিয়া থেকে) বিদায়ের সময়।

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

২৯. এক পায়ের গোছা অপর পায়ের গোছার সাথে জড়িয়ে যাবে।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

৩০. ঐ দিনটি হবে তোমার রবের দিকে রওয়ানা হওয়ার দিন।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

রুকূ' ২

৩১. কিন্তু সে সত্য বলে মেনেও নেয়নি, নামাযও পড়েনি।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾

৭. এখান থেকে আবার ১৬ নং আয়াতের পূর্বের প্রসঙ্গ চালু হলো। এখানে 'কখনো নয়' অর্থ হলো, তোমাদের আখিরাতকে অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, তোমরা আল্লাহকে কিয়ামত কায়েম করতে বা মৃত্যুর পর আবার জীবিত করতে অক্ষম মনে কর; বরং আসল কারণ এটা।

৮. এখানে 'কখনো নয়' কথাটির সম্পর্ক উপরের বক্তব্যের সাথে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভুল যে, তোমাদেরকে মরে শেষ হয়ে যেতে হবে এবং মনিবের সামনে হাজির হতে হবে না।

وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾

৩২. বরং সে মিথ্যা সাব্যস্ত করল ও ফিরে গেল।

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾

৩৩. তারপর গর্বের সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের দিকে চলে গেল।

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾

৩৪. তোর পক্ষেই এরূপ করা সাজে, তোকেই এটা শোভা পায়।

ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾

৩৫. (আবার বলছি,) তোর পক্ষেই এরূপ করা সাজে, তোকেই এটা শোভা পায়।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই[৯] ছেড়ে দেওয়া হবে।

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾

৩৭. সে কি সামান্য এক ফোঁটা বীর্য ছিল না, যা (মায়ের পেটে) ফেলা হয়?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾

৩৮. এরপর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়েছিল। তারপর (আল্লাহ তার দেহ) তৈয়ার করলেন এবং (তার সবকিছু) ঠিকভাবে বানালেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾

৩৯. অতঃপর তা থেকে দু'রকম (মানুষ) বানালেন– পুরুষ ও নারী।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

৪০. তিনি কি এ ক্ষমতা রাখেন না যে, মৃতকে আবার জীবিত করে দেবেন?

৯. আয়াতে 'সুদা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'সুদা উট' ঐ উটকে বলা হয়, যাকে এমনিভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে সে যেখান থেকে খুশি খেয়ে বেড়াতে পারে এবং যাকে আটক করার কেউ নেই। এ অর্থেই আমরা লাগামহীন কথাটা বলে থাকি।

৭৬. সূরা দাহ্‌র

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'দাহ্‌র' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। একই আয়াতের 'ইনসান' শব্দ থেকে এ সূরার অপর নাম ইনসান।

নাযিলের সময়

অধিকাংশ তাফসীরকার এ সূরাটিকে মাক্কী যুগে অবতীর্ণ বলে মনে করেন। কিছুসংখ্যক মুফাস্‌সির একে মাদানী বলেছেন। সূরাটির ভাব ও ভাষায় প্রাথমিক মাক্কী সূরার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায় বলে এ সূরাকে মাক্কীই মনে করা উচিত।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটির প্রথম রুকূ'র মূল আলোচ্য বিষয় হলো আখিরাত এবং দ্বিতীয় রুকূ'র আলোচ্য বিষয় রিসালাত।

আলোচনার ধারা

প্রথম তিন আয়াতে 'আনফুসের' যুক্তি পেশ করে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, এক সময় মানুষের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যখন মায়ের পেটে মিশ্রিত বীর্য হিসেবে তার অস্তিত্ব শুরু হয়েছে, তখনো সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এরপর আমি তাকে শোনার ও দেখার যোগ্যতা দিয়ে জ্ঞান আহরণ করে জীবনের উদ্দেশ্য বোঝার মতো চেতনা দান করেছি, যাতে তাকে আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারি যে, সে আমাকে চিনে কৃতজ্ঞ হয়, না আমাকে চিনতে অস্বীকার করে। অর্থাৎ, তাকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য বোঝার যোগ্যতা দিয়েছি, যার ভিত্তিতে তার যাবতীয় কাজের বিচার করব। আমি যখন তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছি, তখন আখিরাতে আবার তাকেই তৈরি করতে পারব বলে সে কি মনে করে না?

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহকে না চেনা ও না মানার পরিণামে আখিরাতে শিকল পরা অবস্থায় দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

৫-২১ নং আয়াত পর্যন্ত আখিরাতে নেক লোকদের অফুরন্ত সুখ-সুবিধার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে চিনল এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করল, তারা আখিরাতে কী কী পুরস্কার পাবে এর এক দীর্ঘ তালিকা এখানে পেশ করা হয়েছে :

৫ ও ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর এ নেক বান্দারা কর্পূর মেশানো এক ধরনের শরবত পান করবে। এটা এমন এক প্রবাহিত ঝরনা থেকে পাওয়া যাবে, যার শাখা তারা যেখানে খুশি সেখানেই বহায়ে নিয়ে যেতে পারবে।

৭ থেকে ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতের নিয়ামত যাদের জন্য রাখা হয়েছে, তারা দুনিয়ায় কীভাবে চলে। তারা কোনো মান্নত করলে তা পূরণ করে এবং পরকালের বিপদের ভয়ে সাবধান

হয়ে চলে। তারা একমাত্র আল্লাহর মহব্বতে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাওয়ায় এবং তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চায় না, এমনকি শুকরিয়াও কামনা করে না। তারা সব সময় তাদের রবকে ভয় করে চলে এবং আখিরাতের সীমাহীন মুসিবত থেকে বাঁচনোর তাকীদে সতর্ক থাকে।

১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতের ঐ কঠিন দিনে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য দান করবেন। হাশরের দিনের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে তারা বেঁচে যাবে।

১২ থেকে ২১ নং আয়াতে বেহেশতের নিয়ামতের দীর্ঘ তালিকা পেশ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর পথে চলার জন্য যেসবরের পরিচয় তারা দিয়েছে, এরই পুরস্কারস্বরূপ এমন জান্নাত দান করা হবে, যার নিয়ামত নিম্নরূপ–

১. তাদেরকে রেশমি পোশাক দেওয়া হবে। (১২ নং আয়াত)

২. তারা উঁচু মঞ্চে বালিশে হেলান দিয়ে বসে শান্তিময় পরিবেশ উপভোগ করবে। সেখানে রোদের তাপ বা শীতের প্রকোপ তাদেরকে কষ্ট দেবে না। (১৩ নং আয়াত)

৩. বেহেশতের গাছের তৃপ্তিদায়ক ছায়া তাদের উপর পড়বে এবং ঐসব গাছের ফল সবসময় তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (১৪ নং আয়াত)

৪. তাদের সামনে আন্দাজপরিমাণ পানীয় ভর্তি পেয়ালা নিয়ে খাদেমরা ঘোরাফেরা করতে থাকবে, যাতে যখন খুশি তখনই পান করতে পারে। ঐ পেয়ালাগুলো দেখতে রুপার মতো দেখালেও আসলে স্বচ্ছ কাচের পেয়ালাই হবে। পেয়ালাগুলো রুপার ট্রেতে করে পরিবেশন করা হবে। (১৫ নং আয়াত)

৫. বেহেশতে তারা 'সালসাবীল' নামক ঝরনা থেকে এমন এক রকম শরবত পান করবে, যাতে আদার সুগন্ধ ও স্বাদ মেশানো থাকবে। (১৭ ও ১৮ নং আয়াত)

৬. শরবতের পেয়ালা নিয়ে যারা ঘোরাফেরা করবে তারা এমন সুন্দর সুন্দর বালক, যাদেরকে দেখলে মনে হবে যেন মণি-মুক্তা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। (১৯ নং আয়াত)

৭. সেখানে বেহেশতীরা যেদিকেই তাকাবে অফুরন্ত নিয়ামত এবং বিরাট এক রাজ্যের সাজ-সরঞ্জামই দেখতে পাবে। (২০ নং আয়াত)

৮. তাদের শরীরে রেশমের এমন পোশাক পরা থাকবে, যা সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ কাপড় এবং সোনার বুটিদার পুরো রেশমের তৈরি। তাদেরকে রুপার চুড়ি পরানো হবে এবং পবিত্র শরাব পান করানো হবে। (২১ নং আয়াত)

২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বেহেশতের নিয়ামতের এ দীর্ঘ বিবরণের পর ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের নেক আমলের স্বীকৃতিস্বরূপ তোমাদেরকে এ মহান পুরস্কার দেওয়া হলো।

দ্বিতীয় রুকূ'

২৩-২৬ নং আয়াত পর্যন্ত পরোক্ষভাবে কাফির ও মুশরিকদেরকে রিসালাতের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ কথাগুলো রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

এ বক্তব্যের অর্থ নিম্নরূপ-

হে রাসূল! কুরাইশরা আপনাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিচ্ছে না এবং কুরআনকে আমার বাণী হিসেবে স্বীকার করছে না। ওদের স্বীকার করা বা না করার উপর আসল সত্য নির্ভর করে না। আপনার উপর আমিই কুরআন নাযিল করেছি। সবরের সাথে আপনি কুরআনের দেওয়া হুকুম মেনে চলতে থাকুন। ঐ কাফির ও পাপীদের কথায় আপনি কান দেবেন না। ওদের শত্রুতা ও বিরোধিতার কারণে আপনার পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। সব সময় আপনার রবের যিকর করুন এবং রাতে বেশি করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। দুশমনদের মোকাবিলায় মযবুতভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য যে মনোবল ও দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা যিকর ও নামাযের মাধ্যমে হাসিল করুন।

২৭ ও ২৮ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, আপনার উপর এদের ঈমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, ওরা আপনাকে চিনতে পারছে না। ওরা আখিরাতের কঠিন দিনকে ভুলে দুনিয়ার নগদ সুখ-সুবিধাকে বেশি পছন্দ করে নিয়েছে। অথচ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং দেহে শক্তি দিয়েছি। আবার যখন ইচ্ছা ওদের বদলে অন্য লোক তৈরি করতে পারি। তাদেরকে ধ্বংস করার ক্ষমতাও রাখি এবং মৃত্যুর পর নতুনভাবে ওদেরকে বানানোর যোগ্যতাও রাখি।

২৯-৩১ নং আয়াত দ্বারা এ সূরাটি এই বলে শেষ করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে যে কুরআন পাঠানো হয়েছে, তা সবার জন্য কল্যাণকর উপদেশ। এখন সে উপদেশ কবুল করা আর না করা যার যার ইচ্ছা। আল্লাহ জোর করে কারো উপর উপদেশ চাপিয়ে দেন না। এ নসীহত কবুল করার তাওফীক আল্লাহ সবাইকে দেন না। উপদেশ কবুল করার যোগ্যতা শুধু কারো নিজ ইচ্ছায়ই হয় না, যদি তার মনের সঠিক অবস্থা এর উপযুক্ত না হয়। আল্লাহ সবারই অন্তরের খবর রাখেন। তাঁর ইলম ও হিকমত অনুযায়ী যাকে তিনি নসীহত কবুলের তাওফীক দেন তারই সৌভাগ্য হয়। তাঁর বিচারে যে রহমত পাওয়ার যোগ্য সে-ই তা পায়, আর যে যালিম আযাবের উপযুক্ত তার জন্য আযাবই তৈরি রাখা হয়েছে।

সূরা দাহ্‌র

৩১ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ①

১. মানুষের উপর কি মহাকালের এমন একটা সময়ও অতীত হয়েছে, যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিসই ছিল না?[১]

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ②

২. আমি মানুষকে এক মিলিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। আর এজন্যই তাকে শোনার ও দেখার যোগ্য বানিয়েছি।[২]

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ③

৩. আমি অবশ্যই তাকে পথ দেখিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।[৩]

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ④

৪. কাফিরদের জন্য আমি শিকল, বেড়ি ও দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ⑤

৫. নেক লোকেরা (বেহেশতে) শরাবের পাত্র থেকে (এমন জিনিস) পান করবে, যার সাথে কর্পূর মেশানো পানি থাকবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑥

৬. এটি একটি বহমান ঝরনা, যার পানি দিয়ে আল্লাহর বান্দাহরা শরাব পান করবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই এর শাখা বের করে নেবে।

---

১. এখানে প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং মানুষের থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই উদ্দেশ্য যে, হ্যাঁ, এমন একটি সময় অতীত হয়েছে। তা ছাড়া এর দ্বারা মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, যদি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা হয়ে থাকে, তাহলে আবার তাকে সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে কেন?

২. অর্থাৎ, তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছি।

৩. অর্থাৎ, কুফর ও শুকরিয়ার ইখতিয়ার দিয়ে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুফরীর পথ কোন্‌টা এবং শুকরিয়ার পথ কোন্‌টা।

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

৭. (তারা ঐসব লোক) যারা (দুনিয়ায়) মান্নত পুরা করে[৪] এবং ঐ দিনকে ভয় করে, যার বিপদ (সবদিকে) ছড়িয়ে পড়বে।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

৮. এবং আল্লাহর মহব্বতে তারা মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদিকে খানা খাওয়ায়।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

৯. (আর তাদেরকে বলে,) আমরা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে কোনো বদলাও চাই না, শুকরিয়াও চাই না।

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

১০. আমরা তো আমাদের রবের কাছ থেকে ঐ দিনের আযাবের ভয় করি, যা কঠিন বিপদ-মুসীবতের অতি লম্বা দিন হবে।

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾

১১. ফলে আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের ক্ষতি থেকে বাঁচাবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾

১২. আর তাদের সবরের[৫] বদলে তাদেরকে বেহেশত ও রেশমি পোশাক দান করবেন।

مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

১৩. সেখানে তারা উঁচু আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। সেখানে রোদের তাপ বা কঠিন ঠাণ্ডা তাদেরকে জ্বালাতন করবে না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

১৪. বেহেশতের (গাছের) ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে ছায়া দিতে থাকবে এবং এর ফলগুলো (সবসময়) তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (যাতে যেমন খুশি পেড়ে নিতে পারে)।

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٥﴾

১৫. তাদের সামনে রুপার পাত্র[৬] ও কাচের পেয়ালা সাজানো থাকবে।

৪. 'নযর' মানে আল্লাহর সাথে এ ওয়াদা করা যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফরযের অতিরিক্ত বিশেষ কোনো কাজ করবে।

৫. এখানে এ অর্থে 'সবর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, ঈমান আনার পর সে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম পালন করেছে এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে রয়েছে।

৬. সূরা যুখরুফের ৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের সামনে সোনার পাত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা হবে। এতে বোঝা গেল, কোনো সময় সোনার পাত্র, আবার কোনো সময় রুপার পাত্র ব্যবহার করা হবে।

قَوَارِيرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾

১৬. সেই কাচও রুপা জাতীয় হবে[৭] এবং তা (বেহেশতের খাদেমরা) ঠিক পরিমাণমতো পূর্ণ করে রাখবে।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾

১৭. আর সেখানে তাদেরকে এমন শরাবের পেয়ালা পান করানো হবে, যার মধ্যে আদা মিশানো থাকবে।[৮]

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾

১৮. এটি বেহেশতের একটা ঝরনা, যাকে 'সালসাবীল' বলা হয়।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾

১৯. তাদের খিদমতের জন্য এমন সব বালক ঘোরাফেরা করতে থাকবে, যারা সবসময় বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, যেন মণিমুক্তা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾

২০. সেখানে যেদিকেই তাকাবে শুধু নিয়ামতই নিয়ামত এবং বিরাট রাজ্যের (সাজ-সরঞ্জাম) দেখতে পাবে।

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾

২১. তাদের উপর মিহিন রেশমের সবুজ পোশাক ও মখমলের কাপড় থাকবে। আর তাদেরকে রুপার চুড়ি পরানো হবে এবং তাদের রব তাদেরকে অতি পাক-পবিত্র শরাব পান করাবেন।[৯]

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

২২. এটাই তোমাদের পুরস্কার, আর তোমাদের মেহনত কবুল করার যোগ্য হয়েছে।

রুকূ' ২

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৩. (হে রাসূল!) আমিই আপনার উপর অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল করেছি।[১০]

---

৭. অর্থাৎ, সেটা রুপা হওয়া সত্ত্বেও কাচের মতো স্বচ্ছ হবে।

৮. আরবরা যেহেতু শরাবের সাথে আদামেশানো পানি মিলানো পছন্দ করত, সেহেতু বলা হয়েছে যে, বেহেশতেও আদামিশ্রিত শরাবই পান করানো হবে।

৯. সূরা হজ্জের ২৩ নং আয়াত ও সূরা ফাতিরের ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে সোনার চুড়ি পরানো হবে। এতে মনে হয় যে, তারা নিজেদের মর্জি ও পছন্দ অনুযায়ী যখন ইচ্ছা সোনার ও যখন ইচ্ছা রুপার কঙ্কন পরবে এবং যখন খুশি দু'রকমই একসাথে পরবে।

১০. এখানে দেখতে মনে হয়, রাসূল (স)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে; কিন্তু আসলে কাফিরদের একটি আপত্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে। তারা বলত, মুহাম্মদ (স) নিজেই চিন্তা করে এ কুরআন বানাচ্ছেন; তা না হলে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফরমানই হয়ে থাকে তাহলে সবটুকু একবারে একসাথেই আসত।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

২৪. কাজেই আপনি আপনার রবের হুকুম সবরের[11] সাথে পালন করুন; আর ওদের মধ্য থেকে কোনো ফাসিক বা কাফিরের কথা মানবেন না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

২৫. আপনার রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

২৬. আর রাতেও তাঁর জন্য সিজদা করুন এবং রাতের বেশি সময় তাঁর তাসবীহ করতে থাকুন।[12]

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

২৭. এসব লোক যে জিনিস জলদি পাওয়া যায় তাকেই (অর্থাৎ দুনিয়াকেই) ভালোবাসে এবং পরে যে ভয়াবহ দিন আসবে তাকে অবহেলা করে।

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদের গিরাকে মযবুত করেছি। আর আমার যখন ইচ্ছা তখনই তাদের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দিতে পারি।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

২৯. এ (কুরআন) এক উপদেশ। এখন যার ইচ্ছা হয়, সে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ ধরুক।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩০. (শুধু) তোমাদের চাওয়া দ্বারা কিছু হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ না চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন ও সব বিষয়ে কুশলী।

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

৩১. তিনি যাকে চান তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন এবং যালিমদের জন্য তিনি কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১১. অর্থাৎ আপনার রব যে বিরাট কাজের দায়িত্ব আপনার উপর দিয়েছেন, তাতে যত অসুবিধা ও কষ্ট রয়েছে তা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করুন, যাকিছু আপনার উপর আসে তা বলিষ্ঠতার সাথে সহ্য করতে থাকুন এবং দৃঢ়তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা আসতে দেবেন না।

১২. যখন নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বলা হয়, তখন এ যিকর অর্থ নামায। এ আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, 'ওয়াযকুরিসমা রাব্বিকা বুকরাতাও ওয়া আসীলা।' আরবী ভাষায় সকালকে বুকরা বলে। আর আসীলা দ্বারা পড়ন্ত বেলা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বোঝায়, যার মধ্যে যোহর ও আসরের ওয়াক্ত এসে যায়। এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়া মিনাল লাইলি ফাসজুদ লাহূ'। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় থেকেই রাত শুরু হয়ে যায়। তাই রাতে সিজদা করার হুকুমের মধ্যে মাগরিব ও ইশার নামায শামিল হয়ে যায়। এরপর রাতে লম্বা সময় তাসবীহ করার হুকুম দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাযই বোঝায়।

৭৭. সূরা মুরসালাত

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'মুরসালাত' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরা আলোচনা এ কথাই প্রকাশ করে যে, সম্পূর্ণ সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথমদিকেই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হলো, 'কিয়ামত ও আখিরাতের প্রমাণ'। কিয়ামত ও আখিরাতকে অস্বীকার করার যে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে, সে বিষয়ে এ সূরায় মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম সাতটি আয়াতে বৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাতাসকে চালু করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা যে চমৎকার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন, সে ব্যবস্থাকেই কিয়ামত ও আখিরাতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। মক্কাবাসীরা বারবার রাসূল (স)-এর নিকট দাবি করত, 'কিয়ামত ও আখিরাত আমাদের সামনে এনে দেখাও। শুধু শুধু ভয় দেখালে আমরা মেনে নেব না।'

এরই জবাবে এ সূরার প্রথম চারটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, কীভাবে তোমাদের জন্য আল্লাহ্ বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন? বাতাস ও মেঘের খেলা কি তোমাদের চোখে পড়ে না? এ ব্যবস্থা কি তোমরা করেছ?

৫ ও ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখন জোরে বাতাস চলতে থাকে এবং মেঘগুলোকে উড়িয়ে ও ছড়িয়ে তোলপাড় করতে থাকে, তখন কি এ ব্যাপারটা তোমাদের মনকে নাড়া দেয় না? ঐ অবস্থায় কোনো সময় ভয়ের কারণে কি তোমরা আল্লাহর কথা মনে কর না? আবার কোনো সময় বৃষ্টির কারণে কি আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার ভাব মনে জাগে না?

৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বাতাস ও বৃষ্টির এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই তোমরা করনি। যিনি এ ব্যবস্থা করেছেন কিয়ামত ও আখিরাতের ওয়াদা তিনিই পূরণ করবেন। যে কারণে বাতাস ও বৃষ্টিকে তোমরা অস্বীকার করতে পার না, সে কারণেই কিয়ামত ও আখিরাতকেও অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। বাতাস ও বৃষ্টি যেমন তোমাদের জীবনে সত্য, কিয়ামত ও আখিরাতও তেমনি সত্য। এখানে 'আফাক' ও 'আনফুসের' যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

৮-১৫ নং আয়াতে কিয়ামত ও আখিরাত সম্পর্কে কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাস্যকর কথার উল্লেখ না করেই জবাবে বলা হয়েছে, এটা কোনো হাসি-তামাশার ব্যাপার নয় যে, যখন কেউ সেটা দেখানোর দাবি করবে তখনই তা দেখাতে হবে। ঐ দিনে সব মানুষের সকল মোকদ্দমার ফায়সালা

হবে। এর জন্য সময় ঠিক করা আছে। যখন সে সময় আসবে তখন যারা এখন ঠাট্টা করছে তাদের কী দশা হবে, তারা টের পাচ্ছে না।

৮ থেকে ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের সময় আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-তারার এ সাজানো দুনিয়া খতম করে দেওয়া হবে। ১১ নং আয়াতে হাশরের দিনের প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে, রাসূলগণ সেদিন হাজির হবেন এবং তাঁদের কথা কারা মেনেছিল, আর কারা মানতে রাজি হয়নি, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। আজ তোমরা ঠাট্টা করে যে রাসূলের কথাকে উড়িয়ে দিচ্ছ, তিনিই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

১২ থেকে ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করছ যে, ঐ দিনটি কেন দেখানো হচ্ছে না। তোমরা এ বিষয়ে কী জান? সে দিনটি তো কোনো খেল-তামাশার দিন নয়। দুনিয়ার জীবনে তোমরা কে কী করেছ সে সম্পর্কে শেষ ফায়সালাই সেখানে হবে। ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এ দিনটিকে যারা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করছে, তারা নিজেদের ধ্বংসই ডেকে আনছে।

১৬-২৮ নং আয়াতে আখিরাত যে অবশ্যই হবে এবং তা যে হওয়াই উচিত, সে বিষয়ে একের পর এক যুক্তি দেখানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মানুষের জন্মকথা এবং যে পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করছে, এর গঠন-প্রকৃতি এ কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আখিরাত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহর ব্যবস্থাপনারও স্বাভাবিক দাবি এটাই যে, তা হওয়া উচিত।

১৬ থেকে ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ যতই আখিরাতকে অস্বীকার করুক, তাদের উপর আমার মযবুত কর্তৃত্ব রয়েছে। যারা অতীতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আমি যেভাবে ধ্বংস করেছি, তোমাদেরকেও সেভাবেই ধ্বংস করতে সক্ষম। সকল অপরাধীর সাথে আমি একই ব্যবহার করে থাকি।

২০ থেকে ২৪ নং আয়াতে মানুষের জন্ম রহস্যের দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! তোমরা কীভাবে জন্ম নিয়েছ, সে বিষয়ে কি ভেবে দেখেছ?' আজ বড় বাহাদুরি দেখিয়ে আখিরাতকে অস্বীকার করছ। অথচ তোমাকে নগণ্য এক ফোঁটা বীর্য থেকেই তো আমি সৃষ্টি করেছি। সে বীর্যকে আমিই তো মায়ের গর্ভে নিরাপদ জায়গায় রেখে তোমার দেহ গঠন করেছি। এ কাজটি করার সাধ্য যদি আমার থেকে থাকে তাহলে আখিরাত কায়েম করা আমার অসাধ্য কেন হবে? এর পরও যদি তা অস্বীকার কর তাহলে ধ্বংসই তোমাদের পরিণাম। (এখানে আনফুসের যুক্তি পেশ করা হয়েছে)।

২৫ থেকে ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মাটি, পাহাড় ও মিষ্টি পানির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানুষের চিন্তাশক্তিকে আল্লাহর কুদরত স্বীকার করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার বক্তব্য হচ্ছে, 'হে মানুষ, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, এ মাটি কীভাবে জীবিত মানুষ ও জীব-জন্তুর ভরণ-পোষণ করে সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছে? কীভাবে উঁচু পর্বতে বরফ জমিয়ে রেখে তা থেকে জমিতে পানি সরবরাহ করছে এবং সমুদ্রের লোনা পানি থেকে বাষ্পের আকারে মিষ্টি পানি তুলে এনে জীবের প্রয়োজন পূরণ করছে? যে মহাকৌশলী এত কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি আখিরাত কায়েম করতে অক্ষম মনে করার কী যুক্তি থাকতে পারে? এর পরও যারা অস্বীকার করে তাদের ধ্বংস হওয়াই উচিত। (এখানে আখিরাতের আফাকী যুক্তি পেশ করা হয়েছে)।

২৯-৪০ নং আয়াত পর্যন্ত আখিরাত অস্বীকারকারীদের করুণ ও কঠোর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

২৯ থেকে ৩৩ নং আয়াতে হাশরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আখিরাতে অবিশ্বাসীরা! যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে, তা তোমাদের সামনে হাজির। দোযখের আগুন থেকে উঠে আসা কুণ্ডলী পাকানো ও কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ধোঁয়ার অন্ধকার ছায়ার দিকে চল। এ ছায়া ঠাণ্ডা হবে না বা আগুনের শিখা থেকেও রক্ষা করবে না; বরং বিরাট বিরাট আগুনের ফুলকি হলুদ রঙের উটের মতো নাচতে থাকবে।

৩৫ ও ৩৬ নং আয়াতে তাদের চরম অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সেদিন তারা মুখ খুলে কিছুই বলতে সাহস পাবে না। কোনো রকম ওযর-আপত্তি পেশ করার সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না।

৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, এটা ঐ শেষ ফায়লাসার দিন, যেটাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। আজ তোমাদের আগের ও পরের সব অস্বীকারকারীদেরকে একসাথে একই রকম দশায় ফেলা হয়েছে।

৩৯ নং আয়াতে তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে, আজ আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো ষড়যন্ত্র করার থাকলে করে দেখাতে পার। তোমাদের কোনো চালই আজ কোনো কাজে লাগবে না। আজ ধ্বংসই তোমাদের কপালে আছে।

৪১-৪৪ নং আয়াতে ঐসব ভাগ্যবান লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করার ফলে দুনিয়ায় মুত্তাকী হিসেবে জীবন যাপন করেছে। আজ তারা বেহেশতের ছায়ায় বহমান ঝরনার পরিবেশে মজা করে তাদের পছন্দমতো ফলফলাদি খাচ্ছে।

৪৩ ও ৪৪ নং আয়াতে মুত্তাকীদেরকে আরো খুশি করার জন্য বলা হচ্ছে, তোমরা মজা নিয়ে জান্নাতের স্বাদ ভোগ কর। তোমাদের নেক আমলের বদলা এটাই। আমি নেক লোকদেরকে এমন পুরস্কারই দিয়ে থাকি।

৪৬-৪৯ নং আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে, তোরা দুনিয়ার জীবনের এ ক'টা দিন একটু ফুর্তি করে নে। আমার নাফরমানীর জন্য দুনিয়ায় তো আমি শাস্তি দিই না। এখানে পরীক্ষা করার জন্য আমি তোদেরকে যে স্বাধীনতা দিয়েছি, তারই কারণে এখন পাকড়াও করছি না; কিন্তু তোরা তো আসলেই অপরাধী। আমার ও আমার রাসূলের অনুগত হতেই তোদেরকে বলা হয়েছিল; কিন্তু তোরা সেকথা অমান্য করেছিস। এর পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কী হতে পারে?

৫০ নং আয়াতে কাফিরদের আচরণ সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করে বলা হয়েছে, যারা কুরআনের মতো সুস্পষ্ট হেদায়াতের উপর ঈমান আনল না, তারা আর কিসের উপর ঈমান আনবে? তাদের ঈমান আনার আর কী উপায় থাকতে পারে? কুরআনের মতো কার্যকর যুক্তিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হেদায়াতের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও যারা ঈমান আনল না, তাদের হেদয়াতের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই।

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١

১. কসম ঐ (বাতাসের), যা পরপর পাঠানো হয়।

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢

২. তারপর তুফানের বেগে চলতে থাকে।

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣

৩. এবং (মেঘগুলোকে) তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤

৪. তারপর (একে) টুকরা টুকরা করে আলাদা করে দেয়।

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥

৫. পরে (মানুষের মনে আল্লাহর কথা) মনে করিয়ে দেয়—

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦

৬. ওজর হিসেবে বা ভয়ের কারণ হিসেবে।[1]

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧

৭. যে বিষয়ে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে, অবশ্যই তা ঘটবে।[2]

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨

৮. তারপর যখন তারাগুলো আলোবিহীন হয়ে যাবে।

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩

৯. এবং যখন আসমান ফাটিয়ে দেওয়া হবে।

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠

১০. আর যখন পাহাড়গুলোকে ধুনে ফেলা হবে।

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١١

১১. এবং রাসূলগণের হাজির হওয়ার সময় এসে পড়বে[3] (ঐ দিনই সে ঘটনাটি ঘটবে)।

---

১. অর্থাৎ, কোনো সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেলে এবং দুর্ভিক্ষের ভয় দেখা দিলে মানুষের অন্তর নরম হয়। তখন তারা আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে। আবার কোনো সময় বাতাস রহমতের বৃষ্টিধারা নিয়ে এলে মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। আবার এক সময় তুফানের ঝাপটা অন্তরে ভয় ধরিয়ে দেয় এবং ধ্বংসের ভয়ে মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

২. অর্থাৎ বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা এ কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক সময় কিয়ামত অবশ্যই আসবে। বাতাস যদিও সৃষ্টিলোকের জীবন ধারণের জন্য একটি জরুরি মাধ্যম; কিন্তু আল্লাহ যখন চান, বাতাসকে ধ্বংসের মাধ্যমও বানাতে পারেন এবং বানিয়ে থাকেন।

৩. কুরআন মাজীদে বিভিন্ন জায়গায় এ কথা বলা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন মানবজাতির মামলা-মোকদ্দমা আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে তখন যে কাওমের কাছে যাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, সে কাওম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ঐ কাওমের ঐ রাসূলকে হাজির করা হবে, যাতে তিনি আল্লাহর বাণী তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কি না, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾

১২. কোন্ দিনের জন্য এ কাজটি তুলে রাখা হয়েছে?

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

১৩. শেষ ফায়সালার দিনের জন্য।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৪. ফায়সালার দিনটি কেমন, সে বিষয়ে তুমি কী জান?

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

১৫. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾

১৬. আমি কি আগের (কালের) লোকদেরকে ধ্বংস করিনি?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾

১৭. আবার পরের লোকদেরকেও তাদেরই পেছনে চালিয়ে দেব।

كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾

১৮. অপরাধীদের সাথে আমি এমনই করে থাকি।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾

১৯. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।[৪]

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾

২০. আমি কি তোমাদেরকে নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

২১-২২. তারপর আমি কি তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এক নিরাপদ জায়গায় রেখে দিইনি?

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. তাহলে দেখ, আমি (এ কাজে) সক্ষম ছিলাম। অতএব আমি কতই না চমৎকার ক্ষমতার অধিকারী!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।[৫]

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৫-২৬. আমি কি জীবিত ও মৃতদের জন্য জমিনকে সামলিয়ে রাখার যোগ্য বানাইনি?

---

৪. এখানে এ কথা এ অর্থে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তার যে দশা এখন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে তা তার আসল সাজা নয়। আসল শাস্তি তো ফায়সালার দিনই নাযিল হবে।

৫. অর্থাৎ, হায়াতের পর মওতের সম্ভাবনার এমন স্পষ্ট দলিল সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা আজ আখিরাতকে অস্বীকার করছে, তারা ঐদিন অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

وَّجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَّأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৭. আর আমি তাতে উঁচু উঁচু পাহাড় কায়েম করেছি এবং তোমাদেরকে মিঠা পানি পান করিয়েছি।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।[৬]

انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. এখন তোমরা ঐ জিনিসের দিকেই চলো, যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলে।[৭]

انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩০. সেই ছায়ার দিকে চলো, যার তিনটা শাখা[৮] আছে।

لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩১. যে ছায়া ঠাণ্ডাও দেয় না, আর আগুনের শিখা থেকেও বাঁচায় না।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩২. সেই আগুন দালানের মতো বড় বড় ফুলকি ছুড়তে থাকবে।

كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. (যার লাফ দেখে মনে হবে) যেন হলুদ রং-এর উট।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এটা ঐ দিন, যখন তারা কিছুই বলতে পারবে না,

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং তাদেরকে কোনো ওযর পেশ করার অনুমতিও দেওয়া হবে না।[৯]

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।

৬. অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের এ অদ্ভুত নমুনা দেখেও আখিরাত যে সম্ভব ও যুক্তিপূর্ণ, সে কথা অস্বীকার করেছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালিতে মগ্ন থাকতে চাইলে থাকুক। যেদিন তাদের ধারণার বিপরীত সবকিছু ঘটবে, সেদিন তারা টের পাবে যে, তারা এ বোকামি করে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে।

৭. আখিরাতের যুক্তি পেশ করার পর বলা হচ্ছে, যখন এ ঘটনা ঘটে যাবে তখন অস্বীকারকারীদের কী দশা হবে?

৮. ছায়ার অর্থ ধোঁয়ার ছায়া। আর তিনটি শাখার অর্থ এই যে, যখন ধোঁয়া বড় আকারে ওঠে তখন উপরে গিয়ে কয়েক শাখায় ভাগ হয়ে যায়।

৯. অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এমন মযবুত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করা হবে যে, ভয়ে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসবে এবং তাদের পক্ষে কোনো কৈফিয়ত পেশ করার কোনো সুযোগই বাকি থাকবে না।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এটাই ফায়সালার দিন। আমি তোমাদেরকে ও (তোমাদের) আগের লোকদেরকে একসাথে জমা করে দিয়েছি।

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾

৩৯. এখন যদি তোমাদের কাছে কোনো চাল থাকে, তাহলে (আমার বিরুদ্ধে) সে চাল চালিয়ে দেখো।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।

রুকূ' ২

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾

৪১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা আজ ছায়া ও ঝরনার মধ্যে আছে।

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং তারা যেমন পছন্দ করে তেমন ফল (তাদের সামনে হাজির আছে)।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তোমরা যে আমল করছিলে তারই বদলে তোমরা মজা নিয়ে খানা-পিনা করো।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. নিশ্চয়ই আমি নেক লোকদেরকে এমন পুরস্কারই দিয়ে থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. অল্প কিছুদিন তোমরা খেয়ে নাও[১০] ও মজা করে নাও। তোমরা অবশ্যই অপরাধী।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, (আল্লাহর সামনে) নত হও, তখন তারা নত হয় না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. সেদিন মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ধ্বংস।

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. এখন এ (কুরআনের) পর আর কোন্ কথা এমন থাকতে পারে, যার উপর এরা ঈমান আনবে?

---

১০. এখন বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে শুধু মক্কার কাফিরই নয় বরং দুনিয়ার সব কাফিরদেরকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো বলা হচ্ছে।

৭৮. সূরা নাবা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের 'নাবা' শব্দ থেকেই এ নাম রাখা হয়েছে। নাবা অর্থ খবর বা সংবাদ। এ থেকেই নবী শব্দ তৈরি হয়েছে, যার অর্থ সংবাদবাহক বা পয়গাম্বর। এ সূরায় বড় খবর বা মহা সংবাদ দ্বারা কিয়ামত ও আখিরাত বোঝানো হয়েছে।

নাযিলের সময়

মাক্কী যুগের প্রথম ভাগে সূরাটি নাযিল হয়েছে। এর আগের তিনটি সূরা কিয়ামাহ, দাহ্র, ও মুরসালাত এবং এর পরের সূরা নাযি'আতের সাথে এ সূরাটির আলোচ্য বিষয়ে বেশ মিল আছে এবং পাঁচটি সূরাই মাক্কী যুগের প্রথম ভাগে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

কিয়ামত ও আখিরাতই এর আলোচ্য বিষয়। আখিরাতের প্রমাণ এবং আখিরাতকে মানা ও না মানার ফলাফল সম্পর্কে মানুষকে এখানে সাবধান করা হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ

রাসূল (স) যখন ইসলামের তাবলীগ শুরু করেন, তখন তিনটি বিষয়কে প্রথম কবুল করার জন্য জনগণকে দাওয়াত দেন– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

১. আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও মা'বুদ মানা এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে অন্য কাউকে শরীক না করাই তাওহীদের মূল কথা।

২. মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মানাই রিসালাতের প্রথম কথা।

৩. এ কথা বিশ্বাস করা যে, এ দুনিয়া এক সময় খতম হয়ে যাবে এবং আরেকটা দুনিয়া সৃষ্টি হবে, যখন সব মানুষকে আবার জীবিত করা হবে এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের হিসাব নেওয়া হবে। শেষ বিচারে যারা মুমিন ও সৎকর্মশীল প্রমাণিত হবে, তাদেরকে চিরদিনের জন্য বেহেশতে পাঠানো হবে। আর যারা কাফির, ফাসিক ও মুনাফিক প্রমাণিত হবে, তাদেরকে দোযখে দেওয়া হবে। এটাই হলো আখিরাতের সারকথা।

এ তিনটি কথার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় কথার চেয়ে তৃতীয় কথাটিকে মেনে নেওয়াই মক্কাবাসীরা বেশি কঠিন মনে করল। আল্লাহকে তারা বিশ্বাস করত; কিন্তু একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ, মা'বুদ ও মনিব মানতে হবে এবং অন্য কারোই ইবাদত করা যাবে না– একথা তারা মানতে রাজি ছিল না। তেমনিভাবে মুহাম্মদ (স)-কে তারা নবুওয়াতের আগেই সবচেয়ে সত্যবাদী, সচ্চরিত্র ও আমানতদার বলে স্বীকার করত; কিন্তু আল্লাহর রাসূল হিসেবে তাঁকে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা ও মুহাম্মদ (স) তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না।

কিন্তু কিয়ামত ও আখিরাতের কথা তাদের নিকট একেবারেই আজব মনে হলো। তারা কিছুতেই এ কথাকে সত্য বলে মানতে পারছিল না। এটাকে তারা অসম্ভব ও অবাস্তব মনে করত। তাই এ

কথাটি নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। এটাকে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করল এবং এটাকে কল্পনারও অতীত মনে করে চরম বিস্ময় প্রকাশ করল।

অথচ ইসলামের পথে জনগণকে আনতে হলে আখিরাতের বিশ্বাস তাদের অন্তরে না বসিয়ে উপায় ছিল না। কারণ, আখিরাতের আকীদা মন-মগজে মযবুত না হলে মানুষ কিছুতেই ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে না। আখিরাতের বিশ্বাস ছাড়া হক ও বাতিলের পার্থক্য বোঝার যোগ্যতাই সৃষ্টি হয় না এবং ভালো ও মন্দের ব্যাপারে সঠিক মূল্যবোধ মোটেই সৃষ্টি হয় না। রূপ-রস-গন্ধে ভরা এ দুনিয়ার মজা মানুষকে এত জোরে টেনে নেয় যে, আখিরাতের প্রতি মযবুত ঈমান ছাড়া তা থেকে ছুটে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ জন্যই মাক্কী যুগের প্রথম ভাগে নাযিল হওয়া সূরাগুলোতে আখিরাতের যুক্তি-প্রমাণ এমনভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে তাওহীদের ধারণা আপনা-আপনিই এসে যায়। ফাঁকে ফাঁকে রাসূল (স) ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণও তাতে এসে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের সূরাগুলোতে আখিরাত সম্বন্ধে বারবার এত আলোচনা কেন করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে আখিরাত সম্বন্ধে মক্কাবাসীরা যে তর্ক-বিতর্ক ও হাসি-ঠাট্টা করছিল এবং নানা রকম মতামত ও মন্তব্য প্রকাশ করছিল, সেদিকে ইশারা করেই সূরাটি শুরু করা হয়েছে।

৪ ও ৫ নং আয়াতে একটু ধমকের সুরে বলা হয়েছে, আখিরাতকে তোমরা স্বীকার করছ না! একটু অপেক্ষা কর। শীঘ্রই জানতে পারবে। মৃত্যু বেশি দূরে নয়। মৃত্যুর পরই সব জানতে পারবে।

৬-১৬ নং আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের মন-মগজে খোঁচা দিয়ে তাদেরকে কতক প্রশ্ন করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা করতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য যাকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেসবের উল্লেখ করে বলেন, 'জমিন ও আসমান, দিন ও রাত, পাহাড় ও নদী, স্বামী ও স্ত্রী, ঘুম ও বিশ্রাম, সূর্য ও বৃষ্টি এবং তার ফলে সৃষ্ট বাগ-বাগিচা ও উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের সুবন্দোবস্ত কি আমি করিনি? মরণের পরপারে তোমাদের জীবনে যাকিছু হবে, তার ব্যবস্থাও আমি করেছি। এ জীবনে আমি যা করেছি, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পরকালে কী করব, তা এখন দেখতে পাচ্ছ না বলেই কি তা অস্বীকার করা যুক্তি ও বুদ্ধির লক্ষণ?'

তোমাদের জন্য দুনিয়ায় যত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছি, অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য তা করিনি; বরং গোটা সৃষ্টিজগৎ তোমাদের খিদমতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। কোন্ যুক্তিতে তোমরা এই ধারণা করছ যে, দুনিয়ার পরপারে তোমাদের কাছে কোনো হিসাব চাওয়া হবে না? দুনিয়ায় তোমরা আমার মর্জিমতো চলেছ কি না, এ কথা কি জিজ্ঞেস করা হবে না? তোমরা কি মনে কর, দুনিয়ার এ সবকিছু আমি খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করেছি? এর পেছনে কোনো বড় উদ্দেশ্য কি নেই? তোমাদেরকে দুনিয়ায় এত ক্ষমতা দিলাম এবং ভালো-মন্দ বোঝার শক্তিও দিলাম। এরপর এসব কীভাবে ব্যবহার করছ তার হিসাব না নিয়ে এমনিই তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে?

১৭ ও ১৮ নং আয়াতে খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তোমাদের এ জীবনের ফলাফল কী হবে, সে বিষয়ে ফায়লাসা করার দিন ঠিক হয়েই আছে। শুধু শিঙ্গায় একটা ফুঁ দিতে দেরি। তখন তোমরা সবাই দলে দলে হিসাব দেওয়ার জন্য হাশরের ময়দানে হাজির হয়ে যাবে। আজ সে কথা বিশ্বাস কর আর না-ই কর, তাতে আল্লাহর কিছুই আসে-যায় না।

১৯ ও ২০ নং আয়াতে কিয়ামতের অবস্থার সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

২১-৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আখিরাতের হিসাব-কিতাবের ধার ধারেনি, তাদের সব কীর্তিকলাপ শুনে শুনে রেকর্ড করেছি এবং তাদের 'খিদমত' করার জন্য দোযখ ওতপেতে আছে। সেখানে তাদের সব আমলের পুরাপুরি বদলা দেওয়া হবে।

৩১-৩৬ নং আয়াতে ঐসব লোকের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যারা আখিরাতের হিসাব-নিকাশের খেয়াল রেখে পুরো দায়িত্ববোধ নিয়ে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, তাদের নেক আমলের পুরস্কার ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক নিয়ামত দান করা হবে।

৩৭ ও ৩৮ নং আয়াতে আদালতে-আখিরাতের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেখানে কারো পক্ষে তার অনুগামীদের পার করিয়ে নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, বিনা অনুমতিতে মুখ খোলার ক্ষমতাও কারো হবে না। কথা বলার অনুমতি যারা পাবে, তারাও নিজেদের মর্জিমতো যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারবে না। সুপারিশ করার অনুমতি যিনি পাবেন, তিনিও নিজের ইচ্ছামতো যার-তার জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না। যার জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে, শুধু তার পক্ষেই কথা বলতে পারবেন।

শেষ দুই আয়াতে চূড়ান্ত ধমক দিয়ে বলা হয়েছে, শেষ বিচারের যে দিনটির কথা জানানো হলো তা মোটেই দূরে নয়। এখন যার ইচ্ছা হয় আল্লাহর পথে চলুক।

যারা এরপরও আখিরাতে বিশ্বাস করতে চায় না তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা যাকিছু করছ সবই সেদিন তোমাদের সামনে হাজির করা হবে। তখন শুধু আফসোস ও অনুতাপ করে বলতে হবে যে, 'হায়! আমি যদি সৃষ্টিই না হতাম বা এখন যদি মাটিতে মিশে যেতে পারতাম এবং শাস্তি থেকে কোনো রকমে রেহাই পেয়ে যেতাম।' কিন্তু এ আফসোস শুধু দুঃখই বাড়াবে, এতে কোনো লাভ হবে না।

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরায় দোযখ ও বেহেশতের ছবি পাশাপাশি আঁকা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, দোযখ এমন এক চিরস্থায়ী বাসস্থান, যেখানে দুঃখের কোনো সীমা নেই; আর বেহেশতে সুখেরও কোনো সীমা নেই।

যা মানুষের দরকার তার অভাবেই দুঃখবোধ হয়। দেহে পানির অভাব হলেই পিপাসা হয়। স্বাস্থ্যের অভাবে যে দুঃখ হয়, তারই নাম অসুখ বা সুখের অভাব।

এ সূরার ২১ থেকে ২৬ নং আয়াতে দোযখ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেখানে যখন পিপাসা বোধ হয়, তখন অবশ্যই পানি দেওয়া হবে। কিন্তু সে পানি পিপাসা দূর করবে না; বরং এমন পানি দেওয়া হবে, যাতে পিপাসা লক্ষ-কোটি গুণ বেড়ে যাবে। এতে পানির অভাববোধ বেড়ে গিয়ে দুঃখ বাড়তেই থাকবে।

কিন্তু বেহেশতের অবস্থা এর বিপরীত হবে। সেখানে অভাবের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। সুখ ও আরামের জন্য মানুষ যা চায়, সবই সেখানে অফুরন্ত পাবে।

দুনিয়ায় সুখ ও দুঃখ একসাথে মিলে আছে। দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না; কিন্তু আখিরাতের দুঃখ ও সুখ একেবারেই আলাদা হয়ে যাবে। দোযখে শুধু দুঃখ এবং বেহেশতে শুধু সুখ থাকবে। এ দুটো আর একসাথে পাওয়া যাবে না।

বেহেশতে শুধু একটি জিনিসেরই অভাব থাকবে, যার নাম অভাব এবং যা দুঃখের কারণ। বেহেশত এমন এক বাসস্থান, যেখানে সকল প্রকার অভাবেরই অভাব রয়েছে। আর দোযখে একমাত্র ঐ জিনিসই আছে, যা বেহেশতে নেই। তার নামই অভাব। অভাব ছাড়া সেখানে অন্য কিছুই নেই।

Heaven is that eternal abode where there is want of all wants and Hell is that eternal abode where there is only want and nothing else.

سُورَةُ النَّبَإِ مَكِّيَّةٌ
آيَاتُهَا ٤٠ رُكُوعَاتُهَا ٢

সূরা নাবা
৪০ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
পারা ৩০

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١

১. এরা কোন্ বিষয়টি নিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে?

عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۝٢

২. ঐ বড় খবরটি নিয়ে নাকি—

الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣

৩. যে বিষয়ে এরা নানা মত প্রকাশ করে চলেছে?

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤

৪. কক্ষনো নয়![1] শিগ্‌গিরই ওরা তা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥

৫. হ্যাঁ, কক্ষনো নয়! শিগ্‌গিরই ওরা জানতে পারবে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦

৬. এ কথা কি ঠিক নয় যে, আমি জমিনকে বিছানা বানিয়েছি?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧

৭. আর পাহাড়গুলোকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছি?

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨

৮. আমি তোমাদেরকে (নারী ও পুরুষের) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩

৯. তোমাদের ঘুমকে শান্তির উপায় বানিয়েছি।

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١

১০-১১. রাতকে আবরণ ও দিনকে রুজি-রোজগারের সময় বানিয়েছি।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢

১২. তোমাদের উপর সাতটি মযবুত (আসমান) কায়েম করেছি।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣

১৩. আমি এক অতি উজ্জ্বল ও অতি গরম বাতি[2] বানিয়েছি।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤

১৪. মেঘমালা থেকে অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।

১. অর্থাৎ, আখিরাতের বিষয়ে এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে, তা সবই ভুল। এরা যা ধারণা করে আছে, তা কখনো সঠিক নয়।

২. এর মানে হলো সূর্য। আরবী 'ওহ্হাজ' শব্দটি দ্বারা খুব গরম ও উজ্জ্বল– এ দু অর্থই বোঝায়। তাই তরজমায় দুটো অর্থই নেওয়া হয়েছে।

لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّٰتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

১৫-১৬. যাতে এর সাহায্যে ফসল, শাক-সবজি ও ঘন বাগান উৎপাদন করতে পারি।

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয়ই মীমাংসার দিনটির সময় নির্দিষ্ট হয়েই আছে।

يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৮. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তারপর তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।

وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا ﴿١٩﴾

১৯. আসমান খুলে দেওয়া হবে, ফলে গোটা আসমান দুয়ারে পরিণত হবে।

وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

২০. আর পাহাড়কে চলমান করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

২১. নিশ্চয়ই দোযখ একটা গোপন ফাঁদ;[৩]

لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابًا ﴿٢٢﴾

২২. বিদ্রোহীদের আবাস।

لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

২৩. যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে।[৪]

لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৪-২৫. যেখানে তারা গরম পানি ও পুঁজ ছাড়া কোনো রকম ঠাণ্ডা ও পান করার মতো কোনো কিছুরই স্বাদ পাবে না।

جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৬. এটা তাদের (আমলের) পরিপূর্ণ বদলা।

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৭. ওরা কোনো হিসাব দিতে হবে বলে মনে করত না।

وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

২৮. আর আমার আয়াতগুলোকে ওরা একেবারে মিথ্যাই মনে করেছিল।

وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ﴿٢٩﴾

২৯. অথচ প্রতিটি জিনিস আমি গুনে গুনে লিখে রেখেছিলাম।

فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

৩০. এখন মজা বোঝ, আমি আযাব ছাড়া তোমাদের জন্য আর কিছুই বাড়াব না।

৩. শিকার ধরার উদ্দেশ্যে যে জায়গা তৈরি করা হয়, তাকেই আরবীতে 'মিরসাদ' বলে। এতে শিকার বেখেয়ালে এসে হঠাৎ আটকা পড়ে। দোযখকে এ অর্থেই গোপন ফাঁদ বলা হয় যে, আল্লাহর বিদ্রোহীরা দুনিয়ার মজায় এমনভাবে মজে থাকে, যেন তাদের পাকড়াও হওয়ার কোনো ভয় নেই। কিন্তু দোযখ তাদের জন্য এমন গোপন ফাঁদ, যেখানে তারা হঠাৎ করে আটকা পড়বে এবং আটক হয়েই থেকে যাবে।

৪. 'আহকাব' অর্থ হলো, একের পর এক আগত যুগ। এক এক যুগ খতম হওয়ার সাথে সাথেই আরেক যুগ শুরু হয়ে যায়, এমন অবস্থা।

রুকূ' ২

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতার একটা পর্যায়।

حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩২. বাগ-বাগিচা ও আঙ্গুর,

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৩. আর সমবয়সী নবীন যুবতী দল

৩৪. ও ভরা পানপাত্র।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾

৩৫. সেখানে তারা কোনো বাজে ও মিথ্যা কথা শুনবে না।

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৬. (এসব) তোমার রবের কাছ থেকে বদলা ও বিপুল দান।[৫]

رَّبِّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩৭. অত্যন্ত মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের এবং তাদের দুয়ের মাঝে যাকিছু আছে সব কিছুর মালিক; যাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো হবে না।[৬]

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. যেদিন রূহ[৭] ও ফেরেশতারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, অসীম মেহেরবান যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে সে ছাড়া অন্য কেউ কথা বলবে না।

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾

৩৯. ঐ দিনটি সত্যি সত্যিই (আসবে)। এখন যার ইচ্ছা নিজের রবের নিকট ফিরে যাওয়ার পথ দেখুক।

إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًا ﴿٤٠﴾

৪০. আমি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় দেখালাম, যেদিন মানুষ ঐসব দেখবে, যা তার দু হাত আগে পাঠিয়েছে।* এবং কাফির চিৎকার করে বলে উঠবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হতাম!'

৫. বদলা দেওয়ার পর বিপুল দানের মানে হলো তাদের নেক আমলের যেটুকু বদলা পাওনা হবে তা দেওয়ার পরও তাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে নিয়ামত দান করা হবে।

৬. অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের পরিবেশ এমন ভয়াল হবে যে, জমিনের অধিবাসী হোক আর আসমানের বাসিন্দা হোক আল্লাহর সামনে মুখ খোলার বা আল্লাহর আদালতের কাজে হস্তক্ষেপ করার কারো সাহস হবে না।

৭. রূহ অর্থ জিবরাঈল (আ)। তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে ফেরেশতাদের কথা বলার পর আলাদাভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

* অর্থাৎ মানুষের আমল বা কাজ-কর্ম।

৭৯. সূরা নাযি'আত

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দ 'নাযি'আত' অনুযায়ী এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরা নাবার পর এ সূরা নাযিল হয়েছে। এর আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, মাক্কী যুগের প্রথম যুগের প্রথম ভাগেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এর মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। কিয়ামত ও মরণের পর আবার জীবিত হওয়ার প্রমাণ এবং আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে অস্বীকার করার কুফল এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ

সূরা নাবার সমসাময়িক সূরা হিসেবে এর নাযিলের পরিবেশও সূরা 'নাবার'ই অনুরূপ।

আলোচনার ধারা

১-৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঐসব ফেরেশতার কসম খেয়েছেন, যারা মৃত্যুর সময় জান বের করে নেয়, আল্লাহর হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে তা পালন করে ও আল্লাহর কথামতো গোটা সৃষ্টিজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা করে থাকে। কিয়ামত যে হবেই হবে এবং মৃত্যুর পর যে আবার জীবিত হতেই হবে, সে বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দানের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা ঐ ফেরেশতাদের কসম খেয়ে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, ফেরেশতারা অ - জান বের করে নেওয়ার যোগ্য হয়ে থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে জান ফিরিয়ে দেওয়ারও শক্তি রাখে। যে ফেরেশতারা আল্লাহর সব হুকুম পালনে তৎপর, তারা আজ যেমন সমস্ত সৃষ্টিজগৎকে চালাচ্ছে, তেমনি একদিন এ জগৎকে ভেঙে চুরমার করে দেবে এবং আবার আরেকটি জগৎ সৃষ্টি করতে পারবে।

৬-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আজ তোমরা কোন্ যুক্তিতে কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করছ? এর জন্য তো একটা বড় রকমের ভূমিকম্পই যথেষ্ট। একটা ঝাঁকুনি দিলেই আরেক দুনিয়ায় তোমরা সব হাজির হয়ে যাবে। আজ যারা সে কথাকে সত্য মনে করছে না, তারাই সে দিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে এবং ভয়াতুর দৃষ্টি মেলে তারা ঐসব কিছু দেখতে থাকবে, যা আজ তারা অসম্ভব বলে ধারণা করছে।

১৫-২৬ নং আয়াতে মূসা (আ) ও ফিরাউনের কাহিনী অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে বলা হয়েছে, রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, তাঁর দেখানো পথে চলতে অস্বীকার করা এবং চালাকি ও চালবাজি করে তাঁকে পরাজিত করার অপচেষ্টা চালানোর যে কী কুফল তা ফিরআউন দেখতে পেয়েছে। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি তোমরা ফিরাউনের মতো আচরণ ত্যাগ না কর তাহলে তোমাদেরকেও ফিরাউনের মতোই দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করতে হবে।

২৭-৩৩ আয়াতে আখিরাত ও পরকালের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রথমেই অবিশ্বাসীদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'তোমাদেরকে আবার সৃষ্টি করা বেশি কঠিন কাজ নাকি চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারায় সজ্জিত এ বিরাট জগৎ তৈরি করা?' এ ছোট্ট একটা প্রশ্নের মাধ্যমে আখিরাত হওয়া যে খুবই সম্ভব, সে বিষয়ে মযবুত যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

এরপর মানুষ ও তার পালিত পশুর দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু জরুরি, তা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসমান ও জমিনে যে বিরাট সুব্যবস্থা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা সেদিকে কাফিরদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। দিন ও রাত, সমতল জমিন ও উঁচু পাহাড়, আকাশের বৃষ্টি ও জমিনের ঝরনা এবং এ সবের কারণে মানুষ ও পশুর জন্য যত কিছু উৎপন্ন হয় এর প্রতিটি জিনিস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কোনোটাই বিনা উদ্দেশ্যে অনর্থক তৈরি করা হয়নি।

এটুকু ইঙ্গিত দিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, মানুষকে এমন একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ জগতে কি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব তালাশ করার দায়িত্ব মানুষের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান কি এ কথাই বলে যে, দুনিয়ায় মানুষকে ভালো ও মন্দ বাছাই করার যোগ্যতা দিয়ে এবং আসমান ও জমিনের সবকিছুকে ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়ে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? মরার পর এসবের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না?

৩৪-৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আখিরাত হবে, তখন মানুষের সেখানকার চিরস্থায়ী জীবনের ভাগ্য এ দ্বারা নির্ধারিত হবে যে, দুনিয়ার জীবনটা সে কীভাবে কাটিয়েছে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে দুনিয়ার মজা ভোগ করাকে যারা জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিল, দোযখই তাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে। আর যারা আখিরাতে মনিবের সামনে হাজির হয়ে হিসাব দেওয়ার ভয় করেছে এবং সে অনুযায়ী তাদের নাফসের মন্দ ইচ্ছাকে দমন করেছে, জান্নাতই হবে তাদের স্থায়ী বাসস্থান।

এ কথা দ্বারা উপরের ঐ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলো যে, মানুষকে দুনিয়ার জীবনে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এর স্বাভাবিক, নৈতিক ও যুক্তিগত দাবি এটাই যে, আখিরাতে মানুষের পার্থিব জীবনের হিসাব নেওয়া এবং এর ভিত্তিতেই তাদের পুরস্কার ও শাস্তি হওয়া উচিত।

৪২-৪৪ নং আয়াতে 'কিয়ামত কবে হবে?'– কাফিরদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতে অবিশ্বাসীরা ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে বারবার রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করত যে, 'কিয়ামতের এত ভয় দেখাচ্ছ কেন? এখনই কিয়ামত এনে দেখাও না কেন? এটা যদি সত্যিই হবে, তাহলে কবে আসবে তা অন্তত বলে দাও না কেন?

এ ক'টি আয়াতে এসব প্রশ্নেরই সুন্দর জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন-তারিখ জানানোর কোনো দায়িত্ব রাসূলকে দেওয়া হয়নি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তা জানা নেই। কিয়ামত যে অবশ্যই হবে এ বিষয়ে শুধু সাবধান করাই রাসূলের দায়িত্ব।

৪৫-৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (স) কিয়ামত ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক ও সজাগ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে জোর করে আখিরাতে বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব রাসূলকে দেওয়া হয়নি। এরপর যার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুক এবং পরকালের হিসাবের ভয় করে নিজের জীবনকে সংশোধন করুক। অবশ্য যখন সত্যিই হিসাবের দিন এসে যাবে তখন এ অবিশ্বাসীরাই ভালোভাবে অনুভব করবে যে, চিরস্থায়ী জীবনের কথা ভুলে দুনিয়ায় সামান্য সময়ের জীবনকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকাটা কত বড় বোকামি হয়েছে। আখিরাতে স্থায়ী জীবনের সাথে তুলনা করে তারা নিজেরাই তখন বুঝতে পারবে যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটা বা কবরে থাকার সময়টা সামান্য একটা সকাল বা বিকালের চেয়ে বেশি লম্বা ছিল না।

সূরা নাযি'আত

৪৬ আয়াত, ২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١

১. ঐ (ফেরেশতাদের) কসম, যারা ডুব দিয়ে টানে

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢

২. ও আস্তে করে বের করে নেয়।[১]

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤

৩-৪. (ঐ ফেরেশতাদের) কসম, যারা (মহাশূন্যে) দ্রুত সাঁতার কেটে চলে;[২] তারপর তারা (হুকুম পালনে) একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়।[৩]

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥

৫. এরপর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) সব বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করে।[৪]

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦

৬. যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা কাঁপিয়ে তুলবে,

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧

৭. এরপর আরো একটা ধাক্কা আসবে,

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨

৮. সেদিন কতক মন ভয়ে কাঁপতে থাকবে;

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

৯. তাদের চাহনি ভীতিকাতর হবে।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠

১০. এরা বলে, আমাদেরকে কি সত্যি আবার ফিরিয়ে আনা হবে,

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١

১১. যখন আমরা পচা-গলা হাড্ডিতে পরিণত হব?

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢

১২. তারা বলতে থাকে, তাহলে এ ফিরে আসাটা তো বড় ক্ষতিকর হবে।[৫]

১. অর্থাৎ, যেসব ফেরেশতা মওতের সময় মানুষের শরীরের সব জায়গায় ঢুকে জানকে বের করে আনে।

২. অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য ফেরেশতারা এমন ব্যস্তভাবে চলে, যেন তারা শূন্যে সাঁতার কাটছে।

৩. আল্লাহর হুকুমের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে যায়।

৪. এ ফেরেশতারা আল্লাহর বিশাল রাজ্যের কর্মচারী, যারা আল্লাহর আদেশমতো সবকিছুর ব্যবস্থা করে থাকে।

৫. অর্থাৎ, যখন তাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হলো যে, তোমাদেরকে ঠিকই ফিরিয়ে আনা হবে, তখন ঠাট্টা করে তারা একে অপররের সাথে বলাবলি করতে লাগল যে, 'দোস্তরা! যদি সত্যি আমাদেরকে আবার জ্যান্ত করা হয়, তাহলে তো আমাদের খুবই বিপদ হবে দেখছি।'

অনুবাদ	আয়াত
১৩. অথচ এটা (মাত্র এটুকু কাজ যে,) একটা বড় রকমের ধমক আসবে।	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. তখনই ওরা খোলা ময়দানে হাজির হয়ে যাবে।	فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾
১৫. তোমার কাছে মূসার ঘটনার খবর কি পৌঁছেছে?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾
১৬. যখন তার রব তাকে তুয়ার পবিত্র উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন—	اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
১৭. 'ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।'	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾
১৮. তাকে জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি কি পবিত্র হওয়ার জন্য তৈরি আছ?'	فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾
১৯. আর আমি কি তোমার রবের দিকে তোমাকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করে চল?	وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾
২০. এরপর মূসা (ফিরাউনের কাছে গিয়ে) তাকে বড় প্রমাণ দেখালেন।[৬]	فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. কিন্তু সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল ও অমান্য করল।	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর সে চালবাজি করার মতলবে পেছনে ফিরল।	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾
২৩-২৪. তারপর লোকদেরকে জমা করে সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।	فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾
২৫. অবশেষে আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন।	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

৬. বড় প্রমাণ বা নিদর্শন মানে হলো, মূসা (আ)-এর লাঠি অজগর সাপে পরিণত হওয়া। এ কথা কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে আছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ٢٦

২৬. আসলে যে (আল্লাহকে) ভয় করে,[৭] তার জন্য এতে রয়েছে বিরাট উপদেশ।

রুকূ' ২

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ٢٧

২৭. তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, নাকি যে আসমান তিনি বানিয়েছেন (সেটা বেশি কঠিন কাজ)?

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٨

২৮. তিনি এর ছাদ খুব উঁচু করেছেন এবং এর মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ٢٩

২৯. এর রাত ঢেকে দিয়েছেন এবং এর দিন প্রকাশ করেছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ٣٠

৩০. এরপর তিনি জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন।

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣١

৩১. এর ভেতর থেকে এর পানি ও উদ্ভিদজাত খাদ্য বের করেছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٢

৩২. আর এতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন—

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣

৩৩. তোমাদের জন্য ও তোমাদের পালিত পশুর জন্য জীবিকা হিসেবে।

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ٣٤

৩৪. অতঃপর যখন ঐ মহা ঘটনা ঘটবে,[৮]

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ٣٥

৩৫. যেদিন মানুষ যাকিছু করেছে সেসব কথা মনে করবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ٣٦

৩৬. আর যে দেখবে তার সামনে দোযখ খুলে ধরা হবে।

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ٣٧

৩৭. কাজেই যে বিদ্রোহ করেছিল

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٣٨

৩৮. ও দুনিয়ার জীবনকে বেশি পছন্দ করেছিল,

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ٣٩

৩৯. একমাত্র দোযখই হবে তার ঠিকানা।

৭. অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার যে শাস্তি ফিরাউন পেয়েছে, সে রকম পরিণামের ভয় করে।

৮. এর মানে হলো কিয়ামত।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

৪০. আর যে (আখিরাতে) নিজের রবের সামনে খাড়া হওয়ার ভয় করেছিল ও নাফসকে* অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল,

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

৪১. জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾

৪২. এরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, সেই সময়টি কখন এসে পৌছবে?

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾

৪৩. (হে রাসূল!) ঐ সময়টা বলে দেওয়া আপনার কী দরকার?

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾

৪৪. এ বিষয়ের জ্ঞান তো আপনার রব পর্যন্তই শেষ।

اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾

৪৫. যে এর ভয় করে শুধু তার জন্যই আপনি সাবধানকারী।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

৪৬. যেদিন তারা এটা দেখতে পাবে তাদের মনে হবে যে, তারা (দুনিয়াতে বা মৃত্যুর পরে) একটা বিকাল বা একটা সকালের চেয়ে বেশি সময় থাকেনি।

* নাফস মানে প্রবৃত্তি। মানুষের দেহের দাবিগুলোকে 'নাফস' বা 'হাওয়া' শব্দে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবদেহ খিদে লাগলে খাবার দাবি করে, শীত লাগলে গরম দাবি করে, যা সুন্দর তা-ই দেখতে চায়, মিষ্টি আওয়াজ শুনতে চায় এবং দুনিয়ায় যাকিছু ভোগ করার আছে সবই পেতে চায়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে বৈরাগী হতে বলেননি। দুনিয়ার সব ভোগের জিনিসকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী ব্যবহার করাই ইসলামের বিধান। এর বিপরীত ইচ্ছা ও কামনা থেকে নাফসকে যারা ফিরিয়ে রাখে, তাদেরই ঠিকানা হবে বেহেশত।

৮০. সূরা 'আবাসা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দটিই এর নামের ভিত্তি।

নাযিলের সময়

সূরার শুরুতেই যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিহাস ও হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ সূরাটি মাক্কী যুগের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় রিসালাত ও আখিরাত। এখানে দীনের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে রাসূল (স)-কে সঠিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং যারা দীন কবুল করতে রাজি নয়, আখিরাতে তাদের কী দশা হবে তা বলা হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ

নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক নবী ও রাসূল সমাজের নেতাদেরকে দীন কবুল করার দাওয়াত দিয়েছেন। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরা যা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ তা সহজেই কবুল করে বলেই তাঁরা নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাই বিশ্বনবী (স) মক্কার নেতা ও গণ্যমান্য লোকদেরকে ইসলাম কবুল করার জন্য বোঝাচ্ছিলেন।

একদিন রাসূল (স) উতবা, শায়বা, আবু জেহেল, উবাই বিন খালফ, উমাইয়া বিন খালফের মতো ইসলামের চরম-বিরোধী নেতাদেরকে যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন ইবনে উম্মে মাকতূম নামে রাসূল (স)-এর এক অন্ধ আত্মীয় সেখানে হাজির হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিরক্ত হলেন। অবশ্য রাসূল (স)-এর বিরক্তির অর্থ এটা নয় যে, তিনি বড়লোকদের গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন বা সাধারণ লোককে অবহেলা করেছেন। তিনি অত্যন্ত আশা নিয়ে মক্কার বড় বড় নেতাদের হেদায়াত করার চেষ্টা করছিলেন। ঐ সময় অন্য কেউ এসে কথা বললে বিরক্ত হওয়া দূষণীয় নয়। একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় কোনো লোক এসে অন্য কথা বলতে শুরু করলে বিরক্ত হওয়ারই কথা।

আল্লাহ তাআলা এ উপলক্ষে যে কথা সূরার প্রথম দশটি আয়াতে বলেছেন, তাতে পাঠক মনে করতে পারেন যে, এখানে রাসূল (স)-কে ধমক দেওয়া হয়েছে। আসলে পরোক্ষভাবে এখানে ঐ কাফির সর্দারদের বিরুদ্ধেই আল্লাহ তাআলা রাগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন, যে সর্দাররা ইসলামের দুশমন এরা হেদায়াত চায় না। আপনি এদেরকে এত দরদ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, অথচ এরা আপনাকে মানতে মোটেই রাজি নয়। যারা আপনার কাছে হেদায়াতের উদ্দেশ্যে আসে, তারা সাধারণ লোক হলেও আল্লাহর কাছে তাদের দামই বেশি। অবিশ্বাসী নেতাদের মূল্য নেই।

ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ এক সাধারণ মানুষ হলেও তিনি হেদায়াতের আগ্রহ নিয়ে আসায় আল্লাহর কাছে তাঁর মূল্য অনেক বেশি।

আলোচনার ধারা

১-১০ নং আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা উপরের আলোচনায় এসে গেছে। এখানে আল্লাহ্ তাআলা রাসূলকে পরোক্ষভাবে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যারা হেদায়াত পেতে চায়, তাদের জন্য আপনি সময় ও শ্রম খরচ করুন। যেসব নেতা অহঙ্কারী, হঠকারী ও হকের দুশমন, তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হয়নি। ছোট ও বড়, নেতা ও সাধারণ লোক সবাইকেই দাওয়াত দিতে থাকুন। কিন্তু এ জাতীয় নেতাদের তোষামোদ করার দরকার নেই। তাদের যদি দীনের প্রতি আগ্রহ না থাকে তাহলে তাদের জন্য দীনের কোনো প্রয়োজন নেই।

১১-১৬ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে, 'আপনি যে কুরআন পেশ করছেন, তা সবার জন্য অবশ্যই মূল্যবান উপদেশ। আল্লাহ্ স্বয়ং ফেরেশতাদের পবিত্র হাতে এ কিতাব লিখিয়ে রেখেছেন, যা অতি সম্মানিত ও পবিত্র। এ উপদেশ যত মহামূল্যবানই হোক, যাকে ইচ্ছা তাকেই এ উপদেশ কবুল করতে বাধ্য করার কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হয়নি। আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, যার ইচ্ছা হয় সে কবুল করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করুক, আর যার ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে লা'নতের ভাগী হোক।'

১৭-২০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের আচরণকে নিন্দা করে বলেছেন, যারা কুরআনের মতো উপদেশকে কবুল করতে অস্বীকার করে, তারা আসলে নিজেদেরই ধ্বংস করে। তারা কি একটু চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্ তাআলা সামান্য বীর্যের পানি দিয়ে তৈরি করে তাদের মধ্যে এতসব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন? তারপর তাদের ভালো ও মন্দ পথ চেনার ক্ষমতা দিয়ে যে পথ ইচ্ছা সে পথই কবুল করা সহজ করে দিয়েছেন। তিনি কোনো এক পথে চলার জন্য বাধ্য করেননি। ইচ্ছার এ স্বাধীনতাটুকু দিয়েছেন বলেই কি আল্লাহর অবাধ্য হওয়া উচিত? যে অবাধ্য হলো, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই ধ্বংস করল।

২১-২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবনে মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যেটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তা মৃত্যুর সাথে সাথেই খতম হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাকে মৃত্যুর পর কবরে থাকতে বাধ্য করবেন, আবার যখন সময় হবে তাকে জীবিত করবেন। এ ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। মরতে অস্বীকার করা, কবরে পড়ে থাকতে রাজি না হওয়া বা আবার জীবিত হতে আপত্তি করার কোনো ক্ষমতাই তার থাকবে না।

এমন অসহায় মানুষ কোন্ সাহসে আল্লাহর হুকুম পালন করে না? যে আল্লাহর হাতে তার হায়াত, মওত ও পুনরুত্থান, সে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কী লাভ হতে পারে?

২৪-৩২ নং আয়াতে ঐ কথাই বলা হয়েছে, যা সূরা নাবার ৬ থেকে ১৬ নং আয়াতে ও সূরা নাযিআতের ২৭ থেকে ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে মানুষের চিন্তাশক্তির প্রতি আপিল করা হয়েছে এবং বিবেককে জাগানোর মতো আবেগপূর্ণ কথা বলা হয়েছে।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের যত রকম খাদ্য ও পানীয় দরকার, তার কতকগুলো উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মানুষ একটু খেয়াল করে দেখুক, যে মনিব এতসব নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর অবাধ্য হওয়া কি বিবেকবিরোধী নয়? যিনি এসব দিয়েছেন, তিনি কি একদিন একটুও জিজ্ঞেস করবেন না যে, 'আমার কথামতো দুনিয়ায় কাজ করেছ কি না?'

৩৩-৩৭ নং আয়াতে আখিরাতের একেবারে বাস্তব ছবি তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে যার যেমন খুশি চলার পর মৃত্যুর পরপারে হাশরের ময়দানের অবস্থা কেমন হবে, এখানে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে বিবি-বাচ্চা, বাপ-মা ও ভাই-বন্ধুরা একে অপরের মহব্বতে অন্ধ হয়ে তাদের সুখ-সুবিধার জন্য অথবা তাদের দাবি পূরণের জন্য আল্লাহর অবাধ্য হয়; কিন্তু হাশরের ময়দানে এদের পারস্পরিক মহব্বত খতম হয়ে যাবে। সেখানে এরা একে অপর থেকে পালাবে। নিজের অবস্থা নিয়েই প্রত্যেকে এমন পেরেশান থাকবে যে, অন্য কারো কথা চিন্তা করার হুঁশই থাকবে না; বরং বিবি-বাচ্চাসহ নিকটাত্মীয়দের কারণে বিপদ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে সবাই সবার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে।

৩৮-৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে সবার অবস্থা এক রকম হবে না। দুনিয়ায় যেমন সবার অবস্থা এক রকম ছিল না, সেখানেও এক রকম হতে পারে না। এক ধরনের লোকের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তাদের মুখে হাসি-খুশি লেগেই থাকবে এবং তাদেরকে খুবই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত মনে হবে। আরেক ধরনের লোকের চেহারা মলিন, কালিমাখা ও হতাশাগ্রস্ত থাকবে। বলা বাহুল্য, দুনিয়ায় যারা কাফির ও পাপী, তারা এখানে যত মজাই করে থাকুক এবং তাদের চেহারা যত সুন্দরই থাকুক হাশরে অবশ্যই তাদের চরম দুর্দশা হবে।

বিশেষ শিক্ষা

দুনিয়ার জীবনে মানুষ বিবি-বাচ্চা, বাপ-মা ও ভাই-বন্ধুদেরকে খুশি করার জন্য এবং তাদের সুখ-সুবিধার জন্য আল্লাহর কত আদেশ-নিষেধ অমান্য করে থাকে। অনেক সময় তাদের জন্য মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাও কুরবান দেয়। এ ঘনিষ্ঠ লোকদের মহব্বত এমন অন্ধ বানিয়ে দেয় যে, তাদের দুনিয়া বানানোর জন্য অনেকেই নিজেদের আখিরাতকে বরবাদ করে দেয়। হাদীসে এ জাতীয় লোকদেরকে সবচেয়ে দুর্ভাগা বলা হয়েছে।

এ সূরার ৩৩ থেকে ৩৭ নং আয়াতে সাবধান হওয়ার জন্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঐসব ঘনিষ্ঠ মহব্বতের পাত্র-পাত্রীর আচরণ আখিরাতে কেমন হবে। বলা হয়েছে, যাদের সুখ-সুবিধার জন্য দুনিয়ায় হালাল-হারামের পরওয়া না করে কামাই-রোযগারে লিপ্ত রয়েছে, তারা আখিরাতে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে। তোমার হারাম কামাই খেয়ে তারা দুনিয়ায় যত সুখ-সুবিধাই ভোগ করে থাকুক, আখিরাতে তারা কেউ তোমার পাপের ভাগী হতে রাজি হবে না।

এ সূরার পরবর্তী কয়েকটি সূরার পরের সূরা ইনশিক্বাকের ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, নেক লোক যখন তার আমলনামা ডান হাতে পাবে তখন সে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে খুশি প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ আত্মীয়দের মধ্যে যারা নেক, তারা আখিরাতে একে অপর থেকে পালিয়ে বেড়াবে না; বরং একে অপরকে দেখে খুশি হবে। কিন্তু যারা পাপী, তারা সবাই একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে। তারা ভয় করবে যে, না-জানি তার বাপ-ভাইদের পাপের বোঝা তার মাথায়ও এসে পড়ে।

সূরা 'আবাসা

৪২ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤٢ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝١

১. [রাসূল] ভ্রূ কুঁচকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢

২. এ কারণে যে, ঐ অন্ধ লোকটি তার কাছে এসে গেছে।[1]

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۝٣

৩. আপনি কী জানেন? হয়তো সে শুধরে যাবে,

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤

৪. অথবা উপদেশ কবুল করবে; ফলে উপদেশ তার জন্য উপকারী হবে।

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥

৫. যে বেপরওয়া ভাব দেখায়,

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦

৬. তার দিকে তো আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন।

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧

৭. অথচ সে না শুধরালে আপনার উপর এর কী দায়িত্ব আছে?

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨

৮. আর যে আপনার কাছে ছুটে আসে

وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩

৯. এবং ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠

১০. তার প্রতি আপনি অমনোযোগী হচ্ছেন।

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١

১১. কক্ষনো নয়![2] নিশ্চয়ই এ (কুরআন) তো একটি উপদেশ।

---

১. পরের কতক আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, স্বয়ং রাসূল (স)-ই বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এখানে যে অন্ধের দিকে ইশারা করা হয়েছে, তিনি হযরত খাদীজা (রা)-এর ফুফাত ভাই হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)। সে সময় রাসূল (স) মক্কার বড় বড় সর্দারদের নিকট দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করায় ব্যস্ত ছিলেন। এ অবস্থায় ঐ অন্ধ ব্যক্তি এসে কতক প্রশ্ন করতে চাইলেন। এভাবে রাসূলের কাজে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হলেন।

২. অর্থাৎ, কখনো এ ধরনের কাজ করবেন না। যারা আল্লাহকে ভুলে আছে এবং দুনিয়ার মান-মর্যাদা নিয়ে গর্বে ফুলে আছে, তাদেরকে বিনা প্রয়োজনে গুরুত্ব দেবেন না। তাদের সাথে আপনার ব্যবহারে যেন তাদের এমন ধারণা না হয় যে, এরা ইসলাম কবুল না করলে আপনার কোনো স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাবে। ইসলামের শিক্ষা এমন মূল্যহীন নয় যে, যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তাদেরকে তোয়াজ করতে হবে। যারা সত্যের ধার ধারে না, সত্য তাদের পরওয়া করে না।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾

১২. যার ইচ্ছা হয়, সে তা গ্রহণ করুক।

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

১৩. এটা এমন সব বইয়ে লেখা আছে, যা সম্মানিত,

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾

১৪. উচ্চ মর্যাদাবান, পবিত্র।[৩]

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৫-১৬. এটা সম্মানিত সৎ লেখকদের হাতে থাকে।[৪]

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾

১৭. লা'নত[৫] হোক মানুষের উপর; সে কত বড় সত্য অস্বীকারকারী!

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾

১৮. তাকে (আল্লাহ) কোন্ জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

১৯. বীর্যের একটি ফোঁটা থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার তাকদীর* ঠিক করেছেন।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾

২০. এরপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করেছেন।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾

২১. অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন, তারপর কবরে পৌঁছিয়েছেন।

ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾

২২. এরপর যখন তিনি চান তখন তাকে আবার জীবিত করবেন।

৩. অর্থাৎ, সব রকম ভেজাল থেকে পাক। এতে বিশুদ্ধ হক পেশ করা হয়েছে। কোনো ধরনের বাতিল বা ভ্রান্ত চিন্তা, মত ও পথ এতে শামিল হতে পারেনি।

৪. এখানে ঐ সব ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর সরাসরি হেদায়াত অনুযায়ী কুরআনের হেফাযত করা ও রাসূল (স)-এর নিকট ঠিকমতো পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেন।

৫. এখান থেকে কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা হচ্ছে। এর আগে ১৬টি আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হলেও তাতে কাফিরদের প্রতি পরোক্ষ ধমক ছিল। তাতে বলা হয়েছে, 'হে রাসূল! যারা সত্য তালাশ করে, তাদের দিকে মনোযোগ দিন। ঐসব সত্যের দুশমন কুরআনের মূল্য কী বুঝবে?

* শিশু মায়ের পেটে থাকাকালেই ঠিক করে দিয়েছেন যে, তার লিঙ্গ কী হবে, কোন্ রঙের হবে, কতটা লম্বা ও মোটা হবে, তার হাত, পা, চোখ, কান কতটুকু ঠিকমতো তৈরি করা হবে, আর কোন্ কোন্টা কী পরিমাণ বিকল বানানো হবে, এর আকৃতি কীরূপ হবে, এমনকি এর গলার আওয়াজ কেমন হবে, এর দৈহিক শক্তি ও মগজের ক্ষমতা কতটুকু হবে, কোন্ দেশে ও কী পরিবেশে সে জন্ম নেবে ও লালিত-পালিত হবে, দুনিয়ায় কী দায়িত্ব পালন করবে, কতদিন দুনিয়ায় থাকবে। যে আল্লাহর হাতে এসব কিছু করার ক্ষমতা, সে মহা শক্তিশালীকে অস্বীকার করে এবং তাঁর হুকুম অমান্য করে সে কেমন করে সফলতা লাভ করবে?

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ۝٢٣

২৩. কক্ষনো নয়! আল্লাহ তাকে যে (কর্তব্য পালনের) হুকুম দিয়েছিলেন, তা সে পালন করেনি।

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ۝٢٤

২৪. মানুষ তার খাবারের দিকে একটু চেয়ে দেখুক।

أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ۝٢٥

২৫. আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি।[৬]

ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۝٢٦

২৬. তারপর আমি অদ্ভুতভাবে মাটিকে ফাটিয়ে দিয়েছি।

فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝٢٧ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝٢٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝٣٠ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ۝٣١

২৭-২৮-২৯-৩০-৩১. তারপর এতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর ও তরি-তরকারি এবং যায়তুন ও খেজুর, আর ঘন ঘন বাগ-বাগিচা, ফলমূল ও উদ্ভিদজাত খাদ্য।

مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ۝٣٢

৩২. (এসব সৃষ্টি করেছি) তোমাদের জন্য ও তোমাদের পালিত পশুর জন্য জীবিকা হিসেবে।

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ۝٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝٣٤ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ۝٣٥ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ۝٣٦

৩৩-৩৪-৩৫-৩৬. অবশেষে যখন সেই কানে তালা লাগিয়ে দেওয়ার মতো আওয়াজ আসবে[৭] সেদিন মানুষ তার ভাই, মা-বাপ ও বিবি-বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে।

لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝٣٧

৩৭. সেদিন তাদের একেকজনের উপর এমন (কঠিন) সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া কারো খবর থাকবে না।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩

৩৮-৩৯. সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল, হাসি-খুশি ও সন্তুষ্ট-প্রফুল্ল থাকবে।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤٠

৪০. আর কতক চেহারা সেদিন বিষম ধূলিমলিন থাকবে।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝٤١

৪১. থাকবে কলঙ্ক-কালিমায় ঢাকা।

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۝٤٢

৪২. এরাই কাফির ও দুষ্কৃতকারী পাপী।

---

৬. এর মানে হলো বৃষ্টি।

৭. এখানে শেষবারের মতো শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার ভীষণ আওয়াজের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে সব মৃত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে।

৮১. সূরা তাকভীর

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের (কুভ্‌ভিরাত) ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল বিশেষ্য পদ দ্বারাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরার আলোচনার ধারা ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে মনে হয় যে, সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম ভাগে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

প্রথম ১৪টি আয়াতে কিয়ামত ও আখিরাত এবং বাকি অংশে রিসালাতই মূল আলোচ্য বিষয়।

নাযিলের পরিবেশ

যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী তিনটি সূরা নাযিল হয়েছে, এ সূরাটিও একই পরিবেশে নাযিল হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৬ নং আয়াতে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থা কীরূপ হবে এর একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে যখন কিয়ামতের সূচনা করা হবে, তখন সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-তারা ও পাহাড়-পর্বত, নদী-নালার কী অবস্থা হবে তার একটি ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

৭-১৪ নং আয়াতে কিয়ামত ও আখিরাতের দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর পর আবার যখন মানুষকে জীবিত করা হবে, আমলনামা খুলে দেওয়া হবে, দোযখ ও বেহেশত সবার সামনে হাযির করা হবে, তখনকার অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, সেদিন সবাই বুঝতে পারবে যে, দুনিয়ার জীবনে কে কী করে এসেছে। দুনিয়ায় থাকাকালে যারা আখিরাতের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেয়নি, সেদিন তারা টের পাবে যে, কত বড় ভুল হয়ে গেছে; কিন্তু তখন টের পাওয়া দ্বারা কোনো লাভ হবে না।

কিয়ামত ও আখিরাতের জীবন্ত ছবি তুলে ধরে মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও সংশোধন হওয়ার সময় আছে। পরে আফসোস করলেও কোনো লাভ হবে না।

১৫-২৫ নং আয়াতে রিসালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথমেই ডুবে যাওয়া তারা, বিদায় হওয়া রাত ও সকাল বেলার কসম খেয়ে বলা হয়েছে, রাসূল (স) জিবরাঈল (আ) থেকে কুরআনের যে বাণী পেয়েছেন, তা রাতের অন্ধকারে স্বপ্নে পাওয়া নয়। তিনি জিবরাঈল (আ)-কে দিনের আলোতে সজাগ অবস্থায় স্পষ্টভাবে আকাশে দেখেছেন। আর যে ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী নিয়ে আসেন, তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর কাছেও মর্যাদার অধিকারী এবং সকল ফেরেশতা তাঁরই হুকুম মেনে চলে।

জিবরাঈল (আ)-এর মর্যাদা উল্লেখ করার পর রাসূল (স)-এর প্রচারিত কুরআনের বাণীর দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে লজ্জা দিয়ে বলা হয়েছে, 'রাসূল (স) তোমাদের নিকট আল্লাহর যে বাণী পৌঁছাচ্ছেন তা যে কত মূল্যবান, তা বোঝার জন্য তোমরা যদিও প্রস্তুত নও তবুও এটুকু বুদ্ধি তোমাদের থাকা উচিত ছিল যে, এমন উপদেশ ও জ্ঞানময় কথা কোনো পাগলের প্রলাপ হতে পারে না বা শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে পারে না। অথচ তোমরা তা-ই বলে বেড়াচ্ছ।'

২৬ থেকে ২৯ নং আয়াতে অবিশ্বাসীদের বিবেকে চাবুক মেরে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেছেন, 'কুরআনের এমন মূল্যবান উপদেশ থেকে পালিয়ে কোথায় যাচ্ছ? গোটা বিশ্বের সবার জন্য যে উপদেশ পাঠানো হয়েছে, তা কবুল না করে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোথায় যাচ্ছ? আসলে তোমরা সত্য পথে চলতেই চাও না। তোমাদের মধ্যে যারা সরল-মযবুত পথে চলতে চায় তারা এ উপদেশমতো চলে যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হচ্ছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না?

এর চেয়ে আরো বড় সত্য কথা হলো, হেদায়াত পেতে চাইলেও তা পাবে না; যে পর্যন্ত আল্লাহ তা পছন্দ না করেন। তোমরা যে ব্যবহার রাসূলের সাথে করছ, তাতে আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত না পাওয়ার ফায়সালা করে দিতে পারেন। এখনও সময় আছে, তোমাদের নিয়ত ও ইচ্ছাকে পবিত্র করে নাও। তাহলে হয়তো হেদায়াত পেয়ে যাবে।

তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহর ইচ্ছাই আসল। যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি। তোমরা শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে পার। সফলতা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তোমরা কুরআনের অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখার যত ইচ্ছা এবং এর জন্য যত চেষ্টাই কর আমি রাসূলকে কামিয়াব করার ইচ্ছা করলে তোমাদের ইচ্ছা কিছুতেই তা ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। তাই এ ব্যর্থ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছেড়ে সত্যকে কবুল করে নাও।

বিশেষ শিক্ষা

'আল্লাহর ইচ্ছার উপর কারো ক্ষমতা নেই।'

সূরাটির শেষ আয়াতে একটা বিরাট ও গভীর বিষয়কে ছোট্ট এক কথায় প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা মোটেই অবাধ নয়। মানুষ যত ইচ্ছাই করুক, তা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া পূরণ হতে পারে না। মানুষ যে উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করুক, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তার কোনো চেষ্টাই সফল হতে পারে না।

মানুষ যে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং যে উদ্দেশ্যে সে চেষ্টা করে, তা আল্লাহর মর্জির বিপরীত হলেও আল্লাহ সাধারণত তাতে বাধা দেন না। কারণ, তিনি মানুষকে ভালো ও মন্দ দু'দিকেই চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন; কিন্তু এ স্বাধীনতা এমন নয় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাতে বাধা দিতে পারেন না। মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে তিনি চলতে দেন; কিন্তু যখনই সে ঐ শেষ সীমা পার হতে চায় তখনই তিনি বাধা দেন। আর আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন অন্য কোনো শক্তি এতে বাধা দিতে পারে না।

তাই কারো এমন ধারণা করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয় যে, সে যত মন্দই করুক, তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। ভালো ও মন্দ সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকেই যে ধারণা দেওয়া হয়েছে এর বিপরীত পথে চলার চেষ্টা করা একেবারেই বোকামি। আল্লাহকে টেক্কা মেরে যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা যে কারোরই নেই, সে কথা মনে রাখাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

সূরা তাকভীর

২৯ আয়াত ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে,[১]

২. যখন তারাগুলো ছড়িয়ে পড়বে,

৩. যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে,

৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে,[২]

৫. যখন সব বন্যপশুকে একত্রিত করা হবে,

৬. যখন সমুদ্রগুলোয় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে,

৭. যখন প্রাণকে (দেহের সাথে) জুড়ে দেওয়া হবে।[৩]

৮. যখন জ্যান্ত কবর দেওয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে—

৯. কোন্ দোষে তাকে মারা হয়েছিল?

১০. যখন আমলনামা খুলে দেওয়া হবে,

১১. যখন আসমানের পর্দা সরিয়ে দেওয়া হবে,

১২. যখন দোযখের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং

১৩. যখন বেহেশতকে কাছে আনা হবে,

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কী নিয়ে হাজির হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾

وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

১. অর্থাৎ, যে আলো সূর্য থেকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, ঐ আলোকে আর ছড়াতে না দিয়ে সূর্যের উপরই গুটিয়ে ফেলা হবে।

২. আরববাসীদের নিকট ঐ উটের চেয়ে কোনো মালই বেশি মূল্যবান ছিল না, যে উটের বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। এ অবস্থায় উটের খুব বেশি যত্ন নেওয়া হয় এবং হেফাযত করা হয়। দশ মাসের গাভিন উটের দিকে মনোযোগ না দিয়ে এভাবে 'ছেড়ে দেওয়া হবে' বলার মানে হলো, মানুষ এমন কঠিন বিপদে পড়বে, যার ফলে প্রিয়তম মালের যত্ন নেওয়ার মতো হুঁশ-জ্ঞানও তখন থাকবে না।

৩. অর্থাৎ, মানুষকে নতুনভাবে তেমনি জীবিত করা হবে, যেমন দুনিয়ায় মৃত্যুর আগে শরীরের সাথে রূহও যিন্দাহ ছিল।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦

১৫-১৬. না,[৪] আমি কসম খাচ্ছি ফিরে আসা ও লুকিয়ে যাওয়া তারাগুলোর।

وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧

১৭. আর রাতের, যখন সে বিদায় হলো

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨

১৮. এবং ভোরের, যখন সে শ্বাস নিল।

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩

১৯. নিশ্চয়ই এটা একজন সম্মানিত বাণীবাহক [জিবরাঈল (আ)]-এর কথা।[৫]

ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠

২০. যিনি খুব শক্তিশালী ও আরশের মালিকের নিকট বড় মর্যাদার অধিকারী।

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١

২১. সেখানে তার হুকুম মানা হয়[৬] এবং তিনি আস্থাভাজন।

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝٢٢

২২. (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সাথিটি পাগল নন।[৭]

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝٢٣

২৩. তিনি তাকে [জিবরাঈল (আ)-কে] আলোকময় আকাশে দেখেছেন।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤

২৪. আর তিনি গায়েবের (ঐ ইলমকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নন।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ۝٢٥

২৫. এটা কোনো বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝٢٦

২৬. তাহলে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ۝٢٧
لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝٢٨

২৭-২৮. এটা (কুরআন) তো সারা জাহানের জন্য একটা উপদেশ; (বিশেষ করে) তোমাদের মধ্যকার ঐ ধরনের প্রত্যেকটি লোকের জন্য, যে সঠিক পথে চলতে চায়।

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ۝٢٩

২৯. আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন না চাওয়া পর্যন্ত তোমাদের চাওয়াতে কিছুই হয় না।

---

৪. কুরআনে যাকিছু বলা হয়েছে, তা কোনো পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের কুপরামর্শ বলে তোমরা যে ধারণা করছ, তা কখনো সঠিক নয়।

৫. এখানে সম্মানিত রাসূল অর্থ জিবরাঈল (আ), যিনি আল্লাহর বাণী বহন করে আনেন। কুরআনকে ঐ 'বাণী বাহকের কথা' বলার অর্থ এই নয় যে, এটা ঐ বাহকের বাণী। বাণীবাহক (পয়গাম্বর) বা রাসূল বলার মানেই হলো, কুরআন ঐ মহান সত্তার বাণী, যিনি বাহক হিসেবে জিবরাঈল (আ)-কে পাঠিয়েছেন।

৬. অর্থাৎ, তিনি ফেরেশতাদের সরদার। সকল ফেরেশতা তাঁর হুকুমমতোই কাজ করে।

৭. এখানে সাথী মানে রাসূল (স), যিনি মক্কাবাসীদের একজন হিসেবে তাদেরই সঙ্গী-সাথী ছিলেন।

৮২. সূরা ইনফিতার

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'ইনফাতারাত' ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল বিশেষ্য পদের শব্দ দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার ধরনের সাথে সূরা তাকভীরের খুব ঘনিষ্ঠ মিল দেখে মনে হয় যে, এ দুটো সূরা কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এর আলোচ্য বিষয় কিয়ামত ও আখিরাত। রাসূল (স) বলেছেন, 'যদি কেউ কিয়ামত দিনের দৃশ্যকে এমনভাবে দেখতে চায়, যেমন নিজের চোখে দেখা যায়, তাহলে সে সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিক্বাক পড়ুক।'

নাযিলের পরিবেশ

সূরা নাবা থেকে এ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, প্রায় একই ধরনের পরিবেশে এ সূরাটিও নাযিল হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার তি সংক্ষিপ্ত একটা ছবি আঁকা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, গ্রহ-উপগ্রহে সুন্দর করে সাজানো এ পৃথিবী ভেঙে দিয়েই কিয়ামতের সূচনা করা হবে।

৪ ও ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আবার যখন মানুষকে জীবিত করে কবর থেকে উঠিয়ে আনা হবে তখন তাদের দুনিয়ার জীবনের সব কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। তারা নিজেরা জীবিতকালে ভালো ও মন্দ যা করেছে তাও যেমন দেখানো হবে, তেমনি তাদের মৃত্যুর পর তাদের ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দুনিয়ায় যাকিছু ফলাফল হয়েছে তাও দেখানো হবে।

৬-৮ নং আয়াতে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য অতি দরদের সাথে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'হে মানুষ! তোমাদের যে মহান দয়ালু মনিব জীবের সেরা বানিয়ে তোমাদেরকে এমন সুন্দর শারীরিক আকৃতি ও মানসিক গুণাবলি দান করেছেন, তিনি যে এসবের একদিন হিসাব নেবেন এবং তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনের সব কাজ-কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন, সে কথা কেমন করে তোমরা ভুলে আছ? কে ঐ মনিবের কথা ভুলিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?

৯-১২ নং আয়াতের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেছেন, 'আখিরাতে যে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে, সে কথাকে মিথ্যা মনে করার ফলেই তোমরা ধোঁকায়

পড়েছে। ঐ কথা সত্য মনে করলে কিছুতেই বিবেকের বিরুদ্ধে এভাবে কাজ করতে পারতে না।' এর পর ১০ থেকে ১২ নং আয়াতে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'তোমরা মনে করো না যে, তোমরা যা করে বেড়াচ্ছ এর কোনো রেকর্ড রাখা হচ্ছে না। আল্লাহর নিযুক্ত সম্মানিত ফেরেশতারা সব কিছুই লিখে রাখছেন।'

১৩-১৫ নং আয়াতে খুবই জোর দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সৎ লোকেরা অবশ্যই চিরদিন নিয়ামতের মাঝে থাকবে এবং বদ লোকেরা আযাবই পেতে থাকবে। শেষ বিচারের পর থেকে এরা চিরকাল এমন দোযখে থাকতে বাধ্য হবে, যেখান থেকে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কারো সাধ্য থাকবে না।

১৭-১৯ নং আয়াতে বিচারদিবসের ভয়াবহ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ায় যে যত দাপটই দেখাক এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যে যত চালাকিই করুক, আখিরাতের আদালতে কাউকে বাঁচানোর শক্তি কারো থাকবে না। সেদিন সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব আল্লাহরই থাকবে। তিনিই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই থাকবে।

বিশেষ শিক্ষা

'মানুষের কর্মজীবন কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী'

৫ নং আয়াতে এক বিরাট বিষয়কে একটি ছোট আয়াতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ আগে কী করেছে ও পরে কী করছে তা কিয়ামতে জানতে পারবে। আমলনামা যখন হাতে দেওয়া হবে, তখন সবাই বিস্মিত হয়ে বলবে, আমার হিসাবে এত আমল কোথা থেকে এল? যারা নেক আমল করেছে তারাও যেমন আশ্চর্য হবে, তেমনি অপরাধীরাও পেরেশান হয়ে বলবে, 'হায় আল্লাহ! আমরা এত পাপ তো করিনি? এতগুলো কেন আমাদের নামে লেখা হলো?'

আল্লাহর পক্ষ থেকে নেক ও বদ সবাইকে জানানো হবে যে, তোমরা নিজেরা এত কিছু করনি– এ কথা ঠিকই; কিন্তু তোমাদের চেষ্টায় অন্যরা যা করেছে, তোমাদেরকে যারা অনুকরণ করেছে, এমনকি তোমাদের মত ও পথ পছন্দ করে যারা সে অনুযায়ী চলেছে, তাদের সবাই যেসব আমল করেছে সেসবও তোমাদের আমলনামায় জমা হয়েছে। তোমাদের কাজের জের কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন চলেছে, তা তোমাদের হিসাবে লেখা হয়েছে।

এ থেকে বোঝা গেল, মানুষ মরে গেলেই তার আমলের হিসাব শেষ হয়ে যায় না। কিয়ামত না আসা পর্যন্ত মানুষের কাজের হিসাব চূড়ান্ত (Account Close) হয় না। কারণ, মানুষের কাজের জের চলতেই থাকে। হিটলারের মতো লোকের অপকর্মের জের শত শত বছর পর্যন্ত চলাই স্বাভাবিক। ফিরাউন ও নমরূদদের দুষ্কৃতির জের এখনো চলছে। তাই মানুষ জীবিত থাকাকালে যা করে শুধু এর ভিত্তিতেই তার বিচার হওয়া যথেষ্ট নয়। ইনসাফের দাবি এটাই যে, সে যা করেছে তার জের যতদিন চলবে ততদিনই তার আমল জারি আছে বলে গণ্য হতে হবে। অবশ্য আমলে জারিয়া ভালো ও মন্দ দু'রকমই হতে পারে। রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম যে নেক আমল করেছেন, তার জের এখনো চলছে এবং আরো চলবে। তাই তাঁদের আমলনামায় নেক আমলের হিসাব বেড়েই চলছে।

ঐ আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, আখিরাতেই মানুষ জানতে পারবে, সে দুনিয়ায় থাকাকালে কী কী কাজ করেছে এবং তার মৃত্যুর পর তার কাজের জের হিসেবে আরো কী কী কাজ করেছে বলে হিসাবে ধরা হয়েছে। তাই প্রত্যেক কাজ করার সময় এ বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকাই যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি।

সূরা ইনফিতার

১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ①

১. যখন আসমান ফেটে যাবে,

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②

২. যখন তারাগুলো ছড়িয়ে পড়বে,

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③

৩. যখন সমুদ্র ফাটিয়ে দেওয়া হবে এবং

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ④

৪. যখন কবরগুলো খুলে দেওয়া হবে,[১]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ⑤

৫. তখন প্রত্যেক মানুষ আগে ও পরে যাকিছু করেছে তা জানতে পারবে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑥

৬. হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমার ঐ মহান মর্যাদাশালী রবের ব্যাপারে তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে?

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ⑦

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে ভালোভাবে গঠন করেছেন ও তোমাকে সুষম করেছেন।

فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ⑧

৮. তিনি যে আকারে চেয়েছেন সেভাবেই তোমাকে গঠন করেছেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ⑨

৯. কক্ষনো নয়![২] বরং (আসল কথা হলো) তোমরা শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা বলছ।[৩]

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ⑩ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ⑪

১০-১১. অথচ তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত আছে এমন সব সম্মানিত লেখক,

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ⑫

১২. যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে জানে।

---

১. কবর খুলে দেওয়ার মানে হলো মানুষকে আবার জীবিত করে ওঠানো।

২. অর্থাৎ, এমন ধোঁকায় পড়ার কোনো যুক্তি নেই।

৩. অর্থাৎ, যে কারণে তোমরা ধোঁকায় পড়েছ তা কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ নয়; বরং দুনিয়ার পর এর বদলা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তোমরা এক নিছক আহাম্মকী ধারণায় রয়েছ। এ ভুল ও ভিত্তিহীন অনুমানই তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে, তাঁর বিচার থেকে নির্ভয় করে দিয়েছে এবং নৈতিক আচরণে দায়িত্ববোধহীন করে ছেড়েছে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয়ই সৎলোকেরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকবে।

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

১৪. আর অবশ্যই বদলোকেরা দোযখে যাবে।

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾

১৫. প্রতিদান (বদলা) দেওয়ার* দিন তারা তাতে ঢুকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾

১৬. সেখান থেকে তারা মোটেই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾

১৭. আর প্রতিদান দেওয়ার দিনটি সম্পর্কে তুমি কী জান?

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾

১৮. আবার বলছি, প্রতিদান দেওয়ার দিনটি সম্পর্কে তুমি কী জান?

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

১৯. এটা সেই দিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন ফায়সালার** ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে।

* আরবী 'দীন' শব্দের ঐ অর্থই এখানে হবে, যে অর্থে সূরা ফাতিহায় 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলা হয়েছে। 'ইয়াওম' শব্দের বাংলা হলো দিন বা দিবস। ইয়ামুদ্দীন অর্থ বিচারদিবস। ঐ দিন ভালো-মন্দ সব কাজেরই বদলা দেওয়া হবে। তাই ঐ দিনটিকে বদলা দেওয়ার দিনও বলা হয়।

** 'আমর' মানে বিষয় এবং হুকুম। অর্থাৎ ঐ দিন সব বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে থাকবে এবং একমাত্র আল্লাহর হুকুমই সেখানে চলবে।

৮৩. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'মুতাফ্‌ফিফীন' শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরার শেষাংশের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের ঐ সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, যখন হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে ও সভা-সমাবেশে ঈমানদারদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলছিল এবং তাঁদেরকে দেখলেই নানা রকম মন্তব্য করে মুসলিমদেরকে সমাজে হাসির পাত্রে পরিণত করার চেষ্টা চলছিল।

আলোচ্য বিষয়

এর আলোচ্য বিষয়ও আখিরাত।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে ঐ সময়কার ব্যবসায়ী সমাজে প্রচলিত বেঈমানির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। যারা দেওয়ার সময় মাপে কম দেয় আর নেওয়ার সময় বেশি নেওয়ার চেষ্টা করে, তাদেরকে এখানে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। কারণ, সমাজবিরোধী কাজের দীর্ঘ তালিকায় মাপে কম-বেশি করাটা একটা বড় রকমের জঘন্য কাজ।

৪-৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মাপে কম-বেশি করা এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজের আসল কারণ হলো আখিরাতে অবিশ্বাস। মরার পর কোথাও হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস থাকলে এ জাতীয় কাজ করা অসম্ভব। অবশ্য ব্যবসায়ের উন্নতির খাতিরে পলিসি বা নীতি হিসেবে অনেকে সততার পরিচয় দেয়; কিন্তু যদি দুর্নীতি করে সারা যাবে বলে মনে করে, তাহলে আর সততার ধার ধারে না। সত্যিকার ও স্থায়ী সততা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মনে আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় থাকে।

৭-১৭ নং আয়াতে অসৎ ও দুর্নীতিবাজদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ৪ থেকে ৬ নং আয়াতে আখিরাতের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মানুষের চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জোর দিয়ে বলার পর এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে, চরিত্রহীন লোকদের আমলনামা সৎ লোকদের আমলনামার সাথে রাখা হবে না। অসৎ লোকদের রেজিস্টারেই (Black-List) তাদের নাম থাকবে এবং তাদের রেকর্ডপত্রের দফতর আলাদা হবে।

সততা ও অসততা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, যারা ঐ বিধি-নিষেধের ধার ধারে না, সেই পাপীদের সম্পর্কে ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, একমাত্র আখিরাতে বিশ্বাস না থাকার কারণেই এদের চরিত্র এমন হয়েছে। ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআনের আয়াতকে যে ওরা পুরনো কাহিনী বলে উড়িয়ে দিচ্ছে এর আসল কারণও ঐ পাপী মন।

আল্লাহর এক-একটি নাফরমানী তাদের মনে যে কালিমা সৃষ্টি করে, তার ফলে তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে। আখিরাতে এর কী পরিণাম হবে, তা ১৫ থেকে ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

১৮-২৮ নং আয়াতে সৎ ও নেক লোকদের সাথে আখিরাতে কেমন ব্যবহার করা হবে, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ১৮ থেকে ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের আমলনামা সম্মানিতদের রেজিস্টারভুক্ত থাকবে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতারা এর পাহারাদার থাকবে। এরপর ২২ থেকে ২৮ নং আয়াতে তাদের উপর আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের কয়েকটি উল্লেখ করে মানুষকে ২৬ নং আয়াতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উচিত এসব নিয়ামতের জন্য প্রতিযোগিতা করা। মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হাসিল করার জন্য একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়। অথচ পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের নিয়ামত লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা করাই তাদের উচিত।

২৯-৩৩ নং আয়াতে দেখানো হয়েছে, অনৈসলামী-সমাজে আল্লাহর দুশমনরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করে থাকে। এরা সুযোগ পেলেই বিদ্রূপ করে এবং ঈমানদারদেরকে খুব অতিষ্ঠ করে ফিরে যাওয়ার সময় খুব মজা ও তৃপ্তিবোধ করে। আর যখনই কোনো মুসলিমের দেখা পায় তখনই মন্তব্য করে যে, এরা একেবারেই ভুল পথে আছে। ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঠাট্টা করে বলেছেন, আমি তো এদেরকে ঈমানদারদের উপর ইন্সপেক্টর বানিয়ে পাঠাইনি। ইসলামী আন্দোলনের পথ ভুল কি না, সে বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার কোনো দায়িত্ব এদেরকে আমি দিইনি।

৩৪-৩৬ নং আয়াতে কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে বিরক্ত, আহত ও মযলুম মুসলিমদেরকে শক্তি, সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, বিদ্রূপের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় আসবে আখিরাতে। তখন ঈমানদারেরা কাফিরদের অবস্থা দেখে হাসবেন। তারা বেহেশতের নিয়ামতের মধ্যে থেকে দোযখে কাফিরদের অবস্থা দেখে মনে মনে বলবেন, 'দুনিয়ায় কাফিররা আমাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে আজ তারা এর কী বদলাই না পেল।' এভাবে ঈমানদাররা দুনিয়ায় কাফিরদের কারণে মনে যে ব্যথা পেয়েছিল তা দূর হবে।

বিশেষ শিক্ষা

দুনিয়ার জীবনকে যারা চিরস্থায়ী মনে করে এবং আখিরাতের অনন্ত-অসীম জীবনের কথা যারা বিশ্বাস করে না, তারা নিজেদের মনগড়া মত ও পথে দুনিয়ার সুখ-সুবিধা নিয়েই মত্ত। তারা আল্লাহর বিধানের ধার ধারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআন ও হাদীসের আইন-কানুন তাদের ভোগের পথে বাধা দেয় বলে তারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ করে রাখা নিরাপদ মনে করে। তাদের হাতেই দেশের ক্ষমতা। তাদের মর্জিমতোই শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজের গোটা কাঠামো নিয়ন্ত্রিত।

এ অবস্থায় যখন সমাজে আল্লাহর আইন জারি করার জন্য কোনো আন্দোলন শুরু হয়, তখন তাদের গায়ে জ্বালা ধরে। তারা প্রথমে ঠাট্টা করেই এ আন্দোলনকে উড়িয়ে দিতে চায়। মক্কায় রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে কুরাইশনেতারা এ ব্যবহারই করেছিল।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের এ বিদ্রূপের প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা আখিরাতে যে অবশ্যই হবে, সে কথাই সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে। আর যদি ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হয়, তাহলে বিদ্রূপকারীরা দুনিয়াতেও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে বাধ্য হয়, মক্কা বিজয়ের পর যেমন দশা কুরাইশনেতাদের হয়েছিল।

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

৩৬ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٦ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾

১. যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য ধ্বংস।*

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾

২. তারা যখন মানুষের কাছ থেকে নেয়, তখন পুরোপুরি নেয়।

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾

৩. আর যখন তাদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কমিয়ে দেয়।

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾

৪-৫. তারা কি মনে করে না যে, এক মহাদিনে তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে?[১]

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

৬. যে দিন সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে?

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾

৭. কক্ষনো নয়![২] নিশ্চয়ই বদলোকদের আমলনামা জেলখানার দফতরে আছে।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾

৮. জেলখানার দফতর সম্পর্কে তুমি কী জান?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾

৯. (এটা) একটা লিখিত কিতাব।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. যারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস।

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾

১১. যারা প্রতিদান দেওয়ার দিনটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾

১২. আর সীমা লঙ্ঘনকারী পাপী ছাড়া অন্য কেউ সে দিনটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় না।

* আরবী 'ওয়াইলুন' অর্থ– হায়-আফসোস! দুঃখ, অনিষ্ট, ধ্বংস ইত্যাদি।

১. কিয়ামতের দিনকে এক বড় দিন বলার কারণ হলো, ঐদিন সব মানুষ ও জিনের হিসাব আল্লাহর আদালতে এক সাথে নেওয়া হবে এবং পুরস্কার ও শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ, তাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল যে, দুনিয়াতে এতসব অন্যায় করার পর এরা এমনিতেই ছাড়া পেয়ে যাবে।

১৩. যখন তার কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এটা তো পুরনো কালের কাহিনী।[৩]	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑬
১৪. কক্ষনো নয়! বরং আসলে ওদের অন্তরে ওদেরই বদ কাজের (দরুন) মরিচা ধরে গেছে।[৪]	كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑭
১৫. কক্ষনো নয়! অবশ্যই ওদেরকে ঐদিন ওদের রবের দীদার থেকে মাহরূম রাখা হবে।**	كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ⑮
১৬. এরপর ওরা অবশ্যই দোযখে গিয়ে পড়বে।	ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ⑯
১৭. তখন তাদেরকে বলা হবে, এটা ঐ জিনিস, যাকে তোমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে।	ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ⑰
১৮. কক্ষনো নয়![৫] নিশ্চয়ই নেক লোকদের আমলনামা উঁচু দরের লোকদের দফতরে আছে।	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ⑱
১৯. আর ঐ উঁচু দরের লোকদের দফতর সম্পর্কে তুমি কী জান?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ⑲
২০. (এটা) একটা লিখিত কিতাব।	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ⑳
২১. (আল্লাহর) নিকটবর্তী ফেরেশতারা এর দেখাশোনা করে।	يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ㉑
২২. নিশ্চয়ই নেক লোকেরা বড়ই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকবে;	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ㉒
২৩. উঁচু আসনে বসে দৃশ্যাবলি দেখতে থাকবে।	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ㉓
২৪. তুমি তাদের চেহারায় নিয়ামত উপভোগজনিত সজীবতার পরিচয় পাবে।	تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ㉔
২৫. সীলমোহর করা খাঁটি শরাব তাদেরকে পান করানো হবে।	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ㉕

৩. অর্থাৎ ঐসব আয়াত, যাতে কিয়ামতের দিনের খবর দেওয়া হয়েছে।

৪. পুরস্কার ও শাস্তিকে মনগড়া কাহিনী মনে করার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু এজন্য এরা এরূপ মনে করে যে, এদের গুনাহ ও অন্যায়ের ফলে এদের মনে মরিচা ধরে গেছে। তাই যে কথা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ, সে কথাও এদের নিকট বাজে গল্প মনে হয়।

** ঐদিন নেক লোকেরা আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিন্তু বদ লোকেরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৫. অর্থাৎ, পুরস্কার ও শাস্তি হবে না বলে এরা যে ধারণা করছে, তা সম্পূর্ণ ভুল।

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এর উপর কস্তুরীর[***] মোহর লাগানো থাকবে। যারা পাল্লা দিয়ে জিততে চায়, তারা যেন এ জিনিস লাভ করার জন্য বাজি রেখে জিততে চেষ্টা করে।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾

২৭. ঐ শরাবে তাসনীমের[৬] আমেজ থাকবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এটা একটা ঝরনা, যার পানি দিয়ে (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকেরা শরাব পান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. অপরাধীরা দুনিয়ায় ঈমানদারদেরকে ঠাট্টা করত।

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. যখন তাদের পাশ দিয়ে যেত, তখন চোখ মেলে তাদের দিকে ইশারা করত।

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আর যখন ওরা নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরে আসত, তখন হাসি-তামাশা করতে করতে ফিরত।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ لَضَاۗلُّوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. আর যখন ওরা তাদের দিকে দেখত, তখন বলত, 'এরা ভুল পথে আছে'।

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. অথচ ওদেরকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠানো হয়নি।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাই আজ ঈমানদাররা কাফিরদেরকে দেখে হাসছে।

عَلَى الْاَرَاۗىِٕكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. উঁচু আসনে বসে (তাদের অবস্থা) দেখছে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. কাফিররা যা করত, তার বদলা তারা পেয়ে গেল তো?[৭]

*** 'মিসক' মানে মৃগনাভি। এক রকম হরিণের নাভিতে খুব সুগন্ধি জিনিস সৃষ্টি হয়। এরই আরেক নাম কস্তুরী।

৬. 'তাসনীম' মানে উচ্চতা। কোনো ঝরনাকে তাসনীম বলার অর্থ হলো, এ ঝরনা উঁচু জায়গা থেকে বয়ে নিচে আসছে। বেহেশতের এক ঝরনার নাম 'তাসনীম'।

৭. এ কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ আছে। কাফিররা মুমিনদেরকে জ্বালাতন করাকে একটা সুখকর কাজ মনে করত। তাই বলা হচ্ছে, মুমিনরা বেহেশতে আরামে বসে বসে দোযখে কাফিরদের অবস্থা দেখতে থাকবে এবং মনে মনে বলতে থাকবে, তাদের কাজের কী পুরস্কারই না তারা পেল।

৮৪. সূরা ইনশিকাক

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'ইনশাক্কাত' ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল বিশেষ্য পদ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে 'ইনশিক্বাক'।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

এ সূরাটিও মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের সূরা। সূরার আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তখনো ইসলামী আন্দোলনের উপর যুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি। তবে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সাথে সাথে তখন কুরআনকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল এবং আখিরাতে আল্লাহর আদালতে হিসাব দেওয়ার কথা লোকেরা স্বীকার করতে রাজি হচ্ছিল না।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ও কিয়ামত ও আখিরাত।

আলোচনার ধারা

১-৫ নং আয়াতে কিয়ামতের সূচনায় আসমান ফেটে যাওয়ার কথা এবং আখিরাতের সূচনায় মাটির ভেতরের সবকিছু বের হয়ে আসার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আসমান ও জমিনের ঐ অবস্থা আপনা-আপনিই হবে না। আজ যাঁর হুকুমে এরা মানুষের খিদমতে লেগে আছে, সেই মনিবের হুকুমেই তাদের অবস্থা ঐ রকম হবে। হে মানুষ! তোমরা তো অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল সৃষ্টি। তোমরা কোন্ সাহসে আল্লাহর হুকুম অমান্য কর? সারা সৃষ্টি যার হুকুমে চলে, তার হুকুম মানা তোমাদেরও উচিত। না মানলে মনিবের কিছুই আসবে-যাবে না, তোমাদেরই ক্ষতি হবে।

৬-১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ আল্লাহ ও আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার মজা লোটার জন্য রাত-দিন যতই পরিশ্রম করুক আসলে মানুষ বাধ্য হয়ে ঐ গন্তব্যস্থলের দিকেই প্রতিদিন এগিয়ে চলছে, যেখানে একদিন তাকে মনিবের সামনে হাজির হতেই হবে। সেখানে হাজির হওয়ার পর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং তাদের হিসাব হালকাভাবে নিয়ে তাদেরকে বেহেশতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আরেকদল বাঁ হাতে এবং পেছনের দিক দিয়ে তাদের আমলনামা পাবে। তারা মৃত্যু কামনা করবে; কিন্তু তাদেরকে মৃত্যু না দিয়ে দোযখে নিয়ে ফেলা হবে।

১৩-১৫ নং আয়াতে তাদের এ দুর্দশার কারণ বলা হয়েছে, দুনিয়ায় এরা 'খাও-দাও আর মজা কর' এ ভুল নীতিতে জীবন কাটিয়েছে। তারা মনে করেছে, কোনো দিন তাদেরকে এ লাগামহীন জীবনের হিসাব দিতে হবে না। অথচ তাদের মনিব তাদের সব অবস্থা ও কাজ-কর্মই দেখছিলেন। তাই হিসাব দেওয়ার বিপদ থেকে তাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই।

১৬-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবন থেকে আখিরাতের শেষ মনযিল পর্যন্ত মানুষকে ধাপে ধাপে অবশ্যই পৌঁছতে হবে। এটা তেমনি স্বাভাবিক সত্য, যেমন– রাতের পর দিন হয়, মানুষ ও পশু-পাখি সন্ধ্যায় আপন আপন বাসস্থানে ফিরে আসে এবং চাঁদ এক অবস্থা থেকে ক্রমে পূর্ণতায় পৌঁছে।

২০-২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের কী হলো? এত কিছু বোঝানোর পরও তোমরা কেন ঈমান আনতে রাজি হচ্ছ না? এমন আকর্ষণীয় কুরআনের বাণী শোনার পরও আল্লাহর উদ্দেশ্যে কী কারণে মাথা নত করছ না? তোমরা কুরআনের প্রতি শুধু অবিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হচ্ছ না বরং কুরআন ও রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করছ। এ আচরণ দ্বারা তোমরা নিজেদের জন্য কোন্ মঙ্গল যোগাড় করছ, তা আল্লাহর জানা আছে।

হে রাসূল! এদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ দিন। অবশ্য যারা এদের মতো সত্যের দুশমন নয় বরং ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কখনো শেষ হওয়ার নয়।

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٥ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

১. যখন আসমান ফেটে যাবে

২. এবং তার রবের হুকুম পালন করবে। আর এরূপ করাই তার উচিত।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

৩. যখন জমিনকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে,[১]

৪. এবং যাকিছু এর ভেতরে আছে, তা বাইরে ফেলে দিয়ে সে খালি হয়ে যাবে।[২]

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

৫. সে তার রবের হুকুম পালন করবে এবং এরূপ করাই তার উচিত।

يَٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾

৬. হে মানুষ! তুমি চেষ্টা করতে করতে তোমার রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ। এরপর তার সাথেই তুমি সাক্ষাৎ করবে।*

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾

৭-৮. অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে হালকা হিসাব[৩] নেওয়া হবে।

১. জমিনকে ছড়িয়ে দেওয়ার মানে হলো– সমুদ্র ও নদী-নালা বন্ধ করে দেওয়া হবে, পাহাড় ভেঙে চুরমার করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এবং জমিনের সমস্ত উঁচু-নিচু জায়গা সমান করে এক সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে।

২. অর্থাৎ, যত মরা মানুষ জমিনের ভেতর পড়ে ছিল, সবাইকে বের করে বাইরে ফেলে দেবে এবং সব মানুষের কার্যকলাপের যত চিহ্ন জমিনে পড়েছিল, সবই বের হয়ে আসবে, কোনো কিছুই আর মাটির ভেতর থাকবে না।

* দুনিয়ায় পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি করে যাকিছু পাওয়া যায়, তার মাঝেই তুমি ডুবে আছ। কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাতের কথা যতই ভুলে থাক, প্রতিদিন তোমার রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ, যার সামনে মরণের পর তোমাকে অবশ্যই হাজির হতে হবে।

৩. অর্থাৎ, তার কাছ থেকে কড়াকড়ি হিসাব নেওয়া হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, অমুক অমুক কাজ কেন করেছ? তার ভালো কাজের সাথে সাথে কিছু মন্দ কাজের হিসাব নিশ্চয়ই আমলনামায় থাকবে। কিন্তু ভালো কাজের পাল্লা ভারী হওয়ায় মন্দ কাজের দোষ ধরা হবে না এবং সে সবই মাফ করে দেওয়া হবে।

وَّيَنْقَلِبُ إِلٰٓى أَهْلِهٖ مَسْرُورًا ﴿٩﴾

৯. এবং সে তার আপনজনদের দিকে হাসি-খুশি অবস্থায়[৪] ফিরে যাবে।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى سَعِيرًا ﴿١٢﴾

১০-১১-১২. আর যার আমলনামা তার পেছন থেকে দেওয়া হবে,[৫] সে মরণকে ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে।

إِنَّهٗ كَانَ فِيٓ أَهْلِهٖ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾

১৩. সে আপনজনদের মধ্যে আনন্দে মগ্ন ছিল।

إِنَّهٗ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَّحُورَ ﴿١٤﴾

১৪. সে মনে করেছিল, তাকে কখনো ফিরে যেতে হবে না।

بَلٰىٓ ۚ إِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

১৫. না ফিরে কীভাবে পারত? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

১৬-১৭-১৮. সুতরাং তা নয়, আমি কসম খাচ্ছি আসমানের লালিমার, রাতের এবং যাকিছু সে গুটিয়ে আনে তার, আর চাঁদের, যখন সে পূর্ণ হয়।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

১৯. অবশ্যই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে চলে যেতে হবে।[৬]

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২০. তাহলে এদের কী হয়েছে যে, এরা ঈমান আনে না?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

২১. আর যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তারা সিজদা করে না। (সিজদার আয়াত)

৪. আপনজন মানে ঐসব পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, যাদেরকে হয়তো এভাবেই মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

৫. সূরা 'হাক্কা'র ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাদের আমলনামা তাদের বাঁ হাতে দেওয়া হবে।' আর এ সূরায় বলা হয়েছে, 'যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে।' বোধহয় ব্যাপারটা এমন হবে যে, এত লোকের সামনে তাদের খারাপ আমলনামা হাতে নিতে লজ্জাবোধ হবে। তাই হাত পেছনে লুকিয়ে রাখবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে তুলেই দেওয়া হবে।

৬. অর্থাৎ, তোমাদেরকে একই অবস্থায় থাকতে দেওয়া হবে না। যুবক বয়স থেকে বুড়ো বয়স, এরপর মরণ, মরণের পর বারযাখ, আবার জীবিত হওয়া, হাশরের ময়দানে যাওয়া, হিসাব দেওয়া, পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়া ইত্যাদি অগণিত মনযিল পার হতে হবে।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾	**২২.** বরং এই অস্বীকারকারীরা তো উল্টো (এটাকেই) মিথ্যা মনে করছে।
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾	**২৩.** অথচ আল্লাহ ভালো করেই জানেন, যাকিছু এরা (নিজেদের আমলনামায়) জমা করছে।[৭]
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾	**২৪.** অতএব এদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর(!) শুনিয়ে দিন।
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾	**২৫.** অবশ্য যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

এ কথা বলার আগে তিনটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে– (১) সূর্য ডোবার পর আসমানের লালিমার। (২) দিনের পর রাতের অন্ধকার এবং দিনে মানুষ ও পশুর জমিনে ছড়িয়ে পড়া, আবার রাতে তাদের সবাইকে গুটিয়ে নিয়ে আসা। (৩) চাঁদের প্রথম অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণিমায় পরিণত হওয়া। এ কয়টি জিনিস যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষ যে দুনিয়ায় বাস করে তার মধ্যে কোথাও স্থবিরতা ও গতিহীনতা নেই। একের পর এক পরিবর্তন হচ্ছে ও অবস্থা বদলে যাচ্ছে। তাই কাফিরদের এই ধারণা ঠিক নয় যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই সব শেষ হয়ে যাবে এবং আর কোনো অবস্থাই আসবে না।

৭. আর একটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে, কাফিররা অবাধ্যতা, হিংসা, সত্যের দুশমনি, মন্দ ইচ্ছা ও বদ নিয়তের যে আবর্জনা তাদের মনে জমা করে রেখেছে, তা আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন।

৮৫. সূরা বুরূজ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'বুরূজ' শব্দ দিয়ে এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরাটির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মাক্কী যুগের শেষ ভাগে যখন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর চরম অত্যাচার চলছিল তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদকে অস্বীকার করা এবং ঈমানদারদের উপর কাফিরদের যুলুম ও নির্যাতনের করুণ পরিণাম এবং মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দান।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশেষ উদ্দেশ্যে দুটো বিষয়ের কসম খেয়েছেন। বুরূজ বা গ্রহ-উপগ্রহের কসম খেয়ে বলতে চাচ্ছেন, এসব শক্তিমান সৃষ্টি যার হুকুমে চলে, তিনি যালিমদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কিয়ামত, এর ভয়াবহ দৃশ্য ও কিয়ামতে উপস্থিত সব সৃষ্টির কসম খেয়ে বলছেন, দুনিয়ায় যারা যুলুম করছে তাদেরকে কিয়ামতে পাকড়াও করা হবে এবং সেদিন ঈমানদাররা কাফিরদের দোযখে কঠিন আযাব ভোগ করতে দেখবে, যেমন আজ কাফিররা মুমিনদেরকে আগুনে পোড়ানোর তামাশা দেখছে।

৪-৭ নং আয়াতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অতীতে বিভিন্ন সময় আগুনে জ্বালিয়ে নির্যাতন করার কথা উল্লেখ করে মক্কাবাসী কাফির ও রাসূল (স)-এর সাহাবীদেরকে দুটো কথা বোঝানো হয়েছে।

প্রথম কথা, অতীতে আগুনের গর্তে মুমিনদেরকে পুড়িয়ে যারা আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়েছে, আজ মক্কার সর্দাররাও মুসলিমদের উপর যুলুম করে সেই গযবেরই হকদার হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা, আগুনের গর্তে পোড়ানো সত্ত্বেও অতীতে যেমন মুমিনরা ঈমান ছেড়ে দেয়নি, আজকের মুসলিমদেরকেও কঠোর অত্যাচার সহ্য করে ঈমানের উপর মযবুত থাকা উচিত।

৮ ও ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাই এসব যুলুমের একমাত্র কারণ। কিন্তু কাফিরদের জানা উচিত যে, আল্লাহ মহাশক্তিশালী, নিজের গুণেই প্রশংসিত, আসমান ও জমিনের উপর ক্ষমতাবান এবং সবকিছুই দেখছেন। একদিন এ যুলুমের শাস্তি তাদেরকে পেতে হবে। এর দ্বারা মুমিনদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, দীনকে কায়েম করার জন্য বাতিল শক্তির হাতে তোমাদেরকে যে অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে তা আল্লাহ দেখছেন। তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, দীন ইসলামকে বিজয়ী করার এ কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তোমাদের আছে কি না।

১০-১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর যারা যুলুম করেছে তারা যদি এখনো তাওবা করে ঈমানের পথে না আসে, তাহলে দোযখই তাদের বাসস্থান হবে। আর যারা ঈমান এনে নেক আমল করবে তারা বেহেশতে যাবে এবং এটাই সত্যিকার সফলতা। সবারই জানা উচিত যে, আল্লাহ খুব শক্ত হাতেই পাকড়াও করেন। কিন্তু আল্লাহর পথে ফিরে এলে তিনি সব দোষ মাফ করে তাঁর বান্দাহকে স্নেহ করেন। তিনি আরশের মালিক এবং যা তিনি করতে চান তা থেকে কেউ তাঁকে ফেরাতে পারে না।

১৭-২০ নং আয়াতে ইসলামের দুশমনদেরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা কি ফিরাউন ও ছামূদের সেনাবাহিনীর কথা শোননি? তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের বিরোধিতা করার ফলেই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, আল্লাহ সবাইকে ঘেরাও করেই আছেন। মানুষকে দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে চলার জন্য সামান্য কিছু সুযোগ দিয়েছেন মাত্র। পাকড়াও করার সময় এলেই মযবুত হাতে গ্রেফতার করবেন।

২১ ও ২২ নং আয়াতে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, তোমরা কুরআনের ডাকে সাড়া না দিলে আল্লাহর কিছুই আসে-যায় না। এ কুরআন চিরস্থায়ীভাবে 'লাওহে মাহফূযে' খোদাই করা আছে। তোমরা অমান্য করলেও কুরআন বদলে যাবে না। তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করো, কুরআনকে পরাজিত করার কুচিন্তা বাদ দাও।

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরায় একদিকে ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়েছে, অপরদিকে বিরোধী যালিম শক্তিকে এক সময় পাকড়াও করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর দুনিয়াটা কোনো হবুচন্দ্রের খামখেয়ালি রাজ্য নয়। এখানে যার যেমন খুশি যুলুম করতেই থাকবে এবং কোনো সময় যালিমকে ধরার কেউ নেই মনে করা মোটেই ঠিক নয়।

মানুষকে দুনিয়ার জীবনে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আপন খেয়াল-খুশিমতো চলার স্বাধীনতা অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। যেকোনো অন্যায় করার সাথে সাথেই যদি পাকড়াও করা হতো, তাহলে মানুষ অন্যায় করার সাহস করত না। এমন অবস্থা হলে মানুষকে দুনিয়ায় পরীক্ষা করার উদ্দশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার স্বাধীনতা দিয়ে যে পরীক্ষা করছেন, সে কারণেই একটা সীমা পর্যন্ত মানুষকে আপন মর্জিমতো চলার সুযোগ দিয়েছেন।

এ সুযোগটাকে যারা অন্যায় করার লাইসেন্স মনে করছে, তারাই পরীক্ষায় ফেল করছে। আখিরাতে যখন এ পরীক্ষার ফল বের হবে তখনই তারা টের পাবে যে, তারা কী বোকামিই না করেছে। তাই রাসূল (স) বলেছেন, 'ঐ লোকই বুদ্ধিমান, যে নিজের হিসাব নিজেই নেয় এবং যাকিছু করে তার ফল মৃত্যুর পর কী পাবে, সে হিসাব করেই তা করে।'

যালিমরা কোনো সময়ই ইতিহাস থেকে কোনো উপদেশ নেয় না। ফিরাউন ও নমরূদদের আচরণ যুগে যুগে একই রকম দেখা যায়। তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কী ব্যবহার করেছেন, সে কথা মনে করে বর্তমানের ফিরাউন-নমরূদরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন করতে রাজি না হয় তাহলে তাদের সাথেও আল্লাহ একই ব্যবহার করবেন। ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে সবর করতে হবে এবং চরম যুলুম চলছে বলেই ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই।

সূরা বুরূজ

২২ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٢ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢

১. কসম মযবুত দুর্গবিশিষ্ট আসমানের;[১]

২. কসম ঐদিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে;

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣

৩. কসম যারা দেখছে তাদের, আর যা দেখা যাচ্ছে তার।[২]

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

৪-৫-৬-৭. গর্তের মালিকরা ধ্বংস হয়েছে, (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানির আগুন ছিল। যখন ওরা ঐ গর্তের কিনারায় বসা ছিল, আর ওরা ঈমানদারদের সাথে যাকিছু করছিল তা দেখছিল।[৩]

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

৮. ঐ ঈমানদারদের সাথে ওদের দুশমনির এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ ছিল না যে, তারা এমন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহাশক্তিমান ও যিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩

৯. যিনি আসমান ও জমিনের রাজত্বের মালিক এবং ঐ আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠

১০. যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের উপর যুলুম করেছে, এরপর এর জন্য তাওবা করেনি, তাদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে, আর রয়েছে আগুনে জ্বলার শাস্তি।

১. অর্থাৎ, আসমানের বিরাট বিরাট তারা ও গ্রহ-উপগ্রহ। বুরূজ মানে দুর্গও হয়। তাহলে অর্থ হবে দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত তারা।

২. যারা দেখছে তারা হলো ঐসব লোক, যারা কিয়ামতের দিন হাজির থাকবে। আর যা দেখা যাচ্ছে, তার মানে হলো কিয়ামতের ঐ ভয়ানক অবস্থা, যা সবাই দেখতে পাবে।

৩. গর্তওয়ালা বা গর্তের মালিক মানে ঐসব লোক, যারা বড় বড় গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে সেখানে ফেলেছে এবং তারা নিজ চোখে ঈমানদারদের জ্বলার তামাশা দেখেছে। ধ্বংস হয়েছে মানে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়ছে এবং তারা আযাবের ভাগী হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

১১. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান, যার নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে— এটা বিরাট সফলতা।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও বড় শক্ত।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং আবারও সৃষ্টি করবেন।

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

১৪-১৫. আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল, আরশের মালিক ও মহান।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৬. তিনি যা চান, তা-ই করেন।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

১৭-১৮. তোমার কাছে কি ফিরাউন ও ছামূদ জাতির সৈন্যদের খবর পৌঁছেছে?

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

১৯. কিন্তু যারা কুফরী করেছে, ওরা তো মিথ্যা বলেই চলছে।

وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾

২০. অথচ আল্লাহ তাদের ঘেরাও করেই আছেন।

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

২১-২২. (তাদের মিথ্যাচারে এই কুরআনের কোনো ক্ষতি নেই); বরং এই কুরআন মহত্ত্বের অধিকারী, যা সুরক্ষিত ফলকে (খোদাই করা) আছে।[৪]

৪. অর্থাৎ, কুরআনের লেখা অটল ও পরিবর্তনীয় এবং যা লাওহে মাহফূযে খোদাই করা আছে। এ কুরআনে কোনো রদবদল করার কারো ক্ষমতা নেই।

৮৬. সূরা তারিক

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'তারিক' শব্দ দিয়েই এ নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

মাক্কী যুগের প্রথম স্তরের ঐ সময় এ সূরাটি নাযিল হয়, যখন মক্কার কাফিররা কুরআন ও রাসূল (স)-এর ইসলামী আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য সব রকম চালবাজি করেছিল।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত– তিনটিই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। মৃত্যুর পর আল্লাহর সামনে মানুষের হাজির হওয়া সম্পর্কে এবং কুরআন যে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম তিন আয়াতে আসমান ও আলোময় তারার কসম খেয়ে আল্লাহ বলেছেন, এসব বিরাট সৃষ্টির অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, কোনো এক মহাশক্তি এসবকে হেফাযত ও পরিচালনা করছেন।

৪-১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, শুধু আসমান-জমিনের মতো বড় সৃষ্টিই নয়, প্রতিটি জীবকে তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন। মানুষ নিজের জন্মের দিকে একটু খেয়াল করে দেখুক যে, কে তাকে এক ফোঁটা পানি থেকে এমন সুন্দর ও এত যোগ্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের বোঝা উচিত যে, মরার পর আবার তাদেরকে জীবিত করাটা তাঁর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।

যেদিন আবার মানুষকে জীবিত করা হবে সেদিনের অবস্থা কী হবে, তা উল্লেখ করে ৮ ও ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের গোপন কথা, কাজ ও নিয়ত সেদিন প্রকাশ করে দেওয়া হবে। সেদিন অন্য কারো কোনো শক্তি থাকবে না এবং কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

১১-১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আসমানের বৃষ্টি ও জমিনের ফসল যেমন অকাট্য সত্য, কুরআনের বাণীও তেমনি অটল এবং সঠিক। এটাকে হাসি-ঠাট্টার বিষয় মনে করো না। কাফিররা যত রকম চালবাজিই করুক, আল্লাহ সবই বানচাল করার ক্ষমতা রাখেন। কাফিররা রাসূলের আন্দোলনকে ঠেকানোর জন্য যত চেষ্টাই করুক, কুরআনের চূড়ান্ত বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ, মানবজীবনের সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্যই কুরআন এসেছে। কুরআনের মীমাংসাই শেষ মীমাংসা।

শেষ আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, এদের চালবাজিতে আপনার ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আপনার দুশমনদেরকে আর কিছুদিন এ শয়তানিতে লিপ্ত থাকতে দিন। শীঘ্রই এদের সব চাল ব্যর্থ করে আপনাকে বিজয়ী করা হবে।

সূরা তারিক

১৭ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাক্কী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. কসম আসমানের ও রাতে আত্মপ্রকাশকারীর।

২. আর রাতে আত্মপ্রকাশকারী সম্বন্ধে তুমি কী জান?

৩. এটা হলো আলোঝলমল তারকা।

৪. এমন কোনো প্রাণ নেই, যার উপর কোনো হেফাযতকারী নেই।[১]

৫. অতএব মানুষ এটুকুই দেখুক না যে, তাকে কী জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

৬. লাফিয়ে পড়া পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭. (যে পানি) পিঠ ও বুকের হাড্ডিগুলোর মাঝখান থেকে বের হয়ে আসে।[২]

৮. নিশ্চয়ই তিনি একে আবার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٧ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

১. হেফাযতকারী মানে স্বয়ং আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনের ছোট-বড় সৃষ্টির দেখা-শোনা ও হেফাযত করছেন। এর মানে হলো, রাতে আসমানে যে অগণিত গ্রহ-তারা চমকাতে দেখা যায়, এদের অস্তিত্ব এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এমন কেউ আছেন, যিনি এসব তৈরি করেছেন, আলোময় বানিয়েছেন এবং মহাশূন্যে এভাবে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আর এমনভাবে এসবের দেখা-শোনা ও হেফাযত করছেন যে, কোনোটি নিজ জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে না। অগণিত তারা ঘুরে বেড়ানোর সময় একটার সাথে আরেকটার টক্কর লাগছে না। এভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের তদারকী ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। ছোট-বড় সব সৃষ্টির বেলায়ই এ কথা সত্য। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী নন। আর যে মানুষের জন্য গোটা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, সে মানুষের ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে সচেতন। মানুষের এ কথা ভোলা উচিত নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে যেমন হেফাযত করছেন, তেমনি তাদের কার্যকলাপের হিসাবও নেবেন।

২. পুরুষ ও নারীদেহের যে জিনিস দিয়ে মানবদেহ গঠিত হয় তা শরীরের ঐ অংশ থেকে বের হয়, যা বুক ও পিঠের মাঝখানে আছে। তাই বলা হয়েছে, মানুষ ঐ পানি দিয়ে তৈরি, যে পানি পিঠ ও বুকের মাঝখান থেকে বের হয়।

৯-১০. যেদিন সব গোপন রহস্য যাচাই করা হবে।[৩] তখন মানুষের নিজেরও কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝١٠
১১-১২. কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আসমানের; কসম (গাছ জন্মানোর সময়) ফেটে যাওয়া জমিনের।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢
১৩-১৪. এই (কুরআন) যাচাই করা চূড়ান্ত পরীক্ষিত বাণী; এটা হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়।[৪]	إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤
১৫. এরা (মক্কার কাফিররা) কিছু চাল চালছে।	إِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا ۝١٥
১৬. আমিও একটা চাল চালছি।	وَّأَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦
১৭. তাই (হে রাসূল!) এ কাফিরদেরকে সামান্য কিছু সময় তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

৩. গোপন রহস্য মানে মানুষের ঐ কাজও, যা দুনিয়ায় গোপন রহস্য হয়ে আছে এবং ঐ সব কাজ-কারবার, যার বাহ্যিক রূপ দুনিয়ার সামনে প্রকাশ পেলেও এর পেছনে যে নিয়ত, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা ছিল তা গোপনই রয়ে গেছে। সেদিন এসবই যাচাই করা হবে।

৪. অর্থাৎ, যেমন আসমান থেকে বৃষ্টি পড়া ও জমিন ফেটে গাছ-পালা গজানো কোনো হাসি-ঠাট্টা বা খেল-তামাশার বিষয় নয় বরং এসব অত্যন্ত বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনি আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে বলে যে খবর কুরআন দিচ্ছে, তাও হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়; বরং তা খাঁটি সত্য।

৮৭. সূরা আ'লা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের আ'লা শব্দ দ্বারাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, মাক্কী যুগের প্রথম ভাগেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। বিশেষ করে ৬ নং আয়াতে 'আমি আপনাকে পড়িয়ে দেব, তাহলে আপনি ভুলে যাবেন না' কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত রাসূল (স)-এর ওহী গ্রহণ করার অভ্যাস ভালোভাবে হয়নি। প্রথম অবস্থায় ওহী নাযিলের সময় যত আয়াত একসাথে নাযিল হতো, তা মুখস্থ রাখার জন্য রাসূল (স)-কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, আপনাকে মুখস্থ করার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদ, আখিরাত ও রাসূল (স)-কে হেদায়াত।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতেই তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যখনই তোমরা আল্লাহকে ডাক বা আল্লাহর নামে তাসবীহ পড় তখন আল্লাহর এমন সব গুণবাচক নাম ব্যবহার কর, যা তাওহীদের বিরোধী নয়। আল্লাহ সমস্ত গুণের অধিকারী। তাঁর মধ্যে কোনো রকম ত্রুটি নেই। তাঁর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে "আ'লা" অন্যতম। কুরআনে আরও বহু গুণবাচক নাম শেখানো হয়েছে। এসব নামেই তাসবীহ পড়তে হবে। এমন সব নামেই তাঁকে ডাকা উচিত, যা তাওহীদের সাথে মিল খায়।

২ ও ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাকে যে মহান রবের নামে তাসবীহ পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তারপর তাদের তাকদীর ঠিক করেছেন এবং যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, সে কাজের হিদায়াত দিয়েছেন বা সে কাজের উপযোগী বানিয়েছেন।

৪ ও ৫ নং আয়াতে আল্লাহর ক্ষমতা সবার সামনে স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য বলা হয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তিনিই তৃণলতা সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই এসবকে খড়-কুটায় পরিণত করেন। বসন্তকাল আনার সাধ্য যেমন কারো নেই, তেমনি হেমন্তকাল আসা বন্ধ করার ক্ষমতাও অন্য কারো নেই।

৬ ও ৭ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে কুরআন আপনার উপর নাযিল করছি, তা মুখস্থ করানোর দায়িত্ব আমারই। এর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। কুরআনকে ঠিমমতো মুখস্থ রাখা আমার ইচ্ছা ও দয়ার ফল; এতে আপনার কোনো বাহাদুরি নেই, আমি ইচ্ছা করলে ভুলিয়েও দিতে পারি।

৮-১৩ নং আয়াতে তাবলীগ করা ও মানুষকে দীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে, সবাইকে আল্লাহর পথে টেনে আনার অসম্ভব দায়িত্ব আপনার উপর চাপানো হয়নি। মানুষকে হিদায়াত করার কঠিন কাজ আপনাকে দেওয়া হয়নি। আমার বাণী সবাইকে শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়াই আপনার কাজ। এর সহজ নিয়ম হলো, আপনি মানুষকে বোঝাতে থাকুন। যারা উপদেশ কবুল করে উপকৃত হতে রাজি, তাদেরকে নসিহত করুন। যারা রাজি নয়, তাদের পেছনে লেগে থাকার কোনো দরকার নেই। যাদের অন্তরে পথহারা হওয়ার পরিণামের ভয় আছে তারা আপনার নসিহত কবুল করবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা আপনার কথা অমান্য করে দোযখের ভাগী হবে।

১৪ ও ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা ঈমান, চরিত্র ও আমলের দিক দিয়ে নিজেদেরকে পবিত্র রাখে এবং আল্লাহর যিকর করে ও নামায আদায় করে, একমাত্র তারাই সত্যিকার সফলতা ও কামিয়াবী লাভ করবে।

১৬ ও ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সাধারণত মানুষ ঐ চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করার দিকে মনোযোগ দেয় না। নাফসের তাড়না ও শয়তানের কু-পরামর্শে মানুষ শুধু দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী মজা ও লাভ এবং দেহের আরাম-আয়েশের চিন্তায়ই মশগুল থাকে। অথচ আখিরাতের চিন্তাই তাদের প্রধান ধান্দা হওয়া উচিত। কারণ, দুনিয়া অস্থায়ী ও আখিরাত চিরস্থায়ী এবং দুনিয়ার মজা থেকে আখিরাতের নিয়ামত অনেক বেশি ভালো।

১৮ ও ১৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, উপরের ক'টি আয়াতে যে মহাসত্য প্রকাশ করা হয়েছে তা শুধু এ কুরআনেই বলা হয়নি, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর কাছে পাঠানো কিতাবেও এ সত্যবাণী প্রচার করা হয়েছে। কুরাআনের এ শিক্ষা কোনো নতুন সত্য নয়। এ চিরন্তন সত্য সব রাসূলের মারফতেই মানবজাতিকে জানানো হয়েছে।

বিশেষ শিক্ষা

১৬ ও ১৭ নং আয়াতে মানুষের এক সহজাত দুর্বলতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। 'তোমরা দুনিয়ার জীবন প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ আখিরাতই বেশি ভালো ও স্থায়ী।'

'দুনিয়া'র শাব্দিক অর্থ হলো, যা অতি নিকটবর্তী। আর আখিরাত অর্থ, যা শেষে আসবে। এটাই মানুষের স্বভাব যে, নগদ যা পাওয়া যায় যত সামান্যই হোক, তা নিয়েই সে খুশি হয়। অথচ এর পরিণামে পরে যে বিরাট ক্ষতি হবে তা খুব কমই বিবেচনা করা হয়।

দুনিয়ার জীবনে সবারই এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। ছাত্রজীবনে অধিকাংশ লোককেই দেখা যায় যে, আমোদ-ফুর্তি, খেলাধুলা, নাচ-গান, আড্ডাবাজি ইত্যাদিতে অমূল্য সময় নষ্ট করে। এর পরিণামে পরীক্ষায় খারাপ ফল করে বাকি দীর্ঘ জীবন দুঃখ ভোগ করে। তখন শুধু আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকে না। জীবিত অবস্থায়ও মনমরা হয়ে জীবন কাটাতে হয়। যারা 'দুনিয়া' নিয়ে ব্যস্ত তারা দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনের শেষে মৃত্যুর পর এ ধরনের দশায়ই পতিত হবে।

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. (হে রাসূল!) আপনার মহান রবের নামের তাসবীহ পড়ুন।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুষম করেছেন।[১]

৩. যিনি তাকদীর ঠিক করেছেন,[২] তারপর পথ দেখিয়েছেন।[৩]

৪. যিনি গাছ-গাছড়া উৎপাদন করেছেন।

৫. এরপর এসবকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।

৬-৭. আমি আপনাকে পড়িয়ে দেব। এরপর আল্লাহ যা চান,[৪] তা ছাড়া কিছুই আপনি ভুলে যাবেন না।[৫] যা প্রকাশ্য, তা তিনি জানেন এবং যা গোপন, তা-ও (জানেন)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣

وَالَّذِىْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى ۝٦ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧

১. অর্থাৎ, জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যা-ই সৃষ্টি করেছেন, তা ঠিক ঠিকভাবে বানিয়েছেন। এর ভারসাম্য ও সমতা যথাযথভাবে কায়েম করেছেন। প্রত্যেক জিনিসকে এমন আকারে তৈরি করেছেন যে, ঐ জিনিসের জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতি কল্পনাও করা যায় না।

২. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করার আগে ঠিক করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় এর কী কাজ হবে, সে কাজের জন্য এ জিনিস কতটুকু পরিমাণ প্রয়োজন হবে, এর আকৃতি কেমন হবে, এর কী কী গুণ থাকবে, কোন্ জায়গায় এ জিনিস সৃষ্টি হবে, এ জিনিসকে হেফাযত করার উদ্দেশ্যে ও একে কাজে লাগানোর জন্য কী কী সুযোগ ও উপায় দরকার, কোন্ সময় এর সৃষ্টি হওয়া উচিত, কোন্ সময় পর্যন্ত এর দরকার থাকবে এবং কখন, কীভাবে একে খতম হতে হবে– এ সবের পূর্ণ পরিকল্পনার নামই হলো ঐ জিনিসের 'তাকদীর'।

৩. অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে সৃষ্টি করেই এমনি ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং যে জিনিস যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে জিনিস দ্বারা ঐ কাজ ঠিকভাবে করার নিয়মও শিখিয়ে দিয়েছেন।

৪. অর্থাৎ, কুরআনের প্রতিটি শব্দ মনে থাকা আপনার শক্তির বাহাদুরি নয়; বরং এটা আল্লাহর মেহেরবানী ও তাঁরই দেওয়া তাওফীকের ফল। তা না হলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভুলিয়ে দিতে পারেন।

৫. ওহী নাযিলের প্রথম অবস্থায় কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, জিবরাঈল (আ) ওহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই রাসূল (স) কুরআনের আয়াতগুলো ভুলে যাওয়ার ভয়ে যেটুকু শুনতেন, সেটুকুই নিজে পড়তে শুরু করতেন। তাই আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিলেন যে, ওহী

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

৮. আর আমি আপনাকে সহজ পথের সুবিধা দিচ্ছি।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾

৯. কাজেই আপনি উপদেশ দিন, যদি উপদেশ লাভজনক হয়।[৬]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾

১০. যে ভয় করে, সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে।

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾

১১-১২. আর চরম হতভাগাই একে পাশ কাটিয়ে চলবে, সে বিরাট আগুনে প্রবেশ করবে।

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾

১৩. এরপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।*

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾

১৪-১৫. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা লাভ করেছে** ও আপন রবের নাম স্মরণ করেছে এবং তারপর নামায পড়েছে।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾

১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ।

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾

১৭. অথচ আখিরাত অনেক ভালো ও চিরস্থায়ী।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

১৮-১৯. আগের কিতাবগুলোতেও এ কথাই বলা হয়েছিল— ইবরাহীম ও মূসার (কাছে পাঠানো) কিতাবে।

নাযিলের সময় আপনি চুপ করে শুনতে থাকুন, আমি আপনাকে তা পড়িয়ে দেব এবং চিরদিন আপনার মনে থাকবে। যাতে আপনি ভুলে না যান, সে ব্যবস্থা আমিই করব। এ বিষয়ে আপনি পেরেশান হবেন না।

৬. অর্থাৎ, আল্লাহর দীনের প্রচারের ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো অসুবিধায় ফেলতে চাই না। যে শুনতে রাজি নয় তাকে শোনাতেই হবে কিংবা এমন অন্ধ, যে দেখতেই চায় না তাকে পথ দেখাতেই হবে– এমন কঠিন ও অসম্ভব কাজের কোনো দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়া হয়নি। আপনার দায়িত্ব হলো মানুষকে নসীহত করা ও উপদেশ দেওয়া। যারা এ থেকে উপকৃত হতে চায় তারা উপদেশ নেবে। আর যাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা হয় যে, তারা নসীহত কবুল করবেই না তাদের পেছনে লেগে থাকার কোনো দরকার নেই।

* অর্থাৎ, কঠিন আযাবের ফলে যদি দোযখে মানুষ মরে যায় তাহলে শাস্তি জারি থাকতে পারে না। কিন্তু যে দুরবস্থার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে বাধ্য হবে তা মরণের চেয়েও খারাপ। তাই তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা জীবিতও নয়, মৃতও নয়।

** অর্থাৎ, শিরক, কুফর, মন্দ কাজ, অসচ্চরিত্র ইত্যাদি থেকে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

৮৮. সূরা গাশিয়াহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের গাশিয়াহ্ শব্দ থেকেই সূরাটির এ নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরাটির গোটা আলোচনাই প্রমাণ দেয় যে, সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম ভাগেই নাযিলকৃত। অবশ্য মাক্কী যুগের ঐ সময়ই সূরাটি নাযিল হয়, যখন রাসূল (স) প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন এবং লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবুল করতে রাজি হচ্ছিল না।

আলোচ্য বিষয় : তাওহীদ ও আখিরাত।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে অমনোযোগী জনগণকে চমকিয়ে দিয়ে তাদের সামনে হঠাৎ এ প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে যে, 'ঐ ভয়াবহ সময়টার কথা কি তোমরা জান, যখন এক মহাবিপদ সারাটা দুনিয়াকে ছেয়ে ফেলবে?' এ আয়াতের পরপরই ঐ ভয়ানক দিনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যখন সব মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে এবং দুই রকম পরিণাম দেখতে পাবে।

২-৭ আয়াতে ঐ দলের বিবরণ রয়েছে, যারা দোযখে যাবে। তারা কেমন কঠিন আযাব ভোগ করবে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা এসব আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

৮-১৬ নং আয়াতে ঐ দলের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা উন্নত মানের বেহেশতে যাবে। সেখানে তাদের জন্য কেমন নিয়ামতের ব্যবস্থা করা হবে, তার বিবরণ এসব আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

এভাবে দোযখ ও বেহেশতের বিবরণ দেওয়ার পর হঠাৎ আলোচনার বিষয় বদলিয়ে **১৭ থেকে ২০ নং আয়াতে** কতক প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা কুরআনের শিক্ষা ও আখিরাতের বিবরণ শুনে নাক সিঁটকায় তারা কি ঐসব জিনিসের দিকে খেয়াল করে না, যা তারা সব সময় দেখছে? তারা কি অবুঝ জানোয়ারের মতো শুধু চোখ দিয়েই দেখছে, মগজ খাটিয়ে একটু চিন্তা করছে না? আরবের মরুভূমিতে যে উটের উপর তাদের জীবন নির্ভর করে সে উট কীভাবে মরুজীবনের উপযোগী হয়ে সৃষ্টি হলো সে কথা কি তারা চিন্তা করে দেখেছে? তারা কি একটুও ভেবে দেখে না যে, তাদের উপর বিরাট আসমান কোথা থেকে এল? তাদের সামনে এসব পাহাড় কেমন করে খাড়া হয়ে গেল? যে জমিনে তারা বাস করছে, তা কীভাবে মানুষের বাস করার যোগ্য বিছানায় পরিণত হলো? তারা কী মনে করে যে, এসব কোনো মহাশক্তিমান, মহাকৌশলী কারিগর ছাড়া আপনা-আপনিই হয়ে গেছে?

আল্লাহ তাআলা এ প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দেওয়ার দরকার মনে করেননি। কারণ, মানুষের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি এটুকু যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য যে, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা,

নদী-নালা, জীব-জন্তু এত সুন্দর করে সাজানো– এ দুনিয়া আপনা-আপনি হয়ে যায়নি। এক মহাকৌশলী স্রষ্টা ছাড়া এসব সৃষ্টি হতে পারে না এবং এ মহাকারিগরি একই মহাপরিকল্পনার ফল। অন্য কোনো শক্তি এ ব্যাপারে তাঁর শরীক নেই। একাধিক পরিকল্পনাকারী থাকলে গোটা সৃষ্টি এমন শৃঙ্খলার সাথে চলতে পারত না।

যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেক এসব কথা মানতে বাধ্য হয়ে থাকলে ঐ মহাকৌশলীকে একমাত্র রব ও মনিব মানতে আপত্তি কেন? যদি এ কথা বাধ্য হয়েও স্বীকার করতে হয় যে, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাহলে কিয়ামতের পর আবার একটি জগৎ সৃষ্টি করার শক্তি তাঁর আছে বলে স্বীকার করতে বাধা কোথায়?

এভাবে কাফিরদের বিবেক-বুদ্ধিতে খোঁচা দিয়ে অতি সহজ যুক্তি দ্বারা তাওহীদ ও আখিরাতের সত্যতা বুঝিয়ে দেওয়ার পর **২১ ও ২২ নং আয়াতে** রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে রাসূল! এরা আপনার কথা মানুক বা না মানুক তাতে আপনার কিছুই আসে-যায় না। আপনাকে তাদের উপর দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়নি যে, তাদেরকে মানতে বাধ্য করেই ছাড়বেন। তাদেরকে শুধু বোঝানোর চেষ্টা করাই আপনার দায়িত্ব। আপনি তাদেরকে বোঝাতে থাকুন। উপদেশ কবুল করা বা না করা তাদের দায়িত্ব।

২৩-২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা এর পরও তাওহীদ ও আখিরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তাদেরকে কঠোর আযাব দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন তাদের চুলচেরা হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আমার। তাদেরকে আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আপনার কথা না মানার কারণে আপনি পেরেশান হবেন না। না মানার ফল তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তারা আসুক আমার কাছে; আমি তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেব না।

বিশেষ শিক্ষা

২১ ও ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনো মানুষকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব রাসূলকে দেওয়া হয়নি। রাসূলের দায়িত্ব হলো মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা। রাসূলের উপদেশ কবুল করা বা না করা তাদের দায়িত্ব, যাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকেই বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সব বিষয়ে নিজেদের খুশিমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। ভালো ও মন্দ বাছাই করার যোগ্যতা দেওয়া সত্ত্বেও মানুষ নাফসের তাড়নায় ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বা অন্য মানুষের কুবুদ্ধি নিয়ে বিবেকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। তাই আল্লাহ মানুষকে এখানে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার তাকীদ দিয়েছেন।

সূরা গাশিয়াহ্

২৬ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٦ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١

১. তোমার কাছে কি ঐ বিপদের খবর পৌঁছেছে, যা সব কিছু ঢেকে ফেলবে?

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤

২-৩-৪. কতক চেহারা সেদিন ভয়ে কাতর হবে,[১] কঠোর পরিশ্রমে রত হবে, দারুণ কাহিল হয়ে পড়বে, ভয়ানক আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥

৫. ফুটন্ত গরম পানির ঝরনা থেকে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧

৬-৭. কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া অন্য কোনো খাবার তাদের জন্য থাকবে না। (যে খাবার) তাদেরকে পুষ্ট করবে না, খিদেও মেটাবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨

৮. কতক চেহারা সেদিন উজ্জ্বল থাকবে।

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩

৯. নিজেদের চেষ্টা-সাধনার (সুফল দেখে) তারা খুশি হবে।

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠

১০. তারা উঁচু দরের বেহেশতে থাকবে।

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١

১১. সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢

১২. সেখানে বহমান ঝরনা থাকবে।

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣

১৩. সেখানে উঁচু আসন থাকবে।

وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤

১৪. পানপাত্র সাজানো থাকবে।

وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦

১৫-১৬. ঠেস দেওয়ার বালিশগুলো সারিবাঁধা থাকবে এবং দামি নরম শয্যা বিছানো থাকবে।

১. এখানে চেহারা মানে মানুষ। চেহারাই মানুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস বলে 'কতক লোক' না বলে 'কতক চেহারা' বলা হয়েছে।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

১৭. (এরা যে আল্লাহকে মানে না) তবে কি তারা উটকে দেখে না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

১৮. আর আসমানকে (দেখে না), কেমন উঁচু করা হয়েছে?

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

১৯. আর পাহাড়কে (দেখে না), কেমন শক্তভাবে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে?

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

২০. আর জমিনকে (দেখে না), কীভাবে বিছানো হয়েছে?[২]

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

২১. তাহলে (হে রাসূল!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো শুধু উপদেশদাতাই।

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

২২. আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন।

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২৩-২৪. অবশ্য যে মুখ ফিরিয়ে রাখবে ও কুফরী করবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫. এদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

২৬. এরপর তাদের হিসাব নেওয়া আমারই দায়িত্ব।

২. অর্থাৎ, আখিরাত সম্ভব নয় বলে এরা কী করে মনে করে? তারা কি কখনো চারপাশের দুনিয়ার দিকে খেয়াল করে দেখে না যে, উট কেমন করে সৃষ্টি হয়ে গেল? আসমানকে কীভাবে এত উঁচু করা হলো? পাহাড় কীভাবে কায়েম হলো? জমিনকে কীভাবে বিছানো হলো? এসব জিনিস যদি তৈরি হতে পারে এবং তৈরি অবস্থায় এদের সামনে হাজির থাকতে পারে তাহলে কিয়ামত কেন আসতে পারবে না? আখিরাতে আরেকটি জগৎ কেন সৃষ্টি হতে পারবে না? দোযখ ও বেহেশত কেন হতে পারবে না?

৮৯. সূরা ফাজ্‌র

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দটি দিয়েই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরাটিতে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, মাক্কী যুগের মধ্যভাগের ঐ সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে, যখন ইসলামী আন্দোলনে যোগদানকারীদের উপর কাফির ও মুশরিকদের যুলুম ও নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে।

আলোচ্য বিষয়

মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। মক্কাবাসীরা আখিরাতের যে পুরস্কার ও শাস্তির কথা মানতে রাজি হচ্ছিল না, তারই প্রমাণ কতক মযবুত যুক্তি দ্বারা এ সূরায় দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম পাঁচ আয়াতে ফজর, দশ রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কথা মানতে রাজি হচ্ছ না, তা প্রমাণের জন্য কি এ ক'টা জিনিসই যথেষ্ট নয়? এরপর কি আরো কোনো কিছুর কসম খাওয়ার প্রয়োজন আছে? কথার ধরন থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল (স) মক্কাবাসীদেরকে কোনো কথা বোঝাচ্ছিলেন; কিন্তু তারা সে কথা মানতে রাজি হচ্ছিল না।

আল্লাহ তাআলা চারটি বিষয়ের কসম খেয়ে ঐ কথার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। ঐ কথাটি কী, তা সূরার পরবর্তী আয়াতগুলো থেকেই বোঝা যায়। মানুষ দুনিয়ায় ভালো ও মন্দ যেসব কাজ করে এর পুরস্কার ও শাস্তি যে পরকালে অবশ্যই পাবে, সে কথা নিয়েই রাসূল (স)-এর সাথে মক্কাবাসীদের বিতর্ক চলছিল। যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বহু রকম অর্থ করেছেন। কিন্তু যে কথাটির পক্ষে যুক্তি হিসেবে এ কসম খাওয়া হয়েছে তার সাথে যে অর্থের মিল স্পষ্ট, সে অর্থটাই সহজে বুঝে আসে ও বেশি ঠিক বলে মনে হয়। সে অর্থই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

ফজর মানে সকাল। দশ রাত মানে চাঁদের হিসেবে মাসের তিন ভাগ– প্রথম দশ রাতে চাঁদ ধীরে ধীরে বড় হয়, মাঝের দশ রাত সবচেয়ে বেশি বড় থাকে এবং শেষ দশ রাতে ধীরে ধীরে আবার ছোট হতে থাকে। জোড় ও বেজোড় মানে সংখ্যার হিসাব। ২, ৪, ৮ ইত্যাদি জোড় সংখ্যা, যা ২ দিয়ে ভাগ করা যায়। আর ১, ৩, ৫, ৭, ৯ হলো বেজোড়। মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছর গুনতে হলে এ সংখ্যাগুলোর সাহায্যেই এগোতে হয়। রাত যখন চলে যায় তখন অন্ধকারের পর আবার আলো হয়।

এসবের কসম খেয়ে যে কথাটা বোঝানো হচ্ছে তা হলো এই যে, রাসূল (স) আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির যে খবর দিচ্ছেন তা অতি সত্যি। এ চারটি জিনিস ঐ সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ চারটি জিনিস প্রমাণ দিচ্ছে যে, কোনো এক শক্তিশালী পরিকল্পনাকারী পরম শৃঙ্খলা ও মযবুত নিয়মের দ্বারা দিন-রাতের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন, নির্দিষ্ট নিয়মে চাঁদ ছোট-বড় হচ্ছে, এসব পরিবর্তনের কারণে মানুষ দিন, তারিখ, মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারছে।

আল্লাহ তাআলা যে বিশেষ নিয়মে এসবকে চালাচ্ছেন এর মধ্যে রদবদল করার ক্ষমতা কারো নেই। কেউ ইচ্ছা করলেই দিন-দুপুরে চাঁদের আলো দেখতে পারবে না, রাত শেষ হওয়ার আগেই ফজরকে হাজির করতে পারবে না এবং বেজোড় তারিখ পার হওয়ার আগেই জোড় তারিখ আনতে পারবে না। এসব ব্যাপারে যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা, তিনি যদি আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে চান তাহলে এটাকে অসম্ভব মনে করার কী কারণ থাকতে পারে? তাঁর ঐসব ক্ষমতাকে স্বীকার করা যদি যুক্তিপূর্ণ হয় তাহলে পরকালের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতাকে কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করা যায়?

এর পরও যারা পরকালের পুরস্কার ও শাস্তিকে সত্যি বলে মনে করে না তারা একেবারেই আহাম্মক। তারা নিশ্চয়ই দু'রকম বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। হয় তারা ধারণা করছে যে, আল্লাহ তাআলা এত বড় জগৎকে শৃঙ্খলা ও নিয়মমতো চালানোর যোগ্য হলেও মানুষকে আবার জীবিত করে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না; আর না হয় তারা মনে করে যে, দিন-রাত, চাঁদ-সুরুজ বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হলেও মানুষকে ভালো ও মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়ার পেছনে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি, শুধু মানুষকেই অনর্থক বিবেক-বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দিয়েছেন বটে কিন্তু কখনো তাদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন না। আর যখন হিসাবই নেবেন না তখন পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। গোটা সৃষ্টি জগৎ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যারা এ জাতীয় ধারণা রাখে তারা চরম আহাম্মক।

৬-১৪ নং আয়াতে মানবজাতির ইতিহাস থেকে 'আদ ও সামূদ জাতি এবং ফিরাউনের করুণ পরিণাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যখন তারা আল্লাহর চরম অবাধ্য হয়ে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল তখন আল্লাহর আযাবের চাবুক মেরে তাদেরকে শায়েস্তা করা হলো। এসব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, দুনিয়াটা কোনো 'হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী'র হাতে স্থায়ীভাবে দিয়ে দেওয়া হয়নি। যাঁর হাতে গোটা সৃষ্টিজগৎ পরিচালনার ক্ষমতা, তিনি মানবসমাজের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। কোনো জাতির উত্থান-পতন আল্লাহর তৈরি নিয়মেই হয়। কোনো দেশের উপর আল্লাহ্ অনর্থক গযব নাযিল করেন না। একটা সীমা পর্যন্ত তিনি অন্যায়-অবিচার ও যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন। আল্লাহর অবাধ্যতার এ সীমা যখন পার হয়ে যায় তখন তিনি শক্ত হাতে পাকড়াও করেন, যেমন 'আদ ও সামূদ জাতি এবং ফিরাউনের বেলায় করেছেন।

এভাবে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত– আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা ও নীতিবোধ দিয়ে ভালো ও মন্দ কাজ করার ক্ষমতাসহ দুনিয়ায় একেবারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। তাই দেখা যায় যে, একটা সীমা পর্যন্ত সহ্য করার পর তিনি যালিম দুষ্কৃতকারী জাতি, দল ও ব্যক্তির উপর গযব নাযিল করেন এবং আর কোনো অন্যায় করার সুযোগ দেন না। যিনি দুনিয়াতেই এভাবে পাকড়াও করেন তিনি পরকালে এমনি ছেড়ে দেবেন মনে করার কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না।

১৫ ও ১৬ নং আয়াতে দুনিয়াদার লোকদের একটা মস্তবড় ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির ধার ধারে না, তারা দুনিয়ার জীবনটাকেই সবকিছু মনে করে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আল্লাহর দেওয়া উপদেশকে ভুলে গিয়ে নিজেদের মনগড়া ধারণা নিয়ে জীবন কাটায়। দুনিয়ার বস্তুগত সুখ-শান্তিই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। টাকা-পয়সা বেশি থাকলেই তারা মনে করে যে, আল্লাহ তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন; আর সামান্য অভাব হলেই মনে করে, তাদেরকে অপমান করা হয়েছে।

তাদের মতে, মান-সম্মানটা টাকা-পয়সার সাথে জড়িত। এটাই দুনিয়াদারদের মনোভাব। তাই দেখা যায়, চরিত্রের দিক দিয়ে পশুর চেয়ে অধম লোকও টাকা-পয়সার কারণে দুনিয়াদারদের কাছে সম্মান পায়। উন্নত চরিত্রের লোক গরিব হলে তাদের কাছে সামান্য সম্মানও পায় না।

'আমার রব আমাকে সম্মান দিয়েছেন বা অপমান করেছেন' বলে দুনিয়াদারদের যে কথা এ দুটো আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, তারা আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে। কিন্তু দুনিয়ায় ধনী ও গরিব হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ধারণাকে ঠিক মনে করে না। এর দ্বারা আরও একটা কথা বোঝা যায় যে, তারা গরিব হলে আল্লাহকে দোষ দেয় এবং বলে, 'না-জানি কী দোষ করেছি।' ভাবখানা এমন যে, দোষ তো করিই নি, করেছি বলে জানিও না। অর্থাৎ দুনিয়াদাররা নিজেদের দোষ-ত্রুটি দেখে না। অভাব বা বিপদ হলে এর জন্য তারা আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ তাআলা এ দুটো আয়াতে দুনিয়াদারদের ঐ ভুল ধারণা দূর করে বলেছেন, দুনিয়াতে কোনো সময় মানুষের খুব ভালো অবস্থা থাকে, আবার কোনো সময় অভাব দেখা দেয়। দুনিয়ায় আল্লাহর বেশি নিয়ামত পাওয়াটা কোনো পুরস্কার নয় এবং রিযকের অভাবটাও কোনো শাস্তি নয়। টাকা-পয়সা বেশি থাকাটা সম্মানের লক্ষণ নয়, আবার কম থাকাটাও অপমানের ব্যাপার নয়। আসলে এ দুটো অবস্থাই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। ধন দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে, সে শোকর করে কি না এবং এ ধন আল্লাহর মর্জিমতো খরচ করে কি না। অভাব দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে, অভাবের মধ্যে সে সবর করে কি না, অভাবের কারণে তার স্বভাব নষ্ট হয় কি না, সে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে কি না এবং আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহী হয় কি না। আল্লাহ যখন পরীক্ষা করেন তখন এর ফলও নিশ্চয় দেবেন। ফল না দিলে পরীক্ষার কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু পরীক্ষার ঐ ফল এ দুনিয়ার জীবনে দেওয়ার জিনিস নয়। আখিরাত এ জন্যই জরুরি। পরীক্ষায় যারা পাস করল আখিরাতে তারা পুরস্কার পাবে, আর যারা ফেল করল তাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে।

১৭-২০ নং আয়াতে দুনিয়াদারদের আরো একটা বড় দোষের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা সুযোগ পেলেই ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে দখল করে বসে। গরিব-মিসকীনদের জন্য তাদের কোনো দরদ নেই। দুর্বল পাওনাদারদেরকে এরা তাড়িয়ে দেয়। মালের মহব্বতে এরা এমন পাগল যে, যত ধন-দৌলতই থাকুক, এদের টাকা-পয়সার পিপাসা কখনো মেটে না। এ জাতীয় নির্দয় লোকদের কার্যকলাপের হিসাব কেন নেওয়া হবে না? তাদের শাস্তির জন্য পরকাল অবশ্যই জরুরি।

২১-২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হিসাব-নিকাশ অবশ্যই নেওয়া হবে এবং সে কারণেই কিয়ামত দরকার। সেখানে আল্লাহর আদালত কায়েম হবে। আজ যারা পুরস্কার ও শাস্তিকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে না, সেদিন তারা এর সত্যতা ঠিকই টের পাবে; কিন্তু তখন বুঝলেও কোনো লাভ হবে না। তারা তখন আফসোস করে বলবে, 'হায়, যদি পরকালের এ জীবনের জন্য দুনিয়ায় থাকাকালে কিছু ব্যবস্থা করতাম!' কিন্তু এ অনুতাপ তাদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

২৭-৩০ নং আয়াতে আল্লাহর ঐ নেক বান্দাহদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা উপরে বর্ণিত দুনিয়াদারদের মতো নয়। তারা মনে-প্রাণে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী। মনে পূর্ণ আবেগ ও তৃপ্তিবোধ নিয়ে তারা আল্লাহর পথে চলে। আল্লাহ তাআলা আদালতে আখিরাতে তাদেরকে মহব্বতের সাথে ডেকে বলবেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তোমাদের রবের কাছে এসো। আজ আমি তোমাদেরকে পুরস্কার দিয়ে আনন্দিত, তোমরা খুশি হয়ে পুরস্কার নাও। তোমরা আমার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং বেহেশতে গিয়ে সুখে-শান্তিতে চিরদিন থাকো।'

সূরা ফাজ্‌র

৩০ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. কসম ফজরের।

২. কসম দশ রাতের।

৩. কসম জোড় ও বেজোড়ের।

৪. কসম রাতের, যখন সে বিদায় নেয়।

৫. এসবের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি কোনো কসম আছে?[১]

৬-৭. (হে রাসূল!) আপনি কি দেখেননি, আপনার রব কী ব্যবহার করেছেন উঁচু থামওয়ালা ইরাম বংশীয় 'আদ জাতির সাথে?

৮. যাদের মতো কোনো জাতি দুনিয়ায় সৃষ্টি করা হয়নি?

৯. আর (কী ব্যবহার করেছেন) ছামূদ জাতির সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর খোদাই করেছিল?

১০. আর কিলকধারী* ফিরাউনের সাথে (কী ব্যবহার করেছেন)?

১১. এরা ঐসব লোক, যারা দেশে দেশে বিদ্রোহ ও সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

১২. এবং সেখানে ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল।

১৩. শেষে আপনার রব তাদের উপর আযাবের চাবুক মেরেছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ۝١

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣

১. সামনের আয়াতগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় নিয়ে রাসূল (স) ও কাফিরদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল এবং রাসূল (স)-এর প্রমাণ দিচ্ছেলেন; আর কাফিররা তা মানতে অস্বীকার করছিল। এ বিষয়ে চারটি জিনিসের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, এ মহাসত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এরপর আরো সাক্ষীর কি দরকার আছে?

* ফিরাউনের সেনাবাহিনী তাকে এমন শক্তিশালী করেছিল, যেমন খুঁটি, পেরেক বা কিলক দিয়ে কোনো জিনিসকে মযবুত করে রাখা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

১৪. আসলে আপনার রব ঘাঁটিতে ওত পেতে আছেন।[২]

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

১৫. কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে ইজ্জত ও নিয়ামত দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন ও তার রিযক কমিয়ে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।[৩]

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾

১৭. কক্ষনো নয়! বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না।

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾

১৮. এবং মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানোর জন্য একে অপরকে উৎসাহিত কর না।

وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾

১৯. আর তোমরা মীরাসের সমস্ত ধন-সম্পদ জমা করে খেয়ে ফেল।

وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদের মোহে কাতর হয়ে পড়েছ।

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

২১-২২. কক্ষনো নয়![৪] যখন জমিনকে ভেঙে রেণু রেণু করে দেওয়া হবে এবং আপনার রব

২. ঘাঁটি ঐ জায়গাকে বলে, যেখানে কোনো লোক এজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, দুশমন এলেই যেন হামলা করতে পারে অথচ দুশমন জানে না যে, তার উপর আক্রমণ করার জন্য কেউ ওত পেতে আছে। যারা যুলুম ও ফাসাদ করে, তাদের জন্যও আল্লাহ তাআলা এভাবেই ওত পেতে আছেন। এরা একটুও অনুভব করে না যে, আল্লাহ তাদের সব কীর্তি দেখছেন। এরা নির্ভয়ে একের পর এক শয়তানি করে চলে। শেষ পর্যন্ত এরা যখন অন্যায়ের এমন সীমায় এসে পৌঁছে, যার পর আল্লাহ এদেরকে আর সহ্য করতে চান না, তখন হঠাৎ আল্লাহর আযাবের বেত তাদের উপর মারা হয়।

৩. অর্থাৎ, এটাই হলো মানুষের জড়বাদী খেয়াল। দুনিয়ার ধন-দৌলত, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি পাওয়াকেই এরা ইজ্জত ও মান-সম্মান মনে করে। আর এগুলো না পাওয়াকে এরা অপমান বলে ধারণা করে। অথচ আসল সত্য, যা এরা জানে না তা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা টাকা-পয়সা ও ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, মানুষ টাকা ও ক্ষমতা আল্লাহর মর্জিমতো ব্যবহার করে কি না। আর যখন কাউকে গরিব করেন তখন পরীক্ষা করেন যে, এ অবস্থায় আল্লাহর বিধান সে মেনে চলে কি না।

৪. অর্থাৎ, তোমাদের এই ধারণা ভুল যে, তোমরা দুনিয়ায় এসব কিছু করে বেড়াবে আর কখনো এ বিষয়ে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

আগমন করবেন এমন অবস্থায়, যখন ফেরেশতারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে।

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩. আর ঐ দিন দোযখকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে; কিন্তু তখন বুঝলেও আর কী (লাভ) হবে?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ﴿٢٤﴾

২৪. সে (তখন) বলবে, হায়! যদি আমি আমার এ জীবনের জন্য আগে কিছু ব্যবস্থা করতাম!

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾

২৫. ঐদিন আল্লাহ যে আযাব দেবেন, তেমন আযাব আর কেউ দেবে না।

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আল্লাহ যেমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবেন, তেমন আর কেউ বাঁধবে না।

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

২৭-২৮. (অপরদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা![৫] চল তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে, তুমি (নিজের ভালো পরিণামের জন্য) সন্তুষ্ট (আর তোমার রবের নিকট) পছন্দনীয়।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

২৯-৩০. তুমি আমার (প্রিয়) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

৫. 'নাফসে মুতমাইন' মানে এমন মানুষ, যিনি কোনো প্রকার সন্দেহ বা খটকা বোধ না করে মনের পুরো তৃপ্তি ও শান্তির সাথে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ এবং রাসূলের আনীত দীনকে একমাত্র হক দীন হিসেবে মেনে নিয়েছে।

নাফস মানে দেহের দাবি। দেহ বস্তুর তৈরি বলে দুনিয়ার বস্তু ভোগ করার জন্য দেহের দাবি প্রবল। রূহ আল্লাহর দিকে মানুষকে টানে। বিবেক রূহেরই অপর নাম। নাফস মন্দের দিকে নিতে চাইলে রূহ বা বিবেক আপত্তি জানায়। নাফস ও রূহের এ লড়াই সব মানুষের জীবনেই দেখা যায়। এ লড়াইয়ে কোনো সময় নাফস জয়ী হয়, আবার কোনো সময় রূহ জয়ী হয়। যদি নাফস সব সময়ই জয়ী হয়, তাহলে তাকে কুরআনে নাফসে আম্মারা বলা হয়েছে (সূরা ইউসুফ, ৫৩ নং আয়াত)। যদি কোনো সময় নাফস আবার কোনো সময় রূহ জয়ী হয় তাহলে তাকে নাফসে লাওয়ামা বলা হয়েছে (সূরা কিয়ামাহ, ২ নং আয়াত)। আর যদি সব সময় রূহ-ই জয়ী হয়, তাহলে তাকে এ সূরায় নাফসে মুতমাইন্নাহ বলা হয়েছে।– [অনুবাদক]

৯০. সূরা বালাদ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'বালাদ' শব্দ দিয়েই এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরার বক্তব্য থেকে মনে হয়, এ সূরাটিও মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের সূরা; কিন্তু একটি কথা থেকে বোঝা যায় যে, ঐ সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, যখন বিরোধীরা রাসূল (স)-এর উপর যুলুম চালাচ্ছিল।

আলোচ্য বিষয়

কুরআন মাজীদের এটা একটা মু'জিযা যে, একটা বিরাট বিষয় এ সূরায় ছোট ছোট কতক আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায়, মানুষের নিকট দুনিয়ারই বা স্থান কী, তা এখানে বোঝানো হয়েছে।

আলোচনার ধারা

সূরাটি 'লা উকসিমু' দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সূরা কিয়ামাহও (৭৫ নং সূরা) একইভাবে শুরু হয়েছে। 'লা' অর্থ না। 'উকসিমু মানে,' আমি কসম করে বলছি। এভাবে বললে বোঝা যায় যে, কোনো কথাবার্তা চলছিল, যার প্রতিবাদে কসম করে বলা হচ্ছে, 'তোমরা যা বলছ, তা কখনো ঠিক নয়; বরং আমি অমুক জিনিসের কসম করে বলছি যে, আসল কথা এই।'

এখন প্রশ্ন হলো, কাফিরদের কোন্ কথাটির প্রতিবাদ করা হয়েছে? পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, তারা বলত, 'আমরা যেভাবে জীবন কাটাচ্ছি এবং বাপ-দাদারাও যেভাবে কাটিয়ে গেছে, তাতে ভুল কোথায়?' দুনিয়ায় যতদিন আছি খাব-দাব মজা করব, যতটা সম্ভব আরামে থাকার চেষ্টা করব। মৃত্যু এলে মরে শেষ হয়ে যাব। পরকালের ধান্দায় জীবনটা নষ্ট করব কেন? এ কথার প্রতিবাদে প্রথমে বলা হয়েছে, তোমাদের ধারণা একেবারেই ভুল। এরপর এ আয়াতে এই শহরের কসম করছি বলে মক্কা শহরের নামে কসম খাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এ শহরেই রাসূল (স)-এর প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, সে কথা উল্লেখ করে তৃতীয় আয়াতে পিতা ও সন্তানের কসম করা হয়েছে। পিতা ও সন্তান মানে আদম (আ) ও তাঁর সন্তান অর্থাৎ মানবজাতি। এসব কসম খেয়ে যে মহাসত্যকে তুলে ধরা হয়েছে, তা চতুর্থ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবনটা মানুষের ভোগ ও আরামের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অগণিত দুঃখ-কষ্ট, দেহ-মনের শ্রম, ক্লান্তি-শ্রান্তি এবং বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনটা ফুলের বিছানা নয়, কাঁটায় ভরা।

আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার মজায় লিপ্ত থাকাটা অতি বড় বোকামি। এ দ্বারা দু রকম বিরাট ক্ষতি হবে। একদিকে সে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পরওয়া না করে দুনিয়ার জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট

পেল তার জন্য আখিরাতে কোনো বদলা পাবে না। অথচ আল্লাহ তাআলা দুঃখ-কষ্টে ভরা দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য যেটুকু আরাম ও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন সেটুকু যদি আল্লাহর দেওয়া সীমার মধ্যে ভোগ করা হয় তাহলে সে দু'ভাবে পরকালে লাভবান হবে। আল্লাহর মর্জিমতো দুনিয়া ভোগ করার জন্যও পরকালে সে পুরস্কার পাবে; আর দুনিয়ার ছোট-বড় সব দুঃখ-কষ্টের বদলায় সেখানে অফুরন্ত নিয়ামত পাবে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফিরদের যে কথার প্রতিবাদ সূরার শুরুতে করা হয়েছে, তার সাথে মক্কা শহর ও আদম সন্তানের কসম খাওয়ার সম্পর্ক কী? এ কসমের দ্বারা আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদেরকে বোঝাতে চান যে, সবাই যদি 'খাও-দাও-মজা কর' নীতিতেই জীবন কাটাত, তাহলে মানবজাতির মধ্যে কোনো ভালো কাজই হতো না। তোমাদের এত শান্তির স্থান মক্কা শহর কি তোমাদের মতো নাফসের গোলামদের দ্বারা কায়েম হতে পারত? তোমরা তো ভালোভাবেই জান যে, আল্লাহ এক নেক বান্দার বিরাট কুরবানী ও দুঃখ-কষ্টের ফলে এ মক্কা নগরী গোটা আরবে একমাত্র নিরাপদ ও শান্তির স্থানে পরিণত হয়েছে। আরবের সব জায়গায় তোমরা মারামারি-কাটাকাটি দেখতে পাচ্ছ। মক্কা শহরে মানুষের উপর অন্যায় ও যুলুম করাতো দূরের কথা, জীব-জন্তু পর্যন্ত এখানে নিরাপদ। মক্কার এ মর্যাদা কি এমনি হয়েছে? এর জন্য ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মায়ের কত বড় বড় ত্যাগ রয়েছে, তা কি তোমরা জান না?

তেমনিভাবে তোমাদের বাপ আদমকেও বহু কষ্ট করে দুনিয়ায় আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন যাপনের শিক্ষা নিতে হয়েছে। আদম সন্তানদের মধ্যে যারা এভাবে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করার যোগ্য, তারাই দুনিয়ায় মানুষের কল্যাণ করে যায়। তোমাদের মতো প্রবৃত্তির দাসদের চরিত্র এমন যে, মক্কার নিরাপদ শহরে পর্যন্ত নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হয়ে আল্লাহর রাসূলের উপর অত্যাচার করা জায়েয মনে করছ। অথচ তোমরা জান যে, মুহাম্মদ (স) ঐ ইবরাহীম ও ইসমাঈলেরই বংশধর এবং তিনিও তাঁদের মতো একই মহান কাজে নিযুক্ত।

৫-৭ নং আয়াতে নাফসের গোলামদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এরা কি মনে করে, এদের উপর অন্য কোনো শক্তি নেই? এরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে থাকবে, আর এদেরকে পাকাড়াও করার কেউ নেই বলে কি তাদের ধারণা? এরা দুনিয়ায় নিজেদের বড়ত্ব প্রমাণ করার জন্য বাজে কাজে বহু টাকা-পয়সা খরচ করে এবং গর্ব করে বলে, 'আমাদের সাথে কার তুলনা হয়? আমরা অমুক অমুক কাজে কত সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছি।' দুনিয়ায় এটুকু বাহাদুরি দেখানোর জন্যই এরা অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ জমায় এবং খারাপ পথে তা ওড়ায়।

সপ্তম আয়াতে আবার আল্লাহ প্রশ্ন তুলে বলেন, 'এরা কি মনে করে যে, এদের অন্যায় কামাই ও শয়তানি খরচের খবর আল্লাহর জানা নেই? এরা কীভাবে ধন-সম্পদ জমা করেছে এবং কোন্ কোন্ কুপথে খরচ করেছে, তা কি দেখার ও ধরার কেউ নেই? সাথে সাথে পাকড়াও করা হচ্ছে না বলে কি এ কথা মনে করা ঠিক যে, কোনো দিন ধরা হবেই না?'

৮-১১ নং আয়াতে আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'আমি কি মানুষকে সঠিক জ্ঞানের উপায় হিসেবে চোখ-মুখ দিইনি এবং এ সবের মারফতে বোঝার শক্তি দিইনি, যার ফলে কোন্টা ভালো আর কোন্টা মন্দ, তা সে জেনে নিতে পারে? বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তার সামনে সুপথ ও কুপথ আমি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছি।

এক পথ মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। এ পথে যেতে নাফসের কোনো বেগ পেতে হয় না; বরং নাফস খুব মজা পায়। আরেক পথ উন্নত চরিত্রের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এ পথ কঠিন। এ পথে চলতে হলে নাফসকে জোর করে দমিয়ে রাখতে হয়। এটাই মানুষের দুর্বলতা যে, সে সুপথকে কঠিন দেখে কুপথে চলাই সহজ মনে করে।

১২-১৬ নং আয়াতে একটি উদাহরণ দিয়ে সুপথে চলার বাধা কোথায়, তা বোঝানো হয়েছে। এ বাধাকে 'আকাবা' বলা হয়েছে। আকাবা ঐ কঠিন পথকে বলা হয়, যা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়। আল্লাহর দেখানো সুপথকে এখানে পাহাড়ি পথের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, ঐ উন্নতির পথে যেতে হলে লোকদেখানো খরচ (রিয়া), গর্বের উদ্দেশ্যে খরচ ও বাহাদুরি দেখানোর জন্য খরচ না করে নিজের মাল ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য খরচ করতে হবে।

কিন্তু যারা নাফসের খায়েশ মেটানোর উদ্দেশ্যে দেদার টাকা-পয়সা খরচ করে তারা বিপদগ্রস্ত ও দুঃখী মানুষের উপকারে খরচ করতে চায় না। এখানেও তারা নাফস ও শয়তানের বাধা ডিঙ্গাতে পারে না।

১৭-২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা নাফস ও শয়তানের ধোঁকা থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তারা ঐ বাধা ডিঙ্গিয়ে ইয়াতীম, মিসকীন ও দুঃস্থদের সাহায্য করে এবং ঈমানদারদের সাথে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়। তারা সুসংগঠিত উপায়ে সমাজকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে একে অপরকে ধৈর্যের সাথে আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ার জন্য এবং জনগণের প্রতি দরদ নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেয়। যারা এ পথে চলে, তারাই আল্লাহর রহমত লাভ করে। আর যারা বিপরীত পথ ধরে, দোযখের আগুনই তাদের পরিণাম। তারা সে আগুনেই ঘেরাও হয়ে থাকবে, তা থেকে পালাতে পারবে না।

বিশেষ শিক্ষা

'মানবজীবন ত্যাগের মাধ্যমেই সার্থক হয়, ভোগের মাধ্যমে নয়।'

ভোগের মধ্যে যে মজা তা স্থায়ী তৃপ্তি দেয় না। ত্যাগের পথ কঠিন হলেও তাতেই স্থায়ী তৃপ্তি রয়েছে। ভোগের দ্বারা যোগ্যতা কমে, আর ত্যাগের দ্বারা যোগ্যতা বাড়ে। যেকোনো সাধনাই ত্যাগ দাবি করে। ভোগে মত্ত থাকলে কোনো সাধনা করারই যোগ্যতা থাকে না।

উচ্চ ডিগ্রি এবং উজ্জ্বল সাফল্য তাদের ভাগ্যেই জুটবে, যারা রাত-দিন পরিশ্রম করে আরামকে ত্যাগ করতে পেরেছে। সন্তানদেরকে সত্যিকার মানুষ করা ও যোগ্য বানানোর গৌরব সে-ই লাভ করতে পারে, যে তাদের প্রয়োজনে নিজের অনেক আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করে প্রয়োজনীয় খরচ জোগায়। দেশের কল্যাণ তাদের দ্বারাই সম্ভব হয়, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

ইতিহাসে তাদেরই গৌরবগাথা লেখা হয়, যারা ত্যাগের পথে মানবজাতির খিদমত করে। ত্যাগই হলো মনুষ্যত্বের পথ। ভোগ অবশ্যই পশুত্বের পরিচয় বহন করে।

দুনিয়ায় কাজের যোগ্য থাকার জন্য যতটুকু ভোগের দরকার, আল্লাহ ততটুকু ভোগকে 'ইবাদাত' বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করে ভোগ করাই হলো পশুত্ব।

সূরা বালাদ

২০ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٠ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢

১. না,[১] আমি এ শহরের কসম খাচ্ছি।

২. আর (অবস্থা এই যে, হে রাসূল!) আপনাকে এ শহরে (মক্কায়) হালাল করে নেওয়া হয়েছে।[২]

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝٣

৩. আরো কসম করছি, পিতার (আদম [আ]) ও সেই সন্তানের, যা সে জন্ম দিয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤

৪. আসলে আমি মানুষকে কঠিন কষ্ট ও পরিশ্রম করার জন্য সৃষ্টি করেছি।[৩]

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝٥

৫. সে কি মনে করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা খাটবে না?

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦

৬. সে বলে, আমি ঢের মাল উড়িয়ে দিয়েছি।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝٧

৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?[৪]

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝٩

৮-৯. আমি কি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দিইনি?[৫]

---

১. অর্থাৎ, তোমরা যা মনে করে বসে আছ, আসল সত্য তা নয়।

২. হে রাসূল! যে মক্কা শহরে জীব-জন্তুর জন্য পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে, সেখানে আপনার উপর যুলুম করাকে জায়েয করে নেওয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ, এ দুনিয়া মানুষের জন্য মজা করা ও সুখের বাঁশি বাজানোর জায়গা নয়; বরং পরিশ্রম, কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করার জায়গা। সব মানুষই কোনো না কোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য; কেউ এ থেকে মুক্ত নয়।

৪. অর্থাৎ, এ অহঙ্কারী লোকেরা কি বোঝে না যে, কোনো মহাশক্তিমান আল্লাহ আছেন, যিনি দেখছেন যে, এরা কীভাবে ধন-সম্পদ কামাই করেছে, আর কোন্ পথে এসব খরচ করেছে?

৫. অর্থাৎ, আমি কি তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি হাসিল করার উপায়-উপকরণ দান করিনি?

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

১০. আর তাকে কি আমি (ভালো ও মন্দ) দুটো সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?

فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

১১. কিন্তু সে কঠিন দুর্গম পাহাড়ি পথ পার হতে সাহস করেনি।

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾

১২. আর তুমি সেই কঠিন দুর্গম গিরিপথটি সম্পর্কে কী জান?

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

১৩. কোনো ঘাড় (দাস)-কে গোলামি থেকে মুক্ত করা।

أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

১৪-১৫-১৬. অথবা ভুখা থাকার দিন কোনো নিকটবর্তী ইয়াতীমের বা কোনো ধূলিমলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

১৭. এরপর ঐ লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং একে অপরকে সবর করার ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) দয়া করার উপদেশ দিয়েছে।

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

১৮. এরাই হচ্ছে ডান দিকের লোক।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾

১৯. আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মানতে অস্বীকার করেছে, তারাই বাম দিকের লোক।[৬]

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ﴿٢٠﴾

২০. তাদের উপরই আগুন ছেয়ে থাকবে।

৬. ডানদিক ও বাঁদিক মানে, ডান হাতের দিক ও বাঁ হাতের দিক। হাশরের ময়দানে নেক লোকদেরকে আল্লাহর দরবারের ডানদিকে ও বদ লোকদেরকে বাঁদিকে রাখা হবে। আরবী ভাষায় ডানদিকের লোক মানে সম্মানিত, বিশ্বস্ত ও ভাগ্যবান। আর বাঁদিকের লোক মানে হেয়, দুর্ভাগা, অশুভ ইত্যাদি। 'সে আমার ডান হাত' বললে প্রশংসা বোঝায় এবং 'এ কাজটা তো আমার বাঁ হাতের লেখা' বললে অবহেলা বোঝায়। আরবীতেও এ জাতীয় অর্থে ডান ও বাঁ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

৯১. সূরা শাম্‌স

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম : সূরার প্রথম শব্দটিই এ সূরার নাম।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ : মাক্কী যুগের যে সময় ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা বেশ জোরে-শোরে চলছিল, সে সময় সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত, সৎ কাজ ও অসৎ কাজের পার্থক্য এবং যারা এ পার্থক্য না বুঝে অসৎ পথে চলে, তাদের পরিণাম।

আলোচনার ধারা

১-৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, আসমান ও জমিন এবং মানুষের নাফস ও তার স্রষ্টার কসম খেয়ে বলতে চাচ্ছেন, এ সবের প্রত্যেকটারই নিজস্ব স্বভাব রয়েছে। আকারে ও প্রকারে যেমন এরা এক রকম নয়, কাজ-কর্মে এবং পরিণামেও এরা এক নয়।

৮-১০ নং আয়াতে ঐ কথাটি বলা হয়েছে, যে কথার মধ্যে এতগুলো বিষয়ের কসম খাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টি করে অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। মানুষের ফিতরাত বা প্রকৃতির মধ্যেই ভালো ও মন্দের পার্থক্য বোঝার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত এবং আসমান ও জমিন যেমন একটা আরেকটার বিপরীত, তেমনি 'ফুজুর' ও 'তাকওয়া' বা বদী ও নেকী, কুপথ ও সুপথ, পাপ ও পুণ্য কখনো এক হতে পারে না এবং এর পরিণাম ও ফলাফল কিছুতেই এক হবে না।

এ অবস্থায় মানুষের সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি একই ধরনের কাজের ফল নয়। তারাই সফলতা লাভ করবে, যারা নাফসকে পবিত্র করেছে এবং বিবেকের কথামতো তাকওয়ার পথে চলেছে। আর যারা বিবেককে দাবিয়ে রেখে কুপ্রবৃত্তির তাকীদে পাপ পথে চলেছে তারা অবশ্যই বিফলতা ও অশান্তি ভোগ করবে।

১১-১৫ নং আয়াতে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ক্ষান্ত করেননি। তাকওয়ার পথে চলা শেখানোর জন্য তিনি রাসূলও পাঠিয়েছেন; কিন্তু যারা নাফসকে পবিত্র করে না বরং বিবেককে দমন করে রাখে, তারা রাসূলকেও অমান্য করে।

এ প্রসঙ্গে ছামূদ জাতির উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে, হযরত সালেহ (আ) ছামূদ জাতিকে তাকওয়ার পথে চলার জন্য যখন উপদেশ দিলেন তখন তারা তাঁকে রাসূল বলেই মানতে রাজি হলো না। তারা তাঁর নিকট রাসূল হওয়ার প্রমাণ দাবি করল। হযরত সালেহ (আ) একটি উটনীকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন এবং সাবধান করে দিলেন যে, ঐ উটনীর কোনো ক্ষতি করলে তাদের উপর আল্লাহর গযব পড়বে। এ সত্ত্বেও তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেলল এবং এর পরিণামে ছামূদ জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন।

ছামূদের এই কাহিনীর মাধ্যমে ইসলামবিরোধীদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে তোমরা ঐ ব্যবহারই করছ, যা হযরত সালেহ (আ)-এর সাথে ছামূদ জাতি করেছিল।

তোমরা কি ঐভাবে ধ্বংস হতে চাও? এখনও সময় আছে, বাঁচতে হলে ঈমান আনো।

সূরা শাম্‌স

১৫ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٥ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١

১. কসম সূর্য ও এর রোদের।

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢

২. কসম চাঁদের, যখন সে সূর্যের পেছনে পেছনে আসে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣

৩. কসম দিনের, যখন সে সূর্যকে উজ্জ্বল করে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤

৪. কসম রাতের, যখন সে তাকে (সূর্যকে) ঢেকে দেয়।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥

৫. কসম আসমানের এবং যিনি একে কায়েম করেছেন, তাঁর।

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

৬. কসম জমিনের এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন, তাঁর।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧

৭. কসম (মানুষের) নাফসের এবং যিনি তাকে ঠিকঠাকভাবে তৈরি করেছেন তাঁর।[১]

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨

৮. তারপর তিনি তার গুনাহ ও তাকওয়া তার উপর ইলহাম করেছেন।[২]

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩

৯. অবশ্যই সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে তার (নাফসকে) পরিশুদ্ধ করেছে।

১. মানে, তাকে এমন শরীর, মগজ ও জ্ঞান-বুদ্ধি এবং এমনসব শক্তি ও যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সে দুনিয়ায় ঐ সব কাজ করার উপযুক্ত হয়েছে, যা মানুষের করণীয়।

২. এখানে ইলহাম করার দু'রকম অর্থ হতে পারে। এক অর্থ– স্রষ্টা মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দু'রকম ইচ্ছা-আগ্রহ ও মনোভাব সৃষ্টি করেছেন। আরেক অর্থ– প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে চরিত্র ও নৈতিকতার ব্যাপারে ধারণা দান করেছেন যে, কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ।

ভালো চরিত্র ও ভালো আমল এবং মন্দ চরিত্র ও মন্দ আমল এক রকম হতে পারে না। কুকর্ম (ফুজুর) অবশ্যই খারাপ এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকা (তাকওয়া) নিশ্চয়ই ভালো। ভালো ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা মানুষের নিকট অজানা নয়; বরং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির নিকট তা অতি পরিচিত। আল্লাহ তাআলা জন্মগতভাবেই মানুষকে ভালো ও মন্দের স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

১০. আর সে-ই বিফল হয়েছে, যে তাকে (সুমতি) দাবিয়ে দিয়েছে।[৩]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١

১১. ছামূদ (জাতি) নিজেদের বিদ্রোহের দরুন (নবীকে) মিথ্যা বলে অমান্য করেছে।

إِذِ انْۢبَعَثَ أَشْقٰىهَا ۝١٢
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣

১২-১৩. যখন ঐ জাতির সবচেয়ে হতভাগা দুষ্ট লোকটা খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উটনীর উপর হাত তোলো না এবং তাকে পানি খেতে (বাধা দিও না)।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۚ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤

১৪. কিন্তু তারা তার কথাকে মিথ্যা গণ্য করল এবং উটনীকে মেরে ফেলল; অবশেষে তাদের পাপের ফলে তাদের রব তাদের উপর মহাবিপদ চাপিয়ে দিলেন এবং তাদের সবাইকে একসাথে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।[৪]

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

১৫. আর (আল্লাহ তাঁর এ কাজের) কোনো খারাপ পরিণতির ভয় করেন না।[*]

৩. নাফসকে পবিত্র করার অর্থ হলো, একে সকল মন্দ থেকে পবিত্র করা এবং যা ভালো তা এর মধ্যে বাড়িয়ে দেওয়া। আর নাফসকে চাপা দেওয়ার অর্থ হলো, কুপ্রবৃত্তি বা কুমতিকে আরো উসকিয়ে দেওয়া এবং সুমতিকে চাপা দিয়ে রাখা।

৪. এ ঝগড়াটে লোকটি জনগণের ইচ্ছা ও দাবি অনুযায়ী উটনীকে মেরে ফেলেছিল বলে গোটা দেশবাসীর উপরই আযাব নাযিল হয়েছিল। সূরা কামারের ২৯ নং আয়াতে এর বিবরণ রয়েছে।

* এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে– 'আল্লাহ তাদের পেছনে লেগে থাকতে ভয় পান না।' অর্থাৎ, গোটা ছামূদ জাতিকে শাস্তি দিতে গিয়ে দুনিয়ার বাদশাহদের মতো তিনি ঘাবড়ান না বা এর কোনো কুফলেরও ভয় করেন না।

৯২. সূরা লাইল

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম শব্দটি দিয়েই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরা শাম্‌সের সাথে এ সূরার এত মিল যে, মনে হয় এ দুটো সূরা কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়েছে। একই কথাকে দু'রকমভাবে এ দুটি সূরায় বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। মানবজীবনের দু'রকম পথের পার্থক্য, এর পরিণাম ও ফলাফলের পার্থক্য।

আলোচনার ধারা

আলোচনার বিষয়ে সূরাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১ থেকে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত এক ভাগ, আর ১২ থেকে ২১ নং আয়াত পর্যন্ত আরেক ভাগ। প্রথম ভাগে নৈতিকতা ও চরিত্রগত দিক দিয়ে মানুষের বাস্তব কাজ-কর্মের পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

১-৪ নং আয়াতে রাত ও দিন এবং নর ও নারীর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, রাত ও দিন এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোক যেমন এক নয়, তেমনি সব মানুষের চরিত্রও এক রকম নয়।

৫-৭ আয়াতে অতি অল্প কথায় মাত্র তিনটি কাজের উল্লেখ করে এক ধরনের চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা সুপথে মাল খরচ করে, আমাকে ভয় করে চলে এবং যাকিছু ভালো তাকে সঠিক বলে মেনে নেয় তারা যেহেতু নিজেরা ইচ্ছা করেই এ কঠিন পথে চলতে চেষ্টা করেছে, সেহেতু এ পথকে আমি তাদের জন্য সহজ করে দেব।'

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সৎ পথে চলা আসলে কঠিন নয়। এ পথে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই কঠিন। যা ভালো তাকে সবাই ভালো বলতে বাধ্য। কিন্তু ভালোকে মেনে চলাটা সহজ নয়। কারণ যে সমাজ ইসলামী নয়, সে সমাজে কুপথে চলাই সহজ। পরিবেশই কুপথে নিয়ে যায়। কিন্তু ঐ পরিবেশেও যে ঈমানের পথে চলার ফায়সালা করে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা এ পথকে সহজ করে দেন।

৮-১০ নং আয়াতে অন্য তিনটি কাজের উল্লেখ করে আরেক ধরনের চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, 'যারা ভালো কাজে খরচ করার বেলায় কৃপণ, আর যারা আমার কোনো ধারই ধারে না এবং যা ভালো তাকে অগ্রাহ্য করে, তারা নিজেরাই যেহেতু এ পথ বেছে নিয়েছে, সেহেতু এ পথে চলাও তাদের জন্য সহজ করে দেব।

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষকে ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দেওয়ার ফলে তাদের বিবেক তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার তাকীদ দেয়। তাই বিবেককে অগ্রাহ্য করে কুপথে চলা সহজ নয়। কিন্তু যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে না, তাদের বিবেক ধীরে ধীরে মরেই যায় এবং তখন তাদের স্বভাব এমন হয়ে যায় যে, অসৎ গুণকে মন্দ বলে মনে করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। কুপথে চলাই তাদের নিকট সহজ মনে হয়। তখন বিবেকও আর দংশন করে না।

১১ নং আয়াতে অত্যন্ত দরদের সাথে একটা মহাসত্য বোঝানো হয়েছে। দুনিয়ার লোভই মানুষকে এমন বিবেকহীন ও বোকা বানিয়ে দেয় যে, সে এ সামান্য কথাটুকুও খেয়াল করে না। যে মালের পেছনে সে এমন পাগল হয়ে কুপথে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে, সে মাল মরার পর তার কোন্ কাজে আসবে? এ সত্যটুকু যদি মানুষ ঠিকমতো বোঝে, তাহলে তাকওয়ার পথে চলা তার জন্য কঠিন মনে হবে না।

১২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষকে হেদায়াত করা বা সঠিক পথ দেখানো আমারই দায়িত্ব।' কিতাব ও রাসূল পাঠিয়ে আমি সে দায়িত্বই পালন করেছি। মানুষকে আমি শুধু ভালো ও মন্দ পথ চেনার মতো বিবেক দিয়েই ক্ষান্ত হইনি, কিতাব ও রাসূল পাঠানোও দরকার মনে করেছি।

১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আখিরাত ও দুনিয়ার মালিক আমিই। মানুষ যদি আমার কাছে শুধু দুনিয়াই চায়, তা-ও আমারই হাতে রয়েছে। আর যদি আখিরাত চায়, তাহলে আমার দেওয়া পথেই তা পাবে। এখন মানুষ কোন্টা আমার কাছে চায় তা বাছাই করা তাদেরই দায়িত্ব।

১৪-১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা দোযখের আগুনে জ্বলতে থাক, এটা আমার পছন্দ নয় বলেই রাসূলের মারফতে আমি সাবধান করে দিয়েছি। এত কিছু করার পরও যারা রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা সত্যি হতভাগা। আর এ হতভাগারাই আগুনে জ্বলবে।

১৭-২১ নং আয়াতে সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যারা মুত্তাকী এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে, তাদেরকে আগুন থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তাদেরকে এত পুরস্কার দেবেন, যার ফলে তারাও সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

বিশেষ শিক্ষা

মানুষের হেদায়াতের পূর্ণ ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করেছেন। এ দায়িত্ব যে একমাত্র তাঁরই, সে কথা ১২ নং আয়াতে মাত্র কয়েকটি শব্দেই প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লাহ অত্যন্ত সুবিচারক। তিনি আখিরাতে মানুষের যে বিচার করবেন, তাতে ইনসাফের যাবতীয় শর্ত পূরণ করবেন। এ ইনসাফের দাবি পূরণের জন্য তিনি দুনিয়াতে মানুষের জন্য হেদায়াতের যথেষ্ট বন্দোবস্ত করেছেন। এ ব্যবস্থা না করে আখিরাতে শাস্তি দিলে ইনসাফের দাবি পূরণ হতে পারে না।

মানুষের হেদায়াতের প্রয়োজনেই রাসূল ও কিতাব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোনো কারণে যদি কোনো লোকের নিকট রাসূলের শিক্ষা ও আল্লাহর কিতাবের বাণী না পৌঁছে, তাহলে যাতে মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য না হয়, সে জন্যই মানুষকে বিবেক দান করা হয়েছে। কোন্টা ভালো ও কোনটা মন্দ, তা বোঝার যোগ্যতা দেওয়ার ফলেই মানুষ কোনো খারাপ পথে না বুঝেই চলে না। মন্দকে মন্দ বলে জানা সত্ত্বেও সে পথেই চলার সিদ্ধান্ত নেয়। এর জন্য সে-ই দায়ী। তাই এর জন্য তাকে শাস্তি দিলে তা মোটেই অবিচার হবে না।

সূরা লাইল

২১ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ اللَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢١ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম রাতের, যখন সে ঢেকে ফেলে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١

২. কসম দিনের, যখন সে আলোকিত হয়।

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢

৩. কসম তাঁর, যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣

৪. আসলে তোমাদের চেষ্টা নানা রকমের।[১]

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤

৫-৬-৭. তবে যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে ও (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) দূরে থেকেছে এবং যা ভালো তাকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে, তার জন্য আমি সহজ পথে চলার সুযোগ করে দেবো।[২]

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧

৮-৯-১০. আর যে কৃপণতা করেছে ও (আল্লাহর প্রতি) বেপরওয়া ভাব দেখিয়েছে এবং যা ভালো তাকে মিথ্যা গণ্য করেছে, তার জন্য আমি কঠিন পথে চলার সহজ সুযোগ করে দেবো।[৩]

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١٠

১১. আর ধন-সম্পদ তার কী কাজে আসবে, যখন সে একদিন ধ্বংসই হয়ে যাবে?

وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ۝١١

১. অর্থাৎ, যেমন দিন ও রাত এবং নর ও নারী একে অপর থেকে আলাদা ধরনের, তেমনি তোমরা যেসব পথে ও যে ধরনের উদ্দেশ্যে কাজ করছ, তাও প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন এবং এর পরিণামও এক হতে পারে না।

২. অর্থাৎ, যে পথ মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবের সাথে খাপ খায়, সে পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেব এবং এর ফল হিসেবে বেহেশতে যাওয়াও সহজ করে দেব।

৩. অর্থাৎ, ফিতরাতের বিরুদ্ধে চলা তার জন্য সহজ করে দেব, যার পরিণামে সে বিনা বাধায় দোযখে গিয়ে পড়বে।

১২. নিশ্চয়ই পথ দেখানো আমারই দায়িত্ব।	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ⑫
১৩. আসলে আখিরাত ও দুনিয়ার মালিক আমিই।	وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ⑬
১৪. তাই আমি তোমাদেরকে জ্বলন্ত আগুন থেকে সাবধান করে দিয়েছি।	فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ⑭
১৫-১৬. যে মানতে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে হতভাগা ছাড়া (ঐ আগুনে) আর কেউ জ্বলবে না।	لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ⑮ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ⑯
১৭-১৮. আর যে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, সেই অতীব পরহেযগার লোককে (ঐ আগুন) থেকে দূরে রাখা হবে।	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ⑰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ⑱
১৯. তার উপর কারো এমন কোনো মেহেরবানী নেই, যার বদলা তাকে দিতে হবে।*	وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ⑲
২০. সে তো শুধু মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে।	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ⑳
২১. অবশ্যই তিনি (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন।	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ㉑

* অর্থাৎ সে এ জন্য দান করে না যে, কেউ তার উপর দয়া করেছে এবং দয়ার বদলে তাকে দান করতে হচ্ছে; বরং সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়ই দান করে।

৯৩. সূরা দোহা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দটিকে নিয়েই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি মাক্কী যুগের একেবারে প্রথমদিকের সূরা বলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

আলোচ্য বিষয়

মূল বিষয় রিসালাত। রাসূল (স)-কে সান্ত্বনাদান ও ওহী বন্ধ থাকার দরুন তিনি যে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তা দূর করা।

নাযিলের পরিবেশ

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কয়েক মাস ওহী আসা বন্ধ থাকায় রাসূল (স) খুব পেরেশান হন। তাঁর মনে এ চিন্তা ঢুকল যে, না জানি আমার এমন কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে, যার কারণে আমার রব আমার উপর নারাজ হয়ে আমাকে ত্যাগ করেছেন। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, 'আপনার রব আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার উপর নারাজও হননি।' সূরা মুয্যাম্মিল ও সূরা মুদ্দাসসির যে পরিবেশে নাযিল হয়েছে তাতে জানা যায় যে, ওহী নাযিল হওয়ার ফলে রাসূল (স)-এর দেহ ও মনে খুব চাপ পড়ত। এসব সূরাই প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। তখনও তাঁর ওহী গ্রহণের অভ্যাস ভালোভাবে হয়নি। তাই প্রথমদিকে ঘন ঘন ওহী নাযিল হতো না। একবার ওহী আসার পর কিছু দিন বন্ধ রাখা হতো। এভাবে কয়েকবার ফাঁক দিয়ে দিয়ে ওহী নাযিলের পর যখন তিনি ওহী গ্রহণে অভ্যস্ত হন তখন ঘন ঘন ওহী নাযিল হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে দিনের আলো এবং রাতের শান্তিময় নীরবতার কসম খেয়ে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, 'আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওহী বন্ধ রাখা হয়নি।' দিন ও রাতের কসম খেয়ে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, দিনের আলোতে পরিশ্রম করার পর বিশ্রামের জন্য রাতের অন্ধকার দরকার। তেমনি ওহী আসার কারণে আপনার উপর এমন কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ে, যার ফলে আপনি শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যান। আপনার মাঝে মাঝে একটু বিশ্রামের দরকার। ওহী দিনের আলোর মতোই আপনাকে কাজে ব্যস্ত রাখে বলে মাঝে মাঝে রাতের মতো বিশ্রাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওহী বন্ধ রাখা হয়।

৪ নং আয়াতে রাসূল (স)-কে আরো উৎসাহ দেওয়ার জন্য এক বড় সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় আপনাকে যেসব বাধা ও অসুবিধায় পড়তে হয়েছে এ অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। আপনার আন্দোলনের প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা ক্রমেই উন্নত হতে

থাকবে। আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে এত কিছু দেবেন, যার ফলে আপনি খুশি হয়ে যাবেন। মক্কা থেকে রাসূল (স)-এর মদীনায় পৌঁছার পর থেকেই এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হতে শুরু হয়। মক্কা বিজয়ের পর গোটা আরবে ইসলামের মহাবিজয়ের মাধ্যমে এ সুসংবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

৫-৮ নং আয়াতে পরম স্নেহের সুরে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে অনুযোগ দিয়ে বলেছেন, 'আপনার মনে এ চিন্তা ঢুকল কী করে যে, আমি আপনাকে ত্যাগ করেছি বা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছি? আমি তো আপনাকে জন্ম থেকেই আপনার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে এসেছি। আপনি সৃষ্টি হওয়ার সময়ই ইয়াতীম ছিলেন। আমি আপনাকে লালন-পালনের সুবন্দোবস্ত করেছি। আপনি আমার পছন্দনীয় পথ চিনতেন না। আমি আপনাকে সে পথ দেখিয়েছি। আপনি গরিব ছিলেন। আমি আপনাকে ধনী বানিয়েছি। এসব থেকে প্রমাণ হয় যে, আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র এবং কোনো সময়ই আমার মেহেরবানী থেকে আপনি বঞ্চিত ছিলেন না। বর্তমানে মাঝে মাঝে যে ওহী বন্ধ রাখি, তাও আপনার উপর দয়া করার কারণেই। সুতরাং ভবিষ্যতেও আমার মেহেরবানী জারি থাকবে। এ বিষয়ে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। যে কঠিন দায়িত্ব আপনার উপর দিয়েছি তার পেছনে আমি আছি।'

৯-১১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন। আসল উপদেশটি শেষ আয়াতে আছে। এতে বলা হয়েছে, আপনার উপর আমি যত নিয়ামত দিয়েছি, তার বদলে আপনিও অন্যের উপর মেহেরবানী করুন। এ বিষয়ে ৯ ও ১০ নং আয়াতে দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, আপনি ইয়াতীম থাকাকালে যেমন আমি আপনার জন্য সুব্যবস্থা করেছি এর শুকরিয়া তখনই হবে, যদি ইয়াতীমের প্রতি আপনি দয়া করেন। আপনি গরিব থাকাকালে আমি আপনার অভাব দূর করেছি। আপনি গরিবদের খিদমত করে এর শুকরিয়া আদায় করুন।

শেষ আয়াতে আল্লাহর নিয়ামতের কথা প্রকাশ করার যে হুকুম করা হয়েছে তার অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর মেহেরবানী মানুষ পাচ্ছে। গোটা দুনিয়া মানুষকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এমনকি দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক ইত্যাদিও এক প্রকার মেহেরবানী। এ দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং সংশোধন হওয়ার সুযোগ হয়। এ সব রকম অবস্থায় শুকরিয়া প্রকাশের ধরন এক রকম হতে পারে না। তবে সামগ্রিকভাবে কয়েকভাবে শুকরিয়া আদায় করা যায় :

১. মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং মনেও কৃতজ্ঞ ভাব নিয়ে এ কথা স্বীকার করা যে, যেটুকু সুখ-সুবিধা ভোগ করছি তার সবই আল্লাহর মেহেরবানীর ফল।

২. হেদায়াত পাওয়ার শুকরিয়া হলো পথভ্রষ্ট মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার চেষ্টা করা।

৩. ধন-সম্পদের শুকরিয়া হলো হালাল পথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীনের পথে খরচ করা।

৪. স্বাস্থ্যের শুকরিয়া হলো জীবনটাকে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে লাগানো।

৫. রোগ-শোক ও বিপদে-আপদে শুকরিয়া হলো আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়া এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় সবকিছু থেকে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করা।

সূরা দোহা

১১ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাক্কী

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. উজ্জ্বল দিনের কসম।

২. কসম রাতের, যখন সে শান্তভাবে ছেয়ে যায়।*

৩. (হে রাসূল!) আপনার রব আপনাকে মোটেই ত্যাগ করেননি, আর অসন্তুষ্টও হননি।**

৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরের অবস্থা আগের অবস্থার চেয়ে ভালো।

৫. শিগ্‌গিরই আপনার রব আপনাকে এত দান করবেন যে, আপনি খুশি হয়ে যাবেন।

৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি এবং পরে আশ্রয় দেননি?

৭. আর তিনি আপনাকে পথ না জানা অবস্থায় পেয়েছেন এবং তারপর পথ দেখিয়েছেন।

৮. তিনি আপনাকে গরীব অবস্থায় পেয়েছেন এবং পরে ধনী করে দিয়েছেন।

৯. কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।

১০. আর যে চায়, তাকে ধমক দেবেন না।

১১. আপনার রবের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ﴿١﴾

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

* ‘সাজা’ শব্দ দ্বারা রাতের অন্ধকার আসার সাথে সাথে রাতের নিঝুম নিরিবিলি অবস্থাও বোঝায়।

** অর্থাৎ, ওহী আসা কিছু দিন বন্ধ থাকার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করেছেন বা তিনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যেমন সব সময় দিনের আলো থাকলে মানুষের আরাম করা সম্ভব হতো না, তেমনি ওহীর আলোও সব সময় জারি থাকা ঠিক নয়। ওহীর কারণে রাসূল (স)-এর উপর দায়িত্বের যে বিরাট বোঝা পড়ে, মাঝে মাঝে ওহী বন্ধ থাকলে তাতে রাতের মতো কিছুটা বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। তাই ওহী বন্ধ থাকা দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি বোঝায় না।

৯৪. সূরা আলাম নাশরাহ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম : প্রথম দুটো শব্দকেই এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময় : এর আগের সূরাটির পরপরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরা দোহার মতোই এ সূরার আলোচ্য বিষয়ও রিসালাত। এখানে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ

রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন শুরু করতেই রাসূল (স)-কে যে কঠিন অবস্থায় পড়তে হলো নবুওয়াতের আগে তিনি এমন অবস্থায় পতিত হননি। ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার পর দেখতে দেখতেই সমাজ তাঁর দুশমনে পরিণত হলো। অথচ এর আগে ঐ সমাজে সবাই তাঁকে সম্মান করত। আগে যেসব আত্মীয়, বন্ধু, বংশের লোক ও মহল্লাবাসীর কাছে তিনি আদরণীয় ছিলেন, তারাই তখন তাঁকে গালি দিতে লাগল।

এখন মক্কাবাসীরা তাঁর কথা শুনতেই চায় না। তাঁকে পথ দিয়ে যেতে দেখলে টিটকারি দেয়। পদে পদে তাঁর কাজে বাধা দেয়। আস্তে আস্তে এসব বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে আপন কাজে তিনি মযবুত হতে লাগলেন বটে, কিন্তু প্রথমদিকে তাঁর মন ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থাই ছিল। এ অবস্থায় রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূরা দোহা নাযিল হয় এবং এর পরপরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচনার ধারা

১-৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে যে বড় বড় নিয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে তিনটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে প্রশ্নের আকারে বলেছেন, আমি কি এতসব নিয়ামত আপনাকে দিইনি? এ বড় বড় মেহেরবানী পাওয়া সত্ত্বেও আপনার এমন মনমরা হওয়ার কোনো কারণ নেই–

১. প্রথম নিয়ামত হলো, আমি আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছি। আপনাকে ইসলামের যে সুন্দর পথে চলার ব্যবস্থা করেছি, তা যে সত্য ও সঠিক এ ব্যাপারে আপনার মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। যারা এখনও ইসলামের এ সৌন্দর্য বুঝতে পারছে না, তাদের বিরোধিতা ও দুর্ব্যবহারে আপনার মন ভেঙে যাওয়া উচিত নয়। আপনি নিজে যখন ঠিক পথে আছেন, তখন অন্য লোকেরা যা-ই বলুক বা করুক, তাতে ঘাবড়ানোর কী আছে?

২. দ্বিতীয় নিয়ামত হলো, মানবসমাজের শান্তি ও কল্যাণের পথ না পেয়ে আপনি অনেক বছর যে রকম পেরেশান অবস্থায় কাটিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত নির্জনে আমার কাছে ধরনা দিয়েছেন, সে পেরেশানি কি আমি দূর করে দিইনি? সে পথ যখন পেয়ে গেছেন, তখন চিন্তার কোনো কারণ নেই। সমাজকে সংশোধন করতে গেলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারা বাধা দেবেই। আপনি এসব বাধার কারণে মন খারাপ করবেন না।

৩. তৃতীয় নিয়ামত হলো, আপনার সুনাম বৃদ্ধি করা এবং মানুষের মধ্যে আপনার মর্যাদা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। আমি আপনাকে আমার রাসূল নিযুক্ত করেছি। মানুষ আপনাকে এ নামেই জানবে। আপনার নাম সারা দুনিয়ায় ছড়াবে। যারা আপনার উপর ঈমান আনবে তারাই আপনার নাম উঁচু করবে। যারা এখনো ঈমান আনেনি, তারা আপনাকে গালি দিচ্ছে বলে আপনি মোটেই পেরেশান হবেন না। এটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

৫ ও ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, দুঃখের পরপরই সুখ আসে। দুনিয়ায় কোনো সুখই দুঃখ ছাড়া লাভ করা যায় না। আপনি যে বিরাট কাজে হাত দিয়েছেন, তার উপর মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি নির্ভর করে। এত বড় সফলতা কি বিনা বাধা ও বিনা কষ্টে সম্ভব? দুনিয়ায় আমি এ নিয়মই রেখেছি যে, উদ্দেশ্য যত মহান হবে, তার জন্য তত বেশি কষ্ট করতে হবে। আপনার সামনে এখন যত বড় কঠিন বাধা দেখা যাচ্ছে, তাতে চিন্তিত হবেন না। এসব মুশকিল বেশি দিন থাকবে না। ইসলামী আন্দোলনের পেছনে আমি রয়েছি। যথাসময়ে আসানী আসবে। আপনি আমার উপর ভরসা রেখে নিজের কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

শেষ দু'আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে এ কঠিন অবস্থার মধ্যে মনকে মযবুত করার জন্য কী করা দরকার সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের কঠিন দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পান, তখনই আমার যিকর করুন। আপনার মনকে অন্য সব চিন্তা-ধান্দা থেকে খালি করে আমার কথাই স্মরণ করুন। এতে আপনি মনে শক্তি পাবেন এবং আন্দোলনের ঝামেলায় মনে যে ক্লান্তি ও পেরেশানি আসে তা দূর হয়ে যাবে। তখন মনে শান্তি বোধ করবেন।

(সূরা রা'দ-এর ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'জেনে রাখ, একমাত্র আল্লাহর যিকর দ্বারাই অন্তর শান্তি লাভ করে।)'

বিশেষ শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে সুখ ও দুঃখকে একসাথে মিলিয়ে রেখেছেন। এ দুটোকে আলাদা করার কোনো উপায় নেই। সুখ পেতে হলে দুঃখ সইতেই হবে। সফলতার সুখ পেতে হলে কঠোর পরিশ্রমের দুঃখকে বরণ করতেই হবে। জমি থেকে ভালো ফসল পাওয়ার মজা পেতে হলে কষ্ট করে জমিনকে তৈরি করতেই হবে। মা হওয়ার তৃপ্তি পেতে হলে সন্তান ধারণের যাতনা ও শিশুকে সেবা-যত্ন করার সাধনা ছাড়া উপায় নেই। এভাবেই দুনিয়ার প্রতিটি সুখকে দুঃখের সাথে মিশিয়ে রাখা হয়েছে।

কিন্তু আখিরাতে ঠিক এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হবে। সেখানে সুখ ও দুঃখকে এমনভাবে আলাদা করা হবে যে, এ দুটোকে একসাথে মেলানোর কোনো উপায় থাকবে না। বেহেশতের সুখ ও দোযখের দুঃখ একত্র হবে না। বেহেশতে শুধু সুখ, আর দোযখে শুধু দুঃখই থাকবে।

আল্লাহর বিধানকে দুনিয়ায় চালু করার মাধ্যমে মানবজাতিকে শান্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনের কঠিন পথে পা দিয়েছে, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের সব সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতেই হবে। ইসলামী সমাজ কায়েম করার বিরাট গৌরব অর্জন করতে হলে সে অনুপাতেই বিরাট ত্যাগও স্বীকার করতে হবে।

সূরা আলাম নাশরাহ

৮ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

১. (হে রাসূল!) আমি কি আপনার জন্য আপনার সিনাকে খুলে দিইনি?[১]

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

২-৩. আর আপনার উপর থেকে আপনার ঐ ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল।[২]

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤

৪. আপনার খাতিরে আপনার (সুনামের) কথা উঁচু করে দিয়েছি।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

৫. (আসল কথা হলো) প্রত্যেক মুশকিলের সাথেই আসানীও রয়েছে।

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

৬. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে।[৩]

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧

৭. তাই যখনই আপনি অবসর পান, তখনি ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য পরিশ্রমে লেগে যান,

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

৮. এবং নিজের রবের দিকেই গভীর মনোযোগ দিন।[৪]

১. সিনা বা বুক খুলে দেওয়ার কথা কুরআন মাজীদে যত জায়গায় আছে, তার দিকে খেয়াল করলে মনে হয় যে, এর দু'রকম অর্থ রয়েছে– (ক) মন-মগজের সব রকম দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের সত্যতার উপর পূর্ণ নিশ্চিতভাবে আস্থাবান হওয়া। (খ) মনের উৎসাহ ও জীবনের উদ্দেশ্য হাসিলের আগ্রহ বেড়ে যাওয়া, কোনো বড় রকমের অভিযান শুরু করতে বা কোনো কঠিন কাজে হাত দিতে মনে দৃঢ়তা বোধ করা। বিশেষ করে নবী হিসেবে যে কঠিন দায়িত্ব এসেছে তা পালন করার জন্য মনে পূর্ণ সাহস ও প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া।

২. এর মানে হলো, নিজের দেশবাসীর মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধ বিরোধিতা দেখে রাসূল (স)-এর গভীর সংবেদনশীল মনে ব্যথা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার যে বোঝা চেপেছিল তা-ই। এ অবস্থায় তিনি মনে তীব্র বেদনা বোধ করছিলেন। কিন্তু জাতিকে ঐ অবস্থা থেকে বাঁচানোর পথ পাচ্ছিলেন না। এ পেরেশানির বোঝাই তাঁর পিঠকে যেন বাঁকিয়ে দিচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা মানুষের হেদায়াতের জন্য রাসূল (স)-কে ইসলামের এমন সুন্দর পথ দেখালেন, যার ফলে ঐ বেদনার বোঝা হালকা হয়ে গেল।

৩. যে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে রাসূল (স)-এর জীবন কাটছিল, সে অবস্থা যে বেশি দিন থাকবে না এবং অতি তাড়াতাড়ি ভালো অবস্থা যে আসবে, সে কথা জোর দিয়ে বলার উদ্দেশ্যেই এ কথাটি দু'বার বলা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ, যখনই আপনার কাজ থেকে অবসর পান, তখন সব দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে আপনার রবের দিকে কেন্দ্রীভূত করুন এবং গভীরভাবে যিকর ও ইবাদাতে মগ্ন হন।

৯৫. সূরা তীন

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দ দিয়েই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

মাক্কী যুগের প্রথমদিকে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। তখনো ইসলামী আন্দোলনের দিকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়নি; তাই বিরোধিতাও দেখা দেয়নি।

আলোচ্য বিষয়

আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রমাণ।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে তীন ও যায়তুন নামক ফল, তূরে সীনা এবং মক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেসব জিনিসের কসম খান, তার সাথে পরবর্তী কথার সম্পর্ক থাকে। অর্থাৎ পরবর্তী কথাটির উপর জোর দেওয়ার জন্যই কসম খাওয়া হয়।

তীন ও যায়তুন ফল ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তূরে সীনাও ঐ এলাকার কাছাকাছি। এসব এলাকায়ই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় নবী ও রাসূল এসেছেন। আর মক্কা শহরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মতো এক বিশ্বনবী আবাদ করেছেন। এখানেই হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কেন্দ্র ছিল। মুহাম্মদ (স) এ শহরেই জন্ম নিয়েছেন এবং কাবা শরীফ এ শহরেই রয়েছে।

৪ নং আয়াতে ঐ কথাটি বলা হয়েছে, যার সাথে উপরের কসমের সম্পর্ক রয়েছে। সে কথাটি হলো, 'আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকারে সৃষ্টি করেছি।' মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এর উপযোগী শরীর ও মন-মগজ দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের সাথে এসব দিক দিয়ে কোনো সৃষ্টির তুলনা নেই। এ মানুষের মধ্য থেকেই নবী ও রাসূল নিযুক্ত হন, যাঁরা ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মানুষকে এমন আকার ও প্রকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সৃষ্টির সেরা হিসেবেই মানুষের পরিচয়। এ কথাটি বলার জন্যই ঐ সব জায়গার কসম খাওয়া হয়েছে, যেখানে নবী ও রাসূলগণের কেন্দ্র ছিল।

মানুষের যে উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত এ আয়াতটিতে আছে, এ জাতীয় কথা কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বহু সূরায় আছে। যেমন বাকারা ৩০, আন'আম ১৬৫, আ'রাফ ১১, হিজ্‌র ২৮, নাম্‌ল ৬২। কোথাও বলা হয়েছে, মানুষকে আল্লাহর ঐ আমানতের বোঝা দেওয়া হয়েছে, যা বহন করার ক্ষমতা আসমান, জমিন ও পাহাড়ের নেই (আহযাব ৭২)। কোথাও বলা হয়েছে, আমি মানুষকে ইজ্জত দান করেছি এবং সৃষ্টির সেরা বানিয়েছি (বনী ইসরাঈল ৭০)।

৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে এতসব মর্যাদার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও এসব সম্মান লাভ করতে আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষকে বাধ্য করেন না। মানুষ যদি ইচ্ছা করে মন্দ পথে চলে, তাহলে তার নৈতিক অধঃপতন ঐ সীমাও পার হয়ে যেতে পারে, যা তাকে পশুর চেয়েও অধম বানিয়ে ছাড়ে। মানুষের মধ্যে দু'রকম সম্ভাবনাই আছে। আল্লাহর পথে সে ফেরেশতার চেয়েও উন্নত হতে পারে। আর উল্টো পথে চলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবও হতে পারে।

৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমান ও নেক আমলই হলো ঐ পথ, যে পথে চলে অধঃপতন থেকে বাঁচা সম্ভব এবং মানুষের উচ্চ মর্যাদা লাভ করা সহজ। মানুষ হিসেবে যে দায়িত্ব দুনিয়ায় দেওয়া হয়েছে, তা পালন করার একমাত্র পথই এটা এবং যারা এ পথে চলবে আখিরাতের চিরস্থায়ী পুরস্কার তারাই পাবে।

শেষ দু'আয়াতে বলা হয়েছে, এ কথা যখন সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষ এক ধরনের পথে চলে উত্তম হয় আর অন্য ধরনের পথে চলে অধম হয়, তখন এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, এ দু'রকমের মানুষের পরিণাম দু'রকমই হতে হবে। যদি দু'রকমের লোকের পরিণাম একই হয়, তাহলে এর অর্থ হবে আল্লাহর রাজত্বে কোনো বিচারই নেই; ইনসাফ তো দূরের কথা।

অথচ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও কাণ্ডজ্ঞান এটাই দাবি করে যে, ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি হতে হবে। তাহলে সব বিচারকের বড় বিচারকের কাছ থেকে এর বিপরীত ব্যবহার কী করে হতে পারে?

৭নং আয়াতে 'ইউকায্যিবুকা'র অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। ইউকায্যিবু অর্থ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, অবিশ্বাসী বানায়, মানতে অস্বীকার করায়। 'কা' অর্থ 'তুমি'। এখানে 'তুমি' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এ বিষয়েই মতভেদ রয়েছে। যদি 'তুমি' বলতে এখানে রাসূল (স)-কে বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ এক রকম হয়। আর যদি 'তুমি' বলে মানুষকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ আরেক রকম হয়।

তাফহীমুল কুরআনে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। অই এর অর্থ করা হয়েছে, 'হে রাসূল! আখিরাতের বিচার ও কর্মফল সম্পর্কে আপনি যা বলছেন, সে বিষয়ে কে আপনার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে?' আল্লাহ কি সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক নন? তাহলে বিনা বিচারে মানুষকে ছেড়ে দেওয়া হবে কেমন করে?

যারা 'তুমি' শব্দ দ্বারা মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে বলে মনে করেন, তারা এ আয়াতকে চতুর্থ আয়াতের সাথে মিলিয়ে অর্থ করেন। চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর ছাঁচে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঈমান ও নেক আমলের অভাবে মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই ঈমানদার ও নেক লোকদের পরিণাম এবং বেঈমান বদ লোকদের পরিণাম এক রকম হতে পারে না। ৭ নং আয়াতে ঐ মানুষকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! আখিরাতে যে বিচার হবে, সে কথা তুমি কী কারণে অবিশ্বাস করছ? কোন্ জিনিস তোমাকে ঐ বিষয়ে অবিশ্বাসী বানাচ্ছে? কে তোমাকে আখিরাত অস্বীকার করতে বাধ্য করছে?'

সূরা তীন

৮ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১-২. তীন ও যায়তূনের[১] কসম।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ①

৩. কসম তূর-ই সিনার*

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ②

৩. এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কার)।

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③

৪. আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④

৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে সবচেয়ে নীচুদের চেয়েও নিচে নামিয়ে দিয়েছি।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑤

৬. অবশ্য তাদেরকে ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কখনো শেষ হবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑥

৭. (হে রাসূল!) অতঃপর (আখিরাতের) শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে কে আপনার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে?**

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ⑦

৮. আল্লাহ কি সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক নন?[২]

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ⑧

১. অর্থাৎ, এসব ফল যে দেশে বেশি উৎপন্ন হয়। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকেই এখানে বোঝানো হয়েছে; সেসব এলাকায় অনেক নবী জন্মগ্রহণ করেছেন।

* তূর এক পাহাড়ের নাম, যেখান মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। এ পাহাড় যে এলাকায় অবস্থিত তা একটা বদ্বীপ, যা মিসরের মূল ভূখণ্ড ও ফিলিস্তিনের মাঝখানে অবস্থিত। এ বদ্বীপটির নাম এ সূরায় 'সীনীন' এবং অন্য আয়াতে 'সাইনা' বলা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত নাম সীনা বলে তরজমায় এ নামই ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় সিনাই পাহাড় নামেই বিখ্যাত।

** এ আয়াতের অনুবাদ এ রকমও হতে পারে : '(হে মানুষ) অতঃপর (আখিরাতের) কর্মফলের ব্যাপারে কোন্ জিনিস তোমাকে অবিশ্বাসী বানায়?'

২. অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট বিচারকদের কাছ থেকেও যখন তোমরা ইনসাফ ও সুবিচার আশা কর আর দাবি কর যে, দোষীকে শাস্তি দেওয়া হোক এবং ভালো কাজের পুরস্কার দেওয়া হোক, তখন আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কী ধারণা রাখ? তোমরা কি মনে কর, সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক ইনসাফ করবেন না? তোমরা কি মনে কর, ভালো ও মন্দ সবাইকে তিনি একভাবে দেখবেন; সবচেয়ে ভালো ও সবচেয়ে খারাপ মানুষকে মরার পর সমানভাবে মাটিতে পরিণত করবেন; কারো ভালো কাজের কোনো পুরস্কার দেবেন না? আল্লাহ সম্বন্ধে এমন বাজে ধারণা তোমরা কীভাবে কর?

৯৬. সূরা 'আলাক

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

দ্বিতীয় আয়াতের 'আলাক' শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

নাযিলের সময়ের দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথম ৫ আয়াত হেরা গুহায় নাযিল হয়েছে। এটাই রাসূল (স)-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী। সূরার বাকি ১৪ আয়াত আরো পরে ঐ সময় নাযিল হয়েছে, যখন রাসূল (স) কাবা শরীফে নামায আদায় করা শুরু করেন আর আবূ জেহেল তাঁকে ধমক দিয়ে নামাযে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

প্রথম ওহী

হযরত আয়েশা (রা) থেকে জানা যায় যে, রাসূল (স)-এর উপর সত্য স্বপ্ন দ্বারা ওহী আসা শুরু হয়। স্বপ্ন দেখার সময় তাঁর মনে হতো, যেন দিনের আলোতে তিনি স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি নির্জনে থাকা পছন্দ করতে লাগলেন এবং হেরা গুহায় রাতের পর রাত ইবাদাতে কাটাতে থাকলেন।

একদিন হেরা গুহায় থাকাকালে হঠাৎ জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, 'পড়ুন'। হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নিজের কথায় এর যে বিবরণ দেন, তা এখানে উল্লেখ করা হলো :

"ফেরেশতার কথার জবাবে আমি বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না।' তখন ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমার দম বন্ধ হয়ে এল। তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'পড়ুন'। আবার আমি বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না।' তিনি আবার আমাকে চেপে ধরলেন। আমার দম বন্ধ হয়ে এল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'পড়ুন'। আমি তখনো বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না।' ফেরেশতা তখন তৃতীয়বার আমাকে ঐভাবে চেপে ধরলেন, যার ফলে আমার সহ্য করা কঠিন হয়ে গেল। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে 'ইকরা' বিসমি রাব্বিকা' থেকে 'মা লাম ইয়া'লাম' পর্যন্ত পড়ে শোনালেন।"

এর পরের ঘটনা হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (স) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে এসে হযরত খাদীজা (রা)-কে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাকো।' কিছুক্ষণ কম্বল জড়িয়ে থাকার পর যখন ভয় দূর হলো, তখন তিনি বললেন, 'খাদীজা, আমার কী হলো?' তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর বললেন, 'আমার জীবনের ভয় ধরে গেছে।' হযরত খাদীজা বললেন, কখনো নয়। আপনার খুশি হওয়া উচিত। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, আমানতের হিফাযত করেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব বহন করেন, গরিবদের অভাব দূর করেন, মেহমানদারি করেন এবং নেক কাজে সাহায্য করেন।'

এরপর হযরত খাদীজা (রা) রাসূল (স)-কে ওরাকা বিন নাওফালের কাছে নিয়ে যান। ওরাকা হযরত খাদীজা (রা)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী ছিলেন এবং ইনজীলের বড় আলেম ছিলেন। সে সময় ওরাকা খুব বৃদ্ধ ছিলেন, অন্ধও হয়ে গিয়েছিলেন। ওরাকা সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, "আরে! এ তো ঐ ফেরেশতাই, যিনি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। হায় আফসোস! আপনার নবুওয়াতের সময় আমি যদি জওয়ান হতাম! হায় আফসোস! আপনার দেশবাসী যখন আপনাকে তাড়িয়ে দেবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম!' রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে?' ওরাকা বললেন, 'হ্যাঁ, যে জিনিস আপনি এনেছেন, এ জিনিস নিয়ে এমন কোনো লোক আসেনি, যার দুশমনি করা হয়নি। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে সকল শক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ফেরেশতা আসার আগে কখনো রাসূল (স)-এর এ খেয়াল হয়নি যে, তিনি রাসূল নিযুক্ত হবেন। হঠাৎ করে ওহী নাযিল হওয়া ও এভাবে ফেরেশতার সাথে দেখা হওয়ার ফলে রাসূল (স)-এর যে অবস্থা হলো, তাতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই মক্কাবাসীরা যত রকম আপত্তিই তুলুক, এ কথা কেউ বলতে পারেনি যে, 'এ লোক যে একটা কিছু দাবি করে বসবে, তা আমরা অনুমান করছিলাম।'

এ ঘটনা থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, নবুওয়াত লাভ করার আগে রাসূল (স)-এর জীবন কত পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র কত উন্নত ছিল। হযরত খাদীজা (রা) তখন ৫৫ বছরের অভিজ্ঞ মহিলা। এর আগে ১৫ বছর রাসূল (স)-এর বিবি হিসেবে তাঁকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোনো দোষই গোপন থাকতে পারে না। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তিনি রাসূল (স)-কে এত মহৎ মানুষ হিসেবে পেয়েছেন, যার ফলে হেরা গুহার ঘটনা শোনামাত্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মতো নেক লোকের কাছে আল্লাহর ফেরেশতাই এসে থাকবে।

এমনিভাবে ওরাকার মতো অভিজ্ঞ, ধার্মিক ও বয়স্ক লোক রাসূল (স)-কে ছোট সময় থেকেই দেখে আসছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবেও তিনি তাঁকে গভীরভাবে জানার সুযোগ পেয়েছেন। হেরা গুহার ঘটনা শোনার সাথে সাথেই তিনি বিনা দ্বিধায় ঐ মন্তব্য করলেন। রাসূল (স)-কে তিনি অতি উন্নত মানের মহাপুরুষ মনে করতেন বলেই তার মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয়নি।

সূরার দ্বিতীয় অংশ নাযিলের পরিবেশ

তখনো প্রকাশ্যে ইসলামের দিকে জনগণকে দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়নি। কিন্তু রাসূল (স)-কে কাবা শরীফে নামায আদায় করতে দেখে কুরাইশ সরদাররা প্রথমে টের পেল যে, তিনি হয়তো নতুন কোনো ধর্ম পালন করছেন। অন্য লোকেরা তো নামায দেখে খুবই বিস্মিত হলো। কিন্তু আবূ জেহেলের জাহেলী মন সহ্য করতে পারল না। সে ধমক দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে বলল, হারাম শরীফে এভাবে ইবাদাত করা চলবে না।

আবূ জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনেই মাটিতে মুখ ঠেকাচ্ছে?' সবাই বলল, 'হ্যাঁ'। সে তখন বলল, 'লাত ও ওযযার কসম! আমি যদি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ের উপর আমি পা তুলে দেব এবং জমিনে তার মুখ ঘষে দেব।'

তারপর দেখা গেল যে, সে রাসূল (স)-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল, সে পেছনে হটে যাচ্ছে এবং হাত দিয়ে এমনভাবে তার মুখ ঢেকে নিচ্ছে, যেন কোনো কিছু থেকে বাঁচার চেষ্টা

করছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী হলো?' সে বলল, 'আমার ও তার মাঝখানে আগুনের এক গর্ত ও ভয়ানক একটা জিনিস দেখলাম।' পরে রাসূল (স) বললেন, 'যদি সে আমার কাছে পৌঁছত, তাহলে ফেরেশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিত।'

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে প্রথম ওহী হিসেবে এটুকু জানানো হয়েছে যে, ইলম বা জ্ঞানের উৎস হলো আল্লাহ, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতে কার কী দরকার, কোন্‌টা কার জন্য ভালো এবং কীভাবে চললে সবার শান্তি হবে, এসব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাই তাঁর নাম নিয়েই ইলম হাসিল করতে হবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই সহীহ ইলম পাওয়া সম্ভব। যে বিদ্যা আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের সাথে খাপ খায় না তা আসলেই কুশিক্ষা।

দ্বিতীয় আয়াতে জানানো হয়েছে যে, মানুষকে কত নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ সুন্দর দেহবিশিষ্ট বানানো হয়েছে। তার মন-মগজ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যেন ভুলে না যায় যে, বুদ্ধি ও জ্ঞান তিনিই দেন। তাই একটু বুদ্ধি হলেই শয়তান ও নাফসের ধোঁকায় পড়ে সে যেন নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বড় মনে না করে এবং আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে অবহেলা করে যেন ধ্বংস ডেকে না আনে।

৩-৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মহান দয়াবান মনিব মানুষকে সামান্য রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করে ক্রমে সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দিয়েছেন। সে মর্যাদা বহাল রাখতে হলে তাঁরই কাছ থেকে জ্ঞান নিতে হবে। ওহীর মারফতে তিনি যে জ্ঞান দান করেন একমাত্র ঐ জ্ঞানের মারফতেই মানুষ সত্যিকার মর্যাদার অধিকারী হতে পারে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর এটা একটা বিরাট মেহেরবানী যে, কলমের মাধ্যমে লেখার বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে মানুষের জ্ঞানকে পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য হেফাযত করার ব্যবস্থা করেছেন। লেখার বিদ্যা না জানলে অতীতের জ্ঞান হারিয়ে যেত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ মানুষ যে উন্নতি করেছে, তা সম্ভব হতো না। ভবিষ্যতে আরো উন্নতি এ কলমের কারণেই সম্ভব হবে। কলমের চর্চা না থাকলে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানকেও সঠিকভাবে হেফাযত করা সম্ভব হতো না।

৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ওহী দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঐ ইলম দান করেছেন, যা চেষ্টা ও সাধনা করে পাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যই রাসূল (স) যে ইলম পেয়েছেন, তা তাঁর গবেষণার ফল নয়, নিছক আল্লাহর দান। যে বিদ্যা মানুষ সাধনা ও গবেষণা করে পেতে পারে, তার জন্য নবী পাঠানোর দরকার হয় না। নবীর কাছে ঐ জ্ঞানই আসে, যা ওহী ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই।

সূরার শুরুতে 'ইকরা' বা 'পড়ুন' বলা হয়েছে। এতে মনে হয় যে, জিবরাঈল (আ) লিখিতভাবে একটি আয়াত রাসূল (স)-এর সামনে পেশ করেছিলেন। কিন্তু পড়তে না জানার ফলে পরে মুখে শুনিয়ে দিলেন। এরপর ওহী সব সময় তিলাওয়াত করেই রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছানো হয়েছে। রাসূল (স)-এর নির্দেশে কয়েকজন সাহাবা লেখার কাজ সমাধা করতেন। যখন যতটুকু নাযিল হতো, তখন ততটুকুই লিখে রাখা হতো, যাতে কোনো অংশ হারিয়ে না যায়। এর দ্বারাও কলমের গুরুত্ব বোঝা যায়।

৬-৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যেটুকু ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার ফলে মানুষ বেপরোওয়া হয়ে চলে। আল্লাহ যে একদিন

তাকে পাকড়াও করবেন, সে কথা ভুলে যায়। তাই সে বিদ্রোহী হতে সাহস পায়। কিন্তু সে যে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছেই ফিরে যাচ্ছে, সে কথা সে খেয়াল করে না। আল্লাহ বিদ্রোহীদের কথা এখানে সাধারণভাবে বলার পর পরবর্তী আয়াতে বিশেষ করে আবূ জেহেলের নাম উল্লেখ না করেই তার ধৃষ্টতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৯-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আবূ জেহেল আল্লাহর রাসূলকে নামাযে বাধা দিচ্ছে অথচ রাসূলই ঠিক পথে আছেন এবং মানুষকে তাকওয়ার পথে চলার শিক্ষা দেন। আবূ জেহেল কি জানে না যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন এবং সময়মতো গ্রেফতার করবেন?

১৫-১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আবূ জেহেলকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, যদি সে রাসূল (স)-কে নামায আদায়ে বাধা দেওয়া থেকে বিরত না হয় তাহলে তার মাথার চুল ধরে তাকে ফেরাব। তার সমর্থকরা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। হলোও তাই। আযাবের ফেরেশতা তার সামনে দোযখের আগুন দেখিয়ে তাকে ঐ ধৃষ্টতা থেকে বিরত করল।

শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে অভয় দিয়ে বলেছেন, আবূ জেহেলের পরওয়া না করে আপনি যেভাবে নামায আদায় করছিলেন, সেভাবেই করতে থাকুন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করুন। আল্লাহ আপনার সাথেই আছেন।

সূরা 'আলাক

১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١

২. তিনি জমাট রক্তের পিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

৩. আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣

৪. যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

৫. মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না।[১]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

৬-৭. কক্ষনো নয়! মানুষ বিদ্রোহ করে। কারণ সে দেখে যে, সে অন্যের মুখাপেক্ষী নয়।

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧

৮. অথচ আপনার রবের নিকট অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨

৯-১০. তুমি কি ঐ লোকটাকে দেখেছ, যে এক বান্দাহকে নামায পড়ার সময় নিষেধ করে?[২]

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠

১১-১২. তুমি কী মনে কর, যদি (ঐ বান্দাহ) ঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার আদেশ দেয়?

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰىٓ ۝١١ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢

১৩. তুমি কী মনে কর, যদি (ঐ নিষেধকারী লোকটা সত্যকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣

১. এ কয়টি কুরআন মাজীদের প্রথম আয়াত, যা রাসূলের (স) উপর হেরা গুহায় নাযিল হয়েছিল।

২. এ আয়াতগুলো তখন নাযিল হয়েছে, যখন রাসূল (স) নবুওয়াত লাভ করার পর কাবা শরীফে নামায পড়া শুরু করেছিলেন এবং আবূ জেহেল তাঁকে নামায পড়ায় বাধা দিতে চেষ্টা করছিল।

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾

১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন?

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

১৫. কক্ষনো নয়! যদি সে বিরত না হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তার কপালের উপরের চুল ধরে তাকে টেনে আনব—

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

১৬. যে কপাল মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধী।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾

১৭. সে তার সমর্থকদেরকে ডেকে আনুক।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

১৮. আমিও আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডাকব।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

১৯. কক্ষনো নয়! (হে রাসূল!) তার কথা মানবেন না। আর সিজদা করুন এবং (আপনার রবের) নৈকট্য লাভ করুন। (সিজদার আয়াত)

৯৭. সূরা কাদ্‌র

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের কাদ্‌র শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি মাক্কী যুগের না মাদানী যুগের, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে এর আলোচ্য বিষয় থেকে সূরাটি মাক্কী যুগের বলেই মনে হয়।

আলোচ্য বিষয়

কুরআনের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্বই এ সূরার আলোচ্য বিষয়। সূরা 'আলাকের পরপরই এ সূরাটির স্থান নির্দিষ্ট করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত দিয়ে যে কিতাব নাযিল করা শুরু হয়েছে, সে কিতাবের মর্যাদাই সূরা কাদ্‌রে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে দুটো কথা বলা হয়েছে। একটা কথা হলো, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন, এ কিতাব কোনো মানুষের রচিত নয়। এ কিতাব আমি রচনা করেছি এবং আমিই মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল করেছি। আরেকটা কথা হলো, এই কিতাবের এত বড় মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে যে, একে বছরের যেকোনো একদিন নাযিল করা হয়নি। এর জন্য একটা সময় বাছাই করা হয়েছে, যা বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। সে সময়টি হলো কাদ্‌রের রাত।

২ নং আয়াতে কাদ্‌রের রাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য বলা হয়েছে, হে নবী! ঐ রাতের কথা আপনার কতটুকু জানা আছে? আসলে এ রাতের মর্যাদা শুধু আমিই জানি এবং এ সূরাতে এ বিষয়ে আপনাকে যতটুকু দরকার জানাচ্ছি।

সূরার বাকি ৩টি আয়াতে কাদ্‌রের রাতের মর্যাদা, ফযীলত ও গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। এ রাতটি 'শবে কাদ্‌র' নামেই পরিচিত। 'শব' ফারসী ভাষার শব্দ, এর অর্থ হলো রাত। শবে কাদ্‌র মানে কাদ্‌রের রাত। কাদ্‌র শব্দের দুটো অর্থ রয়েছে এবং উভয় অর্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এক অর্থ হলো তাকদীর, আরেক অর্থ সম্মান, মর্যাদা ও মূল্য। শবে কাদ্‌র তাকদীরের রাত; আর এ কারণেই মহামূল্যবান ও মর্যাদাবান রাত।

তাকদীরের রাত মানে মানবজাতির ভাগ্য রচনার রাত। এ কিতাব নাযিলের মানে শুধু কুরাইশ বংশ বা আরব জাতির কিসমতের ফায়সালা করাই নয়, গোটা মানবজাতির ভাগ্য এ কিতাবের উপর নির্ভর করে। তাই যে রাতে এ কিতাব নাযিল হয়েছে, সে রাতটি অন্য সব রাতের মতো সাধারণ কোনো রাত নয়। সূরা দুখানের (৪৪ নং সূরা) প্রথম কয়টি আয়াতে এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, 'ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের কসম, নিশ্চয়ই আমি এ কিতাবকে বরকতওয়ালা রাতে নাযিল করেছি।

অবশ্যই আমি মানুষকে সাবধান করতে চেয়েছি। ঐ রাতে আমার নির্দেশে সব বিষয়ের সুবিচারমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

এতে বোঝা যায়, এ রাতটি আল্লাহর বিশাল রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে প্রতিটি মানুষ এবং প্রত্যেক দেশ বা জাতি এমনকি গোটা মানবজাতির ব্যাপারে পরবর্তী বছরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফায়সালা করা হয়, তা ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ ফায়সালা অনুযায়ী ফেরেশতাগণ কাজ করেন। সারা বছর এ ফায়সালাকেই বাস্তবে চালু করা হয়। এ রাতটিকে যারা শবে বরাত মনে করেন, তাদের বক্তব্যের কোনো সমর্থন কুরআনে পাওয়া যায় না।

এমনি গুরুত্বপূর্ণ রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। কারণ, এ কুরআনের উপরই মানবজাতির ভাগ্য নির্ভর করে। এ কুরআনের সাথে কোন্ জাতি কী ব্যবহার করে এরই উপর সে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কুরআনকে মানার দাবিদার হয়ে যারা বাস্তবে একে মেনে চলে না, তারা দুনিয়ায় দুর্ভাগা বলে পরিচিত হতে বাধ্য। আর যারা কুরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, ধ্বংসই তাদের ভাগ্য।

এ সূরায় শবে কাদরের তিনটি বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে–

১. এ রাতটি হাজার মাসের চেয়েও বেশি ভালো। এ কথা দ্বারা মক্কার কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা এ কিতাবকে নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে করছ। অথচ কিতাবটি যে রাতে নাযিল হয়েছে, তা এত বড় কল্যাণ ও বরকতের রাত ছিল যে, কখনো ইতিহাসের হাজার মাসেও মানবজাতির কল্যাণের জন্য এত বিরাট কাজ হয়নি, যা এক রাতে কুরআন নাযিলের মাধ্যমে করা হয়েছে।

   হাজার মাসকে গুনে ৮৩ বছর ৪ মাস মনে করা ঠিক নয়। আরবীতে অনেক বড় সংখ্যা বোঝানোর জন্য হাজার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই এখানে হাজার মানে এক হাজারই নয়। অর্থাৎ এ রাতটির ফযীলত যে কত বেশি, তা হিসাব করতে গেলে হাজার রাতের চেয়েও বেশি হবে।

২. এ রাতে জিবরাঈল (আ)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতার বিরাট বাহিনী সব জরুরি বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। এ বিষয়ে সূরা দুখানে যা বলা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ঐ রাতটি ফজর পর্যন্ত শান্তিময় থাকে। অর্থাৎ ঐ রাতে কোনো ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। আল্লাহর সব সিদ্ধান্ত সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। এমনকি কোনো জাতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্তও মানবজাতির আসল কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়।

   হাদীসে আছে, শবে কাদরে ফেরেশতাগণ দুনিয়ার সব এলাকায় আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল বান্দাদের শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন এবং তাদের পক্ষে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করেন। এভাবে আল্লাহ বান্দাদের জন্য গোটা রাতটা পরিপূর্ণভাবেই শান্তিময় হয়ে থাকে।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١

১. আমি এ (কুরআন)-কে কাদ্‌রের রাতে নাযিল করেছি।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢

২. আর কাদ্‌রের রাত সম্বন্ধে তোমার কী জানা আছে?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

৩. কাদ্‌রের রাত হাজার মাসের চেয়েও ভালো।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤

৪. (সে রাতে) ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাঈল) নিজেদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি হুকুম নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

৫. ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত ঐ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়।

৯৮. সূরা বায়্যিনাহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'বায়্যিনাহ্' শব্দটিই এ সূরার নাম।

নাযিলের সময়

এ সূরাটিরও নাযিলের সময় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, এ সূরা মাক্কী যুগে, আর কারো মতে, মাদানী যুগে নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না যে, এ সূরা কোন্ যুগের। তবে যাকাতের কথা উল্লেখ থাকায় সূরাটিকে মাদানী বলে মনে করার পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়

মূল আলোচ্য বিষয় রিসালাত। আল্লাহর কিতাবকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য রাসূলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। সূরা 'আলাক ও সূরা কাদ্‌রের পর এ সূরার অবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা 'আলাকের মাধ্যমে প্রথম ওহী নাযিল হয়। সূরা কাদ্‌রে বলা হয়েছে যে, ওহী কোন্ সময় নাযিল হয়েছে। আর এ সূরায় বলা হয়েছে, ওহী নাযিলের জন্য রাসূল পাঠানো কেন জরুরি।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে রাসূল পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মানুষ আহলে কিতাব হোক আর মুশরিক হোক, তারা যে কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে, তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে হলে তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল পাঠানো দরকার ছিল, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর স্পষ্ট দলিল হিসেবে প্রমাণিত হতে পারেন। তিনি মানুষের সামনে আল্লাহর কিতাবকে এর আসল ও বিশুদ্ধ আকারে পেশ করবেন। এর আগে যেসব কিতাব পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে হক ও সঠিক কথা থাকলেও আহলে কিতাবরা অনেক বাতিল কথা এর মধ্যে শামিল করে আল্লাহর কিতাবের আসল শিক্ষা হারিয়ে ফেলেছে। তাই মানুষের হেদায়াতের জন্য আবার নতুন করে মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে পাঠানো হলো। এ রাসূলই আল্লাহর আসল কিতাব নতুন করে পেশ করছেন। এ রাসূলের কথা ও কাজই আল্লাহর বিশুদ্ধ কিতাবের বাস্তব প্রমাণ। কুফর ও শিরক থেকে বাঁচতে হলে এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে হলে এ রাসূলের কাছ থেকেই হেদায়াত পেতে হবে।

৪ নং আয়াতে আহলে কিতাবের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এরা আল্লাহর দেওয়া সত্য ও সঠিক পথ ছেড়ে নানা রকম ভুল পথে চলার জন্য নিজেরাই দায়ী। তাদেরকে সঠিক পথ না দেখানোর কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়নি; বরং পূর্বেও যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারাও নিজেদের দোষেই হয়েছে। আল্লাহর কাছ থেকে রাসূল ও কিতাব আসার পরও দেখা গেছে যে, একদল লোক আল্লাহর দেখানো পথে চলতে রাজি হয়নি। সুতরাং এখনো রাসূল (স)-কে

আসল কিতাব দিয়ে পাঠানো সত্ত্বেও আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা হেদায়াত কবুল করে না, তাদের গোমরাহীর জন্য তারাই দায়ী।

৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে চিরদিনই সঠিক ও মযবুত দীন একই রকম। খালিসভাবে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা হামেশাই আল্লাহর দীনের পরিচয় বহন করে।

আজ মুহাম্মদ (স) যে এসব শিক্ষা দিচ্ছেন, তা নতুন নয়। ইতঃপূর্বে যাদের কাছেই রাসূল ও কিতাব পাঠানো হয়েছে, তাদেরকেও এসবের বিপরীত হুকুম দেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমানে আহলে কিতাব হওয়ার দাবিদাররা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের পথ তো ছেড়ে দিয়েছেই, নতুনভাবে রাসূল পাঠিয়ে ঐ সঠিক দীনকে তাদের সামনে পেশ করা সত্ত্বেও তারা হেদায়াত গ্রহণ করছে না।

৬-৮ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা এ রাসূলকে মানতে অস্বীকার করবে তারা সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারা পশুর চেয়েও অধম। রাসূলের প্রতি তাদের ঈমান না আনার কোনো যুক্তি নেই। তাই দোযখই তাদের চিরদিনের স্থায়ী ঠিকানা।

আর যারা রাসূলের প্রতি ঈমান এনে নেক আমলের চেষ্টা করবে তারাই সৃষ্টির সেরা। তারা চিরদিনই বেহেশতে থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এত বড় পুরস্কার ও সাফল্য তাদের জন্যই, যারা তাদের রবকে ভয় করে চলেছে এবং পদে পদে হিসাব করে চলেছে যে, কোন্ কাজে মনিব সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট। আল্লাহর সন্তুষ্টি যারা তালাশ করেছে আল্লাহ অবশ্যই তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং পুরস্কার পেয়ে তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরার ৬ ও ৭ নং আয়াতে এক মহা সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন সব উপাদান দিয়ে তৈরি করেছেন যে, এর সঠিক সমন্বয় হলে মানুষ সৃষ্টির সেরা মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু যদি সমন্বয়ের অভাব হয়, তাহলে মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

মানুষ পশুর মতো শুধু দেহসর্বস্ব বস্তুগত জীব নয়। আবার মানুষ ফেরেশতাদের মতো বস্তুহীন সত্তাও নয়। বস্তু ও আত্মার সমন্বয়েই মানুষ। মানবদেহ বস্তুর তৈরি বলে বস্তুজগতের দিকে তার প্রবল আকর্ষণ। কিন্তু তার রূহ তাকে আল্লাহর দিকে টানে। এ রূহেরই পরিচয় পাওয়া যায় বিবেকের দংশনের মাধ্যমে। মন্দকে অপছন্দ করা এবং ভালোকে পছন্দ করাই রূহের স্বভাব। কিন্তু এ রূহবিশিষ্ট মানুষ যখন বস্তুসর্বস্ব পশুর মতো শুধু দেহের দাবি ও নাফসের খায়েশ নিয়েই মত্ত থাকে এবং রূহের দাবিকে অগ্রাহ্য করে বিবেকের বিরুদ্ধে চলে, তখন মানুষ পশুর চেয়ে অধম হয়ে পড়ে। বিবেক থাকা সত্ত্বেও সে বিবেকহীন পশুর মতো হওয়ায় তাকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলা ছাড়া উপায় কী?

আবার এ মানুষ যখন রূহের দাবি মেনে চলে, তখন সে ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ, ফেরেশতার পাপ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু পাপ করার সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ বিবেকের দাবি মেনে চলে, তারা সত্যিই সৃষ্টির সেরা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। আর এ পথ যারা কবুল করে না, তারা অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে বেশি অধম।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١

১. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল[১]-প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (কুফরী করা থেকে) বিরত থাকতে তৈরি ছিল না।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢

২. (অর্থাৎ) আল্লাহর কাছ থেকে একজন রাসূল (না আসা পর্যন্ত), যিনি পবিত্র কিতাব পড়ে শোনাবেন।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣

৩. যার মধ্যে সত্য ও সঠিক কথা লিখিত আছে।[২]

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤

৪. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিকট (সঠিক পথের) স্পষ্ট বিবরণ আসার পরেও তারা বিভেদে লিপ্ত হয়েছে।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥

৫. তাদেরকে এছাড়া অন্য হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা যেন দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে— এটাই সঠিক মযবুত দীন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ

৬. আহলে কিতাব ও মুশকিরদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে,[৩] তারা নিশ্চয়ই দোযখের আগুনে যাবে এবং সেখানে

১. এখানে রাসূল (স)-কেই এক স্পষ্ট দলিল বলা হয়েছে। আর আহলে কিতাব মানে ইহুদি ও খ্রিস্টান। আহলে কিতাব শব্দের অর্থ কিতাবধারী, যাদের নিকট আল্লাহর কিতাব আছে বলে তারা দাবি করে।

২. অর্থাৎ, এমন কিতাব, যাতে কোনো প্রকার মিথ্যা, পথভ্রষ্টতা, নৈতিক দূষণীয় বিষয় নেই; যেখানে শুধু সত্য সঠিক কথাই আছে।

৩. এখানে কুফর মানে মুহাম্মদ (স)-কে মানতে অস্বীকার করা ।

أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

৬. আহলে কিতাব ও মুশকিরদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে,[৪] তারা নিশ্চয়ই দোযখের আগুনে যাবে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই হলো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ভালো।

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

৮. তাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের নিকট চিরস্থায়ী বেহেশত, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়েছেন, তারাও আল্লাহর উপর রাজি হয়েছে। এসব তারই জন্য, যে তার রবকে ভয় করেছে।

৪. এখানে কুফর মানে মুহাম্মদ (স)-কে মানতে অস্বীকার করা ।

৯৯. সূরা যিলযাল

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'যিলযাল' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটিরও মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এর আলোচ্য বিষয় ও বাচনভঙ্গি মাক্কী যুগের ও প্রথমদিকের সূরাগুলোর সাথে বেশি মিল খায়।

আলোচনার বিষয়

মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া এবং ভালো ও মন্দ ছোট ছোট সব আমলও মানুষের সামনে হাজির হওয়া।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর আবার মানুষকে কীভাবে জীবিত করা হবে। গোটা পৃথিবীকে ঝাঁকুনির পর ঝাঁকুনি দিয়ে ওলট-পালট করা হবে এবং জমিনে লুকিয়ে থাকা সব মানুষকে যখন বের করা হবে তখন হয়রান হয়ে সবাই বলে উঠবে, 'জমিনের কী হয়েছে যে, এভাবে হঠাৎ করে ওলট-পালট হয়ে গেল?'

৪ ও ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, জমিনের উপর চলাফেরা করার সময় মানুষ নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়িয়েছে এবং কল্পনাও করেনি যে, একদিন এ বোবা পৃথিবীও মুখ খুলবে এবং জমিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে কথা বলতে থাকবে, কোন্ মানুষ কখন কোথায় কী কাজ করেছে জমিন নিজেই মনিবের আদালতে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। যদিও আল্লাহ সবার সব আমলের খবরই রাখেন, তবুও ইনসাফের দাবি অনুযায়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ না নিয়ে তিনি বিচার করবেন না।

৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন মানুষ আল্লাহর আদালতে ব্যক্তিগতভাবেই হাজির হবে। বংশ, দল, জাতি বা দেশ হিসেবে একজোট অবস্থায় সেখানে বিচার হবে না। আল্লাহর দরবারে হাজির করে তাদের সবাইকে নিজ নিজ আমলনামা দেখানো হবে। কে কী করেছে, তা তাদেরকে না দেখিয়ে বিচার করা হবে না। প্রত্যেকের কৃতকর্ম এমনভাবে দেখানো হবে, যাতে কেউ তার প্রতি অবিচার হয়েছে বলে মনে করতে না পারে।

শেষ দু'আয়াতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকের আমল যখন তার সামনে পেশ করা হবে, তখন এমন বিস্তারিত ও পরিপূর্ণভাবে দেখানো হবে যে, বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ বা মন্দ কাজও বাদ যাবে না।

অবশ্য সূরা 'কারি'আতে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ভালো কাজের পুরস্কার ও প্রত্যেক মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়ার নীতি তিনি গ্রহণ করেননি। যাদের বদ আমলের চেয়ে নেক আমল বেশি, তাদের বদ আমলের জন্য তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন না। এটা মানুষের প্রতি মেহেরবান আল্লাহর অসীম দয়ার প্রমাণ।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١

১. যখন জমিনকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে।

وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٢

২. এবং জমিন নিজের (ভেতরের সব) বোঝা বাইরে ফেলে দেবে।

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣

৩. তখন মানুষ বলে উঠবে, এর কী হলো?

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٤

৪. সেদিন (জমিন) নিজের সব খবর বলে দেবে, (যা তার উপর ঘটেছে)।

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝٥

৫. কারণ, (হে রাসূল!) আপনার রবই তাকে (এরূপ করার) হুকুম দিয়ে থাকবেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٦

৬. সেদিন মানুষ আলাদা আলাদা (অবস্থায়) ফিরে আসবে, যাতে তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧

৭. অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

৮. আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

১০০. সূরা 'আদিয়াত

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম শব্দটিই এর নাম।

নাযিলের সময়

এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময় নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয় ও বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট মনে হয় যে, মাক্কী যুগেরও প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। আখিরাতকে বিশ্বাস না করলে কীরূপ নৈতিক অধঃপতন হয়, তা বোঝানো এবং এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, আখিরাতে মনের গোপন কথারও হিসাব নেওয়া হবে।

আলোচনার ধারা

১-৫ নং আয়াতে সেকালের আরবের লুটতরাজ, মারামারি ও চরম অশান্তির একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের খিদমতের জন্য যে ঘোড়া দিয়েছেন, সে ঘোড়াকে তারা ব্যবহার করত একে অপরকে আক্রমণ ও যুলুম করার জন্য। এ অবস্থার দরুন কেউ নিরাপদে ও শান্তিতে ঘুমাতে পারত না। তাদের এ নৈতিক অধঃপতনের আসল কারণ পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬-৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যত রকম উপায়-উপকরণ ও শক্তি দান করেছেন, তা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করে তারা ধন-দৌলতের লোভে ঐসবকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। এরই ফলে তারা অশান্তি ভোগ করে। এরূপ আচরণ আসলে আল্লাহর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। তারা যদি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে আল্লাহর পছন্দমতো ব্যবহার করত, তাহলেই এসব নিয়ামতের প্রকৃত শুকরিয়া আদায় হতো। কিন্তু এরা দুনিয়ার লোভে মত্ত হওয়ায় এরূপ অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছে। এদের বিবেক অবশ্যই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এরা অকৃতজ্ঞ।

৯-১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী করে মানুষ যে অশান্তি ভোগ করে, এর আসল কারণ হলো আখিরাতের প্রতি অবহেলা। যদি মানুষ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত যে, একদিন কবর থেকে আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে এবং তাদের সব রকম আমলের হিসাব দিতে হবে, এমনকি তাদের মনে গোপনভাবে যেসব কুভাব পোষণ করত, তাও তখন প্রকাশ করা হবে, তাহলে তারা এমন অকৃতজ্ঞ হতো না।

সেদিন তাদের মনিবের কাছে তাদের কোনো অবস্থাই গোপন থাকবে না। দুনিয়ায় তারা কে কী কুকাজ করে গেছে এবং কাকে কোন্ ধরনের শাস্তি দিতে হবে, তা আল্লাহর ভালোভাবেই জানা আছে। সেদিন তিনি এসব বিষয় ভালোভাবে জেনে-শুনেই তাদের বিচার করবেন। তিনি কারো উপরই অবিচার করবেন না।

সূরা 'আদিয়াত

১১ আয়াত ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۱۱ رُكُوْعُهَا ۱

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿۱﴾

১. কসম ঐ (ঘোড়া) গুলোর, যারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ায়।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿۲﴾

২. তারপর (খুর দিয়ে) আগুনের ফুলকি ঝাড়ে।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿۳﴾

৩. আর খুব সকালে হামলা করে।

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿۴﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿۵﴾

৪-৫. তারপর এ সময় ধূলি উড়ায়, আর এ অবস্থায়ই কোনো জনসমাবেশে ঢুকে পড়ে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿۶﴾

৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১]

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿۷﴾

৭. আর নিশ্চয়ই সে নিজে এর সাক্ষী।[২]

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿۸﴾

৮. নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মহব্বতে খুব বেশি (মগ্ন)।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿۹﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿۱۰﴾

৯-১০. সে কি ঐ সময়টা জানে না, যখন কবরে যাকিছু আছে, তা বের করা হবে? আর (মানুষের) বুকে যাকিছু (লুকিয়ে) আছে, তা বের করে যাচাই করা হবে?[৩]

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

১১. নিশ্চয়ই সেদিন তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থাকবেন।[৪]

---

১. অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষকে যেটুকু শক্তি দিয়েছেন, তা আল্লাহর মর্জিমতো ব্যবহার করা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে সে শক্তি যুলুম ও অন্যায় পথে ব্যবহার করে অকৃতজ্ঞ হয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না।

২. অর্থাৎ, তার বিবেক এর সাক্ষী, তার আমলও এর সাক্ষী। এমনকি অনেক কাফিরের মুখের কথাও অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়।

৩. অর্থাৎ, মনের মধ্যে যে ইচ্ছা, নিয়ত ও উদ্দেশ্য গোপন আছে, তাও প্রকাশ করে দেওয়া হবে এবং আলাদা করে দেখানো হবে।

৪. অর্থাৎ, আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন যে, কে কেমন এবং কোন্ ধরনের শাস্তি বা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

১০১. সূরা কারি'আহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম : সূরার প্রথম শব্দটি দিয়েই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি যে মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। সূরাটির বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় যে, এটা মাক্কী যুগের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : কিয়ামত ও আখিরাত।

আলোচনার ধারা

১-৩ নং আয়াতে মানুষকে চমকে দেওয়ার মতো কয়েকটি কথা এমনভাবে বলা হয়েছে, যাতে সবাই সেদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। কথাগুলো বলার ভঙ্গি থেকে মনে হয়, যেন কিয়ামতের মহাবিপদ ও দুর্ঘটনা এখনই হাজির হয়ে গেছে। বলা হয়েছে, ঐ বিরাট দুর্ঘটনা যে কী ভয়ানক, তা আমিই জানি। তোমরা সে বিষয়ে কী জান? তোমরা জান না বলেই তাকে অবহেলা করে চলেছ।

৪ ও ৫ নং আয়াতে মাত্র দুটো কথায় কিয়ামতের ভয়াবহ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সেদিন মানুষ পেরেশান হয়ে এমনভাবে সবদিকে ছোটাছুটি করবে, যেমন কীট-পতঙ্গ আগুনের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। আর পাহাড়-পর্বতগুলোর অবস্থা এমন হবে যে, ধোনা পশমি তুলার মতো মনে হবে। এমন মযবুত ও ভারী পাহাড়গুলোর দশাই যদি এরূপ হয়, তাহলে সেদিন মানুষের যে কী দুর্দশা হবে, তা কল্পনাও করা যায় না।

৬-১১ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, আখিরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে, তখন মানুষের বিচার সেখানে কোন্ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হবে। যদি প্রত্যেকের ভালো ও মন্দ সব কাজের ভিত্তিতে বিচার করা হয়, তাহলে কেউ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ, এমন কোনো মানুষ নেই, যার কোনো দোষ বা ভুল হয় না। তাই মেহেরবান আল্লাহ এমন নীতিতে বিচার করবেন, যার ফলে একমাত্র ঐসব লোকই শাস্তি পাবে, যাদের নেক আমলের চেয়ে বদ আমল বেশি। আর যাদের নেক আমল বদ আমলের চেয়ে বেশি, তাদেরকে বদ আমলের শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে বেহেশতে আরামে থাকতে দেওয়া হবে।

আখিরাতে একমাত্র নেকীরই ওযন হবে। তাই পাল্লা ভারী হওয়ার মানে হলো নেকী বেশি হওয়া। আর নেকী কম থাকলে পাল্লা হালকাই হবে। সূরা আ'রাফের ৮ ও ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'ঐদিন শুধু হকেরই ওজন হবে। যার পাল্লা ভারী হবে, সে-ই সফল হবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

বদ আমল বেশি হওয়ার দরুন যারা দোযখে যাবে, তাদের নেক আমল কম হলেও এর কোনো পুরস্কার পাওয়ারই কি তাদের হক নেই? তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, তারা দোযখে শাস্তি ভোগ করার পর এক সময় বেহেশতে যাবে। আর যাদের ঈমান নেই, তাদের কোনো নেক আমল আল্লাহ কবুল করেন না। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত ছাড়া কোনো আমলই পুরস্কারের যোগ্য নয়। তাই বেঈমানের ভালো কাজের কোনো পুরস্কার দেওয়া হবে না।

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. বিরাট দুর্ঘটনা (বিপজ্জনক ঘটনা)।

২. সে বিরাট দুর্ঘটনাটা কী?

৩. আর তুমি ঐ দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে কী জান?

৪-৫. সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার মতো হয়ে যাবে। আর পাহাড়গুলো ধোনা রঙিন পশমের মতো হয়ে যাবে।

৬-৭. তারপর যার পাল্লা ভারী হবে,[১] সে মনের মতো আরামে থাকবে।

৮-৯. আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা* হবে 'হাবিয়া'** (দোযখ)।

১০. হাবিয়া কী, সে বিষয়ে তুমি কী জানো?

১১. এটা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ﴿١﴾

مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿٤﴾

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٥﴾

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾

نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

১. অর্থাৎ, নেকীর পাল্লা ভারী হবে।

* 'উম্মুন' মানে মা। তার মা হাবিয়া হবে মানে– মা যেমনে শিশুর আশ্রয় বা ঠিকানা, তেমনি হাবিয়া দোযখ তার ঠিকানা হবে।

** 'হাবিয়া' মানে গভীর গর্ত। দোযখকে এজন্য 'হাবিয়া' বলা হয়েছে যে, তা খুব গভীর এবং তাতে উপর থেকে দোযখবাসীদেরকে ফেলা হবে।

১০২. সূরা তাকাছুর

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'তাকাছুর' শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী, এ বিষয়ে মতভেদ আছে বলে বিপুলসংখ্যক মুফাসসির সূরাটিকে মাক্কী যুগের বলেই মত প্রকাশ করেছেন। এর বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গি থেকে সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথমদিকের বলেই মনে হয়।

আলোচ্য বিষয় : দুনিয়া পাওয়ার ধান্দার পরিণাম।

আলোচনার ধারা

প্রথম দুই আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে দুনিয়ার লোভে এমনভাবে মত্ত থাকে যে, সারাটা জীবন দুনিয়ার ধান্দায়ই কেটে যায়। কীভাবে একে অপরকে ঠকিয়ে বা জোর-জুলুম করে পয়সাওয়ালা হওয়া যায় এরই প্রতিযোগিতায় মানুষ পাগল হয়ে খাটতে থাকে। দুনিয়ার মজা, বস্তুগত লাভ ও ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে মানুষ একে অপরকে বেশি এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এতটা মশগুল হয়ে থাকে যে, তারা এ কথা ভুলেই যায় যে, একদিন তাদেরকে মরতে হবে। এ ধান্দায় থাকা অবস্থায়ই হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে তাদেরকে কবরে পৌঁছিয়ে দেয়।

৩-৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একেবারেই ভুল ধারণায় পড়ে থাকার ফলে তোমাদের এ দশা হয়েছে। তোমাদের এ ধারণা কোনো সঠিক ইলমের ভিত্তিতে অর্জিত নয় এবং তোমরা যে পথে চলছ, তা মোটেই ঠিক নয়। যদি তোমরা জানতে যে, মরণের পর এর কুফল কী হবে তাহলে কখনো এভাবে চলতে পারতে না। রাসূল (স) তোমাদেরকে এ বিষয়ে যে জ্ঞান দান করেছেন, যদি তা তোমরা কবুল না কর, তাহলে মৃত্যুর পর শীঘ্রই তা জানতে পারবে। কিন্তু তখন জেনে কী লাভ হবে? মৃত্যুর আগেই সে কথা কবুল করে নাও, যদি আখিরাতে বাঁচতে চাও।

৬ ও ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আজ তোমরা যে দোযখের কথা মোটেই বিশ্বাস করতে চাচ্ছ না, মৃত্যুর পর সে দোযখকে নিজের চোখে এমনভাবে দেখতে পাবে যে, তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার যেসব নিয়ামতে মজে থাকার ফলে আখিরাতকে এভাবে তোমরা ভুলে আছ, সেসব নিয়ামত তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই দেওয়া হয়েছিল। তাই এসবকে শুধু নিয়ামত মনে করে আজ যে বিরাট ভুল করছ, তা মৃত্যুর পর টের পাবে। আখিরাতে যখন এসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, কীভাবে এসব হাসিল করেছিলে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করেছিলে, তখন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়ার জীবনে কত বড় ভুল করে গিয়েছ।

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١

১. একজন অপরজন থেকে বেশি (পাওয়ার ধান্দা) তোমাদেরকে ভুলের মধ্যে ফেলে রেখেছে।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

২. এমনকি (দুনিয়া পাওয়ার এ চিন্তা-ধান্দা নিয়েই) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣

৩. কক্ষনো নয়! শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে।[1]

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤

৪. আবার (শোনো), কক্ষনো নয়! শিগৃগিরই তোমরা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥

৫. কক্ষনো নয়! যদি তোমরা বিশ্বাসযোগ্য ইলমের ভিত্তিতে (তোমাদের এ চালচলনের কুফল) জানতে পারতে, (তাহলে এভাবে চলতে পারতে না)।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦

৬. অবশ্যই তোমরা দোযখ দেখতে পাবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧

৭. আবার (শোনো), তোমরা তা এমনভাবে দেখবে, যা ইয়াকীনে পরিণত হয়।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

৮. তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১. শীঘ্রই অর্থ আখিরাতও হতে পারে, মৃত্যুও হতে পারে। কেননা, মরার পরই মানুষ বুঝতে পারে যে, সারা জীবন যেসব কাজকর্মে সে মজে ছিল, তা তার জন্য কতটুকু সৌভাগ্য আর কতটুকু দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে।

১০৩. সূরা 'আসর

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম : সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরা নাযিলের সময় সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে, সূরাটি মাক্কী যুগে অবতীর্ণ। মাক্কী যুগের প্রথমদিকের সূরার যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এ সূরায় স্পষ্ট। ছোট ছোট আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাকে এমন আকর্ষণীয় ভাষায় মাক্কী যুগের প্রথমদিকের সূরায় পেশ করা হয়েছে যে, একবার শুনলে আর ভোলার উপায় নেই। সূরা 'আসরও ঐ জাতীয় সূরার একটি।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরাটি অতি সংক্ষেপে বিরাট বিষয় পেশ করার অতুলনীয় নমুনা। বাছাই করা কয়েকটি মাত্র শব্দে এক দুনিয়ার অর্থ ভরে দেওয়া হয়েছে, যা বর্ণনা করতে হলে বিরাট বইও যথেষ্ট নয়। এতে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সফলতার পথ কোন্‌টি এবং বিফলতা ও ধ্বংসের পথই বা কোন্‌টি।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে বর্ণিত 'আসর' শব্দটির অর্থ হলো সময়। সময়ের কসম করে এমন একটা মহা মূল্যবান কথা অতি অল্প কথায় বলা হয়েছে, যা গোটা মানবজাতির ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। মানবজাতির অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা এ কথার উজ্জ্বল সাক্ষী যে, মানুষ হিসেবে তাদের জীবন সাধারণভাবে ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘ অতীতকাল এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যেসব বিষয়কে সঠিক বলে অকপটে স্বীকার করে এসেছে, বাস্তব জীবনে মানুষ ঐসব কথাকে পালন করেনি। যেসব মূল্যমান ও মূল্যবোধকে মানুষ হিসেবে সবাই সত্য ও পালনযোগ্য বলে মেনে নিতে বাধ্য, সেসবকেই তারা নানা কারণে অমান্য করে চলে। ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে চিরকাল মানুষ যেসব ধারণা পোষণ করে এসেছে, এর কতটুকু মানুষ সত্যিকারভাবে তাদের জীবনে মেনে চলে?

জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের নিকট মানুষের এই পরাজয় কি মানুষ হিসেবে তাদের ব্যর্থতা নয়? যেসব কথাকে তারা কল্যাণকর বলে স্বীকার করেও তা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তারা কি সত্যিকারভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি?

ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে মানুষের এ জাতীয় ব্যর্থতার ফলে কীভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কত জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, মহাকালই এর সাক্ষী। এ সূরার প্রথম দুটো আয়াত এ কথাই ঘোষণা করেছে।

পরের আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে মানুষের ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে একমাত্র ঐসব লোকই রক্ষা পেয়েছে, যাদের মধ্যে চারটি গুণের সমাবেশ হয়েছে। তাদের সংখ্যা যুগে যুগে ও দেশে দেশে কম হতে পারে, কিন্তু তাদের সাফল্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ চারটি গুণের যেকোনো একটির অভাব হলে মানবজীবনে প্রকৃত সফলতা সম্ভব নয়:

১. প্রথম গুণ হলো ঈমান। এর শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। শুধু মুখে স্বীকার করলেই ঈমান পয়দা হয় না। মনে-প্রাণে স্বীকার করাকেই ঈমান বলে। আল্লাহ মনের খবর জানেন। তাই 'তাসদীক বিল জিনান' বা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়াই হলো আল্লাহর নিকট ঈমানের সঠিক পরিচয়। কুরআন মাজীদের অন্য

আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই একমাত্র তারাই ঈমানদার, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং এরপর কোনো রকম সন্দেহে পড়েনি।' (সূরা হুজুরাত ১৫)

'নিশ্চয়ই যারা বলেছে যে, আল্লাহই আমাদের রব এবং এরপর এ কথার উপর মযবুত হয়ে টিকে রয়েছে।' (সূরা হা-মীম সাজদা ৩০)

কুরআন মাজীদে যত কথা বলা হয়েছে, এসবের প্রতি বিশ্বাস করাই ঈমানের দাবি। তবে প্রধানত তিনটি বিষয় বিশ্বাস করাই হলো ঈমানের মূলকথা। আর বাকি সব এ তিনটিরই শাখা-প্রশাখা। এ তিনটি বিষয় 'তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত' নামে পরিচিত।

২. দ্বিতীয় গুণ হলো, আমলে সালিহ বা নেক আমল। কুরআনে যেখানেই নেক আমলের কথা আছে, সেখানেই প্রথমে ঈমানের উল্লেখ রয়েছে। তাই আমলে সালিহ মানে হলো, ঈমানের তাকীদে আল্লাহ ও রাসূলের হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করা। যে কাজের সাথে ঈমানের কোনো সম্পর্ক নেই, যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না এবং যে কাজ রাসূল (স)-এর হেদায়াত ও তরীকা অনুযায়ী হয় না, তা ভালো কাজ মনে হলেও আমলে সালিহ বলে গণ্য হবে না। বীজ ও গাছের যে সম্পর্ক, ঈমানের সাথে আমলে সালিহের সেই সম্পর্ক।

উপরের দুটো গুণ ব্যক্তিগতভাবে যাদের মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে সংগঠনগতভাবে আরো দুটো গুণ থাকতে হবে, যদি তারা ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে চায়। এ দুটো গুণের প্রথমটি হলো, একে অপরকে হকের দিকে ডাকতে থাকা। আর দ্বিতীয়টি হলো, একে অপরকে সবরের তাকীদ দেওয়া। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ দুটো কাজ ঈমানদারদের পক্ষে আলাদা আলাদাভাবে করা সম্ভব নয়। এর জন্য তাদেরকে জামায়াতবদ্ধ হতে হবে এবং সংঘবদ্ধভাবেই এ দুটো কাজ করতে হবে।

৩. চারটি গুণের তৃতীয় গুণটি হলো, একে অপরকে হকের উপদেশ দেওয়া। হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত অর্থবোধক। হকের এক অর্থ হলো, সত্য ও ন্যায়। আরেক অর্থ হলো, অধিকার। প্রথম অর্থে আকীদা, বিশ্বাস ও দুনিয়ার কাজ-কর্মে যা সত্য, সঠিক, ইনসাফপূর্ণ তা-ই হক। আর দ্বিতীয় অর্থে আল্লাহ ও বান্দার যা প্রাপ্য ও অধিকার তাও হক। 'তাওয়াসী বিল হক'-এর দাবি হলো, ঈমানদারদের এমন সজাগ থাকতে হবে, যাতে সমাজে যখনই কোথাও হকের বিপরীত কিছু দেখা যাবে তখনই নিজে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং একে অপরকে এর জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

৪. চতুর্থ গুণটি হলো, 'তাওয়াসী বিস সাবর' বা একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ ও তাকীদ দেওয়া। অর্থাৎ হককে সমাজে চালু রাখতে হলে বাতিলের সাথে বিরোধ ও সংঘর্ষ হবেই। তাই হকের উপর কায়েম থাকতে হলে এবং হকের পক্ষে সমর্থন দিতে গেলে বহু বাধা আসবে, অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং নানা রকম ক্ষতির কারণ ঘটবে। এ অবস্থায়ও যাতে ঈমানদাররা তাদের কর্তব্যে অবহেলা না করে এবং বাধা-বিপত্তি দেখে পিছিয়ে না যায়, সেজন্য তো ধৈর্য ধারণ করবেই; একে অপরকে মযবুত থাকার জন্য আহ্বান জানাবে, একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং সবাইকে সাহস জোগাবে।

বিপদ-আপদ ও বাধা-বিপত্তি দেখে বিরক্ত হয়ে বসে থাকার নাম সবর নয়। মানুষ হক কথা শুনতে চায় না বলে এবং হকের পক্ষে কাজ করতে গেলে বাতিলপন্থিদের নিকট অপমানিত হতে হয় বলে 'সবর ইখতিয়ার' করে চুপ করে থাকা সবরের সম্পূর্ণ বিপরীত। সবর মানে অধ্যবসায়। যত বাধাই আসুক, তার পরওয়া না করে হকের পক্ষে সব অবস্থায় কাজ করতে থাকাই হলো প্রকৃত সবর। ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে হলে ঈমান, আমলে সালিহ, তাওয়াসী বিল হক ও তাওয়াসী বিস সাবর– এ চারটি গুণ একসাথে থাকতে হবে।

সূরা 'আসর

৩ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. সময়ের কসম![1]

২. নিশ্চয়ই মানুষ বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

৩. ঐসব লোক ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, একে অপরকে হক কথার উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে সবর করার উপদেশ দিয়েছে।

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝٢

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

১. সময় মানে গত সময় এবং চলতি সময়ও। সময়ের কসম অর্থ, ইতিহাসও সাক্ষী এবং যে সময় এখন যাচ্ছে তাও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পরের আয়াতে যে কথা বলা হচ্ছে তা এমন সত্য ও খাঁটি, যা সময়ের কসম দিয়ে বলা হয়।

১০৪. সূরা হুমাযাহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের হুমাযাহ্ শব্দ দিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সকল মুফাসসিরই একমত যে, এ সূরাটি মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে। ভাব ও ভাষা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরা।

আলোচ্য বিষয়

মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। সে সময়কার আরব সমাজের ধনী লোকদের বড় বড় কতক চারিত্রিক দোষ এবং আখিরাতে এর ভয়ানক পরিণাম।

সূরা যিলযাল থেকে হুমাযাহ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়

যিলযাল, 'আদিয়াত, কারি'আ, তাকাছুর, 'আসর ও হুমাযাহ্– এ ছয়টি সূরা পরপর এমনভাবে সাজানো আছে যে, এদের একটির আলোচ্য বিষয়ের সাথে পরবর্তী সূরার আলোচ্য বিষয় মিলে একই মূল বক্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মনে হয়। আল্লাহ তাআলা এ কয়টি সূরায় দুনিয়ার জীবনের সাথে আখিরাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টিকে ৬ কিস্তিতে ধাপে ধাপে এমন সুন্দর করে বুঝিয়েছেন যে, সবটুকু মিলে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় পরিণত হয়েছে। একই সূরায় এ সবটুকু কথা বোঝালে মন-মগজে এত ভালোভাবে কথাগুলো বসে যেতে ারত না।

সূরা যিলযালে বলা হয়েছে, আখিরাতে প্রত্যেক মানুষের গোটা আমলনামা তার সামনে রেখে দেওয়া হবে। অণু পরিমাণ আমলও বাদ দেওয়া হবে না। ভালো হোক আর মন্দ হোক, তার সব আমলই সেখানে হাজির করা হবে।

সূরা 'আদিয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে যত কিছু নিয়ামত ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, সে সবের হিসাব আখিরাতে নেওয়া হবে এবং সেখানে শুধু আমলের হিসাবই নয়; কোন্ আমল কী নিয়তে করা হয়েছে তাও সেখানে প্রকাশ করা হবে।

সূরা কারি'আতে কিয়ামতের চিত্র তুলে ধরে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আদালতে আখিরাতে মানুষের কিসমতের ফায়সালা এর উপর নির্ভর করবে যে, কার আমলের পাল্লা ভারী আর কার পাল্লা হালকা। নেকী ও বদী ওজন করে পুরস্কার ও শাস্তির ফায়সালা দেওয়া হবে।

সূরা তাকাছুরে বলা হয়েছে, মানুষ এ বস্তুগত জগতের আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে দোযখকে যতই ভুলে থাকুক, মৃত্যুর পর সে নিজের চোখে তার শাস্তির আয়োজন দেখতে পাবে। তখন দুনিয়ার প্রতিটি নিয়ামত সে কীভাবে হাসিল করেছে আর কীভাবে তা ব্যবহার করেছে, সবই তাকে তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সূরা 'আসরে একেবারে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানবজাতির ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, ঈমান ও নেক আমল এবং এর ভিত্তিতে সমাজকে গঠন করার চেষ্টা ছাড়া মানবজীবন একেবারেই ব্যর্থ ও বিফল। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ভিত্তি ছাড়া যারা জীবনে সফলতা চায়, তারা শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। আর মানবজীবন যেহেতু দুনিয়ায়ই সীমাবদ্ধ নয়, সেহেতু তাদের ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা আখিরাতে আরো ভয়ানক হবে।

এর পরই সূরা হুমাযা'তে সমাজের নেতা ও ধনী লোকদের স্বার্থপরতা ও পরনিন্দা, ধন-সম্পদের লোভ এবং ধন-সম্পদকে সফলতার মাপকাঠি মনে করাকে তাদের ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনটাকেই যারা সবকিছু মনে করে, তাদের চরিত্র এমন হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু এর পরিণাম যে কত 'মর্মান্তিক', তার করুণ চিত্র সূরার শেষাংশে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা কারি'আতে শুধু জ্বলন্ত আগুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরায় বলা হয়েছে, সে আগুনের এমন ক্ষমতা যে, মানুষকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। সে আগুন শুধু শরীরকে পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয় না, অন্তরকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাড়ে। এ আগুন থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না। ঢাকনা দিয়ে আটকে রাখা অবস্থায় আগুনের মধ্যেই ঘেরাও হয়ে থাকতে হবে। সূরা আ'লাতে বলা হয়েছে, দোযখের এত কঠিন শাস্তি সত্ত্বেও তারা মরবে না। মরলে তো আযাব থেকে বেঁচে যেত। কিন্তু এ অবস্থায় বেঁচে থাকাটাকে বাঁচাও বলা যায় না। তাই বলা হয়েছে, তারা মরবেও না, বাঁচবেও না।

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে মানুষের এমন কয়েকটা দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে. যা প্রায় সব লোকের মধ্যেই দেখা যায় :

১. মানুষ নিজের দোষ খুব কমই দেখতে চায়। নিজের বড় বড় দোষকেও ঢেকে রাখতে সবাই ব্যস্ত। এমনকি নিজের বিবেককে শান্ত করার জন্য দোষগুলোর পক্ষেও যুক্তি দেখায়। কিন্তু মানুষ অন্যের সামান্য দোষ দেখলেও তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রকাশ করতে খুব মজা পায়। এটাকে গীবত বলে। বেশি বেশি গীবত করাকেই 'হুমাযাহ্' বলা হয়।

২. অপরের দোষ চর্চা করতে গিয়ে মানুষ শুধু নিন্দা করেই ক্ষান্ত হয় না। গীবতের এক পর্যায়ে গিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও ধিক্কার দিয়ে অন্যকে হেয় করে সে তৃপ্তি বোধ করে। এটাকেই 'লুমাযাহ্' বলা হয়।

৩. টাকা-পয়সা কামাই করা অবশ্যই মানুষের দরকার। জীবন কাটানোর জন্য ধন-সম্পদ নিশ্চয়ই দরকারি জিনিস। কিন্তু টাকা-পয়সার সাথে মানুষ সাধারণত যে মহব্বত প্রকাশ করে, তা অর্থহীন। সে টাকা-পয়সা গুনে গুনেই যেন মজা পায়। অনেক সময় নিজের জরুরি কাজেও পয়সা খরচ করে না। টাকার অংক বড় করে জমিয়ে রাখার মধ্যে সে আরাম বোধ করে। মনে হয় যেন টাকা-পয়সা জমা করাটাই তার জীবনের বড় উদ্দেশ্য।

৪. মানুষ ভুলে যায় যে, একদিন এসব মাল ছেড়ে খালি হাতে চলে যেতে হবে। এ মাল যে স্থায়ী নয় এবং চিরদিন এ মাল যে তার সাথে থাকবে না, সে সহজ হিসাবটাও সে ভুলে যায়। মালের মহব্বত তাকে এমন পাগল ও অবুঝ বানিয়ে ছাড়ে, সে দুনিয়াতে তো মাল ভোগ না করে জমা করেই রাখে, আখিরাতেও এ মালের কারণেই তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।

মানুষের এসব দোষ দূর করার একমাত্র উপায়ই হলো আখিরাতের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস।

সূরা হুমাযাহ্

৯ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٩ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ﴿١﴾

১. ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য, যে (সামনা-সামনি) ধিক্কার দেয় ও (পেছনে) নিন্দা করে বেড়ায়।

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ﴿٢﴾

২. যে মাল জমা করেছে ও গুনে গুনে রেখেছে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ ﴿٣﴾

৩. সে মনে করে যে, তার মাল সব সময় তার সাথেই থাকবে।[১]

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ ﴿٤﴾

৪. কক্ষনো নয়! অবশ্যই এমন জায়গায় তাকে ফেলে দেওয়া হবে, যা (ভেঙে) টুকরো টুকরো করে।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ ﴿٥﴾

৫. সেই টুকরো টুকরো করার জায়গাটি সম্পর্কে তুমি কী জান?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ ﴿٦﴾ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ ﴿٧﴾

৬-৭. (সেটা) আল্লাহর আগুন, (যাকে) বেশি করে জ্বালানো হয়েছে; যা অন্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ ﴿٨﴾

৮. নিশ্চয়ই (এ আগুনকে) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ ﴿٩﴾

৯. (এ অবস্থায় তারা) উঁচু উঁচু থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।[২]

১. এ কথার আরও একটা অর্থ হতে পারে– সে মনে করে যে, তার ধন-রত্ন তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তার মনে কখনো এ কথা আসে না যে, তাকে একদিন এসব ফেলে দুনিয়া থেকে খালি হাতে চলে যেতে হবে।

২. এর কয়েক রকম অর্থ হতে পারে :

ক. দোযখের দরজা বন্ধ করে উঁচু উঁচু খুঁটি গেড়ে দেওয়া হবে, যাতে দরজা না খোলে।

খ. এসব অপরাধী উঁচু উঁচু খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় দোযখের আযাব ভোগ করতে থাকবে।

গ. দোযখের আগুনের শিখা উঁচু উঁচু খুঁটির মতো লম্বা হয়ে উপরে উঠতে থাকবে।

১০৫. সূরা ফীল

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'ফীল' শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটি মাক্কী যুগের। এর ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে খেয়াল করলে মনে হয় যে, মাক্কী যুগের প্রথমদিকেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

সৌদি আরব ও ইয়ামান লোহিত সাগরের পূর্বদিকে এবং এ সাগরের পশ্চিমদিকে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। সৌদি আরবের দক্ষিণ অংশে ইয়ামান এবং ইয়ামানের বরাবর লোহিত সাগরের অপর পারে আফ্রিকার ঐ বিখ্যাত দেশটি অবস্থিত, যেখানে বাদশাহ নাজ্জাশীর শাসনকালে রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ মক্কাবাসীদের অত্যাচারের ফলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেকালে ঐ দেশটির নাম ছিল হাবশা। বর্তমানে ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া নামে পরিচিত। আমরা এ আলোচনায় একে হাবশা নামেই উল্লেখ করব।

৫২৫ খ্রিস্টাব্দে হাবশার খ্রিস্টান শাসকরা ইয়ামান দখল করে নেয়। ১০/১২ বছর পর আবরাহা ইয়ামানের গভর্নর হয়। ধীরে ধীরে আবরাহা সেখানে স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। আবরাহা গোটা আরবে ঈসায়ী ধর্ম প্রচার করার সাথে সাথে আরব ব্যবসায়ীদের হাত থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দখল করার চেষ্টা করে। আরবের পূর্বদিকে ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে এবং পশ্চিম আফ্রিকা ও ইউরোপের সাথে যে ব্যবসা চলত, তা আরবদের মাধ্যমেই চালু ছিল।

আরবদের ধর্মীয় অবস্থা তখন যত বিকৃতই থাকুক, চার হাজার বছর পূর্ব থেকেই (ইবরাহীম (আ)-এর সময়) মক্কার কাবাঘর আরববাসীর নিকট সম্মানের স্থান বলে গণ্য ছিল। এ কাবাঘর যিয়ারতের জন্য রজব, যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম মাসে সমগ্র আরবে মারামারি-কাটাকাটি বন্ধ থাকত। ঐ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এ সময় বিনা বাধায় চলত। আর কাবাঘরের হেফাযতকারী হিসেবে কুরাইশ বংশের লোকেরা সারা বছরই বিনা বাধায় ব্যবসায় করত। গোত্রে গোত্রে যত মারামারি ও লুটতরাজই চলুক, কুরাইশদেরকে কাবাঘরের খাতিরে সবাই সম্মান করত বলে তাদের ব্যবসায়ের কোনো অসুবিধা হতো না।

আবরাহা এ গোটা ব্যবসায় আরবদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারল যে, মক্কার কাবাঘরের মর্যাদার সাথে এর এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, এর মতো সম্মান পাওয়ার যোগ্য কোনো ধর্মীয় কেন্দ্র ইয়ামানে কায়েম করতে না পারলে ঈসায়ী ধর্ম প্রচার ও ঐ ব্যবসায় দখল করার কোনো আশাই পূরণ হতে পারে না। তাই ইয়ামানের রাজধানী সানাআতে এক বিরাট গির্জা তৈরি করে কাবার পরিবর্তে ঐ গির্জা যিয়ারত করার জন্য গোটা আরবে ঘোষণা দেওয়া হলো।

আরবরা ক্ষিপ্ত হয়ে এ গির্জায় আগুন লাগিয়ে দিল এবং অপমান করার উদ্দেশ্যে রাতের বেলা গোপনে সেখানে পায়খানা করে দিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, আবরাহা ষড়যন্ত্র করে নিজের লোক দিয়েই এসব করিয়েছে, যাতে কাবাঘর আক্রমণ করার জন্য অজুহাত পেয়ে যায়। আবরাহা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে, মক্কার কাবাঘর কায়েম থাকতে তার তৈরি গির্জা মানুষকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারবে না। তাই সে কাবাঘরকে ধ্বংস করার জন্য সুযোগ তালাশ করছিল।

৫৭০ সালে তেরটি হাতিসহ ষাট হাজার হাবশী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আবরাহা মক্কার দিকে রওয়ানা হলো। পথে কোনো কোনো আরব গোত্র বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মক্কার কাছাকাছি আসার পর সেনাবাহিনীকে সেখানেই থামানোর আদেশ দিয়ে আবরাহা মক্কার সরদারের কাছে লোক পাঠাল। দূত গিয়ে বলল, বাদশাহ মক্কাবাসীকে আক্রমণ করার জন্য আসেননি। কাবাঘর ভেঙে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ বিষয়ে সরদারের সাথে বাদশাহ কথা বলতে চান।

রাসূল (স)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবই সবচেয়ে বড় সরদার ছিলেন। তিনি দূতের সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব এমন আকর্ষণীয় ছিল যে, আবরাহা তাঁকে দেখেই নিজের আসন থেকে উঠে সম্মানের সাথে তাঁকে নিয়ে আলোচনায় বসল। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনার কোনো কিছুর দরকার থাকলে আমাদের জানালেই হতো, আপনার নিজের এতদূর আসার কী দরকার ছিল? আবরাহা বলল, আমি শুনেছি কাবাঘর নাকি শান্তির ঘর। আমি এ শান্তিকে খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বললেন, এটা আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত আল্লাহ কোনো লোককে এ ঘর দখল করতে দেননি। আবরাহা বলল, আমি এ ঘর না ভেঙে ফিরে যাব না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনি যা চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে ফিরে যান। কিন্তু আবরাহা এ কথা মানতে রাজি হলো না এবং মক্কা আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে যে, আবরাহার সেনাবাহিনী যেখানে অবস্থান করছিল, সেখানে তারা মক্কাবাসীদের উট, ছাগল, গরু ইত্যাদি পালিত পশু দখল করে নিয়েছিল। এর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের ২০০ উটও ছিল। আবরাহার সাথে আলোচনার সময় আবদুল মুত্তালিব যখন তার উট ফেরত চাইলেন তখন আবরাহা বলল, 'আপনি কাবাঘরের খাদেম, আর আমি এসেছি সে ঘর ধ্বংস করতে। এ ব্যাপারে আপনাকে পেরেশান মনে হলো না। অথচ আপনার উটের জন্য এত ব্যস্ত হলেন?' এর জবাবে আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'ঐ ঘরের যিনি মালিক, তিনিই তাঁর ঘরের হেফাযত করবেন। আমি ঐ ঘরের মালিক নই। আমি যেসব উটের মালিক, তা আমার হেফাযতে দিয়ে দিন।' তখন আবরাহা তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। আবদুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে এসে মক্কাবাসীকে বিবি-বাচ্চা নিয়ে পাহাড়ের উপর আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং কতক কুরাইশ সরদারকে নিয়ে কাবাঘরের দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে ধরনা দিলেন, যাতে আল্লাহ তাঁর ঘরকে হেফাযত করেন। এ বিপদের সময় কোনো সরদারই কাবায় রাখা ৩৬০টি মূর্তির কাছে ধরনা দেননি। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সবাই দো'আ করলেন। দো'আয় কীরূপ কাতরভাবে তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন, তা তাফহীমুল কুরআনের তাফসীরে লেখা আছে।

আবরাহা যখন মক্কার দিকে এগিয়ে আসতে চাইল, তখন তার নিজস্ব হাতি 'মাহমুদ' হঠাৎ বসে পড়ল এবং মাহুত তাকে মেরে যখম করা সত্ত্বেও মক্কার দিকে এক কদমও এগোতে রাজি হলো না।

অন্যদিকে যেতে বললে সে দৌড়ে যায়, কিন্তু মক্কার দিকে নিতে চাইলেই বসে যায়। এ সময় হঠাৎ বিরাট একদল পাখি ঠোঁটে ও পায়ে করে কঙ্কর নিয়ে এসে আবরাহার হাবশী সেনাবাহিনীর উপর বৃষ্টির মতো ফেলতে লাগল। যার উপরই এ পাথর পড়ত, তার শরীর গলে যেত, গায়ের গোশত খুলে খুলে পড়ত এবং রক্ত পানির মতো বয়ে যেত। আবরাহাও এভাবেই মরে গেল। ৬০ হাজারের গোটা বাহিনী পালাতে থাকল ও পথে পথে মরতে মরতে শেষ হয়ে গেল। এভাবে আবরাহা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ইয়ামানে হাবশার রাজত্বও খতম হয়ে গেল এবং হাবশার বিরুদ্ধে ইয়ামান বিদ্রোহ করে তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেল। মক্কা থেকে আরাফাহ যাওয়ার পথে মিনা ও মুযদালিফার মাঝামাঝি যে জায়গাটি মুহাসসির নামে পরিচিত, সেখানেই আবরাহার সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি এসে কঙ্করবৃষ্টি বর্ষণ করে। রাসূল (স) আরাফায় যাতায়াত করার সময় এ জায়গাটিকে আল্লাহর গযবের স্থান মনে করতেন এবং তাড়াতাড়ি এ জায়গাটি পার হয়ে যেতেন। এখানে কোনো সময় অবস্থান করতেন না। হজ্জের সময় আরাফাহ থেকে ফিরে আসার সময় মুযদালিফায় হাজী সাহেবগণকে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হয়। তখন সবাই সাবধান থাকেন, যেন ভুলে মুহাসসির নামক এ স্থানটিতে অবস্থান করতে না হয়।

আবরাহার হাবশী বাহিনী সমগ্র আরবে 'আসহাবুল ফীল' বা হাতিওয়ালা বাহিনী নামেই পরিচিত হয় এবং যে বছর এ ঘটনা ঘটে, সে বছরকে 'আমুল ফীল' বা হাতির বছর বলা হয়। এটা এত বড় ঘটনা যে, ঘরে ঘরে এর ব্যাপক চর্চা হয় এবং কবিরাও এ বিষয়ে বহু কবিতা রচনা করে। এ ঘটনা মুহাররম মাসে ঘটে, আর রাসূল (স) রবিউল আউয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আবরাহার ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

আলোচনার ধারা

আবরাহার হাতিওয়ালা বাহিনীকে ধ্বংস করার ঘটনাকে সামান্য কয়েকটি কথায় এ সূরাটিতে পেশ করা হয়েছে। মক্কার সবাই এ বিষয়ে ভালো করেই জানত বলে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। এ সূরা নাযিল হওয়ার মাত্র ৪০-৪২ বছর আগে আবরাহার বাহিনীকে সামান্য পাখির দ্বারা যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তা যে একমাত্র আল্লাহর অসীম কুদরতেই হয়েছে এ কথা গোটা আরববাসী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত। ইতিহাসে এ কথাও স্বীকৃত যে, কুরাইশ সরদাররা কাবাঘরের হেফাযতের জন্য কাতরভাবে একমাত্র আল্লাহর নিকট দো'আ করেছিলেন। আর আল্লাহর কুদরতের চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে কুরাইশরা এত অভিভূত হয়েছিল যে, এরপর দশ বছর তারা মূর্তিপূজা করেনি।

এ সূরাতে আল্লাহর কুদরতের ঐ বাস্তব প্রমাণের ইঙ্গিত দিয়ে বিশেষভাবে কুরাইশদেরকে এবং সাধারণভাবে আরববাসীকে বোঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) তাদেরকে ঐ শক্তিমান আল্লাহর দাসত্ব করারই দাওয়াত দিচ্ছেন, যিনি সামান্য পাখির মাধ্যমে কাবাঘরের দুশমনকে ধ্বংস করেছেন। মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদাত করার দাওয়াত যে রাসূল (স) দিচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যারা আজ দুশমনি করছে তাদের ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত যে, ঐ আল্লাহর গযব তাদের উপরও পড়তে পারে এবং যিনি বাদশাহ আবরাহার আক্রমণ থেকে কাবাঘরকে হেফাযত করতে পারেন, তিনি তাঁর রাসূলকেও কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করতে সক্ষম।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তুমি কি দেখনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী (ব্যবহার) করেছেন?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١

২. তিনি কি তাদের চালাকি বানচাল করে দেননি?

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢

৩-৪. আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন, যারা তাদের উপর পাকা মাটির তৈরি পাথর ফেলছিল।

وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤

৫. এরপর তিনি তাদেরকে (পশুর) চিবানো ভুসির[১] মতো করে দিলেন।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۝٥

১. এটা ঐ ঘটনার কথা, যা রাসূল (স)-এর জন্মের মাত্র ৫০ দিন আগে ঘটেছিল। ইয়ামানের খ্রিস্টান বাদশাহ আবরাহা ষাট হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে কাবাঘর ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা আক্রমণ করে। এ বাহিনীর সাথে কতক হাতিও ছিল। যখন এরা মুযদালিফা ও মিনার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছল, তখন লোহিত সাগরের দিক থেকে দলে দলে এক প্রকার পাখি ঠোঁটে ও পায়ে পাথরের টুকরা নিয়ে এসে আবরাহার বাহিনীর উপর বৃষ্টির মতো ফেলতে লাগল। যার উপর এ কঙ্কর পড়ল, তারই গায়ের মাংস গলে গলে পড়তে থাকল। এভাবে সে বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আরবে এ ঘটনা খুব বিখ্যাত ছিল। এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় মক্কার হাজার হাজার এমন লোক জীবিত ছিল, যাদের চোখের সামনে ঐ ঘটনা ঘটেছে। গোটা আরববাসী এ কথা স্বীকার করত যে, একমাত্র আল্লাহর কুদরতেই এ বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল।

১০৬. সূরা কুরাইশ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'কুরাইশ' শব্দই এ সূরার নাম।

নাযিলের সময়

কেউ কেউ এ সূরাকে মাদানী যুগের বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসির এ সূরাটিকে মাক্কী যুগের বলেই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় আয়াতে 'এই ঘরের রব' কথাটি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ সূরাটি মাক্কী যুগের। এ ঘর বলতে যে কাবাঘরই বোঝায়, এ বিষয়ে সবাই একমত। তাই মাদানী যুগে মক্কার ঘরকে 'এই ঘর' বলা কিছুতেই মানানসই হতে পারে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

কুরাইশ বংশের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষ কুসাই বিন কিলাবের পূর্ব পর্যন্ত আরবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। কুসাইয়ের চেষ্টায় এরা মক্কায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং আল্লাহর ঘরের খাদেমের দায়িত্ব পায়। তারই নেতৃত্বে মক্কা শহরভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। হজ্জের সময় সমগ্র আরব থেকে আগত হাজীদের সন্তোষজনক খিদমতের মাধ্যমে কুরাইশদের মর্যাদা ও প্রভাব বেড়ে যায়।

কুসাইয়ের ছেলে আবদে মানাফ পিতার জীবিতকালেই আরববাসীর নিকট সুনাম অর্জন করে। আবদে মানাফের চার ছেলের মধ্যে হাশিম বড় ছিল। রাসূল (স)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব হাশিমেরই ছেলে। গোটা আরবে কুরাইশ বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম-সুখ্যাতির ফলে হাশিমই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দেয়। সূরা ফীলের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বলা হয়েছে, আরবের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালু ছিল। কিন্তু এ ব্যবসায় তখন ইরানিদের হাতে ছিল। ইরানিরা একদিকে পারস্য উপসাগর দিয়ে দক্ষিণ আরবের মাধ্যমে পূর্বদিকের দেশগুলোর সাথে এবং অপরদিকে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে মিসর এবং সিরিয়ার সাথে এ ব্যবসায় চালু করেছিল। যদিও আরবদের সহযোগিতা ছাড়া এ ব্যবসায় চলতে পারত না, তবুও এ ব্যবসায়ের আসল লাভ ইরানিরাই ভোগ করত।

কুরাইশ নেতা হাশিম সারা আরবে তাদের সুনাম ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে এ বাণিজ্যে আরবদের প্রাধান্য হাসিলের উদ্যোগ নেন। হজ্জের সময় কুরাইশদের উদার ব্যবহার ও আশাতীত খিদমতে আরবের সব গোত্রের লোকই তাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকায় কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে কেউ লুট করত না। এমনকি তাদের নিকট কোনো গোত্রই কোনো রকম ট্যাক্স দাবি করত না। এ ব্যবসায়ের সুযোগে মক্কা শহর আরবের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হলো।

হাশিম ও তার ভাই আবদে শামস, মুত্তালিব ও নাওফাল মিলে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইয়ামান ও হাবশার শাসকদের কাছ থেকে সরকারিভাবে এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমতি হাসিল করে নেয়।

এ ব্যবসায় এতটা উন্নতি লাভ করে যে, এরা চার ভাই আরবে 'ব্যবসায়ী গোষ্ঠী' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এ বাণিজ্য উপলক্ষে আরবের সকল গোত্রের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং চারপাশের রাষ্ট্রগুলোর সাথে আরবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার কারণে কুরাইশ নেতাগণ 'আসহাবুল ঈলাফ' বা 'বন্ধুত্ব ও পরিচয়ের ধারক ও বাহক' হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই 'ঈলাফ' শব্দটি দিয়েই সূরা কুরাইশ শুরু হয়েছে।

কুরাইশদের এ মর্যাদার ফলে সমগ্র আরবে তাদের নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেওয়া হতো। ধন-সম্পদের দিক দিয়েও তারা আরবের সেরা গোত্রে পরিণত হয়। মক্কা শহর আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রের মর্যাদা পায়। আন্তর্জাতিক পরিচিতির দরুন কুরাইশরা ইরাক থেকে উন্নত মানের আরবী বর্ণমালা লেখার শিক্ষা পায় এবং সে বর্ণমালাতেই কুরআন মাজীদ লিখিত হয়। লেখা-পড়ার চর্চা কুরাইশদের মধ্যে যে পরিমাণে ছিল, এতটা আর কোনো গোত্রে ছিল না। এসব কারণেই রাসূল (স) বলেছিলেন, 'কুরাইশরাই জনগণের নেতা'।

এ অবস্থায় যদি বাদশাহ আবরাহার হাবশী বাহিনী কাবাঘর ধ্বংস করতে পারত, তাহলে কুরাইশদের সব কিছুই খতম হয়ে যেত। আল্লাহর ঘর হিসেবে কাবার মর্যাদা শেষ হয়ে যেত, কাবার খাদেম হিসেবে কুরাইশদের সম্মানও খতম হতো। মক্কা আর ব্যবসায় কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হতো না এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরবদের হাত থেকে হাবশীদের হাতে চলে যেত।

আল্লাহর কুদরতে হাবশীরা চরম গযবে পতিত হওয়ার ফলে কাবাঘর 'বায়তুল্লাহ' হিসেবে সমগ্র আরবে আগের চেয়েও বেশি সম্মানিত বলে গণ্য হলো এবং সাথে সাথে কুরাইশদের নেতৃত্ব আরো মযবুত হলো। সবার মনেই এ বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, কুরাইশদের উপর আল্লাহর খাস মেহেরবানী আছে।

আলোচনার ধারা

উপরিউক্ত পটভূমিকে সামনে রাখা হলে সূরা কুরাইশের মর্মকথা বুঝতে কোনো রকম বেগ পেতে হয় না। শীত, গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সারা বছর সর্বত্র ব্যাপক পরিচিতি ও বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে কুরাইশরা যে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে, তার বাহাদুরি যে তাদের নয়, এ কথাই এ সূরায় বোঝানো হয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষ কুসাইয়ের নেতৃত্বে কুরাইশরা মক্কায় সমবেত হওয়ার পূর্বে সমগ্র আরবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা যে অভাব-অনটনে ছিল এবং নিরাপত্তার দিক দিয়ে অন্যান্য আরব গোত্রের মতোই তারা যে অনিশ্চিত অবস্থায় জীবন যাপন করত, সে দুরবস্থা থেকে বর্তমান সুদিনের কারণ যে একমাত্র এই কাবাঘর, সে কথা এখানে তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ ঘরের যিনি মালিক, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা তাদের উচিত। আর মুহাম্মদ (স) তাদেরকে এ কথারই দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াত কবুল করলেই কুরাইশদের মর্যাদা বহাল থাকতে পারে। নেতৃত্বের অহঙ্কারে যদি এ দাওয়াত তারা কবুল না করে তাহলে এ ঘরের মালিকই তাদের মর্যাদা কেড়ে নেবেন।

সূরা কুরাইশ

৪ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যেহেতু কুরাইশরা সুপরিচিত হয়েছে—

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١

২. (অর্থাৎ) শীতকাল ও গরমকালে (বিদেশ) সফরে তাদের পরিচিতি হয়েছে,[১]

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

৩. সেহেতু এ (কাবা) ঘরের[২] মালিকের ইবাদাত করা তাদের উচিত।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে বাঁচিয়ে খাবার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে রেখেছেন।[৩]

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

১. শীত ও গ্রীষ্মের সফর মানে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফর। কুরাইশ বংশের লোকেরা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে এবং শীতকালে দক্ষিণ আরবের দিকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করত। এরই ফলে তারা ধনশালী হতে পেরেছিল।

২. এর অর্থ হলো কাবাঘর, যা মক্কা শহরে অবস্থিত।

৩. মক্কাকে হারাম শরীফ (সবার সম্মানের জায়গা) হিসেবে মানত বলে কুরাইশদের বিশ্বাস ছিল যে, কেউ মক্কা আক্রমণ করবে না। আর কুরাইশরা কাবাঘরের খাদেম ছিল বলে তাদের বণিকদের কাফেলা নিরাপদে আরবের সব এলাকায় যাতায়াত করতে পারত এবং কেউ তাদের সাথে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করত না।

১০৭. সূরা মা'ঊন

মাদানী যুগে নাযিল

নাম : এ সূরার শেষ শব্দটি দিয়ে এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী যুগের, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সূরাটির মধ্যে এমন প্রমাণ রয়েছে, যার দরুন এ সূরাকে মাদানী বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। সূরার ৪ থেকে ৬ নং আয়াতে যাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে, তারা ঐ শ্রেণীর মুনাফিক, যাদের অস্তিত্ব মক্কায় ছিল না। মদীনার বিজয় যুগেই লোকদেখানো নামাযীদের সন্ধান মিলে। এরা আসলে মুসলিম ছিল না; এরা মুসলিম সেজে মুসলিম সমাজে ঢুকে ইসলামের দুশমনি করত। কিন্তু নামাযের জামাআতে যারা হাজির হয় না তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্যই করা হতো না বলে বেচারাদেরকে নামাযী সাজতে হতো। এ জাতীয় মুনাফিক মক্কার সংগ্রামযুগে ছিল না। সে সময় তো খাঁটি মুসলমানদের পক্ষেও প্রকাশ্যে নামায পড়া কঠিন ছিল। মাক্কী যুগের মুনাফিকদের পরিচয় সূরা 'আনকাবূতের প্রথম রুকূ'তে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সূরা মা'ঊন নিঃসন্দেহে মাদানী।

আলোচ্য বিষয় : আখিরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের চরিত্র কী ধরনের হয়, সে বিষয়ে এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা

প্রথম তিন আয়াতে বলা হয়েছে, হে মানুষ! তোমরা কি খেয়াল করে দেখ না যে, যারা এ দুনিয়ার জীবনকেই সবকিছু মনে করে এবং মৃত্যুর পর আখিরাতে যে দুনিয়ার জীবনের হিসাব নিয়ে ভালো ও মন্দ কাজের বদলা দেওয়া হবে– এ কথাকে যারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, তাদের চরিত্র কেমন হয়ে থাকে? এ জাতীয় লোকেরা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ইয়াতীম, মিসকীন ও সমাজের অভাবগ্রস্তদের প্রতি এদের কোনো দরদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, দরদ থাকলেই ত্যাগ সম্ভব। যারা আখিরাতে বদলার আশা করে না, তারা কেন ত্যাগ করবে? অভাবীদের জন্য দরদবোধ করা ও তাদের জন্য খরচ করার মধ্যে তারা দুনিয়ার কোনো লাভই দেখে না। আর বিনা লাভে মানুষ কি কাজ করতে পারে?

৪-৬ নং আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের একটা বড় দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরা যদি কোনো ভালো কাজ করেও, তা দেখানোর উদ্দেশ্যেই করে। ভোটের জন্য, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো স্বার্থ পাওয়ার জন্য দরকার হলে এরা দরদ দেখায় এবং ত্যাগও করে থাকে। এ দরদ আসল নয়, একেবারেই মেকি।

আর এ জাতীয় ত্যাগ আরো বেশি পাওয়ার জন্য করে থাকে। এমনকি এরা যদি দুনিয়ার স্বার্থে ঈমানদার সাজতে বাধ্য হয়, তাহলে নামাযও লোকদেখানোর জন্যই পড়ে এবং এর মধ্যে যত রকমের ফাঁকি দেওয়া যায় সে চেষ্টাই করে।

শেষ আয়াতে এদের ছোটলোকির পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে, এরা দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস পর্যন্ত কাউকে ধার দিতে রাজি হয় না। মানুষের সামান্য কোনো প্রকার উপকারই তাদের দ্বারা হয় না। এরা শুধু নিজের স্বার্থ-চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আখিরাতে বিশ্বাস করলে তাদের এ চেষ্টাই বড় হতো যে, আল্লাহর সৃষ্টির কী কী খিদমত করে আল্লাহকে খুশি করা যায়, যাতে আখিরাতে লাভবান হওয়া যায়। এদের নিকট দুনিয়ার স্বার্থই একমাত্র ধান্দা।

সূরা মা'উন

৭ আয়াত, ১ রুকূ', মাদানী

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ ۝٦

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে (আখিরাতের) বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে?

২-৩. ঐ লোকই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে (তাড়ায়) এবং মিসকীনের খাবার* দিতে উৎসাহ দেয় না।[১]

৪-৫. অতঃপর ঐ নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে,[২]

৬. যারা লোকদেখানো কাজ করে,

৭. (এমনকি) সাধারণ ব্যবহারের জিনিসও** অন্যকে দেয় না।

* খেয়াল রাখা দরকার যে, 'মিসকীনকে খাবার' দেওয়ার কথা বলা হয়নি। 'মিসকীনের খাবার' বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, সচ্ছল লোকদের নিকট মিসকীনদের খাবার আছে। যখন মিসকীনকে খাবার দেওয়া হয়, তখন তার নিজের খাবারটুকুই সে খায়। এ খাবার দাতার দয়া নয় মিসকীনের হক।

১. অর্থাৎ, এরা ইয়াতীমকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, ভদ্রতার সাথেও বিদায় করে না; বরং গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আর এদের মালে যে মিসকীনদের হক আছে, সে কথাও তারা স্বীকার করে না।

২. এর অর্থ নামাযে ভুল করা নয়। নামাযে অবহেলা করা মানে নামাযকে গুরুত্ব না দেওয়া। কখনো পড়ে, কখনো পড়ে না, পড়লেও সময়মতো পড়ে না, নামাযে এমনভাবে যায় যেন এতে কোনো আগ্রহ নেই, দায়ে ঠেকে যেন যায়, নামায পড়া অবস্থায় কাপড় নিয়ে খেলে, বারবার হাই তোলে, নামায পড়ছে অথচ মন সেদিকে নেই, এত তাড়াহুড়া করে পড়ে যে, রুকূ'-সিজদা ঠিকমতো হয় না ইত্যাদি।

** মাউন' মানে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য এমনসব সাধারণ জিনিস, যা প্রতিবেশীরা একে অপর থেকে ধার নেয় এবং কাজ শেষে ফেরত দেয়। এসব জিনিস ধনী-গরিব সবাই ধার চাইতে লজ্জা করে না। এ ধরনের জিনিস দেওয়া-নেওয়া সাধারণভাবে প্রচলিত এবং কেউ চাইলে না দেওয়াটা খুব ছোটলোকের স্বভাব বলে মনে করা হয়। যেমন বই-কলম, বাসন-পেয়ালা, দা-কোদাল-কুড়াল, খন্তা, বিছানা-বালিস, ডেকচি, বালতি ইত্যাদি।

১০৮. সূরা কাওছার

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'কাওছার' শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়াতের দরুন যথেষ্ট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, সূরাটি মাক্কী যুগেই নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকেও বোঝা যায়, তখন ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার মনে করেছেন। এ জাতীয় পরিবেশ মক্কায়ই ছিল। তাই এ সূরাটি নিঃসন্দেহে মাক্কী।

ঐতিহাসিক পটভূমি

সূরা দোহা ও সূরা আলাম নাশরাহ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, নবুওয়াতের প্রথমদিকে যখন রাসূল (স) নিজের বংশের লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন, তখন কেমন ধরনের বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। রাসূল (স) এবং তাঁর সামান্য কয়েকজন সাহাবীর ঐ অসহায় অবস্থায় আল্লাহ তাআলা সূরা দোহার ৩ ও ৪ নং আয়াতে সান্ত্বনা দিলেন যে, 'নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরের অবস্থা আগের অবস্থার চেয়ে ভালো আসবে এবং শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এত দান করবেন যে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।' সূরা আলাম নাশরাহ-এর ৪ থেকে ৬ নং আয়াতে আবার সান্ত্বনা দিলেন যে, 'আমি আপনারই খাতিরে আপনার সুনামের কথা উঁচু করে দিয়েছি, নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথেই আসানী রয়েছে।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, দুশমনরা সারা দেশে আপনার বদনাম করার চেষ্টা করছে দেখে ঘাবড়াবেন না। আমি আপনার নাম উজ্জ্বল করার ব্যবস্থা করেছি। আর বর্তমান পরিবেশ আপনার জন্য কঠিন দেখে পেরেশান হবেন না, এ অবস্থা বেশি দিন থাকবে না।

এমনই কঠিন পরিবেশে সূরা কাওছারের মাধ্যমে একদিকে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তাঁর দুশমনদেরই লেজ কাটা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। সে সময় পরিবেশ কীরূপ নৈরাশ্যজনক ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসেই রয়েছে।

কুরাইশ সরদাররা বলত, 'সে তো গোটা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একঘরে হয়ে গেছে এবং তার কোনো সঙ্গী-সাথি ও সহায়ক নেই।' তারা আরো বলত, 'সে তো শিকড়কাটা গাছের মতো শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে।' মক্কার সরদার আস বিন ওয়ায়েল বলত, 'সে তো জড় কাটা এক লোক, তার কোনো ছেলেসন্তান নেই, মরে গেলে তার নাম নেওয়ারও কেউ থাকবে না।'

রাসূল (স)-এর বড় ছেলে কাশিম (রা) প্রথমে ইন্তিকাল করেন। পরে ছোট ছেলে আবদুল্লাহ (রা)-ও যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন রাসূল (স)-এর আপন চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী আবু লাহাব খুশি হয়ে দৌড়ে গিয়ে এ খবরটাকে একটা সুসংবাদ হিসেবে ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'আজ রাতে মুহাম্মদ নিঃসন্তান হয়ে গেল, তার শিকড় কেটে গেল।'

এ অবস্থায় রাসূল (স)-এর মনে কতটা ব্যথা বোধ হওয়ার কথা, তা সহজেই অনুমান করা যায়। একদিকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার ফলে মুশরিক কুরাইশদের নিকট তিনি হেয় হয়ে গেলেন। বংশের সেরা সম্মানিত বলে যিনি সমাদর পেতেন, তিনি 'বংশের কলঙ্ক' বলে চিহ্নিত হলেন। অপরদিকে যে ক'জন লোক তাঁর সাথি হয়েছিলেন, তাঁদেরকেও কুরাইশরা সমাজচ্যুত করে মারপিট করতে লাগল। এরপর একে একে সব পুত্রসন্তানের ইন্তিকালে যখন পাড়া-প্রতিবেশী ও দূরের আত্মীয়দের কাছ থেকে শোক জ্ঞাপন ও সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিবর্তে আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা পর্যন্ত উৎসব পালন করতে থাকল তখন রাসূল (স)-এর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

সূরা কাওছার আল্লাহ তাআলার ঐ উপলব্ধিরই প্রমাণ। আল্লাহ নিজেই যাঁকে ইসলামী আন্দোলনের কঠিন ময়দানে নামিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বিপদ-আপদ ও দুঃখ-বেদনায় তিনি ছাড়া আর কে সান্ত্বনা দেবেন?

সূরা কাওছার সে সান্ত্বনার সওগাত নিয়েই হাজির হয়েছে। এ সূরাটি কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা। কিন্তু এর মধ্যে রাসূল (স)-এর জন্য এমন মহা সুসংবাদ রয়েছে, যা অন্যকোনো মানুষকে কোনোকালেই দেওয়া হয়নি। সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা রাসূল (স)-এর বিরোধিতা করছে, আসলে তারাই জড় কাটা বা শিকড়ছেঁড়া বলে প্রমাণিত হবে।

আলোচ্য বিষয়

রাসূলের (স) প্রতি আল্লাহর অগণিত দান ও বিরোধীদের প্রতি অভিশাপের ঘোষণা।

আলোচনার ধারা

প্রথম আয়াতে এ সূরা নাযিলের সময়কার নৈরাশ্যজনক অবস্থার যে করুণ বিবরণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ফলে রাসূল (স) শোক-দুঃখ ও ব্যথা-বেদনার যে মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, সে অবস্থায় মাত্র ১০টি শব্দের ছোট্ট এ সূরাটির প্রথম তিনটি শব্দে আল্লাহ তাআলা যেন দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত তাঁর প্রিয় বান্দার উপর ঢেলে দিলেন। 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি' বলে আল্লাহ তাআলা যেন এক কথায়ই সবকিছু দিয়ে দিলেন। কোনো ভাষায়ই এক শব্দে 'কাওছার' শব্দটির তরজমা পেশ করা সম্ভব নয়। সব রকম কল্যাণ ও মঙ্গল এবং অফুরন্ত নিয়ামতের প্রাচুর্য এ একটা শব্দেই বোঝানো হচ্ছে। এখানে ভবিষ্যতে 'কাওছার' দেওয়া হবে বলা হয়নি; বরং নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, কাওছার দেওয়া হয়ে গেছে। এ কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দুশমনরা ধারণা করেছিল যে, 'ইসলামী আন্দোলনের কারণে রাসূল (স)-এর ব্যবসা-বাণিজ্য খতম হয়ে গেছে। সমাজে তিনি একঘরে হয়ে আছেন। অসহায় সঙ্গী-সাথিরাও নির্যাতিত ও আধমরা অবস্থায় আছে। ছেলেরাও মরে গেল। এ অবস্থায় বেচারা দুনিয়া থেকে চলে গেলে এর নাম নেওয়ার জন্য আর কেউ থাকবে না।' এর জবাবে সামান্য এক কাওছার শব্দে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, "হে আমার প্রিয় বান্দাহ! আমি আপনাকে নবুওয়াতের মর্যাদা দিয়েছি, চরিত্রের অতুলনীয় সম্পদ দিয়েছি, কুরআন, ইলম ও হিকমত দান করেছি এবং মানবজাতির উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান দিয়েছি। এ সবের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার উম্মতের মাধ্যমেই মানবজাতি কল্যাণের পথ পেতে থাকবে। আর কিয়ামতের পর হাশরের ময়দানে যখন সব মানুষ

পিপাসায় কাতর হবে, তখন 'হাউজে কাওছার' আপনারই দায়িত্বে থাকবে এবং আপনি যাদেরকে এ হাউজ থেকে পানি পান করাবেন, তারা ছাড়া অন্য কেউ সেদিন পানি পাবে না। এ পানি বেহেশতের হাউজে কাওছার থেকেই হাশরের ময়দানে প্রবাহিত হবে। হাশরের পর যখন আপনি জান্নাতে যাবেন, তখনও সেখানকার হাউজে কাওছার আপনারই হাতে থাকবে। এ সব নিয়ামতই আপনাকে দিয়ে দিলাম।" হাউজে কাওছারের পানি সম্বন্ধে হাদীসে বিস্তর আলোচনা আছে। বলা হয়েছে, সে পানি দুধ, বরফ ও রুপা থেকে বেশি সাদা, বরফ থেকে ঠাণ্ডা ও মধু থেকে মিষ্টি হবে। এর নিচের মাটি মিসক আতর থেকে বেশি সুগন্ধি। যে এ পানি পান করবে, তার আর পিপাসা হবে না, আর যে এ পানি থেকে বঞ্চিত হবে অন্য কিছুতেই তার পিপাসা মিটবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আপনার দুশমনদের বেদনাদায়ক কথাবার্তা গায়ে মাখবেন না, আপনার সম্পর্কে তাদের মন্তব্যে মন খারাপ না করে আপনার রবের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

শেষ আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, যারা আপনাকে লেজকাটা বা জড়কাটা বলছে, তারাই আসলে এসব উপাধি পাওয়ার যোগ্য। কিছুদিন সবর করুন, দেখবেন যে, আপনার দুশমনরা কীভাবে পরাজিত হয় এবং চিরদিনের জন্য মানবজাতির নিকট ঘৃণ্য হয়ে থাকে।

বিশেষ শিক্ষা

ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আসল সম্পদ নয়; দুনিয়ায় আল্লাহর মর্জিমতো কাজ করে আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই আসল কামিয়াবী।

কুরাইশ সরদাররা রাসূল (স)-এর কোনো পুত্রসন্তান না থাকার ফলে মনে করেছিল যে, তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলে তাঁর নাম-নিশানাও মিটে যাবে। তারা নিজেদের হিসাব অনুযায়ীই এ ধারণা করেছিল।

কিন্তু এ কথাই চির সত্য যে, মানুষ কর্মের মাধ্যমেই বেঁচে থাকে। পরবর্তী বংশধরদের মাধ্যমে কারো নামটুকু শুধু কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু যিনি মহৎ ও বড় কোনো কাজ করে যান, তাকে গোটা মানবজাতি চিরদিন মনে রাখে। এসব লোকের মৃত্যু নেই।

রাসূল (স)-এর কোনো ছেলে না থাকায় রক্তের দিক দিয়ে তাঁর বংশ বাড়েনি। কিন্তু তাঁর রূহানী সন্তান দুনিয়ার সব জায়গায় পাওয়া যায়। কোটি কোটি মানুষ রাসূল (স)-কে যেভাবে মহব্বত করে এবং তাঁর জন্য যে আবেগ বোধ করে, অন্য কোনো মানুষের বেলায় কি এমন হয়?

যারা রাসূল (স)-কে লেজকাটা বলে মনে করেছিল, তাদেরকে ধিক্কার দেয় না এমন মানুষ কি দুনিয়ায় আছে? এমনকি যারা আজ আবু জাহ্‌ল ও আবু লাহাবদের ভূমিকা পালন করছে তারাও এদেরকে ধিক্কারই দিয়ে থাকে। তাই এরাই আসলে লেজকাটা।

সূরা কাওছার

৩ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ①

১. (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'কাওছার' দান করেছি।[১]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②

২. সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্যই নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

৩. আপনার দুশমনই জড়কাটা[২] (শেকড়ছেঁড়া বা লেজকাটা)।

১. কাওছার অর্থ হলো, দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত কল্যাণ ও মঙ্গল। হাশরের দিনের হাউজে কাওছার এবং বেহেশতের কাওছার নামক ঝরনাও ঐ সব কল্যাণের মধ্যেই গণ্য।

২. কাফিররা রাসূল (স)-কে দুই অর্থে জড়কাটা বলত– ক. তিনি নিজের দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, মাত্র অল্প কিছু লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁর আপন কুরাইশ বংশও তাঁর দুশমনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। খ. রাসূল (স)-এর কোনো পুত্রসন্তান জীবিত ছিলেন না বলে কাফিররা মনে করত যে, তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলে তাঁর নাম ও পরিচয় খতম হয়ে যাবে।

এর জবাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (স) জড়কাটা বা লেজকাটা নন, তাঁর দুশমনরাই লেজকাটা। অর্থাৎ, রাসূল (স) শীঘ্রই জনপ্রিয় হবেন এবং তাঁর নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে, আর কাফিররা হেয় ও পরাজিত হবে এবং চিরদিন তাদের নাম ঘৃণ্য হয়েই থাকবে।

১০৯. সূরা কাফিরূন

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'কাফিরূন' শব্দ দিয়েই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

মতভেদ সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাসসির সূরাটিকে মাক্কী যুগের বলেই মত প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য বিষয় থেকেও সূরাটি মাক্কী বলেই প্রমাণিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

রাসূল (স)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও কুরাইশ সরদাররা বারবার তাঁর নিকট বিভিন্ন ধরনের আপস-প্রস্তাব পেশ করতে থাকে। তখনও তারা আশা করেছিল, কোনো না কোনো রকমে একটি মীমাংসায় পৌঁছতে পারলে বর্তমান ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ খতম হতে পারে।

তারা কোনো সময় এ প্রস্তাব দিয়েছে যে, 'তোমাকে আমরা মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দিই, তুমি সুখে থাক; কিন্তু সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।' কোনো সময় মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে। মক্কার সরদাররা তাঁকে সরদার হিসেবে মানার জন্যও রাজি ছিল। এসব প্রস্তাবে যখন তিনি কোনো সাড়াই দিলেন না, তখন ধর্মীয় সমঝোতার চেষ্টা চলল। তারা বলল, 'তুমি আমাদের মাবুদদের পূজা করতে রাজি হলে আমরাও তোমার মাবুদের পূজা করব।' 'এক বছর তোমার ধর্ম চালু থাকুক, আরেক বছর আমাদের ধর্ম মানা হোক।'

এ জাতীয় অগণিত প্রস্তাবের মাধ্যমে তারা রাসূল (স)-কে বিরক্ত করেছিল। আল্লাহ তাআলা এ সূরার মারফতে স্পষ্ট জবাব দিয়ে তাদের এ আপস-মনোভাবকে খতম করে দিলেন।

আলোচ্য বিষয়

নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষণা এবং শিরকের সুস্পষ্ট বিরোধিতাই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোক এ সূরাটিকে এর ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। 'প্রত্যেকেই যার যার ধর্ম নিয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করতে থাক, ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি কর না এবং একের ধর্ম অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না' ইত্যাদি বক্তব্য তারা এ সূরার মাধ্যমে আবিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

'কুরআন মাজীদে লা- ইকরাহা ফিদ-দীন' বলে অবশ্যই ঘোষণা করা হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই। কারণ, দীন কবুল করা মনের ব্যাপার। মনের উপর জোর চলে না। জোর করে ঈমান আনানো যায় না। জোর করে যাকে মুসলমান বানানো হয় সে, সত্যিকার মুসলিম হয় না; মুনাফিক হয়ে থাকতেই বাধ্য হয়। তাই এ জাতীয় মুসলমান ইসলামী সমাজের জন্য ক্ষতিকর, বিধায় গায়ের জোরে মুসলমান বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

কিন্তু এ বক্তব্য সূরা কাফিরূনে নেই। এখানে বরং কাফিরদের আপস-প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে বলা হয়েছে, তাওহীদের ব্যাপারে মুশরিকদের সাথে কোনো সমঝোতা হতে পারে না।

আলোচনার ধারা

সূরাটিতে আগাগোড়া একটা মূল বক্তব্যকেই বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে, যাতে কোনো রকম অস্পষ্টতা বাকি না থাকে। আল্লাহ তাআলা এ কথাগুলো রাসূল (স)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন। 'হে রাসূল! আপনি এভাবে বলুন' বলে সূরাটি 'কুল' (বলুন) শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। কাফিরদের আপস-প্রস্তাবের জবাব এ সূরাটিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আয়াতে রাসূল (স) কাফিরদেরকে সম্বোধন করেছেন। এখানে কাফির শব্দটি কোনো গালি হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। রাসূল (স) ঐসব লোককে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, যারা রাসূলকে মানতে রাজি হয়নি এবং যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে। এখানে 'কাফির' শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে কাফিরগণ! তোমরা যাদের ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদাত করি না।' মক্কার কাফিররা মুশরিক ছিল। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে অস্বীকার করত না, কিন্তু আল্লাহর সাথে অনেককে মাবুদ হিসেবে শরীক করত। যেমন ফেরেশতা, জিন, আম্বিয়া, আওলিয়া, দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়, নদী, গাছ ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে মূর্তি বানিয়ে এসবকে আল্লাহর বিভিন্ন শক্তির বিকাশ হিসেবে পূজা করত। আজও দুনিয়ার মুশরিকদের মধ্যে এসব চালু রয়েছে। এরা আল্লাহকে স্বীকার করে; কিন্তু সৃষ্টির অনেক কিছুকে মাবুদ হিসেবে আল্লাহর অংশীদার মনে করে। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করলে তাঁর সাথে শরীক করে কীভাবে।

এ আয়াতে রাসূল (স) যে কথাটি কাফিরদেরকে বলেছেন, এর মর্ম অতি পরিষ্কার। তিনি বলতে চান যে, 'হে কাফিরগণ! তোমরা যদিও আল্লাহকে স্বীকার কর, তবু তাঁকে একমাত্র মাবুদ মনে কর না। ইবাদাতে আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদের কারো ইবাদাত করি না। আমি শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করি।'

তৃতীয় আয়াতে রাসূল (স) আরো পরিষ্কার করে দিলেন যে, 'আমি যার ইবাদাত করি, তোমরা তো তাঁর ইবাদাতকারী নও।' অর্থাৎ আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারী, তোমরা তা নও। তোমরা আল্লাহকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করার ফলে তোমরা কোনো কোনো সময় আল্লাহর ইবাদাত করলেও তা আল্লাহর ইবাদাত বলে গণ্য হয় না। সুতরাং আমার মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ এক নয়।

এর চেয়েও বড় কথা হলো, আমি যে আল্লাহর ইবাদাত করি, তাঁকে তোমরা মাবুদ মেনেই নিচ্ছ না। যে গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর, তা অন্যের মধ্যেও আছে বলে তোমরা মনে কর। যেসব অধিকার একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য, তার মধ্যে তোমরা অন্যকেও শরীক করে থাক। সুতরাং তোমরা আসল আল্লাহকে চিনতেই পার না। তোমাদের আল্লাহ আলাদা। তোমরা নামে মাত্র আল্লাহকে স্বীকার কর। আমি যে আল্লাহর ইবাদাত করি, তোমরা সে আল্লাহর ইবাদতকারী নও।

চতুর্থ আয়াতে রাসূল (স) আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, 'হে কাফিরগণ! তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদাত করে এসেছে, আমি তাদের ইবাদাতকারী নই।' ২ নং আয়াতে যে

কথাটা বর্তমানকালের অর্থে বলা হয়েছে, সে কথাটাই ৪ নং আয়াতে অতীতকালের অর্থে বলা হয়েছে। ২ নং আয়াতে 'তোমরা যার ইবাদাত কর' বলা হয়েছে, আর এখানে 'তোমরা যার ইবাদাত করেছ' বলা হয়েছে।

অর্থাৎ রাসূল (স) বলছেন, তোমাদের মাবুদের সংখ্যার তো হিসাবই নেই। তোমরা কত কিছুকেই মাবুদ মেনে থাক। তোমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদের সাথে নতুন মাবুদও তোমরা যোগ করে থাক। তোমরা মাবুদের তালিকায় যত কিছুকে এ পর্যন্ত শামিল করেছো, আমি এদের কারো ইবাদাতকারী নই।

পঞ্চম আয়াতের ভাষা তৃতীয় আয়াতের মতো হলেও দু'জায়গায় দু'রকম অর্থ বোঝায়। ২ নং আয়াতে 'তোমরা যাদের ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না' বলার পর ৩ নং আয়াতের অর্থ হয়, 'আমি যে গুণবিশিষ্ট একমাত্র মাবুদের ইবাদাত করি, তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও।'

আর ৪ নং আয়াতে 'তোমরা যাদের ইবাদত করেছ, আমি তাদেরও ইবাদাতকারী নই' বলার পর ৫ নং আয়াতের অর্থ হয় 'আমি যে গুণবিশিষ্ট একমাত্র মাবুদের ইবাদাত করি, তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী হবে বলে মনে হয় না।' অর্থাৎ তোমরা অতীতে ইবাদাতের ব্যাপারে যে ভুলের মধ্যে ছিলে এবং এখনও তোমাদের মনোভাব যা, তাতে আমি আশা করি না যে, তোমরা আমার মাবুদের ইবাদাতকারী হবে।

শেষ আয়াতে রাসূল (স) চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন। হে কাফিরগণ! তোমাদের দীন ও আমার দীনের মধ্যে কোনো রকম আপস বা সমঝোতা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহর আনুগত্যই দীনের ভিত্তি। সে ভিত্তিই আমাদের এক নয়। আমার আল্লাহকে তোমরা আল্লাহ বলে স্বীকারই কর না। তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা রাখ, সে ধরনের আল্লাহকে আমিও স্বীকার করি না। সুতরাং তোমাদের সাথে আমার কোনো মিল হতেই পারে না। তোমাদের পথ আর আমার পথ কখনো এক নয়।

এ আয়াতের অর্থ এটা হতেই পারে না যে, 'তোমরা তোমাদের দীনের উপর কায়েম থাক, তাতে আমার আপত্তি নেই। আমাকেও আমার দীনের উপর চলতে দাও। দীনের ব্যাপারে আমরা এভাবে আপস করে চলতে থাকি। আমাদের পারস্পরিক কোনো বিরোধ নেই।'

এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কুরআন মাজীদের বহু জায়গায়ই আছে। সূরা যুমারের ১৪ নং আয়াতই এর জন্য যথেষ্ট। এতে বলা হয়েছে, 'হে নবী! এদেরকে বলে দিন যে, আমি তো আমার দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে নিয়ে তাঁরই ইবাদাত করতে থাকব। তোমরা তাঁকে ছেড়ে যার যার ইবাদাত করতে চাও করতে থাক।'

এ কথার সঠিক অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে এ কথা শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি কাফির ও মুশরিকদেরকে এভাবে বলুন, 'তোমাদেরকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই আমি ইবাদাতের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছি। আমি যার ইবাদাত করছি, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। এ উপদেশ মানা-না মানা তোমাদের ইচ্ছা। এ বিষয়ে তোমাদের সাথে কোনো রকম আপস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

সূরা কাফিরূন

৬ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

১-২. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, হে কাফিররা![১] তোমরা যাদের ইবাদাত কর,[২] আমি তাদের ইবাদাত করি না।

৩. আর আমি যাঁর ইবাদাত করি,[৩] তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও।

৪. তোমরা যাদের ইবাদাত করছ,[৪] আমি তাদেরও ইবাদাতকারী নই।

৫. আর আমি যাঁর ইবাদাত করি, তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও।

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আর আমার জন্য আমার দীন।[৫]

১. অর্থাৎ, হে ঐসব লোক! যারা আমাকে রাসূল হিসেবে মানতে ও আমার আনীত শিক্ষাকে কবুল করতে অস্বীকার করেছ।

২. যদিও কাফিররা অন্যান্য মাবুদের সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদাতও করত, তবু তাদের ইবাদাতকে এখানে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবুদকে ইবাদাতে শরীক করার দরুন তাদের কোনো ইবাদাতই কবুল হওয়ার যোগ্য নয়।

৩. অর্থাৎ, যে গুণাবলিবিশিষ্ট আল্লাহর ইবাদাত আমি করি, তোমরা সেই আল্লাহর ইবাদাত করছ না।

৪. অর্থাৎ, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব মাবুদের ইবাদাত করে এসেছে, আমি তাদের কারো ইবাদাত করি না।

৫. অর্থাৎ, দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে আমার কোনো মিল নেই। আমার পথ আলাদা, তোমাদের পথও আলাদা।

১১০. সূরা নাস্‌র

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'নাস্‌র' শব্দ দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

রাসূল (স)-এর বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের (যিলহাজ্জ মাসের ১১ থেকে ১৩ তারিখের) কোনো এক দিন এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা নাস্‌র নাযিলের তিন মাস ও কয়েক দিন পর রাসূল (স) ইন্তিকাল করেন। বিদায় হজ্জ ও রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের মধ্যবর্তী সময়ও তিন মাসের কিছু বেশি। এভাবে এ কথা নিশ্চিত মনে হয় যে, সূরাটি বিদায় হজ্জেরই কোনো এক সময় নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আরবে যখন ইসলামের বিজয় পরিপূর্ণ হবে এবং যখন দলে দলে লোক ইসলাম কবুল করতে থাকবে তখন মনে করতে হবে যে, ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করা হয়েছে। দায়িত্ব পালনশেষে রাসূল (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি সেই আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ করতে থাকেন, যাঁর মেহেরবানী ও সাহায্যে এত বিরাট দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আল্লাহর দেওয়া এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাকিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে, সেজন্য তিনি আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকেন।

সর্বশেষ পূর্ণ সূরা

পূর্ণ সূরা হিসেবে এ সূরাটি সবশেষে নাযিল হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, কোন্ আয়াতটি সবশেষে নাযিল হয়েছে বা শেষ ওহী কোন্‌টি। কিন্তু সূরা হিসেবে এ সূরাটিই নাযিলকৃত শেষ সূরা। যেমন সূরা ফাতিহার পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে একাধিকবার ওহী নাযিল হলেও পরিপূর্ণ সূরা হিসেবে সূরা ফাতিহাই প্রথম নাযিল হয়েছে।

ইসলামের বিজয়োৎসবের ধরন

রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে মাত্র ২৩ বছরে আরবে যে মহাবিপ্লব বিজয় লাভ করে, তা চিরকালই ইতিহাসের মহাবিস্ময় হয়ে থাকবে। একটা বিচ্ছিন্ন ও অসভ্য মানবগোষ্ঠীকে মানবজাতির জন্য চির আদর্শে পরিণত করার এত বড় গৌরব যে মহামানবের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে, তাঁকে সূরাটিতে তাঁর সাফল্যের বিজয়োৎসব পালনের অপূর্ব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

সাধারণত কোনো বিপ্লবী নেতা সফলতা লাভ করার পর আনন্দ-উৎসবে মেতে নিজের বাহাদুরির ঢোল সারা দুনিয়াকে শুনিয়ে বাজানোর চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে সম্পূর্ণ

ভিন্ন পদ্ধতিতে সাফল্যের জয়গান শেখালেন। এ শিক্ষাই দেওয়া হলো যে, ইকামাতে দীনের এ বিরাট সাফল্য কোনো মানুষের বাহাদুরির ফল নয়। এ সাফল্য মহান আল্লাহর দান। তাই তাঁর গুণগান করেই বিজয়োৎসব পালন করতে হবে। আর এ কাজে মানবিক দুর্বলতার দরুন যেসব ভুল-ক্রটি হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করার মাধ্যমে মনে সান্ত্বনা পেতে হবে।

রাসূল (স)-এর জীবনে এ সূরার প্রভাব

১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যখন এ সূরা নাযিল হয়েছে তখন রাসূল (স) বলেছেন, 'আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

২. হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, যখন এ সূরা নাযিল হয়েছে তখন রাসূল (স) বললেন, 'এ বছরই আমার ইন্তিকাল হবে।' এ কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রা) কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (স) বললেন, 'আমার বংশের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম এসে আমার সাথে মিলিত হবে।' একথা শুনে ফাতেমা (রা) হাসলেন।

৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, "রাসূল (স) ইন্তিকালের আগে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা' বেশি বেশি পড়তেন।" এ কথাগুলো অন্য রেওয়ায়াতে এভাবে বলা হয়েছে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।'

৪. হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সব অবস্থায় উঠতে-বসতে, আসতে-যেতে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পড়তে থাকতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ যিকিরটি আপনি এত বেশি কেন করেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'আমাকে এর হুকুম করা হয়েছে।' এ কথা বলেই তিনি এ সূরাটি পড়ে শোনালেন।

৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, এ সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূল (স) আখিরাতের জন্য এত বেশি পরিশ্রম করতে লাগলেন, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

বিশেষ শিক্ষা

কোনো মহৎ ও বড় কাজ সমাধা করাই আসল সাফল্য নয়। সে কাজ যদি আল্লাহ তাআলা কবুল না করেন তাহলে বড় কাজ সত্ত্বেও জীবন ব্যর্থ।

মানুষ যত যত্নের সাথেই কাজ করুক, তাতে ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে আল্লাহর দৃষ্টিতে ও তাঁর উন্নত মানে বিচার করলে পদে পদেই দোষ বের হবে। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ মানুষের সাধনার সুফল দিতে চান। তাই মানুষকে এ সূরার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন নিজের যোগ্যতা নিয়ে গর্ববোধ না করে এবং কোনো বড় কাজ সমাধা করতে পারায় গৌরবের দাবিদার না হয়।

অন্য মানুষ তার কাজের যত প্রশাংসাই করুক, সে নিজে যেন এ কথাই মনে করে যে, তার কাজ যতটা নিখুঁত হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। তার এ ধারণা থাকাই উচিত যে, এ কাজে যে পরিমাণ সাফল্য হয়েছে, তা আল্লাহর মেহেরবানী। আর যেটুকু ক্রটি রয়ে গেছে, তা তারই দোষে হয়েছে।

এ মনোভাব যার আছে, সে কোনো বিরাট খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার পরও অহঙ্কার প্রকাশ করবে না; বরং সে বিনয়ের সাথে ইস্তিগফার করতে থাকবে এবং দোষ-ক্রটি মাফ করে এ খিদমতটুকু কবুল করার জন্য মনিবের দুয়ারে ধরনা দিতে থাকবে।

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন[১] আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যায়;

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ١

২. এবং (হে রাসূল! যখন) আপনি দেখতে পান যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হচ্ছে,

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ٢

৩. তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করুন ও তাঁর কাছে মাফ চান;[২] নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٣

১. নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী এ সূরাই সব শেষে রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের প্রায় তিন মাস আগে নাযিল হয়েছে। এ সূরার পর আরও কতক আয়াত নাযিল হয়েছে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ কোনো সূরা আর নাযিল হয়নি।

২. এটাও বর্ণিত আছে যে, এ সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূল (স) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে অনেক বেশি হামদ, তাসবীহ ও ইস্তিগফার করেছিলেন।

১১১. সূরা লাহাব

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'লাহাব' শব্দ দ্বারাই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি মাক্কী যুগের। কিন্তু মাক্কী যুগের কোন্ স্তরে এ সূরা নাযিল হয়েছে, তা সঠিকভাবে বর্ণনা করা কঠিন। অবশ্য সূরার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, যখন রাসূল (স)-এর আপন চাচা আবু লাহাবের বিরোধিতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছল যে, ইসলামী আন্দোলনের পথে সে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সম্ভবত নবুওয়াতের সপ্তম বছর থেকে দুশমনরা যখন রাসূল (স)-এর চাচা আবু তালিবসহ গোটা বংশকে 'শি'বে আবী তালিব' নামক উপত্যকায় বন্দী করে রাখে, তখন একমাত্র আবু লাহাব ছাড়া রাসূল (স)-এর সব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই বংশীয় সম্পর্কের খাতিরে রাসূল (স)-কে সমর্থন করে। এর ফলে তারা সবাই রাসূল (স)-এর সাথে বন্দীদশায় জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এ কঠিন সময়েও আবু লাহাব বংশের সবার বিরুদ্ধে রাসূল (স)-এর দুশমনদের সাথে মিলে শত্রুতা করতে থাকে।

এ সূরাটি নাযিলের সময়ের সাথে উপরের ঘটনার সম্পর্ক আছে বলেই ধারণা করা হয়। কারণ, কুরআন মাজীদে স্পষ্ট নাম উল্লেখ করে অন্য কোনো লোককে নিন্দা করা হয়নি। আবু লাহাবকে এ সূরায় যে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, তা রাসূল (স)-এর মুখে আপন চাচার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা সাধারণ অবস্থায় ভদ্রতার খুবই বিরোধী। বিশেষ করে সেকালে আরবে বংশীয় সম্পর্কের যে রেওয়াজ ছিল, তাতে এ ধরনের নিন্দাবাদ নিতান্ত আপত্তিকর মনে হওয়ারই কথা। রাসূল (স) সমাজে অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এ নিন্দাবাদের প্রতিবাদ কেউ করেনি; বরং সমাজ আবু লাহাবের আচরণকেই চরম বিরোধী মনে করেছে। গোটা বংশের বিরুদ্ধে একা আবু লাহাব যে ব্যবহার করেছে, তাতে সে সময়কার রেওয়াজ অনুযায়ী সে চরম নিন্দার যোগ্য ছিল বলেই কেউ এতে আপত্তি তোলেনি। আবু লাহাবের এ আচরণ ঐ সময় যতটা নিন্দনীয় বলে সমাজে স্বীকৃত ছিল, এতটা শুধু তার ইসলাম বিরোধিতার কারণে হয়নি। তাই এ সূরাটি ঐ সময়কার বলেই মনে হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

কুরআন মাজীদে ইসলামের দুশমনদের মধ্যে একমাত্র আবু লাহাবের নাম নিয়ে কেন নিন্দাবাদ করা হলো– এ কথা ভালোভাবে বুঝতে হলে আরব সমাজকে বুঝতে হবে এবং আবু লাহাবের ভূমিকা জানতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই আরববাসীদের মধ্যে এমন মারামারি, কাটাকাটি, লুটতরাজ চালু ছিল যে, আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বংশীয় ও গোত্রীয় ঐক্য ছাড়া বাঁচার কোনো পথই ছিল না।

আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের গুরুত্ব সেখানে সবচেয়ে বেশি ছিল। তাই এক বংশের কোনো লোকের সাথে অন্য বংশের কোনো লোকের ব্যক্তিগত ঝগড়াও সহজেই বংশীয় লড়াইয়ে পরিণত হতো।

এ সামাজিক প্রথার কারণেই কুরাইশদের অন্য সব গোত্র একজোট হয়ে রাসূল (স)-এর দুশমন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব প্রকাশ্যভাবে রাসূল (স)-কে সমর্থন করতে থাকল। অথচ তাদের অধিকাংশ লোক তখনো ঈমান আনেনি। ধর্মের দিক দিয়ে রাসূল (স)-এর বিরোধী কুরাইশদের সাথে তাদের মিল থাকলেও গোত্রীয় কারণেই রাসূল (স)-কে তাঁর দুশমনদের হাতে তারা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না।

বংশীয় ও গোত্রীয় ঐক্যের প্রচলিত এ রীতি আরবে এতটা স্বীকৃত সামাজিক নীতি হিসেবে গণ্য ছিল যে, কুরাইশরা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে রাসূল (স)-এর সমর্থন করার দরুন কখনো এ অভিযোগ করেনি যে, তোমরা বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধী লোককে সমর্থন করে ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছ। কারণ, ঐ সমাজে বংশের মর্যাদা ধর্মের চেয়ে বেশি ছিল। এমনই এক সমাজে আবু লাহাবই একমাত্র লোক ছিল, যে এ প্রচলিত ও সর্বজনস্বীকৃত রীতির বিরুদ্ধে তারই আপন ভাতিজার দুশমনদের সাথে মিলে নিজ বংশের বিরোধী বলে পরিচিত হয়ে গেল। যে সমাজে ভাতিজাকে আপন ছেলের মতো স্নেহ করা এবং জান দিয়ে হলেও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার নীতি চালু ছিল, সে সমাজে আবু লাহাবের এ আচরণ চরম নিন্দারই যোগ্য ছিল। তাই তার নাম নিয়ে এ নিন্দাবাদ করা সত্ত্বেও কেউ এ কারণে রাসূল (স)-এর উপর দোষারোপ করেনি এবং আপন চাচার বিরুদ্ধে এ সূরার কঠোর ভাষা প্রয়োগ করাকে নিন্দনীয় মনে করেনি।

আবু লাহাবের দুশমনির ধরন

১. নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে যখন রাসূল (স) সর্বপ্রথম সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিলেন, তখন আবু লাহাব চিৎকার করে বলে উঠল, 'তাব্বান লাকা' অর্থাৎ, 'তুমি ধ্বংস হও'। এ সূরাতে এ শব্দটিই আবু লাহাবের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

২. একদিন আবু লাহাব রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার দীন কবুল করলে আমার কী লাভ হবে?' রাসূল (স) বললেন, 'অন্য সব ঈমানদারের যা হবে তা-ই।' আবু লাহাব ঐ 'তাব্বান' শব্দ ব্যবহার করেই বলল, 'ঐ দীন ধ্বংস হোক, যা আমাকে সাধারণ লোকের সমান বানাতে চায়।'

৩. আবু লাহাবের বাড়ি ও রাসূল (স)-এর বাড়ি পাশাপাশি ছিল। সে ও তার স্ত্রী হরহামেশা রাসূল (স)-কে বিরক্ত করত। রাসূল (স) যখন নামায আদায় করতেন তখন ছাগলের ভুঁড়ি উপর থেকে ছুড়ে ফেলত। কখনো রাসূল (স)-এর বাড়িতে খাবার পাক হওয়ার সময় মলমূত্র ছড়িয়ে দিত। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) রোজ কাঁটাওয়ালা গাছ-গাছড়া রাতের বেলা রাসূল (স)-এর ঘরের দরজার সামনে জমা করে রাখত, যাতে সকালে বের হলেই রাসূল (স)-এর পায়ে বিঁধে।

৪. নবুওয়াতের পূর্বে আবু লাহাবের দু'ছেলের সাথে রাসূল (স)-এর দু'মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। ইসলামের দাওয়াত ব্যাপক হতে দেখে আবু লাহাব রাসূল (স)-এর মেয়েদেরকে তালাক দিতে বাধ্য করল।

৫. যখন রাসূল (স)-এর দ্বিতীয় ছেলেও ইন্তিকাল করলেন তখন আবু লাহাব খুশি হয়ে দৌড়ে গিয়ে কুরাইশ সরদারদেরকে সুসংবাদ! দিল। রাসূল (স)-এর বিরোধিতায় সে এমন অন্ধ ছিল যে, এ জাতীয় হীন কাজ করতেও সে লজ্জাবোধ করেনি।

৬. রাসূল (স) যখনই যেখানে দীনের দাওয়াত দিতেন, সাথে সাথেই আবু লাহাব গিয়ে লোকদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। কখনো নিজেই পাথর মেরে রাসূল (স)-কে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত।

৭. নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত গোত্র মিলে যখন বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে 'শি'বে আবী তালিবে' বন্দী করে তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করল, তখন একমাত্র আবু লাহাবই তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বংশের বিরুদ্ধে কুরাইশদের দলে গিয়ে শামিল হলো। এ অবরোধ দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত চলেছিল। রাসূল (স) এবং তাঁর বংশের লোকেরা যাতে খাবার জিনিস এমনকি পানিও না পায়, সে ব্যবস্থায়ই তারা করল। জেলের বন্দীদের চেয়েও দুরবস্থায় পড়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণায় যাতে বাধ্য হয়ে তারা কুরাইশদের নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে চেষ্টাই চলল। এমন অমানুষিক কাজেও আবু লাহাব অগ্রগামী ছিল।

৮. হজ্জের সময় আগত দূরবর্তী লোকদের নিকট রাসূল (স)-এর পক্ষে দীনের দাওয়াত দেওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল আবু লাহাব। রাসূল (স)-এর আপন চাচা হিসেবে সে যখন দূর থেকে আগত লোকদের নিকট রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচার চালাত তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বিভ্রান্ত হতো। তারা রাসূল (স)-কে ঘনিষ্ঠভাবে না চেনার ফলে তাঁর চাচার বিরোধিতায় কমপক্ষে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া সহজ ছিল। এমনই পরিস্থিতিতে আবু লাহাবই এমন এক ব্যক্তি ছিল, যার নাম নিয়ে নিন্দা করা দরকার ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত যে কিতাব মানুষ পড়তে থাকবে, সে কিতাবে তার নামে লা'নত বর্ষণ করাই তার উপযুক্ত পুরস্কার। আখিরাতে তার ও তার স্ত্রীর যে দশা হবে সে বিষয়ে সূরার শেষ তিন আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর সূরার প্রথম আয়াতের মাধ্যমে তাদের জন্য চিরকাল মানবজাতির অভিশাপ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সূরার মারফতে রাসূল (স)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে আত্মীয়দের কোনো পরওয়া করার দরকার নেই। আপন বংশের লোক হলেও যদি সে দীনের বিরোধী হয় তাহলে তাকে আপন মনে করা চলে না। আর যারা দীনের সাথি, তারা দুশমনের বংশের লোক হলেও তাদেরকেই প্রকৃতপক্ষে আপন মানুষ মনে করতে হবে। এটাই দীনের দাবি।

সূরা লাহাব

৫ আয়াত, ১ রুকূ‘, মাক্কী

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١

১. আবূ লাহাবের[১] দুই হাত ধ্বংস হলো এবং সেও ধ্বংস (বিফল) হয়ে গেল।[২]

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢

২. তার মাল ও যা সে কামাই করেছে, তা তার কোনো কাজে লাগল না।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤

৩-৪. শিগ্‌গিরই সে শিখাযুক্ত আগুনে প্রবেশ করবে এবং (তার সাথে) তার ঐ স্ত্রীও[৩] (আগুনে প্রবেশ করবে), যে কুটনামি করে বেড়ায়।*

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

৫. তার ঘাড়ে খেজুর শাখার আঁশের পাকানো (খসখসে) দড়ি থাকবে।**

১. এ লোকটি রাসূল (স)-এর চাচা ছিল এবং আবু লাহাব নামেই পরিচিত। (লাহাব মানে আগুনের শিখা। তার গায়ের রঙ আগুনের মতো উজ্জ্বল বলে তাকে এ নামে ডাকা হতো। সে শেষ পর্যন্ত দোযখের আগুনে জ্বলবে বলেও লাহাব নামই বেশি উপযোগী।)

২. অর্থাৎ, ইসলামের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য আবু লাহাব যত শক্তিই খরচ করে থাকুক, শেষ পর্যন্ত সে বিফল ও ব্যর্থই হয়েছে।

৩. এ মহিলার নাম ছিল উম্মে জামীল এবং সে আবু সুফিয়ানের বোন ছিল। সে ইসলামের দুশমনির ব্যাপারে তার স্বামীর থেকে কোনো অংশে কম ছিল না।

* ‘হাম্মা-লাতাল হাতাব’-এর শাব্দিক অর্থ– যে কাঠ বয়ে আনে। ‘কাঠ বয়ে আনা’ কথাটির কয়েকটা অর্থ হতে পারে– ক. উম্মে জামীল জঙ্গল থেকে কাঁটাওয়ালা ডালপালা জোগাড় করে রাসূল (স)-এর ঘরের সামনে রাখত, যাতে রাসূল (স)-এর পায়ে বিঁধে। খ. সে রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে বেড়াত, যার ফলে তার পাপের বোঝা বেড়ে যাচ্ছিল। আরবী পরিভাষায়, পাপের বোঝা অর্থেও ‘কাঠের বোঝা’ কথাটি ব্যবহৃত হয়।

** ‘জীদ’ অর্থ অলঙ্কারে সজ্জিত গলা। উম্মে জামীল খুব মূল্যবান হার গলায় পরত। এখানে বলা হয়েছে যে, সে সজ্জিত গলায়ই দোযখে কষ্টদায়ক শিকল বাঁধা থাকবে।

১১২. সূরা ইখলাস

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

কুরআন মাজীদের সূরাগুলোর নাম যে নিয়মে রাখা হয়েছে, সে নিয়মে এ সূরার নামকরণ করা হয়নি। সাধারণত একটি সূরার কোনো একটি শব্দ থেকেই ঐ সূরার নাম রাখা হয়েছে; কিন্তু এ সূরায় সে নিয়ম পালন করা হয়নি। 'ইখলাস' শব্দটি এ সূরায় নেই। সূরা ফাতিহার মধ্যেও 'ফাতিহা' শব্দ নেই। এ দুটি সূরার নামকরণই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

এ সূরাটির নাম অত্যন্ত সার্থক। 'ইখলাস' মানে আন্তরিকতা। খালিস বা খালাস শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। খালিস মানে বিশুদ্ধ এবং খালাস মানে মুক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যে পরিচয় এ সূরায় দেওয়া হয়েছে, তাওহীদ সম্পর্কে এটাই একমাত্র বিশুদ্ধ ধারণা এবং যারা এভাবে আল্লাহকে চিনে নেবে তারাই শিরকের ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং এর ফলে দোযখ থেকেও মুক্তি পাবে। তাওহীদ সম্পর্কে প্রকৃত আন্তরিকতা সৃষ্টি করাই এ সূরার উদ্দেশ্য। তাই এর নাম রাখা হয়েছে ইখলাস বা আন্তরিকতা।

নাযিলের সময়

বিভিন্ন রেওয়ায়াতের কারণে এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু সূরার ভাষা ও বাচনভঙ্গি মাক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরার মতোই মনে হয়। আর যেহেতু তাওহীদই দীন-ইসলামের প্রথম ভিত্তি, সেহেতু নবুওয়াতের প্রথমদিকেই এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া স্বাভাবিক। ছোট ছোট আয়াতে দীনের বুনিয়াদি কথা মুখস্থ রাখার উপযোগী করে বলার যে বৈশিষ্ট্য মাক্কী যুগের প্রথমদিকের সূরায় দেখা যায়, এ সূরাটিতেও সে বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। আরো একটা বিখ্যাত ঘটনা থেকে সূরাটিকে মাক্কী বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত বেলাল (রা) উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলামের তাওহীদী শিক্ষা ত্যাগ করে মুশরিকী আকীদায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য উমাইয়া যখন হযরত বেলাল (রা)-কে আগুনঝরা রোদের সময় ভয়ানক গরম বালুর উপর শুইয়ে বুকের উপর বিরাট এক পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল, তখন তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ দিয়ে একদিকে তাওহীদের ঘোষণা দিচ্ছিলেন, অপরদিকে এ মহাবিপদে 'আহাদ' শব্দেই আল্লাহকে কাতরভাবে ডাকছিলেন। এ ঘটনা মাক্কী যুগের এবং এ শব্দটি এ সূরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। তাই সূরাটি নিঃসন্দেহে মাক্কী।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। মানুষ আল্লাহকে যে নামেই ডাকুক, সবকিছুর উপর যে একজন মহাশক্তিমান সত্তা আছেন, তা মানবজাতি কোনোকালেই অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে মানুষ অগণিত দেব-দেবী ও বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহর গুণাবলির বিকাশ মনে করে এসবকে আল্লাহর সাথে শরীক বলে ধরে নিয়েছে। অগ্নিপূজা ও সূর্যপূজা থেকে শুরু করে লিঙ্গপূজা পর্যন্ত অসংখ্য শিরকী আকীদা দুনিয়ায় আজো আছে, যেমন সেকালে

ছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এক আল্লাহ'তে বিশ্বাসী বলে দাবি করলেও তারা আল্লাহর নবীগণকে পর্যন্ত আল্লাহর সন্তান বানিয়ে পূজা করার ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহর কিতাবকে মানার দাবিদার হয়েও তারা তাওহীদের বিশুদ্ধ শিক্ষা হারিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় রাসূল (স) যখন হাজারো রকমের শিরকে লিপ্ত মানুষকে খালিস তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই গোটা সমাজই এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়াল। সবার একই প্রশ্ন, 'বাপ-দাদার কাল থেকে যাদের পূজা করে এসেছি তা কি সবই মিথ্যা? তাহলে মুহাম্মদ যাকে একমাত্র মাবুদ মানার দাওয়াত দিচ্ছে, সে সত্তার সঠিক পরিচয় কী?' বিভিন্ন সময় লোক বিচিত্র ধরনের ভাষায় রাসূল (স)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। এমনকি অভদ্র, বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যকর প্রশ্নও করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ সূরাতে অতি সংক্ষেপে স্পষ্ট ভাষায় ঐসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

ফযীলত ও গুরুত্ব

রাসূল (স) থেকে এ সূরা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা এ সূরাটির বিরাট মর্যাদা, ফযীলত ও গুরুত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। এ সূরাটি যেন বেশি বেশি পড়া হয়, সে বিষয়েও যথেষ্ট তাকীদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো তাওহীদ। আর এ সূরাতে অতি সংক্ষেপে তাওহীদের মূল কথাকে এমন কয়েকটি ছোট ছোট আয়াতে শেখানো হয়েছে, যা সহজেই মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং যা বুঝতেও সহজ।

এ সূরার ফযীলত সম্পর্কে সবচেয়ে বিখ্যাত হাদীস হলো এই যে, রাসূল (স) বিভিন্ন সময় বলেছেন, 'এ সূরাটি কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।' মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ কথার অনেক রকম অর্থ করেছেন। একটি অর্থই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। সে অর্থ অনুযায়ী তিন বার এ সূরাটি পড়লে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ একবার পড়ার সওয়াব হয়। অবশ্য রাসূল (স) নিজে এ ধরনের কথা বলেননি। সওয়াব দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। এ ব্যাখ্যা আল্লাহ ঠিক মনে করলে অবশ্যই সওয়াব দেবেন।

যারা এ সূরার মূল আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিত্তিতে ঐ হাদীসের ব্যাখ্যা করেন, তাদের মতে, হাদীসটিতে এ সূরার বিরাট গুরুত্বই বোঝানো হয়েছে। ইসলামের বুনিয়াদি আকীদা তিনটি– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। ঈমানের জন্য যতগুলো বিষয়ে বিশ্বাস করা জরুরি, তার মধ্যে এ তিনটিই আসল ও প্রধান। গোটা কুরআনের বুনিয়াদি শিক্ষাই এ তিনটি। তাই তাওহীদের শিক্ষা কুরআনের বুনিয়াদি তিনটি শিক্ষার মধ্যে প্রথম ও প্রধান। সে হিসেবে তাওহীদের শিক্ষাই কুরআনের মূল শিক্ষার তিন ভাগের এক ভাগ। আর সূরা ইখলাসে ঐ তাওহীদের শিক্ষাই সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। তাই গুরুত্বের দিক দিয়ে এ সূরাটি কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।

রাসূল (স)-এর সময় বেশ কয়েকজন সাহাবী এ সূরাটি খুব বেশি পড়তেন। এমনকি ইমামতি করতে গিয়ে কোনো এক সাহাবী প্রত্যেক রাকাআতে এ সূরা পড়ার পর অন্য সূরা পড়তেন। এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস সম্পর্কে অনেকেই রাসূল (স)-এর মতামত জানতে চান। যাদের সম্পর্কে এ বিষয়ে রাসূল (স)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়, তাদেরকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এ সূরাকে নামাযে এত বেশি বেশি কেন পড়?' তাঁরা সবাই একই ধরনের জবাব দিলেন যে, 'এ সূরাকে আমি খুব মহব্বত করি। কারণ, এতে রহমানের গুণাবলি বয়ান করা হয়েছে।' রাসূল (স) এ কথা শুনে বললেন, 'এ সূরার মহব্বত তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দিল।' আরেকজন সম্পর্কে তিনি বললেন, 'তাকে খবর দিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলাও তাকে মহব্বত করেন।'

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন,[১] তিনিই আল্লাহ,[২] (যিনি) একক (অদ্বিতীয়)।[৩]

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾

২. আল্লাহ সবার কাছ থেকে অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

৩. তাঁর কোনো সন্তান নেই; তিনিও কারো সন্তান নন।*

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾

৪. কেউই তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

১. কাফির ও মুশরিকরা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করত যে, সব মাবুদকে বাদ দিয়ে আপনার যে রবকে একমাত্র মাবুদ বানানোর চেষ্টা করছেন, তিনি কেমন? তাঁর বংশ পরিচয় কী? কী দিয়ে তিনি তৈরি? এ দুনিয়া তিনি কার কাছ থেকে ওয়ারিস হিসেবে পেয়েছেন? আর কে-ই বা তাঁর ওয়ারিস হবে? এসব প্রশ্নের জবাবেই এ সূরা নাযিল হয়।

২. অর্থাৎ, যাকে তোমরাও আল্লাহ নামেই জান এবং যাকে গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা ও রিযিকদাতা বলে মান, তিনিই আমার রব।

৩. 'ওয়াহিদ' শব্দ ব্যবহার না করে 'আহাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ওয়াহিদ' মানে 'এক' আর 'আহাদ' মানে 'অদ্বিতীয়'– যার মতো আর কেউ নেই। একজন মানুষ বা একটি দেশ বললে বোঝা যাবে যে, অনেক মানুষ বা দেশ আছে, যার একটির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ অদ্বিতীয় বলতে বোঝা যায়, তিনি সকল দিক দিয়েই একক, যার সাথে তুলনা করার কেউ নেই বা এ জাতীয় সত্তা আর একটিও নেই। তাই আরবী ভাষায় 'আহাদ' শব্দটি শুধু আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা হয়।

* অর্থাৎ তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

১১৩. সূরা ফালাক ও ১১৪. সূরা নাস

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এ দুটি সূরা আলাদা দু'নামে পরিচিত হলেও বিভিন্ন কারণে সূরা দুটির পরিচিতি একই সাথে দেওয়া হচ্ছে। সূরা দুটির মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আলোচ্য বিষয়েও সূরা দুটোর মধ্যে এত মি রয়েছে যে, দুটোকে মিলিয়ে 'মুআব্বিযাতাইন' (আশ্রয় চাওয়ার দুটো সূরা) নাম দেওয়া হয়েছে। আলাদাভাবে সূরা দুটোর প্রথম আয়াত থেকে 'ফালাক' ও 'নাস' শব্দ দ্বারা এদের নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

বিভিন্ন রকম রেওয়ায়াতের দরুন এ দুটো সূরা মাক্কী না মাদানী, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু সূরা দুটোর ভাব ও ভাষা এবং বাচনভঙ্গি মাক্কী যুগের সূরার অনুরূপ।

মদীনায় ইহুদিরা রাসূল (স)-এর উপর যে জাদু করেছিল, সে জাদু এ দুটো সূরার মাধ্যমে খতম করা হয়েছিল বলেই এ সূরা দুটোকে মাদানী মনে করা জরুরি নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় একই সূরা নতুন করে পেশ করা হয়েছে বলে জানা যায়। তাই এ সূরা দুটি মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে বটে, কিন্তু হিজরতের পর মদীনায় ইহুদিদের জাদুক্রিয়া বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে জিবরাঈল (আ) এ দুটো সূরা পড়ার জন্য রাসূল (স)-কে উপদেশ দেন। সূরা দুটি একই সাথে নাযিল হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মাক্কী যুগে যখন এ দুটো সূরা নাযিল হয়েছে, তখন কুরাইশদের বিরোধিতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যে, রাসূল (স)-এর ইসলামী আন্দোলন যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল মারার কাজ করেছে। এক সময় বিরোধীরা ধারণা করেছিল, কোনো না কোনোভাবে রাসূল (স)-কে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু তারা যখন এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেল তখন দুশমনি চরম আকার ধারণ করল।

বিশেষ করে যেসব পরিবারে কোনো পুরুষ বা নারী, যুবক বা যুবতী ইসলাম কবুল করার দরুন পরিবারের অন্যদের সাথে তাদের বিরোধ চলছিল, কুরাইশদের নেতৃত্বে তাদের দুশমনি আরো বেড়ে গেল। ঘরে ঘরে গভীর রাতে সলা-পরামর্শ চলতে লাগল। রাসূল (স)-কে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলল। নানা রকম জাদু-টোনা করা হলো, যাতে রাসূল (স) অসুস্থ হন বা পাগল হয়ে যান। মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের মধ্যে শয়তান প্রকৃতির সবাই জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে হাজারো রকমের অপপ্রচার চালাতে লাগল। তারা জনগণের মনে এমন সব সন্দেহ ও খারাপ ধারণার সৃষ্টি করতে থাকল, যাতে তারা রাসূল (স) থেকে দূরে সরে থাকে।

আবু জাহ্ল ও অন্য কুরাইশ নেতাদের মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ, রাসূল (স) কুরাইশ বংশের বনূ আবদে মানাফ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর আবু জাহ্ল ও অন্য নেতারা দুনিয়ার সব ব্যাপারেই ঐ শাখার সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিলেন। সব পার্থিব বিষয়েই প্রতিযোগিতা সম্ভব ছিল; কিন্তু নবুওয়াতের বেলায় আবু জাহ্লরা অসহায়বোধ করে চরম হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল।

আলোচ্য বিষয়

এমনই পরিবেশে আল্লাহ তাআলা এ দুটো সূরার মাধ্যমে রাসূল (স)-কে উপদেশ দিলেন যে, আপনি কোনো অবস্থায়ই পেরেশান হবেন না। আপনি আপনার রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন ও

নিরাপত্তা বোধ করুন। বিরোধিতার এ তুফান দেখে আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আপনি নিজেকে অসহায় ও নিরাশ্রয় মনে করবেন না। আপনার রবই আপনার সহায়ক। তাঁর নিকট আশ্রয় চান।

এ দুটো সূরার মাধ্যমে রাসূল (স)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, দুশমনদের সামনে ঘোষণা করে দিন যে, আপনি কোনো মহাশক্তির আশ্রয়ে আছেন এবং সে কারণেই তাদের বিরোধিতার কোনো পরওয়া করেন না।

আলোচনার ধারা

সূরা ফালাকের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি এভাবে ঘোষণা করুন :

'হে আমার দুশমনের দল! তোমরা আমাকে অসহায় ও দুর্বল মনে করছ। আমার উপর দুশমনির কালোরাত চাপিয়ে দিয়ে তোমরা ভাবছ যে, এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায়ই আমার নেই। তোমরা জেনে রাখো যে, তিনিই আমার রব, যিনি অন্ধকার রাত সরিয়ে দিয়ে আলোময় সকাল এনে দেন। তোমরা রাতের বেলায় গোপনে পরামর্শ করে জাদুর সাহায্যে এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে যত রকমেই আমার ক্ষতি করার চেষ্টা কর না কেন, আমার রব আমার আন্দোলনের পথে তোমাদের সৃষ্ট এসব দুশমনির অন্ধকার দূর করে আমার জন্য একদিন সফলতার সকাল অবশ্যই এনে দেবেন, যেমন তিনি রাতের পর দিন এনে থাকেন। আমি ঐ মহাশক্তিমান রবের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। তোমাদের যাবতীয় গোপন ষড়যন্ত্র, জাদু এবং হিংসার অনিষ্ট আমার নাগালই পাবে না।'

সূরা নাসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি এভাবে ঘোষণা করুন :

'হে আমার বিরোধীরা! তোমরা কি জান যে, আমি কার কাছে আশ্রয় নিয়েছি? যিনি গোটা মানবজাতির মনিব, যিনি সকল মানুষের উপর ক্ষমতাসীন বাদশাহ এবং যিনি সব মানুষের ইলাহ হিসেবে স্বীকৃত, তাঁরই নিরাপদ আশ্রয়ে আমি আছি। তাই জিন ও ইনসানের মধ্যে যত রকম শয়তানি খাসলতের লোক আছে, তারা আমার আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণের মনে যত ভুল ধারণাই সৃষ্টি করুক, এর ক্ষতি থেকে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।'

আল্লাহর নিকট রাসূলগণের আশ্রয় চাওয়ার ধরন

আল্লাহ তাআলা যাঁদের উপর রাসূলের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাঁদের নিকট সবচেয়ে মযবুত আশ্রয়ই হলো আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা। তাঁরা দুনিয়ার কোনো শক্তিকে ভয় করেন না। এক আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় ছাড়া অন্য কারো পরওয়া তাঁরা করেন না। তাঁরা জানেন যে, আল্লাহ তাআলাই তাঁদেরকে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তিনিই সকল অবস্থায় তাঁদের সহায়ক। তাই বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত হুমকিই আসুক, তাঁরা এতে কখনো ভীত হন না। অতি কঠিন অবস্থায়ও আল্লাহর আশ্রয়ে আছেন বলে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকেন। ধীরস্থির মনে তাঁরা দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। প্রতিকূল পরিবেশেও তাঁরা পেরেশান হয়ে পড়েন না।

রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের চরম দুশমনির অবস্থায় আল্লাহ তাআলা এ দুটো সূরার মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে ঐ মহা অস্ত্রই দান করেছেন, যার চেয়ে কার্যকর অন্য কোনো অস্ত্র হতে পারে না। সত্যিকারভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার মধ্যে যে পরম নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়, তা আর কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। যদি মনের মধ্যে এ নিরাপত্তাবোধ আছে বলে টের পাওয়া না যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহর কাছে সঠিকভাবে আশ্রয় চাওয়াই হয়নি। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার পর পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে নির্ভরশীল হতে হবে।

আল্লাহর রাসূলগণের জীবনে এ জাতীয় সত্যিকারের আশ্রয় চাওয়ার উদাহরণ গোটা কুরআন মাজীদে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি নমুনার উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে :

১. রাসূল (স) হযরত আবূ বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করার পথে মক্কা থেকে একটু দূরে এক পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নেন। দুশমনের দল রাসূল (স)-কে কতল করার জন্য তালাশে বের হলো। একদল ঐ গর্তের মুখে পৌঁছে গেল। হযরত আবূ বকর (রা) স্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়ে গেলেন, নিজের প্রাণের ভয়ে নয়; রাসূল (স)-এর নিরাপত্তার চিন্তায়। কিন্তু রাসূল (স) একটুও পেরেশান হলেন না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে অভয় দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'

২. উহুদের যুদ্ধে একদল সাহাবীর ভুলের কারণে যখন মুসলিম বাহিনীর প্রাথমিক পরাজয় হলো, তখন রাসূল (স)ও আহত হলেন। দুশমনরা তখন প্রচার করে দিল যে, রাসূল (স) নিহত হয়েছেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় মুসলিমদের মধ্যে যখন দিশেহারা অবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন আহত অবস্থায় রাসূল (স) মুজাহিদদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। সূরা আলে ইমরানের ১৫৩ আয়াতে আল্লাহ তাআলা উহুদের যুদ্ধের পর্যালোচনা উপলক্ষে সে কথার উল্লেখ করেছেন।

৩. মূসা (আ)-এর প্রভাব বেড়ে যেতে দেখে ফিরাউন রাজ-দরবারের লোকদেরকে বলল, 'আমাকে বাধা দিও না, আমি মূসাকে কতল করব।' ফিরআউন মহাশক্তিশালী বাদশাহ আর মূসা (আ)-এর সাথে তাঁর ভাই হারূন (আ) ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাঁদের কাছে আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু ফিরাউনের পক্ষ থেকে হত্যার হুমকি শুনে তিনি অতি শান্তভাবে ঘোষণা করলেন, 'আখিরাতের হিসাব-নিকাশে যেসব অহংকারীরা বিশ্বাস করে না, তাদের অনিষ্ট থেকে আমি অবশ্যই ঐ সত্তার নিকট আশ্রয় নিয়েছি, যিনি আমার রব এবং তোমারও রব' (সূরা মুমিন : ২৭)। এখানে মূসা (আ) স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, 'আমাকে হত্যার ভয় দেখাচ্ছ? আমি তো এমন এক মুনীবের নিকট আশ্রয় নিয়েছি, যিনি আমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাকেও আমার অনিষ্ট করা থেকে ফিরিয়ে রাখার যোগ্যতা রাখেন।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নমরূদ আগুনে ফেলে দেওয়ার ঘোষণা দিল। ইবরাহীম (আ) একবিন্দুও বিচলিত হলেন না। আল্লাহ এ অবস্থা দেখে নিজেই আগুনকে নির্দেশ দিলেন, 'হে আগুন, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও, ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' (সূরা আম্বিয়া : ৬৯)

এসব উদাহরণ আল্লাহ তাআলা গল্প বলার জন্য উল্লেখ করেননি। যারা আল্লাহর দীনকে আল্লাহর জমিনে কায়েম করার উদ্দেশ্যে জান ও মাল কুরবানী দেওয়ার জন্য সত্যিকারভাবে প্রস্তুত, তাদেরকে ঐ মহা কর্ম অবশ্যই হাসিল করতে হবে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় নেওয়ার চেয়ে বড় কোনো নিরাপত্তা নেই। এ নিরাপত্তাবোধ নিয়ে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকলে হাসিমুখে শহীদ হওয়া সম্ভব। এ মনোভাবই মুসলিম সেনাপতির প্রধান অস্ত্র। এ অস্ত্র না থাকলে অন্যান্য অস্ত্র সত্ত্বেও পরাজয় আসবে। আর এ অস্ত্র থাকলে অন্য অস্ত্রের অভাব হলেও বিজয় সম্ভব।

রাসূল (স)-এর উপর জাদুর প্রভাব : এ কথা ঐতিহাসিক সত্য এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মদীনার ইহুদীরা রাসূল (স)-এর এক ইহুদী কর্মচারীর সাহায্যে তাঁর চিরুনি ও মাথার কতক চুল নিয়ে তাতে জাদু করে একটা কুয়ার ভেতর মাটিতে পাথর-চাপা দিয়ে রেখেছিল। অনেক দিনে ধীরে ধীরে এর কুফল দেখা গেল। অবশ্য নবী হিসেবে রাসূল (স)-এর উপর যে পবিত্র দায়িত্ব ছিল, তার উপর জাদুর কোনো প্রভাব পড়েনি। শুধু দৈহিক দিক দিয়ে তিনি রোগা হতে লাগলেন। কোনো কাজ না করেই তিনি

কখনো মনে করতেন যে, করেছেন। হঠাৎ মনে হতো যে, তিনি যেন কিছু দেখেছেন, অথচ তিনি আসলে দেখেননি। জাদুর এ জাতীয় যে প্রভাব দেখা গেল, তা অনুভব করে রাসূল (স) একদিন আল্লাহর নিকট দোআ করতে থাকলেন। এ অবস্থায় একটু ঘুম ঘুম ভাব হলো। জেগেই তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, 'আমার রবকে আমি যে কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।'

রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলেন যে, দু'জন ফেরেশতার একজন আমার মাথার দিকে এবং অন্যজন পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে একে অপরের সাথে আলাপ করার মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, লাবীদ বিন আ'সাম নামক ইহুদী আমার চিরুনি ও চুলে জাদু করে খেজুরের খোসা দিয়ে ঢেকে অমুক কুয়ার মধ্যে পাথর-চাপা দিয়ে রেখেছে। কুয়ার পানি ফেলে ঐ জিনিসটা বের করে নিতে হবে।'

রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-সহ কতক সাহাবীকে সেখান পাঠালেন এবং নিজেও সেখানে গেলেন। জিনিসটা বের করে দেখা গেল যে, চিরুনি ও চুলের সাথে একটা সুতায় এগারোটা গেরো দেওয়া আছে এবং মোমের একটা পুতুলে এগারোটা সুঁই বিঁধানো আছে।

জিবরাঈল (আ) এসে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি 'মুআব্বিযাতাইন' পড়ুন। তিনি এক এক আয়াত পড়তে থাকলেন। সাথে সাথে এক একটা গেরো খোলা হতে লাগল এবং এক একটা সুঁই বের করা হলো। এ দুটো সূরার এগারোটি আয়াত পড়ার সাথে গেরো ও সুঁই খুলে ফেলার পর রাসূল (স) এমন হালকা অনুভব করলেন, যেন তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং এখন সে বন্ধন খুলে দেওয়া হয়েছে।

জাদুর এ ঘটনা হাদীস থেকে এতটুকুই প্রমাণিত। একজন মানুষ হিসেবে অবশ্যই রাসুল (স)-এর দেহের উপর জাদুর প্রভাব পড়েছিল। এ দ্বারা নবুওয়াতের উপর কোনোক্রমেই প্রভাব পড়ার কারণ নেই। তায়েফে তিনি পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তীরের আঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন, এমনকি তার দাঁত পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। একবার তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলেন। এক সময় বিচ্ছুর কামড়ে তিনি বেদনাবোধ করেছিলেন। মানুষ হিসেবে এসব অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রাসূল (স)-এর শরীরে ও মনে যে প্রভাব পড়েছিল, তাতে যদি নবুওয়াতের মর্যাদার কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলে জাদুর কারণে অসুস্থ হওয়ার দরুন নবুওয়াতের উপর কোনোরূপ প্রভাব পড়ার কোনো যুক্তি নেই।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান : এ দুটো সূরামারফত যেভাবে রাসূল (স)-কে জাদুর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করা হলো, তাতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ইসলামে জায়েয। রাসূল (স) নিজেও শোবার সময় এ সূরা দুটি পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে সারা শরীরে হাত বুলিয়েছেন।

আরব সমাজে রোগের চিকিৎসা হিসেবে বা সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কামড়ালে মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করার প্রথা চালু ছিল। রাসূল (স) প্রথমে এসব করা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব দ্বারা মানুষের যে উপকার হচ্ছিল, সে বিষয়ে রাসূল (স)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি দুটো শর্তে অনুমতি দিলেন :

১. মন্ত্রের কথাগুলো অর্থবোধক হতে হবে- তাতে এমন আজে-বাজে কথা থাকতে পারবে না, যা অর্থহীন।

২. মন্ত্রের কথাগুলোতে শিরকের লেশও থাকতে পারবে না এবং তাতে তাওহীদের বিপরীত কোনো কথা থাকা চলবে না।

একবার রাসূল (স)-কে নামাযরত অবস্থায় বিচ্ছু কামড়ে দিয়েছিল। নামায শেষে তিনি লবণ পানিতে মিশিয়ে মালিশ করালেন এবং সাথে সাথে সূরা কাফিরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়তে

থাকলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চিকিৎসা করাতে হবে, কিন্তু রোগমুক্ত করার আসল ক্ষমতা যে আল্লাহর, সে কথা মনে রাখতে হবে। তাই চিকিৎসার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোআ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছে হলে তবেই ওষুধ ও চিকিৎসায় সুফল হবে। শুধু ওষুধেই যদি রোগ সেরে যেত, তাহলে হাসপাতালে কেউ মারা যেত না।

একবার রাসূল (স)-এর অসুখ হলো। হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁকে ঝাড়লেন। তিনি তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে গেলেন। এতে লোকেরা আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি বললেন, 'জিবরাঈল এসে কতক কথা দ্বারা আমাকে ঝেড়েছেন।'

মোটকথা, আল্লাহর নাম নিয়ে বা আল্লাহর কালামের সাহায্যে ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয বলে প্রমাণিত। কিন্তু শুধু এর উপর নির্ভর করা এবং কোনো রকম চিকিৎসার চেষ্টা না করা ঠিক নয়। রাসূল (স) চিকিৎসা করার তাকীদ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা তিনি নিজেও শিক্ষা দিয়েছেন বলে হাদীসে প্রমাণিত। চিকিৎসা এক জিনিস, আর ঝাড়-ফুঁক অন্য জিনিস। চিকিৎসা করতে হবে রোগ-মুক্তির তদবীর হিসেবে। আর ঝাড়-ফুঁক হলো আল্লাহর নিকট দোআ করা, যাতে চিকিৎসায় উপকার হয়।

আল্লাহর নাম ও তাঁর কালাম দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয, এমনকি সুন্নাত হলেও এটাকে চিকিৎসার ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করার কোনো প্রমাণ সাহাবায়ে কেরামের যুগে দেখা যায়নি। যারা ডাক্তারদের মতো দোকান খুলে এ ব্যবসাকে রুজি-রোজগারের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের পক্ষে হাদীসে মযবুত কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতিহা ও এ দুটো সূরার মধ্যে মিল : কুরআন মাজীদ সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এ দুটো সূরা দিয়ে শেষ হয়েছে। যদিও এ দুটো সূরা মাক্কী যুগেই নাযিল হয়েছে, তবু কুরআন মাজীদের সূরাগুলোকে সাজানোর সময় এ সূরা দুটিকে সর্বশেষে রাখা হয়েছে। কুরআন আল্লাহ্ তাআলাই নাযিল করেছেন এবং তিনিই সূরাগুলোকে এভাবে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাই প্রথম সূরা ও শেষ দুটো সূরার এ বিন্যাস তাৎপর্যহীন নয়।

প্রথম সূরাতে রাব্বুল আলামীন, রাহমান ও রাহীম এবং মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের (বিচার দিবসের মালিকের) প্রশংসা করে আল্লাহর বান্দাহ নিবেদন করছে যে, 'আমি একমাত্র তোমরাই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আর সবচেয়ে বড় যে সাহায্য আমার দরকার তা হলো এই যে, আমাকে সরল মযবুত পথে চালাও।

এ দরখাস্তের জবাবে বান্দাহকে সঠিক পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাকে যে কুরআন দান করলেন, তা এ কথা দ্বারা শেষ করা হলো, 'যে মুনীব রাব্বুল ফালাক, রাব্বুন নাস, মালিকিন নাস ও ইলাহিন নাস, তাঁরই নিকট বান্দাহ সবশেষে আরয করছে যে, 'আমি প্রতিটি সৃষ্টির যাবতীয় ফিতনাহ ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তোমারই কাছে আশ্রয় চাই। বিশেষ করে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা কুপরামর্শ দেয়, তাদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার আশ্রয় ছাড়া কুরআনে দেখানো পথে চলার সাধ্য আমার নেই।'

সূরা ফাতিহা ও এ দুটি সূরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অতি স্পষ্ট। কুরআনের শুরু ও শেষ মুনীব ও দাসের সম্পর্ককে কত গভীর করে দিয়েছে! আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এ গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

১-২. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি সকালবেলার রবের[১] নিকট আশ্রয় চাই; যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

৩. আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়।[২]

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤

৪. এবং গিরায় ফুঁক দানকারী (বা ফুঁক দানকারিণী)[৩]-দের অনিষ্ট থেকে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।[৪]

১. অর্থাৎ, ঐ রবের নিকট, যিনি রাতের অন্ধকার দূর করে উজ্জ্বল ও ফর্সা সকাল এনে দেন।

২. কেননা, যুলুম ও অন্যায় সাধারণত রাতেই হয়ে থাকে এবং অনিষ্টকারী জীব-জানোয়ার রাতের বেলাই বের হয়।

৩. এখানে জাদুগীর পুরুষ ও নারী বুঝাচ্ছে, যারা গিরায় ফুঁ দিয়ে জাদু করে।

৪. অর্থাৎ, যখন সে হিংসা করে কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

সূরা নাস

৬ আয়াত, ১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১-২-৩. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের (আসল) মা'বুদের কাছে।

৪. ঐ কুপরামর্শদাতার[১] অনিষ্ট থেকে, যে বারবার ফিরে আসে*।

৫. যে মানুষের মনে কুপরামর্শ দেয়।

৬. সে জিন হোক আর মানুষ হোক।[২]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

১. 'ওয়াসওয়াস' অর্থ যে ফুসলিয়ে বা কুপরামর্শ দিয়ে কুপথে নেওয়ার চেষ্টা করে। 'ওয়াসওয়াসাহ' অর্থ কুমন্ত্রণা। এ থেকেই 'ওয়াসওয়াস' শব্দটি এসেছে।

* 'খান্নাস' অর্থ পলায়নকারী। শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে পালিয়ে যায়, আবার এসে কুমন্ত্রণা দেয়।

২. অর্থাৎ, কুমন্ত্রণাদাতা মানুষ হোক আর জিন (শয়তান) হোক, উভয়ের অনিষ্ট থেকেই আমি আশ্রয় চাই।

সমাপ্ত

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

কুরআন মাজীদ খতমের (সমাপ্তির) দু'আ

হে আল্লাহ! আমার কবরের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতায় আমাকে প্রশান্তি দান করো; হে আল্লাহ! মহান কুরআনের মাধ্যমে আমার উপর রহমত বর্ষণ করো! কুরআনকে আমার জন্য ইমাম, জ্যোতি, পথ-প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ করো! হে আল্লাহ! এর যা কিছু আমি ভুলে যাই তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও! যা কিছু আমি না জানি, তার জ্ঞান আমাকে দান করো! দিন ও রাতে সর্বক্ষণ এর তিলাওয়াতের তাওফীক আমাকে দান করো! হে নিখিল জাহানের রব! কুরআনকে আমার জন্য দলীল (হুজ্জাত) স্বরূপ করো!